শস্য শারীরবিজ্ঞান

নিশীথ কুমার পাল

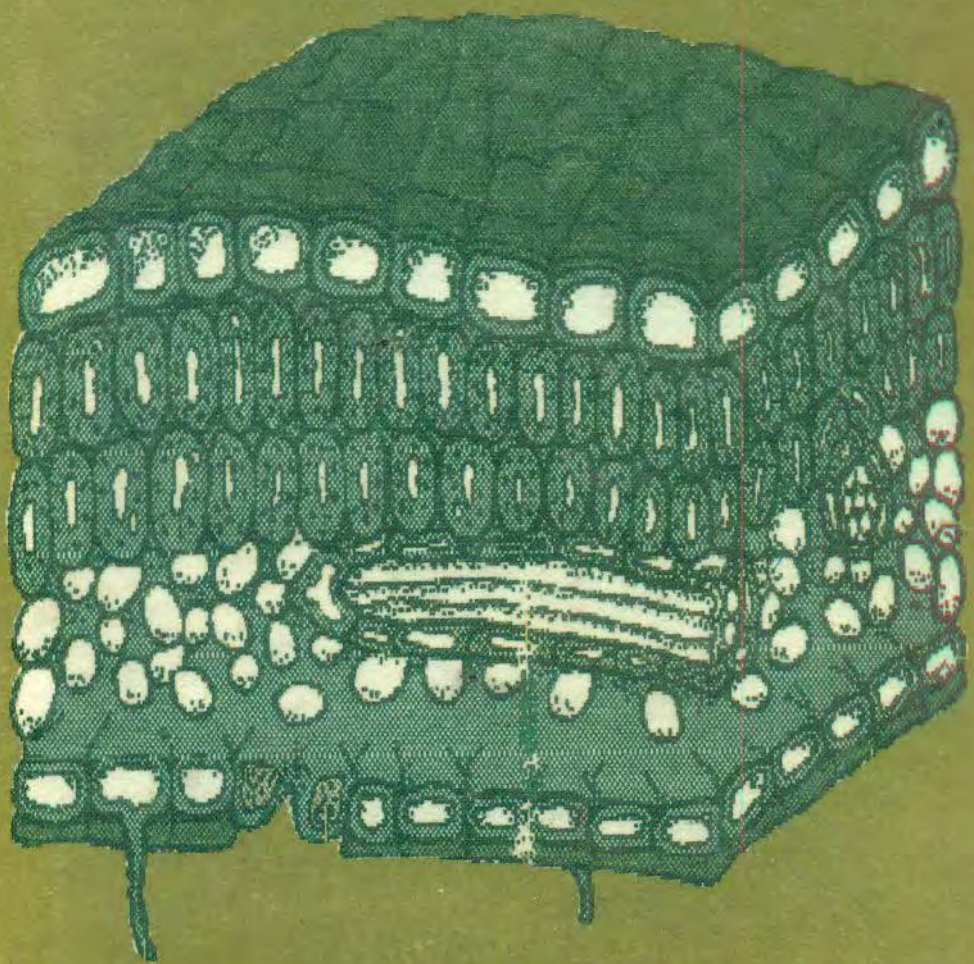

শস্য শারীরবিজ্ঞান (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান ছাড়াও কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, উদ্যানতত্ত্ব ও কৃষি আবহাওয়া বিদ্যা বিষয়ক পাঠ্যসূচির অনুসরণে প্রণীত। ফলন বৃদ্ধিতে শস্য উদ্ভিদের শারীরতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলন বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের উন্নত অবস্থার গঠন ও সংশ্লিষ্ট পরিবেশ বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত মৃত্তিকা ও বায়বীয় পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবক এবং শস্য উদ্ভিদের নিত্য প্রয়োজন পানি ও পুষ্টি গ্রহণ এবং ব্যবহার সম্পর্কিত বিস্তৃত বর্ণনা গ্রন্থটির অন্যতম বিশেষত্ব। কিছুটা উচ্চ পর্যায়ের বর্ণনায় উপস্থাপিত পরিবেশগত পীড়ন সম্পর্কিত আলোচনাও বিশেষ গুরুত্ব রাখে। গ্রন্থটির এই খণ্ডে শস্য উদ্ভিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সুবিস্তৃত বর্ণনা গ্রন্থটির উপযোগিতা বৃদ্ধি করেছে। সর্বোপরি পাঠ্যসূচির বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ প্রণয়নে যথাসম্ভব আধুনিক তথ্য সম্মৃদ্ধকরণ ও প্রমিত বানানে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর ভূমিকা উচ্চ শিক্ষাস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের অভ্যাস গঠনে অগ্রগণ্য

শস্য শারীরবিজ্ঞান

(প্রথম খণ্ড)

ড. নিশীথ কুমার পাল
প্রফেসর
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

BANSDOC Library
Dhaka

বাংলা একাডেমী ঢাকা

BANSDOC Library

শস্য শারীরবিজ্ঞান (প্রথম খণ্ড)
(উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের মৌলিক ও পরিবেশগত বিষয়)

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪০৪/ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

বা/এ ৩৭২১
(৯৭–৯৮ পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি : ১)

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ
জীকৃচি ২৪২

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ মোহসীন

মূল্য
একশত বিশ টাকা

SHASSA SHARIRBIJNAN (Crop Physiology Vol-I) by Dr. Nishit Kumar Paul. Published by Gholam Moyenuddin, Directer, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Edition : February 1998. Price : Tk. 120.00 only.

ISBN 984-07-3730-9

উৎসর্গ

প্রয়াত মেজদা নীলমণি পাল

ভূমিকা

শস্য শারীরবিজ্ঞান উদ্ভিদবিজ্ঞানের একটি নতুন ফলিত শাখা। শস্যের সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাই প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন শস্যের ভাল গুণাবলীসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলছে। এতদসত্ত্বেও শস্যের ফলন একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছানোর পর আর তেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই শস্যের ফলনের এই বাধা অতিক্রমের জন্য বিজ্ঞানীরা শস্যের শারীরতত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

শস্যের শারীরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ সাফল্যের সাথে ব্যবহার করে ভবিষ্যতে হয়তো শস্যের ফলন ও গুণগত মান আরও বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন।

শস্য শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় পুস্তকের সংখ্যা বেশ কম। বাংলায় দুটি খণ্ডে প্রকাশিত শস্য শারীরবিজ্ঞানের গ্রন্থ দুটিই এই বিষয়ে আমার প্রথম পুস্তক। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বিভিন্ন পুস্তক, বিজ্ঞান সাময়িকী এবং আমার গবেষণা কর্মের অভিজ্ঞতার আলোকে পুস্তকটি লেখা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখিত পুস্তকগুলো থেকে আমি অনেক সাহায্য নিয়েছি।

শস্য শারীরবিজ্ঞান (১ম খণ্ড) গ্রন্থে শস্য উদ্ভিদের শারীরতত্ত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত মৃত্তিকা ও বায়বীয় পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবক এবং শস্য উদ্ভিদের পুষ্টি ও পানি গ্রহণ সম্পর্কিত বর্ণনা সাতটি অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝার সুবিধার্থে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের ব্যবহার বহুলাংশে পরিহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লিখিত পুস্তক থেকে তথ্য পাওয়া যাবে।

পুস্তকটি লেখার ব্যাপারে বন্ধুবর ড. শ্যামল কুমার রায়, সহযোগী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট উৎসাহ যুগিয়েছেন, তাঁকে অনেক ধন্যবাদ। আমার স্ত্রী দেবশ্রী এবং প্রাক্তন ছাত্র দিবাকর কুমার সরকার ও অরুণ কুমার দাশ চিত্রের ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। তাঁদের কাছে আমি ঋণী। আমার স্ত্রী ও পুত্রদ্বয় পুস্তকটি লেখার সময় সুখময় পরিবেশ সৃষ্টি করে আমাকে সহায়তা করেছে, তাদেরকে ধন্যবাদ।

পরিশেষে, পুস্তকটি সার্বিক তত্ত্বাবধানে সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নিশীথ কুমার

Library
Dhaka

সূচিপত্র

প্রথম	অধ্যায়	:	সাধারণ আলোচনা	১
দ্বিতীয়	অধ্যায়	:	মৃত্তিকা পরিবেশ	২৪
তৃতীয়	অধ্যায়	:	বায়বীয় পরিবেশ	৪৪
চতুর্থ	অধ্যায়	:	পানির সরবরাহ ও ব্যবহার	৯৮
পঞ্চম	অধ্যায়	:	শস্য উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি	১২২
ষষ্ঠ	অধ্যায়	:	পরিবেশগত পীড়ন	১৫৩
সপ্তম	অধ্যায়	:	সালোকসংশ্লেষণ, অন্ধকার শ্বসন এবং আলোক শ্বসন	১৮৬
			তথ্যপঞ্জি	২২২
			গ্রন্থপঞ্জি	২৪৬

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ আলোচনা

শস্য হলো একক উদ্ভিদের সমাবেশ যা সাধারণত একই প্রজাতিভুক্ত এবং জিনের সংগঠনে ও মোটামুটিভাবে একই প্রকার এবং এটি মানুষের প্রয়োজনীয় কোনো দ্রব্যের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় জন্মানো হয়।

শস্য কতকগুলো উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা– প্রাথমিক প্রোপাগিউলের (primary propagules) আকার, সংখ্যা ও প্রকৃতি, অন্টোজেনির সময়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও কার্যকারিতা এবং যে পরিবেশে এ ঘটনাগুলো ঘটে যথা– বহিস্থ: পরিবেশ এবং সহযোগী উদ্ভিদের আকার, গঠন ও সজ্জাবিন্যাসের জন্য পরিবর্তিত পরিবেশ। এ সকল উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া এবং তাদের ফলাফল অর্থাৎ শস্যের ফলন এবং গুণগত মান হলো শস্য শারীরবিজ্ঞানের মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

গোড়ার দিকে উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞানীগণ উদ্ভিদে কিভাবে জৈবিক কার্যকলাপ সংঘটিত হয় তা জানার জন্য কতকগুলো পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। পরবর্তী সময়ে এই পদ্ধতিগুলোকে (যেমন- সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন ইত্যাদি) গভীরভাবে জানার জন্য ব্যাপক গবেষণা চলতে থাকে। এ সমস্ত গবেষণালব্ধ বিশাল জ্ঞানকে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করা হয় ; যেমন- অণুজীববিদ্যা, কোষ জীববিদ্যা, প্রাণ-রসায়ন, প্রাণ-পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞান। এ সময় প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত উদ্ভিদ সম্প্রদায় ও তাদের উপর নির্ভরশীল সহযোগী জীবসমূহের উপর পরিবেশের কি প্রভাব আছে তা জানার জন্য গবেষণা পরিচালিত হয় যা পরবর্তীকালে পরিবেশতত্ত্বের বিষয়বস্তু হয়। প্রকৃতপক্ষে, উদ্ভিদ পরিবেশতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞানের মধ্যভাগে শস্য শারীরবিজ্ঞানের অবস্থান। প্রাকৃতিক পরিবেশে শস্য জন্মানোর সময় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সাথে শস্যের শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতির কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা উদ্‌ঘাটন করাই শস্য শারীরবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। একে পরিবেশ বিজ্ঞান না বলে শারীরবিজ্ঞান বলা হয়। কারণ উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ ব্যতীত অন্য সকল জীবের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনা করা হয় না।

শস্য উদ্ভিদ জমিতে বপনের পর থেকে শস্যকর্তন পর্যন্ত– এই দীর্ঘ সময় ধরে এদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটতে থাকে। তবে উল্লেখ্য যে, বীজ অথবা অঙ্গজ প্রোপাগিউল, যা কৃষকেরা মাঠে বপন করে, তা সম্পূর্ণ পৃথকীকৃত একক। প্রত্যেকটি এককে নির্ধারিত বংশগতীয় কমপ্লিমেন্ট থাকে, একক বা একাধিক কেন্দ্রীয় অক্ষ (axis) আছে এবং খাদ্যও মজুদ থাকে। মৃত্তিকা ভেদ করে চারাগাছ বের হওয়ার পর এটি স্বভোজী হয়। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানির মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে এবং মূল কর্তৃক খনিজ মৌল উপাদানও পরিশোষিত হয়। এ অবস্থায় শস্যকে একক জীবের সমষ্টি হিসেবে গণ্য করা যায় যা সুবিস্তৃত কারখানার ন্যায় আচরণ করে। এই কারখানায় উৎপন্ন কিছু দ্রব্য পুনরায় নতুন যন্ত্রপাতি উৎপাদনে অংশ নেয়, কিছু দ্রব্য দৈহিক গঠনে অংশগ্রহণ করে এবং কিছু পরিমাণ দ্রব্য সঞ্চিত হয়। কতগুলো শস্য এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়, এবং প্রত্যেকের কাজের হারের উপর প্রাত্যহিক প্রকৃত উৎপাদন নির্ভর করে। তাই কোনো সময়ে একক উদ্ভিদের আকার, আয়তন ও নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার হার নির্দেশ

করে প্রাত্যহিক উৎপাদনের পরিমাণ; প্রাত্যহিক উৎপাদনের হার ও বিভিন্ন অঙ্গে এদের আনুপাতিক স্থানান্তর নির্ভর করে পরিবেশ ও অন্তঃস্থ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের উপর। প্রকৃতপক্ষে, পরিবেশ ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক শস্যের সমগ্র বিকাশকাল ব্যাপী চলে।

ভেরিয়েশন বা ভেদ

বিভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকেই ভেদ বা বিভিন্নতা বলে। যেক্ষেত্রে উদ্ভিদে উদ্ভিদে এই পার্থক্য বংশপরম্পরায় স্থায়ী হয় এবং বিভিন্ন পরিবেশে এই পার্থক্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তাকে বংশগতীয় ভেরিয়েশন বলে। যদি কোনো প্রজাতিকে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে জন্মানোর ফলে তাদের মধ্যে ভেরিয়েশন হয়, তাকে পরিবেশগত ভেরিয়েশন বলে।

ভেরিয়েশন ঘটার আরও একটি উৎস আছে যার আবির্ভাব ঘটে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের সময়। এই ভেরিয়েশন দ্বারা উদ্ভিদের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন বুঝায়। এই জাতীয় অন্টোজেনেটিক পরিবর্তন কখনও কখনও এমন নাটকীয়ভাবে ঘটে—যেমন কাণ্ডের শীর্ষদেশ অঙ্গজ অবস্থা হতে পুষ্পীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হয়—তখন একপ্রস্থ জিনের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয় এবং অপর একপ্রস্থ জিনকে সক্রিয় করে তোলে। অন্যান্য পরিবর্তন খুবই নমনীয় এবং এগুলো সময়ের তালে তালে প্রতিফলিত হয়। তবে অন্টোজেনেটিক পরিবর্তনের কারণ যাই হোক না কেন, সাধারণত এই পরিবর্তন বেশ ব্যাপক। এর ফলে একটি পরিবেশীয় প্রকরণের প্রভাবে উদ্ভিদের ভিন্নতা দেখা দেয়। অপর ফল হলো, একই বংশগতীয় গঠনযুক্ত পপুলেশনের সদস্যদের মধ্যে একই পরিবেশে ভিন্নতা দেখা যায়।

মেরিস্টেমের গুরুত্ব (Importance of Meristem)

নির্দিষ্ট অঞ্চলে কোষের বিভাজন, প্রসারলাভ এবং পৃথকীকরণের মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সংঘঠিত হয়। কোষের প্রসারতা ও পৃথকীকরণের ভিন্নতার কারণে উদ্ভিদ অঙ্গের আকারের দৃশ্যমান পার্থক্য হয়। কোষ বিভাজন, কেন্দ্রের সংখ্যা, কার্যকারিতা এবং স্থায়ীত্বের উপর একটি অঙ্গের সাধারণ গঠন এবং আকারের প্রায় সকল রকম পার্থক্য ঘটে। ভ্রূণের মূল ও বিটপের অগ্রভাগে অবস্থিত মেরিস্টেম বীজ বপনের পর কার্যক্ষমতা ফিরে পায় এবং উদ্ভিদের প্রায় সারা জীবন এটি অক্ষুণ্ণ থাকে। কাণ্ডের ক্ষেত্রে, ফুলের উৎপত্তির ফলে বৃদ্ধি সাময়িক বন্ধ থাকে ; কোষ বিভাজনের জন্য প্রাথমিক কাণ্ডের অক্ষ গঠিত হয়। একইভাবে পাতার প্রাইমোরডিয়াতে কোষ বিভাজন হয়। উৎপত্তির পর থেকেই পাতার মেরিস্টেম অবিরত বিভাজিত হয় ; কিন্তু এর ক্রিয়ার স্থায়ত্ব সীমাবদ্ধ, ফলে পাতা হয় সীমিত বৃদ্ধির অঙ্গ। কাক্ষিক মুকুলের ক্ষেত্রে মুকুলটির জন্মলাভের পর বৃদ্ধি চলতে থাকে এবং নতুন পাতা ও মুকুল প্রাইমোরডিয়ার জন্ম দেয় এবং কিছুকাল পর বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এই বৃদ্ধি পুনরায় ঘটতে পারে আবার নাও পারে। যদি ঘটে, তবে এটি শাখা অথবা গৌণ-কাণ্ড অক্ষে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে ক্যাম্বিয়ামের উৎপত্তির ফলে নতুন মেরিস্টেমের জন্ম হয় যা উদ্ভিদের জীবনের চিরস্থায়ী। অসংখ্য পার্শ্বীয় মূলের জন্ম হয় যার শীর্ষে স্থায়ী মেরিস্টেম ও পশ্চাতে ক্যাম্বিয়াম মেরিস্টেম থাকে। পাতা, ফুল ও ফলের মেরিস্টেমের স্থায়ীত্বকাল বেশ কম।

পাতার প্রাইমোরডিয়ার উৎপত্তি হয় কাণ্ডের বাইরের স্তরের কোষ হতে। ফুলের প্রাইমোরডিয়া কাণ্ডের সকল স্তর হতে জন্মায় এবং এক্ষেত্রে কাণ্ডের অক্ষের বৃদ্ধি বন্ধ থাকে। কারণ কাণ্ডের অগ্রভাগে ফুল জন্মায়। যদি অধিকাংশ অক্ষের ফুল একই সঙ্গে ফোটে, তাহলে শীঘ্রই উদ্ভিদটি মারা যায়। যদি এটি বৃদ্ধির প্রথম বছর ঘটে, তবে এসকল উদ্ভিদকে বর্ষজীবী এবং দ্বিতীয় বছর ঘটলে দ্বি-বর্ষজীবী উদ্ভিদ বলে। প্রকৃত বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের অনেক অঙ্গজ কাণ্ড শীর্ষে থাকে ;

এদের মধ্যে প্রজাতির কিছু উদ্ভিদের শীর্ষ ফুলে ফুলে বিকশিত হয়। কিছু প্রজাতির উদ্ভিদ, যেমন শতাব্দী উদ্ভিদ বহু বছর পরে ফুল ধারণ করে এবং এক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের শীর্ষদেশে ফুল হয়। ফলে পুষ্পধারণের পর উদ্ভিদটি শুকিয়ে মরে যায়। অন্যান্য প্রজাতির, যেমন টমেটোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যখন শীর্ষস্থ মেরিস্টেম হতে পুষ্পমঞ্জরীর জন্ম হয়, তখন নিম্নস্থ মুকুল বিকশিত হয়ে অঙ্গজ বিটপের জন্ম দেয়। যদিও কিছুদিন পর এই মুকুলও ফুলের জন্ম দেয়।

নিচে কোষের গড় আয়তন ও শুষ্ক ওজনের পরিসংখ্যান উপস্থাপিত হলো।

পূর্ণাঙ্গ কোষ	মূল	পাতা
আয়তন (ঘন মাইক্রোমিটার)	২×১০^{৫}	৩×১০^{৪}
শুষ্ক ওজন (মাইক্রোগ্রাম)	৬	৮

শুষ্ক ওজন হলো প্রায় $\frac{১}{৩}$ অংশ কোষ প্রাচীর (সেলুলোজ, পেকটিন ইত্যাদি), $\frac{১}{৩}$ অংশ প্রোটিন এবং $\frac{১}{৩}$ অংশ অন্যান্য বস্তু।

ভাজক কলা : পূর্ণাঙ্গ কোষের আয়তনের প্রায় $\frac{১}{১০}$ অংশ এবং শুষ্ক ওজনের $\frac{১}{১০}$ অংশ।

বৃদ্ধি, ডিফারেনসিয়েশন এবং কোঅর্ডিনশন (Growth, Differentiation and Coordination)

সুনির্দিষ্ট কতকগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভিদের আকার ও আকৃতির বৃদ্ধি ঘটে। আকারের মাপকাঠি হলো উচ্চতা, আয়তন, সজীব ওজন, শুষ্ক ওজন ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্যে শুষ্ক ওজন সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য, কেননা পানির পরিমাণের স্বল্পকালীন পরিবর্তন এক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না এবং বায়োমাসে কি পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকে শুষ্ক ওজন তার একটি ভাল নির্দেশক। যেমন, অধিকাংশ শুষ্ক ওজন সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য, কেননা পানির পরিমাণের স্বল্পকালীন পরিবর্তন এক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না, ওজন তার একটি ভাল নির্দেশক। যেমন অধিকাংশ শুষ্ক কলায় (অতি উচ্চ প্রোটিন অথবা ফ্যাটি সঞ্চিত বীজ ব্যতীত) সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ প্রায় $১\cdot৭৪\times১০^{৭}$ জুল প্রতি কেজিতে।

সাধারণভাবে উল্লেখ যায় যে, অন্তঃস্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোষ, কলা ও অঙ্গে ডিফারেনসিয়েশন ঘটে। যে পরিবেশীয় প্রকরণের পরিবর্তনের মধ্যে শস্য উদ্ভিদ জন্মে তাতে সাধারণত এগুলোর আকৃতির পরিবর্তন খুব কম হয়। আকারের পরিবর্তন এবং কোনো নির্দিষ্ট আকারে পৌঁছাতে সময়ের অর্থাৎ বৃদ্ধির হারের পার্থক্য প্রধান। তবে এর সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম আছে যেমন পুষ্পায়ন, শাখায়ন, অঙ্গজ সঞ্চিত অঙ্গ যেমন– কন্দ তৈরি এবং বীজ ও ফলে বিভিন্ন পদার্থের আনুপাতিক স্থানান্তর, এর ফলে গুণগত মানের ভিন্নতা হয়। তবে এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে উদ্ভিদ–হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শস্যের শ্রেণীবিন্যাস

বিভিন্নভাবে শস্যের শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। যেমন, (১) কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবহার (agronomic use), (২) বিশেষ উদ্দেশ্য (special purpose), (৩) বৃদ্ধিস্বভাব (growth habit) অথবা জীবন চক্র

(life cycle), (৪) পত্র ধারণের স্থায়িত্ব (leaf retention),(৫) গঠন এবং আকৃতি (structure and form), (৬) জলবায়ুগত অভিযোজন (climatic adaptation), (৭) ব্যবহারগত (usefulness), (৮) আলোকশ্বসনিক ধরন (photorespiratory type), (৯) ফটোপিরিওডিক ধরন (photoperiodic type), (১০) তাপমাত্রাগত (temperature type) এবং (১১) উদ্ভিদতাত্ত্বিক (botanical)।

১. কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবহার

এক্ষেত্রে শস্যের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। যেমন–

(ক) **দানাশস্য** (Cereals): এটি এক প্রকার ঘাস ; ভক্ষণযোগ্য বীজের জন্য এগুলো জন্মানো হয়। ধান, গম, যব ইত্যাদি দানাশস্যের উদাহরণ।

(খ) **ডালজাতীয় শস্য** (Pulses) : যেমন– মটর, মশুর, ছোলা ইত্যাদি।

(গ) **গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত শস্য** (Forage crops) : এটি সজীব অথবা সংরক্ষিত অবস্থায় গবাদিপশুর খাদ্য। ধান, লেগুম, ব্রুসিফার ইত্যাদি।

(ঘ) **মূলীয় শস্য** (Root crops) : স্ফীত মূলের জন্য এই জাতীয় শস্য ব্যবহার করা হয়। যেমন– মিষ্টি আলু, ক্যাসাভা, ইয়াম, সুগারবিট, গাজর, শালগম ইত্যাদি।

(ঙ) **তন্তু উৎপাদনকারী উদ্ভিদ** (Fibre crops) : যেমন– পাট, তুলা, শনপাট, র‍্যামি (ramie), তিশি (flax) ইত্যাদি।

(চ) **টিউবার শস্য** (Tuber crops) : যেমন– গোল আলু।

(ছ) **চিনি উৎপাদনকারী শস্য** (Sugar crops): যেমন– আখ এবং সুগারবিট। এগুলোর মিষ্টি রস থেকে চিনি উৎপাদন করা হয়।

(জ) **তেল উৎপাদনকারী শস্য** (Oil crops) : যেমন– সরিষা, রাই, বাদাম, সয়াবিন, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

(ঝ) **ওষুধ উৎপাদনকারী শস্য** (Drug crops) : যেমন– কালমেঘ, কুচি, স্বর্পগন্ধা ইত্যাদি।

(ঞ) **রবার উৎপাদনকারী শস্য** (Rubber crops) : যেমন– *Hevea brasilensis*।

২. বিশেষ উদ্দেশ্যে শ্রেণীবিন্যাস

অনেক কৃষিবিদ শস্য উদ্ভিদকে বিশেষ উদ্দেশ্যে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। যেমন–

(ক) **কভার শস্য** (Cover crops) : সাময়িকভাবে মৃত্তিকাকে ধরে রাখার জন্য কভার শস্য বপন করা হয়। আলফালফা, ক্লোভার, সয়াবিন, কাউপি, রাই (rye) এবং বাফহুইট গুরুত্বপূর্ণ কভার শস্য। মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য কভার শস্য সবুজ অবস্থায় চাষ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে তাকে সবুজ সার বলে।

(খ) **ক্যাচ শস্য** (Catch crops) : অন্য শস্যের পরিবর্তে বেশ দেরিতে অথবা নির্দিষ্ট শস্য নষ্ট হয়ে গেলে ক্যাচ শস্য বপন করা হয়। স্বল্পকালস্থায়ী শস্য যেমন– মিলেট এবং বাকহুইট এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

(গ) **সঙ্গী শস্য** (Companion crops) : এগুলো নার্স (nurse) শস্য নামেও পরিচিত। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সুবিধার জন্য দুটি শস্য একত্রে বপন করা হয় এবং সাধারণত নতুন কোনো শস্য থেকে প্রথম বর্ষে কিছু ফলন পাওয়ার আশায় এটি করা হয়। আলফালফার সাথে জইকে (oats) সঙ্গী শস্য হিসেবে বপন করলে, প্রথম বছরে আলফালফা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ের মধ্যেই জই–এর দানা সংগ্রহ করা যায়।

(ঘ) **সাইলেজ শস্য** (Silage crops) : যে সমস্ত শস্য রসালো অবস্থায় আংশিকভাবে গাঁজনের (fermentation) বায়ুরোধী আধারে রেখে দেয়া হয়, তাকে সাইলেজ শস্য বলে। যেমন ভুট্টা, সরগাম, ফরেজ ঘাস ও লেগুম।

(ঙ) **সয়েলিং শস্য** (Soiling crops) : এগুলো সবুজ অবস্থায় কেটে পশুদিগকে খাওয়ানো হয়। যেমন-- লেগ্যুম, ঘাস, কেল, ভুট্টা।

(চ) **ট্র্যাপ শস্য** (Trap crops) : কতকগুলো ক্ষতিকারক পোকামাকড় ধরার জন্য এই শস্য বোনা হয়। এই উদ্দেশ্য শেষে এগুলোকে চাষ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয় অথবা তুলে ফেলা হয়।

৩. বৃদ্ধিস্বভাব অথবা জীবনচক্র অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস

জীবনচক্র অনুসারে শস্যকে গ্রীষ্মকালীন বর্ষজীবী (Summer annual), শীতকালীন বর্ষজীবী (Winter annual), দ্বি–বর্ষজীবী এবং বহুবর্ষজীবী বলা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ খাদ্যশস্য বর্ষজীবী এবং এদের মধ্যে কোনোটি গ্রীষ্মকালীন বর্ষজীবী ও কোনোটি আবার শীতকালীন বর্ষজীবী। যেমন বসন্তকালীন গম বসন্তকালে বপন করে গ্রীষ্মের শেষে ফসল সংগ্রহ করা হয়। এগুলো গ্রীষ্মকালীন বর্ষজীবী।

অপরদিকে, শীতকালীন গম হেমন্তকালে বপন করা হয় এবং পরের বছরের গ্রীষ্মের শুরুতেই এদের জীবন চক্র সম্পূর্ণ হয়। এদেরকে শীতকালীন গম বলা হয়। বর্ষজীবী উদ্ভিদ এক বছরের মধ্যেই জীবন চক্র সম্পূর্ণ করে। দ্বি–বর্ষজীবী উদ্ভিদ এক বছরের মধ্যেই জীবন চক্র সম্পূর্ণ করে না। দ্বি-বর্ষজীবী শস্যের জীবন চক্র সম্পূর্ণ করতে দুই বছর সময় লাগে। সাধারণত প্রথম বর্ষে এটি মূল ও কাণ্ডের সঞ্চয়ী অঙ্গে খাদ্য জমা করে এবং দ্বিতীয় বর্ষে পুষ্পায়ন এবং বীজ উৎপাদন হয়। শালগম ও হলুদ দ্বি-বর্ষজীবী সুইট, ক্লোভার, সুগারবিট, গাজর, পেঁয়াজ, বাঁধাকপি ইত্যাদি দ্বি-বর্ষজীবী শস্য। বহুবর্ষজীবী শস্যের জীবন চক্র সম্পূর্ণ করতে দু'য়ের অধিক বছর সময় লাগে এবং এদের কোনো কোনো অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারে। কোনো কোনো শস্য নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বর্ষজীবী, কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বহুবর্ষজীবী। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো তুলা এবং সরগাম।

৪. পত্র ধারণ স্থায়িত্বের শ্রেণীবিন্যাস

মাঠ শস্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পত্র পতন দেখা যায় না, তবে অনেক বৃক্ষের শীতকালে পাতা পতন হয়। এদেরকে পর্ণমোচী উদ্ভিদ বলে। চিরহরিৎ বৃক্ষের পাতা সবসময় সবুজ থাকে।

৫. গঠন ও আকৃতিগত শ্রেণীবিন্যাস

অধিকাংশ মাঠ শস্য বীরুৎ জাতীয় --- নরম এবং রসালো ও গৌণ কলা থাকে না বললেই চলে। কাষ্ঠল বৃক্ষের প্রচুর পরিমাণে গৌণ কলা, বিশেষ করে জাইলেম থাকে।

৬. জলবায়ুগত শ্রেণীবিন্যাস

নিরক্ষরেখা বরাবর যেসকল শস্য জন্মে তাদেরকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় শস্য বলে এবং [illegible] অক্ষাংশ বরাবর শস্যকে নাতিশীতোষ্ণ শস্য বলা হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও নাতিশীতোষ্ণ

অঞ্চলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উৎপন্ন শস্যকে সাব-ট্রপিক্যাল শস্য বলে। বাংলাদেশের অবস্থান সাব-ট্রপিকাল এলাকায়।

৭. ব্যবহারগত শ্রেণীবিন্যাস

ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে শস্যকে ব্যবহারোপযোগী, ব্যবহারের অনুপোযুক্ত এবং ক্ষতিকারক এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। আগাছা মাঠশস্যের জন্য ক্ষতিকারক ; কেননা আলো, বাতাস, পানি, খনিজ উপাদান ইত্যাদির জন্য শস্যের সাথে আগাছা প্রতিযোগিতা করে।

৮. আলোকশ্বসনিক শ্রেণীবিন্যাস

C_3 শস্যে, যেমন– ধান, গম, সয়াবিন, সরিষা ইত্যাদিতে আলোকশ্বসন আছে। কিন্তু C_4 শস্যে, যেমন– ভুট্টা, সরগাম, ইক্ষু ইত্যাদিতে আলোকশ্বসন নাই।

৯. ফটোপিরিওডিক শ্রেণীবিন্যাস

গম, জই, যব, রাই (rye)-এ দিবাদৈর্ঘ্য ১৪ ঘন্টার বেশি না হলে পুষ্পায়ন হয় না ; ১৪ ঘন্টার কম হলে অঙ্গজ অবস্থায় থাকে। এদেরকে দীর্ঘ–দিবালোক প্রাপ্ত শস্য বলে। ধান, সরগাম, ভুট্টা, সয়াবিনে দিবাদৈর্ঘ্য ১৪ ঘন্টার কম হলে পুষ্পায়ন হয়। এদেরকে স্বল্পদিবালোকপ্রাপ্ত শস্য বলে। আবার কতকগুলো শস্যের পুষ্পায়নে দিবালোকের কোনো ভূমিকা নাই। এদেরকে দিবালোক নিরপেক্ষ শস্য বলে।

১০. তাপমাত্রাগত শ্রেণীবিন্যাস

শস্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য হয় নিম্ন তাপমাত্রা না হয় উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। এদেরকে যথাক্রমে ঠাণ্ডা এবং উষ্ণ–মৌসুমের শস্য বলে। যেমন– গম, যব, রাই (rye) এবং অনেক লেগুম ঠাণ্ডা–মৌসুমের এবং ভুট্টা, সরগাম উষ্ণ–মৌসুমের শস্য।

১১. উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাস

উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাসতত্ত্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই শ্রেণীবিন্যাস পুস্তকের আলোচনা বহির্ভূত।

শস্য উদ্ভিদের উৎপত্তি

অনুমান করা হয় যে, সকল আবাদি উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে বন্য জাত থেকে। তবে উৎপত্তির সঠিক সময় ও স্থান এবং অনেক শস্যের প্রকৃত পূর্বপুরুষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ শস্য উদ্ভিদ প্রাগৈতিহাসিক যুগে অতীব আদিমভাবে জন্মাতো। চাষাবাদের সূত্রপাত হয়েছে প্রায় দশ হাজার বছর আগে, যখন প্রাচীনকালের মানুষ পশু শিকার ছাড়াও খাদ্যের উৎস বাড়ানোর জন্য তাদের চারপাশে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মাতো তাদের মধ্য থেকে কতকগুলো উদ্ভিদ বাছাইয়ের মাধ্যমে। প্রাচীনকালের অনেক উদ্ভিদ বর্তমানেও চাষাবাদ করা হচ্ছে, তবে অনেক উন্নত অবস্থায়। প্রাচীনযুগের মানুষের কাছে যে সমস্ত উদ্ভিদ অজানা ছিল, সেগুলোও শতাব্দীর আবর্তে বর্তমানে চাষাবাদ করা হচ্ছে। এর অনেক পর মানুষের মধ্যে পরিবেশের সৌন্দর্যপ্রিয়তা জাগ্রত হয়, তখন আবাদি উদ্ভিদের তালিকায় পুষ্প উৎপাদনকারী উদ্ভিদ, লনের জন্য ঘাস এবং ছায়া প্রদানকারী উদ্ভিদ স্থান পায়।

মানুষসহ সকল জীবের খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত খাদ্যশস্যের কখন এবং কোথায় [illegible] সে সম্পর্কে কতিপয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। সুইস উদ্ভিদবিজ্ঞানী Alphonse Decandolle *Origin of Cultivated Plants* শীর্ষক একটি পুস্তক [illegible] সংস্করণ ১৮৩৩ সালে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। [illegible] ১৯৯টি শস্য পুরাতন বিশ্বে (old world) এবং ৪৫টি আমেরিকায় উৎপন্ন হয়। পশ্চিম গোলার্ধে উৎপত্তি হয় ভুট্টা, আলু, মিষ্টি আলু, বাদাম, সূর্যমুখী এবং তামাক। ইউরেশিয়াতে গম, যব, রাই, ধান, সয়াবিন, সুগারবিট, ইক্ষু এবং গবাদিপশুর খাদ্যের জন্য অধিকাংশ ঘাস ও লেগুম। সরগাম, কাউপি, ইয়াম, পার্ল মিলেটের উৎপত্তি হয় আফ্রিকাতে। তুলার উৎপত্তি উভয় গোলার্ধেই হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত রাশিয়ান বংশগতিবিদ Nikolai Vavilov ১৯১৬ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত শস্যের উৎপত্তির উপর গবেষণামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন। পৃথিবীর বহু জায়গায় ঘুরে তিনি হাজার হাজার উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ করেন। এই গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তিনি *The Origin, Variation, Immunity and Breeding of Cultivated Plants* শীর্ষক পুস্তক প্রণয়ন করেন। রাশিয়ান ভাষা থেকে অনুবাদ করে ইংরেজীতে এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। Vavilov মন্তব্য করেন যে, নিম্নলিখিত ৮টি কেন্দ্রে আবাদি উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে :

১. চীন, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চল : সয়াবিন, যব, জই, বাকহুইট, ইক্ষু ইত্যাদি ১৩৬টি প্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে।

২. বার্মাসহ ভারত : ধান, তুলা, কাউপি সহ ১১৭টি প্রজাতি।

৩. মধ্য এশিয়া : গম, তুলা, সিসেম, হেম্প,মটর, মশুরসহ ৪২টি প্রজাতি।

৪. নিকট প্রাচ্য (এশিয়া মাইনর ও ইরানসহ) : গম, যব, (দুই সারিবিশিষ্ট), রাই, জই,আলফালফাসহ ৮৩টি প্রজাতি।

৫. ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল : ডুরাম, এমার এবং স্পেল্ট গম, বিটু, যব, [illegible] প্রজাতি।

৬. পূর্ব আফ্রিকার ইথিওপিয়া-সোমালিল্যান্ড অঞ্চল : যব (ছয় সারিবিশিষ্ট), ডুরাম গম, সরগাম, মিলেট, রেড়ি, ছোলা, মশুর, কফিসহ ৩৮টি প্রজাতি।

৭. দক্ষিণ মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকা : ভুট্টা, উচ্চ ভূমির তুলা, মিষ্টি আলুসহ ৪৯টি প্রজাতি।

৮. দক্ষিণ আমেরিকা,বিশেষ করে পেরু, বলিভিয়া ও ইকুয়েডর অংশ : আলু, চীনাবাদাম, টমেটোসহ ৪৫টি প্রজাতি।

পরবর্তী বছরগুলোতে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলাফল Vavilov-এর এইসব কেন্দ্রের অবস্থান প্রমাণ করেছে।

সাম্প্রতিককালে শস্য উদ্ভিদের উৎপত্তি সম্পর্কে মানব ভূগোলবিদ Carl Sauer প্রণীত *Agricultural Origins and Dispersals*, Jack Harlan প্রণীত *Crops and Man* এবং Barbara Bender প্রণীত *Farming in Prehistory* শীর্ষক পুস্তকে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

Sauer প্রস্তাব করেন যে, প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার, বর্তমানের থাইল্যান্ডে কৃষিকাজের সূচনা হয়। এই অঞ্চল ১০° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো এবং তাপমাত্রাও বেশি ছিল—উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত অবস্থা। Sauer এর

মতানুসারে বৃহৎ নদীর অববাহিকার পরিবর্তে বৃক্ষরাজিসহ বনাঞ্চলে কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে, কৃষির প্রাথমিক অবস্থায় অঙ্গজ জননের বাঞ্ছনীয় বৈশিষ্ট্য অতি দ্রুত স্থায়ী হয়।

Vavilov-এর ধারণা অনুযায়ী শস্য-উদ্ভিদের যে সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রে উৎপত্তি ঘটেছে, সে বিষয়ে Harlan একমত হতে পারেন নি। তবে তিনি স্বীকার করেন যে, কতিপয় সুনির্দিষ্ট কেন্দ্র ছিল, কিন্তু সেই সাথে তিনি আরও বলেন যে, একই সময়ে অনেক প্রজাতির ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে উৎপত্তি ঘটেছে, যাকে তিনি "নন-সেন্টার" নামে অভিহিত করেছেন।

শস্য উদ্ভিদের বিবর্তনে শারীরতাত্ত্বিক দিক (Physiological Aspects of Crop Plant Evolution)

বন্য প্রোটোটাইপের তুলনায় আবাদি শস্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এসকল শস্যের ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষের প্রচেষ্টার জন্য এটি সম্ভব হয়েছে। বন্য উদ্ভিদের তুলনায় আবাদি উদ্ভিদের অধিক ফলন, উন্নত গুণগত মান এবং ফল ফেটে (shattering) না যাওয়ায় মানুষের ব্যবহারের জন্য অধিক উপযোগী হয়েছে। যুগ যুগ ধরে কয়েক হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি থেকে মানুষ তার প্রয়োজনের জন্য কতকগুলো প্রজাতি বাছাই করেছে। এই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আদিম মানুষ বেশ পারদর্শী ছিল, কেননা আধুনিক মানুষের অবদান এক্ষেত্রে বেশ কম। শস্য উদ্ভিদের বিবর্তনে শারীরবৃত্তীয় দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১. **স্বল্পবিস্তার এবং বর্ধিত বীজাকার** (Reduced dissemination and increased seed size) : বন্য গম (*Triticum boeoticum* এবং *T. dicoccides*) এবং যবের (*Hordeum spontaneum*) পুষ্পমঞ্জরীর র‍্যাকিস ক্ষণভঙ্গুর। পরিপক্ব হলে এটি বিসরণের একক হিসেবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ হয়ে যায়। এদের আকৃতি, হুলযুক্ত হওয়ায় এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য থাকায় এরা খুব সহজেই মৃত্তিকায় গ্রোথিত হতে পারে। বীজ সংগ্রহের সময় বেশ কিছু সংখ্যক বীজ মৃত্তিকায় পড়ে যায় এবং পরের মৌসুমে এগুলো থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। পক্ষান্তরে, কিছু কিছু উদ্ভিদের, যেগুলোর শক্ত র‍্যাকিস থাকে, অধিক সংখ্যক বীজ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এবং পরবর্তী মৌসুমে আবাসস্থলের পাশে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ মৃত্তিকায় বপন করা হয়। চাষাবাদ প্রবর্তনের সাথে সাথে শক্ত র‍্যাকিসসম্পন্ন উদ্ভিদ বাছাই করা হয়, এর ফলে বিস্তার কম কার্যকরী হয়। স্বল্পবিস্তার কার্যকর করার মাধ্যমে আবাদি উদ্ভিদ এবং তাদের বন্য পূর্বপুরুষের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তা কেবল আইনকর্ন (cincorn) এবং এমার গমেই ঘটে নি, অন্যান্য শস্য, যেমন- ভুট্টা, অবিদারী ফল বাছাই করা হয়েছে।

স্বল্প বিস্তারের সাথে সাথে বীজের আকার বৃদ্ধির দিকেও নজর দেয়া হয়েছে। যেমন ডিপ্লয়ড গমের ক্ষেত্রে, আবাদি *T. monococcum*-এর দানার আকার বন্য *T. boeoticum*-এর দানার তুলনায় ২ থেকে ৩ গুণ বড়। একইভাবে আবাদি *Phaseolus*-এর বীজ অনুরূপ বন্য প্রজাতির বীজের তুলনায় প্রায় ৫ থেকে ৮ গুণ বড়।

বড় দানার উদ্ভিদ থেকে শস্যদানা সংগ্রহ করা সহজতর। বড় বীজ থেকে যে চারাগাছ জন্মায় সেগুলো অতিদ্রুত বৃদ্ধি পায়।

২. **শস্য, আগাছা এবং অভিযোজনীয়তা** (Crops, weeds and adaptibility) : ডমিস্টিকেশনের প্রাথমিক পর্যায়ে অনাবশ্যক উদ্ভিদ হিসেবে আগাছার গুরুত্ব ছিল খুবই নগণ্য। অনেক শস্য, যেমন ভুট্টা, কুমরা, আলু, রেড়ি ইত্যাদি প্রথমে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কারণ বসতবাড়ির আশপাশের জমিতে এগুলো প্রচুর পরিমাণে জন্মাতো। অন্যান্য শস্য, যেমন-

রাই (rye), এবং জই (oats) প্রথমে আগাছা হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং প্রাথমিক শস্য যেমন- গম ও যবের মতো কম অনুকূল পরিবেশেও তুলনামূলকভাবে অধিক উৎপাদনশীল শস্যে পরিণত হয়।

আগাছার মতো অনেক সফল শস্য উদ্ভিদের বিভিন্ন পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা আছে। যেমন– সয়াবিন, আলু, গম, ধান প্রভৃতি শস্যের অনেক আধুনিক ভ্যারাইটিতে দিবা দৈর্ঘ্যের জন্য পুষ্পায়ন বন্য ভ্যারাইটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বাধ্যতামূলক। প্রকৃতপক্ষে, সারা পৃথিবীতে জন্মানোর জন্য মেক্সিকান গম এবং IRRI-র ধান প্রজনন গবেষণার একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো দিবা–দৈর্ঘ্যে সাড়া না দেয়া ভ্যারাইটি উদ্ভাবন করা।

৩. **আকারের পরিবর্তন :** আবাদি উদ্ভিদ এবং তাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষের মধ্যে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং স্থায়ী পার্থক্য হলো আবাদি উদ্ভিদের দানবাকৃতি (gigantism)। আকৃতি বৃদ্ধির ব্যাপারটা ঐসব অঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বর্তায় যা মানুষ তার প্রয়োজনের জন্য সংগ্রহ করে (যেমন– দানা) এবং সেই সাথে সম্পূর্ণ উদ্ভিদের তুলনায় এই অংশের অনুপাত ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবাদীকরণের (domestication) সাথে সাথে প্রাকৃতিক উপায়ে বীজ বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা এবং বন্য অবস্থায় টিকে থাকার জন্য অভিযোজনের গুরুত্ব কমে যায়। ফলে সঞ্চিত বস্তুর একটি বড় অংশ অন্যান্য অঙ্গের বিনিময়ে যাদের প্রয়োজন ছিল বন্য অবস্থায় টিকে থাকার জন্য খাদ্য অথবা তন্তুর জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গে জমা হয়। যেমন বন্য গমের তুলনায় আধুনিক গমের দানা ভর্তির (grain filling) সময় অধিক পরিমাণে অ্যাসিমিলেট দানায় স্থানান্তরিত হয় এবং অল্প পরিমাণে যায় কুশি (Tiller), মূল ও কাণ্ডে (Evans and Dunstone, 1970)।

৪. **গঠনের পরিবর্তন** (Changes in composition) : আধুনিক উদ্ভিদে শুধু আকারের পরিবর্তন নয়, সেই সাথে সংগৃহীত অংশের গঠনেরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বন্য ইয়াম (Yams)–এর বিষাক্ত উপাদান এবং লুপিনের (lupins) কটু পদার্থ দূরীভূত করা হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদানেরও পরিবর্তন হয়েছে।

যেমন সুগারবিট ও আখের চিনি, ভুট্টার তেল, বাদাম, সয়াবিন এবং রাই-সরিষার তেল ও প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। যেমন- খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সুগারবিট সালাদ উদ্ভিদ হিসেবে জন্মাতো। এর মূলের চিনির পরিমাণ বাড়ানোর কাজ শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এবং গত একশ বছরে চিনির পরিমাণ ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তেল অথবা প্রোটিনের নির্দিষ্ট কোনো উপাদান বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সফলতা এসেছে। যেমন– ভুট্টা, গম ও যবের সস্যের (endosperm) প্রোটিনে লাইসিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে এর পুষ্টিগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

এমনিভাবে বহুকাল ধরে প্রায় সকল শস্য উদ্ভিদ মানুষ কর্তৃক বাছাই হয়েছে এবং এই বাছাইয়ের চাপে তাদের মধ্যে পরিবর্তনও হয়েছে। এদের ব্যবহারের পরিবর্তন হতে পারে এবং সেই সাথে বাছাইয়ের প্রকৃতিও ভিন্নতর হবে, কিন্তু শস্য হিসেবে এদের অভিযোজন মানুষের এক স্মরণীয় কৃতিত্বপূর্ণ কাজ।

খাদ্য উৎপাদনের প্রারম্ভ (Food production beginning)

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ বছর আগে। এসময়ের প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ অংশে মানুষ বেঁচে থেকেছে পশু–পাখি এবং মাছ শিকার করে এবং বন্য ফল, মূল ও লতা-পাতা সংগ্রহ করে। কেবল আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে থেকে মানুষ আবাসস্থলের চারপাশে উদ্ভিদ

জন্মাতে এবং পশুকে গৃহপালিত করতে শুরু করে। ধারণা করা হয় যে, বর্তমানে থাইল্যান্ডে প্রথম কৃষির সূচনা হয়। দশ হাজার বছর আগেরকার ধানও সয়াবিনের অবশিষ্টাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে কাস্তে এবং পেষণ প্রস্তরসহ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, প্রায় এক হাজার বছর পর মানুষ দানাশস্যের আবাদ করতে শুরু করে।

পুরাতন পৃথিবীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত দেরীতে নতুন পৃথিবীতে (অর্থাৎ আমেরিকা) শস্য উৎপাদন শুরু হয় এবং সম্ভবত মেক্সিকোতে এটি ঘটে। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগে দক্ষিণ-মধ্য মেক্সিকোতে প্রথম শস্যের আবাদ শুরু হয়।

বিভিন্ন শস্যের মধ্যে সর্বপ্রথম দানাশস্যের (cereals) চাষাবাদ আরম্ভ হয়। এদের মধ্যে গম, যব ও মিলেট বৈদিক যুগ হতে চাষ করা হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়। রাই এবং জই অপেক্ষাকৃত নতুন শস্য। মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম দিকে এসব শস্য সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানতো না। অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য ধান সম্ভবত তিন হাজার বছর পূর্বে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় প্রথম দেখা যায়। ভুট্টা সম্প্রতি মানুষের নিকট পরিচিতি লাভ করে। একে নতুন পৃথিবীর শস্য বলে। মধ্য আমেরিকা বা মেক্সিকো ভুট্টার উৎপত্তিস্থল বলে ধারণা করা হয়।

জনসংখ্যা ও খাদ্য সরবরাহ

মনুষ্যের মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্য অন্যতম। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, খাদ্য সরবরাহ ও জনসংখ্যার সাথে সবসময়ই একটি প্রতিযোগিতা চলেছে। বর্তমানের মতো অতীতেও দুর্ভিক্ষে বহুলোকের প্রাণহানি ঘটেছে। ১১২৫ সালে দুর্ভিক্ষে জার্মানির লোকসংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। ১২০৫ সালে হাঙ্গেরিতে দুর্ভিক্ষ হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউরোপে দুর্ভিক্ষ ছিল একটি সাধারণ ঘটনা। ১৮৭০–৭১ সালে পারস্যের দশ লাখ মানুষ (মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ) অনাহারে মারা যায়। ১৮৭৭–৭৮ সালে চীনদেশে খাদ্যের অভাবে ৯৫ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ১৯২১–২২ সালের দুর্ভিক্ষে রাশিয়ায় অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। রাশিয়াতে সর্বশেষ বড় রকমের দুর্ভিক্ষ হয় ১৯৩২ সালে ভলগা উপত্যকায়।

বর্তমানে বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের একটি বড় সমস্যা হলো খাদ্যসমস্যা। তাই খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সকল দেশেই শুরু হয়েছে। অধিক সংখ্যায় সন্তান উৎপাদন এবং বিজ্ঞানের কল্যাণে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস ও মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিজনিত কারণে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে।

১৯৬০ সাল থেকে দানাশস্যের ফলন দুই থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ফলন বাড়ানোরও একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ানোও তেমন সম্ভব নয়। এশিয়াতে সেচ ব্যতীত কৃষিজমির পরিমাণ খুব সামান্যই বাড়ানো যেতে পারে। দক্ষিণ এশিয়াতে আনুমানিক ৫০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে পানি সেচ করা সম্ভব। বর্তমানে এশিয়াতে শস্যের উৎপাদন বেড়েছে মূলত উন্নত জাতের খর্বাকৃতির ধান ও গমের ভ্যারাইটি এবং সঙ্কর ভুট্টা ও সরগাম চাষ করে। আমাদের খাদ্য তালিকায় দানাশস্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্যালোরি ভিত্তিতে আমাদের সরাসরি খাদ্যের ৭০ শতাংশ যোগান দেয় দানাশস্য এবং সম্ভবত আরও ২০ শতাংশ মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ও ডিমের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে যোগান দেয়।

অধিক খাদ্য উৎপাদনের উপায়সমূহ (Means for Increased Food Production)

এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রত্যেক বছরেই খাদ্য ঘাটতি হচ্ছে। আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে অথবা হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি করে খাদ্য উৎপাদন

বাড়ানো যায়। কৃষিজাত পণ্য ছাড়াও, কৃত্রিমভাবে তৈরি খাদ্য [illegible] যেমন– ছত্রাক এবং শৈবালের চাষ করেও খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায়। [illegible] পৃথিবীর [illegible] সবদেশেই আবাদি জমির পরিমাণ বাড়ানো বেশ জটিল। আনুমানিক ১,৪২৪ মিলিয়ন হেক্টর অর্থাৎ পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় ১১ শতাংশ জমি আবাদি, পতিত এবং [illegible] প্রায় [illegible] মিলিয়ন হেক্টর অর্থাৎ স্থলভাগের ১৯ শতাংশ জমি ব্যবহৃত হয় চারণ ভূমি হিসেবে। [illegible] জমি অর্থাৎ ৭০ শতাংশ জমিতে কোনো খাদ্য তৈরি হয় না কিংবা হলেও খুব সামান্য পরিমাণে হয়। সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমাণ প্রায় ২,৬৬৬ মিলিয়ন হেক্টর। পৃথিবীর বিভিন্ন জলবায়ুগত অঞ্চলে সম্ভাব্য আবাদি ভূমি, চারণ ভূমি এবং অনাবাদি ভূমির পরিমাণ ১.১ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ১.১ : বরফাচ্ছাদিত অঞ্চল বাদে বিভিন্ন জলবায়ুগত অঞ্চলে সম্ভাব্য [illegible]
(বিলিয়ন হেক্টরে)

	জলবায়ুগত অঞ্চল	সম্ভাব্য আবাদি ভূমি		চারণ ভূমি		অনাবাদি ভূমি		মোট	
		হেক্টর	%	হেক্টর	%	হেক্টর	%	হেক্টর	%
১.	মেরু ও উপমেরু	০	০	০	০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
২.	শীতল নাতিশীতোষ্ণ বোরিয়াল	০.০৪৯	০.৩৭	০.১৯০	১.৪৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৩.	শীতল নাতিশীতোষ্ণ	০.৯০৭	৬.৮৯	০.৯৯৬	৭.৫৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৪.	উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ	০.৫৫৫	৪.২২	০.৮৪১	৬.৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৫.	গ্রীষ্মমণ্ডলীয়	১.৬৭২	১২.৭১	১.৬৯৮	১২.৯৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	মোট	৩.১৮৩	২৪.১৯	৩.৭৫৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

শস্য এবং বিশ্বের খাদ্য সরবরাহ (Crops and world food supply)

কালের বিবর্তনে মানুষ প্রায় তিন হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং এদের মধ্যে মাত্র দুই শত প্রজাতি আবাদীকৃত হয়েছে। ডেনমার্ক থেকে প্রাপ্ত [illegible] পাকস্থলীর ভিতরের বস্তু Helback (1950) পরীক্ষা করেছেন, [illegible] সময় প্রায় [illegible] প্রজাতির উদ্ভিদ খেয়েছিল। বর্তমানে পাঁচটি দানাশস্য (cereals), তিনটি টিউবার শস্য, কতিপয় লেগ্যুম, আখ এবং সুগারবিট মানুষের প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন সরবরাহ করে যা সারণি ১.২ -এ দেখানো হয়েছে। ভোজ্য শুষ্ক ওজনের (edible dry weight) দুই তৃতীয়াংশের অধিক সরবরাহ করে দানাশস্য এবং শতকরা ৮০ ভাগই মাত্র [illegible] উদ্ভিদ প্রজাতি [illegible] থেকে আসে মাত্র শতকরা ৬ ভাগ। প্রোটিন সরবরাহের মধ্যে দানাশস্যের অবদান অর্ধেক এবং এক চতুর্থাংশেরও কম আসে প্রাণী থেকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের খাদ্যের ক্যালোরি এবং প্রোটিন উভয়েরই অধিকাংশ আসে উদ্ভিদ থেকে। এছাড়াও, দুই তৃতীয়াংশের অধিক [illegible] তেল পাওয়া যায় উদ্ভিদ থেকে

সারণি ১.২ : ভোজ্য শুষ্ক পদার্থ ও প্রোটিনের বিশ্বব্যাপী উৎপাদন

বিভিন্ন শস্য	শুষ্ক পদার্থ (মেট্রিক টন × ১০^{৭})	প্রোটিন (মেট্রিক টন × ১০^{৬})
দানা শস্য		
গম	২৭.৫	৩২.৯
ধান	২৬.৭	১৩.২
ভুট্টা	২৩.৫	১৪.৭
যব	১১.৪	১১.৬
সরগাম / মিলেট	৮.২	৭.৪
অন্যান্য	৭.৬	১.১
	১০৪.৯	১০০.৯
শর্করাযুক্ত টিউবার		
গোল আলু	৬.৬	৬.০
মিষ্টি আলু এবং ইয়াম	৩.৯	২.৯
ক্যাসাভা	৩.৪	০.৮
	১৩.৯	৯.৭
চিনি শস্য		
আখ	৪.৩(চিনি)	—
সুগারবিট	৩.০	—
	৭.৩	—
লেগ্যুম এবং তেলবীজ		
সয়াবিন	৪.২	১৬.১
বাদাম	১.৬	৪.৬
মটর	১.৩	৩.৫
বিন	১.৫	৫.৪
তুলা-বীজ	(২.০)	(৭.২)
তন্তু	(১.১)	
অন্যান্য	(৩.৫)	(১২.৪)
	১৫.২	৫৩.০০
শাক-সবজি	১.৮	৮.০
ফলমূল	২.৫	১.৫
প্রাণিজ দ্রব্য		
দুধ	৫.২	১৪.৫
মাংস	২.৮	১২.৬
ডিম	[illegible]	২.৫
মাছ	[illegible]	৬.২
	১০.২	[illegible]
সর্বমোট	১৫৬.৬	[illegible]

[উৎস : FAO Production Yearbook and United Nations Statistic Yearbook.(1970) যে সমস্ত দ্রব্য খুব সামান্য কিংবা একেবারেই মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার না, তাদেরকে ব্র্যাকেটে রাখা হয়েছে।]

সারণি ১.২ : ভোজ্য শুষ্ক পদার্থ ও প্রোটিনের বিশ্বব্যাপী উৎপাদন

বিভিন্ন শস্য	শুষ্ক পদার্থ (মেট্রিক টন × $১০^{৭}$)	প্রোটিন (মেট্রিক টন × $১০^{৬}$)
দানা শস্য		
গম	২৭.৫	৩২.৯
ধান	২৬.৭	২৩.২
ভুট্টা	২৩.৫	২৪.৭
যব	১১.৪	১১.৬
সরগাম/মিলেট	৮.২	৭.৪
অন্যান্য	৭.৬	১.১
	১০৪.৯	১০০.৯
শর্করাযুক্ত টিউবার		
গোল আলু	৬.৬	৬.০
মিষ্টি আলু এবং ইয়াম	৩.৯	২.৯
ক্যাসাভা	৩.৪	০.৮
	১৩.৯	৯.৭
চিনি শস্য		
আখ	৪.৩(চিনি)	—
সুগারবিট	৩.০	—
	৭.৩	—
লেগ্যুম এবং তেলবীজ		
সয়াবিন	৪.২	১৬.১
বাদাম	১.৬	৪.৮
মটর	১.৩	৩.৫
বিন	১.৫	৫.৪
তুলা-বীজ	(২.০)	(১.২)
তন্তু	(১.১)	—
অন্যান্য	(৩.৫)	(১২.৪)
	১৫.২	৫৫.০০
শাক-সবজি	২.৮	৮.০
ফলমূল	২.৫	১.৩
প্রাণিজ দ্রব্য		
দুধ	৫.২	১৪.৫
মাংস	২.৮	১১.৬
ডিম	০.৫	২.৫
মাছ	১.৭	৮.৫
	১০.২	৩৮.১
সর্বমোট	১৫৬.৮	২০৮.০

[উৎস : FAO Production Yearbook and United Nations Statistical Yearbook.(1970) যে সমস্ত দ্রব্য খুব সামান্য কিংবা একেবারেই মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয় না, তাদেরকে ব্র্যাকেটে রাখা হয়েছে।]

খাদ্য উৎপাদনের বিকল্প উৎসসমূহ (Alternative Sources of Food)

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত *The Environment Game* শীর্ষক পুস্তকে Calder লিখেছেন যে, "agriculture is simply failing us and will need to be replaced by synthetic methods of food production"। তবে এখন পর্যন্ত কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় নি যাতে সৌর কিংবা নিউক্লীয় শক্তি ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে কার্বোহাইড্রেট অথবা এই জাতীয় যৌগ পদার্থ তৈরি করা যায়। কতকগুলো যৌগ পদার্থ, যেমন–১,৩-বুটানেডিয়োল এবং ২,৪–ডাইমিথাইল–হেপাটোনিক অ্যাসিড, যা পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য থেকে অল্প খরচে তৈরি করা সম্ভব, নিরাপদ এবং পরীক্ষণ প্রাণীর শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণযোগ্য (Scrimshaw, 1966)। তবে শস্যের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদে এদের ব্যবহার নির্ভর করবে জীবাশ্ম জ্বালানির বদলে সৌর অথবা নিউক্লীয় শক্তির সহজলভ্যতার উপর।

১.২ নং সারণি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভোজ্য শুষ্ক পদার্থের প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ হলো প্রোটিন। যদি খাদ্যের ক্যালরির ১০–১২% প্রোটিন থেকে আসে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের খাদ্যে যদি ৬% প্রোটিনও থাকে, তাহলে খাদ্যে প্রোটিনের মাত্রা পর্যাপ্ত ধরা যায়। তবে যে সকল অঞ্চলে নিম্ন প্রোটিন খাদ্য, যেমন– ধান অথবা শর্করাজাতীয় মূল খাদ্য হিসেবে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রোটিনের মাত্রা পর্যাপ্ত নয়। যাহোক, দানাশস্যের ফলন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রোটিনের পরিমাণ হ্রাস পায়। তাই ভবিষ্যতে প্রোটিনের বিকল্প উৎস সম্ভবত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

President's Science Advisory Committee (1967) –এর এক হিসাবে বাৎসরিক মাছের উৎপাদন ৫.৫ থেকে ২০০×১০^{৬} মেট্রিক টন। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে প্রোটিনের ঘাটতি অনেকটা পূরণ করা যাবে। শৈবাল থেকে তৈরি খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়াসহ অনেক দেশে ব্যাপকভাবে শৈবালের চাষ হচ্ছে।

প্রত্যেকটি শৈবালের কোষ যাতে ভালভাবে কার্বন ডাই–অক্সাইড পায় তারজন্য উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও শৈবালের ফলন ৮ থেকে ১৮ গ্রাম শুষ্ক ওজন প্রতি বর্গমিটারে প্রতিদিন হয় (Tamiya, 1957 ; Thomas, 1965)। অপরদিকে, শস্যের বৃদ্ধির হার এর তুলনায় অনেক বেশি। পানিতে কার্বন ডাই–অক্সাইডের ব্যাপন সূচক (coefficient) বায়ুমণ্ডলের তুলনায় ১ × ১০$^{-৪}$। এজন্যই শৈবালের বৃদ্ধির হার কম। সারা বছর ধরে শৈবাল সংগ্রহ করা যায় এবং দালানের ছাদেও এদেরকে জন্মানো যায়। তাই নগরায়নের ফলে আবাদি জমি যা নষ্ট হচ্ছে তা কিছুটা পূরণ করা সম্ভব। শৈবালে প্রোটিনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি এবং এতে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডও বেশি আছে (Tamiya, 1957)। আরেকটি সুবিধা হলো যে, মাধ্যমের (medium) পরিবর্তন করে শৈবালের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন করা যায়। তবে কালচারে সার্বক্ষণিকভাবে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা এবং কোষ প্রাচীর পৃথিবীকরণ ব্যয়বহুল বলে উৎপাদন খরচ বেশি।

সাম্প্রতিককালে প্রোটিনের উৎস হিসেবে ইস্ট, ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডসহ প্রায় ৫০% প্রোটিন আছে ইস্টে ; উভয় মহাযুদ্ধের সময় এটি ইউরোপে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এটি তেমন সুপাচ্য নয় এবং এর উৎপাদন খরচও বেশি। কাগজ উৎপাদনের উপজাত বস্তু সালফাইটে অথবা সস্তা ঝোলাগুড়ের উপর এটি জন্মানো যায়। অতি সম্প্রতি ইস্টের এমন স্ট্রেইন বাছাই করা হয়েছে যা পেট্রোলিয়াম

থেকে উচ্চতর এন- অ্যালকেনম (এটি লুব্রিক্যান্ট-এ অর্নাভপ্রেত) পৃথক করতে পারে। প্রতি বছরে সারা পৃথিবীতে ব্যবহৃত ২.১ × ১০^{৯} টন পেট্রোলিয়ামে, এতে অ্যালকেনস-এর পরিমাণ ৫.৬ ×১০^{৭} টন, যদি এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, তাহলে প্রায় ৩২ × ১০^{৯} টন একককোষী প্রোটিন তৈরি হবে যা লেগ্যুমজাতীয় শস্য কর্তৃক উৎপাদিত প্রোটিনের প্রায় সমান।

কতিপয় ব্যাকটেরিয়া যেমন– *Micrococcus* পেট্রোলিয়ামে জন্মানো যায়। অন্য পদ্ধতির মধ্যে যেমন *Penicillium* এবং *Aspergillus* জাতীয় ছত্রাক ভুট্টা অথবা আলুর শর্করায় জন্মানো যায়। এক্ষেত্রে অবশ্য শক্তি উৎপাদনের জন্য শস্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তবে দানাশস্য ও টিউবার শস্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তবে দানাশস্য ও টিউবার শস্যের তুলনায় লেগ্যুমজাতীয় শস্যের ফলন অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় এই পদ্ধতি লাভজনক হবে। প্রাণী ও শিল্প-কারখানার বর্জ্য পদার্থ এবং অপাচ্য উদ্ভিদ অংশের উপর ব্যাকটেরিয়া জন্মিয়ে একদিকে যেমন প্রোটিনের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, অপরদিকে পরিবেশ দূষণও কম হবে।

এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খাদ্য উৎপাদনের বিকল্প পথ থাকলেও, শক্তি ও প্রোটিনের জন্য শস্য উদ্ভিদের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা ভবিষ্যতেও থাকবে।

শস্যের ফলন

১৭৯৮ সালে যখন Malthus মন্তব্য করেন যে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে, তখন অবশ্য তিনি অনুমান করতে পারেন নি যে, নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের ফলে (আমেরিকা) আবাদি জমির পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে। বর্তমানে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমগ্র জমির প্রায় ১১ শতাংশে চাষাবাদ হয়। সম্ভাব্য আবাদি জমির পরিমাণ নির্ণয়ে ভিন্নতা থাকলেও, Kellogg এবং Orvedal (1964) ধারণা করেন যে, আবাদি জমির পরিমাণ বর্তমানের ১.৪ × ১০^{৯} হেক্টর থেকে কমপক্ষে ৩.২ × ১০^{৯} হেক্টরে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ দেশে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশি বেড়েছে। উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ উৎপাদন বেড়েছে প্রতি একক জমিতে শস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্যশস্যের অনেক উৎপাদন বেড়েছে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য (Revelle, 1966)। আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ-আমেরিকায় অপেক্ষাকৃত কম জমি আবাদের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই এটি আরও বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু এশিয়া এবং উন্নত দেশগুলোতে ভবিষ্যতে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কেবল শস্যের ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমেই সম্ভব হবে।

জাপানে ধানের ফলন এবং ইংল্যান্ডে গমের ফলনের ঐতিহাসিক ধারা ১.১ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। Matsuo (1959) এবং gavin (1951) কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রাথমিক ফলনের তথ্যাদি স্বাভাবিকভাবেই অপর্যাপ্ত ; তবে বর্তমানে এসব দেশের ফলন বৃদ্ধির হার খুব বেশি। অন্যান্য দেশের ফলন বৃদ্ধির হার অবশ্য এতো ব্যাপক নয়। যেমন কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ায় গমের নিম্ন ফলনের জন্য দায়ী এদেশগুলোর প্রাতিকূল আবহাওয়া। তাই উন্নতমানের শস্য উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। এদেশগুলোতেও শস্যের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

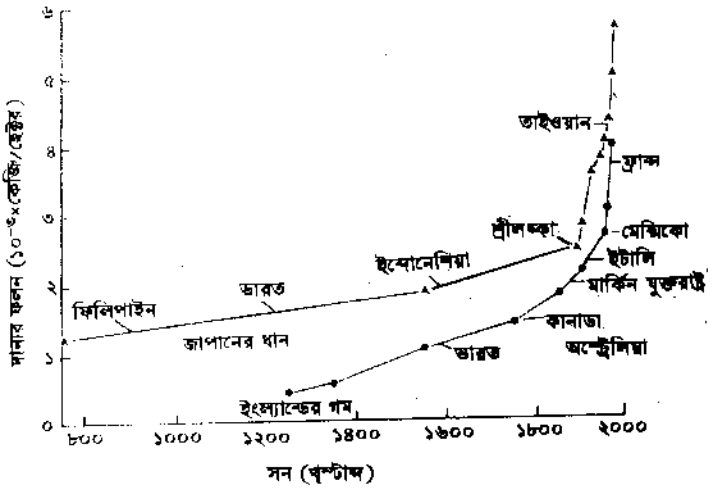

চিত্র ১.২ : জাপানের ধানের ফলন এবং ইংল্যান্ডে গমের ফলনের ঐতিহাসিক ধারার সাথে কয়েকটি দেশের ১৯৬৮ সালের ধান ও গমের ফলনের তুলনা

পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মানুষের প্রধান খাদ্য ধান ও গম। ১.২ নং চিত্রে পৃথিবীর লোকসংখ্যার পরিবর্তনের সাথে গম ও ধানের ফলনের পরিবর্তনের তুলনা করা হয়েছে। এই চিত্রে ধান ও গমের রেকর্ড ফলন (যথাক্রমে জাপানে *Ootori* ভ্যারাইটি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে *Gains* ভ্যারাইটি) এবং সেই সাথে ৪০০ ক্যালরি প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে প্রতিদিনে সূর্যালোকের জন্য সর্বোচ্চ পটেনশিয়াল ফলন দেখানো হয়েছে। পৃথিবীব্যাপী সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ফলন পেতে হলে পানির ব্যবহার (শহরাঞ্চলে এবং শিল্প কারখানার চাহিদার সাথে অবশ্য ইত:মধ্যেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে), অনবায়নযোগ্য সার, যেমন- ফসফেট, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে নাইট্রোজেনঘটিত সার, আগাছানাশক, ছত্রাকবারক এবং কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ এবং শস্য উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।

শস্যের ফলনকে দুভাবে প্রকাশ করা হয়; যথা- জৈবিক এবং অর্থনৈতিক (economic)। শস্যের সম্পূর্ণ বায়োমাসকে জৈবিক ফলন বলে এবং এটি প্রধানত পরীক্ষণের ফলনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু শস্যের সকল অংশ উৎপাদনকারী বা ব্যবহারকারীর নিকট প্রয়োজনীয় নয়, সেহেতু জৈবিক ফলন সবসময় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক নয়। কতিপয় ক্ষেত্রে শস্যের সকল অংশ ব্যবহৃত হয়; যেমন সুইড (swed), টারনিপ (turnip) ইত্যাদিতে। অন্যান্য শস্যে কেবল একটি সুনির্দিষ্ট অংশ ব্যবহৃত হয় এবং তা মাঠ থেকে সংগ্রহ করা হয়। কয়েকটি শস্যের সংগৃহীত অংশের নাম ১.৩ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন শস্যে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ব্যবহৃত হয়। গোল আলুর ক্ষেত্রে ভূ-নিমস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড বা কন্দ হলো সঞ্চয়ী অঙ্গ যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সুগারবিটে সুক্রোজ নিষ্কাশনের জন্য মূল সংগ্রহ করা হয়, যদিও উপজাত দ্রব্য হিসেবে এর বিটপ এবং মূলের অবশিষ্টাংশ পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। গোলআলু এবং মূলীয় শস্যের অঙ্গজ (vegetative) অংশ মানুষের কাজে লাগে।

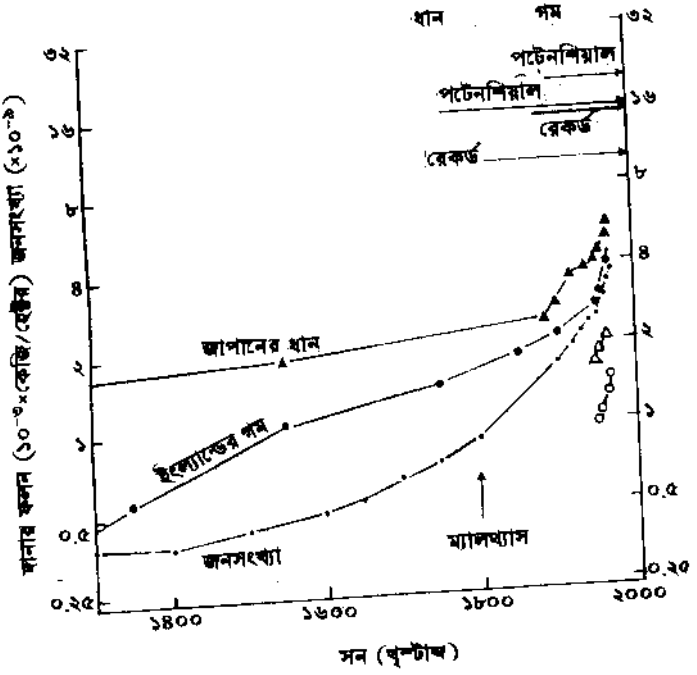

চিত্র ১.২ : পৃথিবীর জনসংখ্যা, জাপানে ধানের ফলন (Δ) ও বিশ্বের ফলন (Δ) এবং ইংল্যান্ডে গমের ফলন (o)ও বিশ্বের ফলন (o)-এর ঐতিহাসিক ধারা।

দানাশস্য এবং তেলজাতীয় শস্যে জনন (reproductive) অংশ ব্যবহৃত হয়। লেগ্যুমিনাস শস্যের বীজ অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ জাতীয় দানা-উৎপাদনকারী শস্যে তুলনামূলকভাবে খুব সামান্য অংশ ব্যবহৃত হয় এবং মূল, কাণ্ড ও পাতার বর্তমানে অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুব সামান্য বা নেই বললেই চলে। দানাশস্যের দানা উৎপাদনের যোগ্যতার নির্দেশক হলো সংগ্রহ সূচক (harvest index) অর্থাৎ দানা (ইকনমিক ফলন) ঃ সম্পূর্ণ বায়োমাস (biological yield)-এর অনুপাত। Austin (1980) মন্তব্য করেন যে, বর্তমানে সংগ্রহ সূচক বৃদ্ধির মাধ্যমে যবের ফলন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। পুরাতন ভ্যারাইটির হারভেস্ট ইনডেক্স ছিল প্রায় ৪০ শতাংশ (অর্থাৎ ৪০ দানা ঃ ৬০ বায়োমাস), কিন্তু আধুনিক ভ্যারাইটিগুলোতে এই মান ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ।

সারণি ১.৩ : কতকগুলো শস্যের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ

শস্য	সংগৃহীত অংশ	অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য
সুগারবিট	মূল	সুক্রোজ
গোল আলু	কন্দ	কন্দ
সূর্যমুখী	ফল	তেল এবং প্রোটিন
সরিষা	বীজ	তেল এবং প্রোটিন
তিশি		
(১)	বীজ	তেল এবং প্রোটিন
(২)	কাণ্ড এবং মূল	তন্তু
যব	বীজ	মানুষ ও গবাদিপশুর খাদ্য
ধান	বীজ	মানুষের খাদ্য
গম	বীজ	মানুষের খাদ্য
সুইড (Swede)	মূল এবং পাতা	পশুখাদ্য এবং মানুষের খাদ্য (কেবল মূল)
কেল (kale) এবং রেপ (rape)	কাণ্ড এবং পাতা	পশুখাদ্য

যে সমস্ত শস্য প্রধানত পশুখাদ্যের জন্য জন্মানো হয় (যেমন– কেল, ফরেজ রেপ), তাদের ক্ষেত্রে ভূ-উপরিস্থ সকল অংশই ব্যবহারযোগ্য ; তাই হারভেস্ট ইনডেক্স-এর ধারণা অনুপোযুক্ত। উপরন্তু, এক্ষেত্রে সরাসরি শুষ্ক ওজনও ফলনের অর্থবহ নির্দেশক নয়। কারণ খাদ্যগ্রহণ এবং গবাদি পশুর বাড়ির সাথে এসকল শস্যের গুণগত প্রকরণ সম্পর্কযুক্ত। সুপাচ্য জৈবপদার্থ ও সুপাচ্য ক্রুড প্রোটিন (crude protein) এসকল শস্যের অর্থনৈতিক ফলনের অধিকতর অর্থবহ নির্দেশক। অন্যান্য ফরেজ শস্য যেমন– ভুট্টা, সুইড এবং ঘাসের ক্ষেত্রে একই বিষয় প্রযোজ্য।

শস্যের ফলন নির্ধারিত মান অনুসারে প্রকাশ করা হয়। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে, দানাতে শতকরা ১৫ ভাগ পানিসহ টন/হেক্টরে ফলন প্রকাশ করা হয়। মাঠ থেকে দানা সংগ্রহের সময় পানির পরিমাণের বেশ তারতম্য হয়, তাই দানাতে পানির পরিমাণ একটি নির্ধারিত মানে রূপান্তরিত করে ফলনে একটি নির্ধারিত মানে রূপান্তরিত করে ফলনে তুলনা করা হয়। আর না শুকিয়ে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পানি থাকলে দানা–ভালভাবে মজুদ করা যায়, তার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক শস্যের দানায় পানির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। সরিষার ক্ষেত্রে বীজে পানির পরিমাণ ধার হয় শতকরা ৯ ভাগ।

নির্দিষ্ট পরিমাণ চিনিসহ (যেমন– শতকরা ১৬ ভাগ) প্রতি হেক্টরে পরিষ্কার মূলের ওজন (টন) সুগারবিটের ফলন হিসেবে প্রকাশ করা হয়। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে যেমন অল্পদিনের ব্যবধানে সম্পূর্ণ শস্য সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু সুগারবিটের বৃদ্ধি সারা শরৎকাল চলে এবং কারখানার চাহিদা অনুযায়ী অনেক সময় আগে থেকেই মূল সংগ্রহ শুরু করতে হয়।

গোল আলুর ফলন কোনো নির্দিষ্ট মানে প্রকাশ করা বেশ কঠিন। একটি সাধারণ পদ্ধতি হলো সম্পূর্ণ কন্দের ফলন। তবে একটি নির্দিষ্ট আকারের (৪.১ সেন্টিমিটার ব্যাসের অধিক) কন্দকে বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত মান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এজন্য অর্থনৈতিক ফলনের পরিমাণ বেশ কমে যায়। ভালভাবে সংগ্রহ না করায় কিছু পরিমাণ কন্দ মাঠে থেকে যায়, এভাবেও ফলন কম

হয়। ক্ষতিগ্রস্থ কন্দ বাতিল করা হয়। তাই কেবল গুদাম থেকে বিক্রয়যোগ্য কন্দ হলো গোল আলুর অর্থনৈতিক ফলন।

শস্য শারীরবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শস্য শরীরবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, শস্যের ফলনের উন্নয়ন এবং প্রকৃতপক্ষে এই লক্ষ্যে W.L. Balls মিশরের নীলনদের অববাহিকায় তুলা শস্য নিয়ে প্রথম গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন প্রায় ৭৬ বছর আগে। Balls এবং Holton (1915a,b) শস্য অবস্থায় মিশরীয় তুলা গাছের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব এবং বীজ বপনের সময়ের এদের বৃদ্ধি ও ফলনের উপর কি প্রভাব আছে তা বিশ্লেষণ করেন। তৃতীয় গবেষণা পত্রে Balls (1917) তুলার ফলনের উপর পরিবেশীয় বিভিন্ন প্রকরণের কি ভূমিকা আছে তা বিশ্লেষণ করেন এবং তিনি লক্ষ্য করেন যে, অনেকগুলো আপাত পরস্পরবিরোধী বিষয়কে, ব্যাখ্যা করা যাবে শস্যের জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপকে, যা পরবর্তীতে ফলনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে, পর্যবেক্ষণ করে এবং এগুলো পরিবেশের পীড়নে (stress) সংবেদনশীল। যেমন– তিনি লক্ষ্য করেন যে, জুলাই মাসে পানি সেচের জন্য স্বাভাবিক মিশরীয় তুলার পুষ্পায়নের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু ফলের মধ্যে লিন্ট হেয়ার (lint hair) কোষ দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়।

শস্য ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষনের জন্য ১৯০৫ সালে F. F Blackman কর্তৃক প্রকাশিত প্রভাবকের সীমায়িত সূত্রের উপর Balls নির্ভর করেন। সেই সঙ্গে ফলনের বিকাশের জন্য ক্রিটিক্যাল অবস্থা এবং প্রত্যেক অবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবকের সনাক্তকরণের দশ বছরের মৌলিক ও ব্যাপক গবেষণার প্রেক্ষিতে তুলা শস্যের শারীরতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়। এতদসত্ত্বেও Balls -এর গবেষণা চুক্তি নবায়ন না হওয়ায়, তিনি শস্য শারীরবিজ্ঞানের গবেষণা কর্মসূচি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন (Harland, 1961)।

Balls–এর গবেষণার পরবর্তী দশ বছরে ইংল্যান্ডে অনেক বিজ্ঞানী শস্যের বৃদ্ধি ও ফলন বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ১৯২৪ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত *Proceedings of the Imperial Botanical congress* দেখলে এটি স্পষ্ট হয়। এতে *The physiology of crop yield : a Survey of modern methods of attack* বিষয়ে W. L. Balls, V.H. Blackman, F. G. Gregory, G. E. Briggs, R. A. Fisher, F.J. Maskell, F. L. Engledow প্রমুখ বিজ্ঞানী পর্যালোচনা করেন।

১৯২৫ সালে R. A. Fisher পরিসংখ্যানগত পরীক্ষণের ডিজাইন সম্বলিত পুস্তক Statistical Methods for Research Workers প্রকাশ করেন। একই বছরে ইংল্যান্ডের রথামস্টেড–এ এই নতুন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সর্বপ্রথম মাঠ পর্যায়ে গবেষণা শুরু করেন।

১৯১৯ সালে Blackman উদ্ভিদের বৃদ্ধি বিশ্লেষণের (growth analysis) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, উদ্ভিদের ওজন লগারিদমভাবে বাড়ে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে efficiency index বা আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার (relative growth rate বা R G R) দ্বারা বর্ণনা করা যায়। Gregory (1917) প্রস্তাব করেন যে, প্রতি একক পাতার ক্ষেত্রের (area) জন্য উদ্ভিদের শুষ্ক ওজন বৃদ্ধির হারকে (একে নীট আত্তীকরণ হার বা NAR বলে) পাতার নীট সালোকসংশ্লেষণের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। Fisher (1920) কিছু পরিমার্জনা করে বৃদ্ধি বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যান যাতে করে উদ্ভিদের শুষ্ক পদার্থ (dry matter) তৈরিকে NAR এবং পাতার ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

রথামস্টেড–এ মাঠশস্যের প্রথম বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করেন Basptiste এবং Watson ১৯৩৪ সালে। তাঁরা সুগারবিট এবং ম্যাংগোল্ড বিভিন্ন সময়ে বপন করে এদের বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করেন। প্রায় একই

সময়ে সুদানে Crowther এবং রোডেশিয়াতে (বর্তমানে জিম্বাবুয়ে) Heath তুলা শস্য নিয়ে একই রকম গবেষণা করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে (১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কিছুটা স্তিমিত হয়) বিভিন্ন ভ্যারাইটি ও প্রজাতির শস্য ভিন্ন ভিন্ন কালচারাল (cultural) অবস্থায় জন্মিয়ে অনেক উপাত্ত সংগৃহীত হয়। এসকল উপাত্তের উপর ভিত্তি করে ১৯৫২ সালে Watson শস্যের ফলনের তারতম্যের জন্য শারীরতাত্ত্বিক ভিত্তি বিষয়ক একটি পর্যালোচনা (review) প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই শস্য শারীরবিজ্ঞানকে সকলের কাছে পরিচিত করান। তখন থেকে শস্য শারীরবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে চলতে থাকে।

সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis)

প্রাথমিক অবস্থায় নীট আত্তীকরণ হারের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। যেহেতু এটি একটি উদ্ভিদের সবগুলো পাতার গড় হার এবং সাধারণত এক সপ্তাহ পর পর নির্ণয় করা হয়, সেহেতু এটি সালোকসংশ্লেষণের হারের প্রকৃত পরিমাপক নয়। তাই Heath এবং Gregory (1938) মন্তব্য করেন যে, উদ্ভিদের অঙ্গজ দশায় বিভিন্ন প্রজাতি ও বিভিন্ন পরিবেশে NAR প্রায় একই থাকে (যদিও এই হার প্রকৃতপক্ষে ০.১২ থেকে ০.৭২ গ্রাম/ডেসিমিটার^2/সপ্তাহ)। তাঁরা আরও বলেন যে, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদে শুষ্ক পদার্থ জমাকরণের বিভিন্নতার প্রধান নিয়ামক হলো পাতার বৃদ্ধির হার—প্রতিটি পাতার আকার এবং নতুন পাতা উৎপাদনের হার। তাই পরবর্তী সময়ে শস্যের পাতার বৃদ্ধির উপর বেশি নজর দেয়া হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালের দুটি কারণে পুনরায় সালোকসংশ্লেষণের হারকে ফলনের প্রধান নিয়ামক হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। প্রথম কারণটি হলো ইনফারেড গ্যাস অ্যানালাইজার (IRGA)–এর সাহায্যে সালোকসংশ্লেষণের হার সঠিকভাবে এবং অল্পসময়ের ব্যবধানে নির্ণয়ের সুবিধা। দ্বিতীয় কারণ বর্তমানে জানা গেছে যে, বিভিন্ন শস্যের সালোকসংশ্লেষণের হার এবং গতিপথ ভিন্নতর। ১৯৬৩ সালে Hesketh এবং Moss লক্ষ্য করেন যে, অন্যান্য উদ্ভিদের তুলনায় ভুট্টা, আখ এবং কতকগুলো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘাসের সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি এবং এদের আলোর সম্পৃক্ততা ধীরে ধীরে হয়। প্রায় একই সময়ে Tarchevkii এবং Karpilov (1963) এবং Kortschak ও তাঁর সহকর্মীরা (1965) দেখান যে, এসকল উদ্ভিদের $^{14}CO_2$ আত্তীকরণের প্রাথমিক উৎপাদিত বস্তু অন্যান্য উদ্ভিদ থেকে আলাদা —এটি C_4 ডাই-কার্বোক্সালিক অ্যাসিড। ১৯৭০ সালে Hatch এবং slack–এর গবেষণার ফলাফল থেকে C_4 এবং C_3 উদ্ভিদের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো হলো সালোকসংশ্লেষণের হার, আলোক প্রখরতার প্রভাব, তাপ ও অক্সিজেন মাত্রা, আলোকশ্বসন, পাতার অন্তর্গঠন, ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন, পরিবহণের হার, পানি ব্যবহারের দক্ষতা যা ফলনের শারীরতত্ত্বের উপর ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে।

পাতার বৃদ্ধি ও ক্যানোপির বিকাশ

ইংল্যান্ডে বৃদ্ধি বিশ্লেষণের প্রাথমিক অবস্থায় পাতার বৃদ্ধির গাণিতিক ফরমূলার উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। Boysen Jensen (1932) বুঝতে পেরেছিলেন যে, উদ্ভিদ সম্প্রদায়গত অবস্থায় (community) থাকলে তাদের সালোকসংশ্লেষণের হার একক পাতার তুলনায় কম। কারণ সম্প্রদায়গত অবস্থায় ক্যানোপির নিচের পাতায় পর্যাপ্ত সূর্যালোক পৌঁছায় না এবং ক্যানোপির পাতার কোণের (angle) উপর এই পার্থক্য নির্ভর করে। এ থেকে তিনি ভূমির (ground) ক্ষেত্রফল এবং মোট পাতার ক্ষেত্রফলের মধ্যে একপ্রকার সম্পর্ক দেখতে পেয়েছিলেন যাকে ১৯৪৭ সালে D.J Watson পত্র ক্ষেত্রফল সূচক (leaf area index বা LAI) বলে অভিহিত করেছিলেন। এই সূচক প্রবর্তনের ফলে শস্যের বৃদ্ধি বিশ্লেষণের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয় এবং শস্য শারীরবিজ্ঞানের নতুন

পথের সন্ধান দেয়। এরপর ১৯৫৩ সালে M. Moni এবং T. Sacki নামক দু'জন জাপানী বিজ্ঞানী ক্যানোপির উপর পতিত আলোর বিনষ্ট (extinction) হওয়ার সাথে LAI-এর একটি সম্পর্ক স্থাপন করেন। এর মূল ভিত্তি হলো Beer-এর সূত্র ; এর ফলে শস্যের সালোকসংশ্লেষণ এবং আলোর প্রোফাইলের একটি পরিমাণগত বর্ণনা সহজতর হয়। ক্যানোপিতে আলোর এই বিনষ্টতা পাতার কোনো, আকার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। Monsi এবং Saeki-এর এই তথ্য দু'ভাবে শস্য শারীরবিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে। প্রথমত, জাপানে ধান প্রজননবিদগণকে একটি আদর্শ উদ্ভিদ প্রকার (ideal plant type) উদ্ভাবনের প্রচেষ্টাকে সুদৃঢ় করেছে। দ্বিতীয়ত, শস্যের সালোকসংশ্লেষণের মডেলিং এর উপর গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছে। প্রাথমিক মডেলগুলোতে, যেমন Davidson এবং Philip (1958) এবং Sacki (1960)-এর মডেল, শস্যের শ্বসন সরাসরি LAI-এর সমানুপাতিক বলে ধরে নেয়া হয়েছিলো। তাই তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, ক্যানোপির গঠনের সাথে সর্বোত্তম LAI-এর অবশ্যই সম্পর্ক আছে।

পরবর্তীকালে শস্যের শ্বসনের বৃদ্ধি ও LAI বৃদ্ধির সাথে একটি পরোক্ষ সম্পর্ক দেখানো হয়েছে যার ফলস্বরূপ নীট সালোকসংশ্লেষণের হার ও LAI-এর মধ্যে একটি সূচালো সর্বোত্তম অবস্থা না হয়ে 'বড প্লেটু' (broad plateau) সম্পর্ক প্রদর্শন করে। বর্তমানে কম্পিউটারের উন্নতির সাথে সাথে শস্য সালোকসংশ্লেষণের মডেলেরও উন্নতি হয়েছে। অপরদিকে শস্যের শ্বসনের হার নির্ণয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলতে গেলে অবহেলিত। তবে সাম্প্রতিককালে শস্য শারীরবিজ্ঞানীরা এ বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ধারণা করা হয় যে, শস্যের ফলন প্রধানত সীমায়িত হয় সালোকসংশ্লেষণ এবং অ্যাসিমিলেট সরবরাহের জন্য, কিন্তু বর্তমানে শস্য শারীরবিজ্ঞানীগণ উচ্চ ফলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অন্যান্য বিষয়েও অধিকতর দৃষ্টি দিয়েছেন।

পরিবহণ (Translocation)

তুলা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে শর্করা বিতরণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য Mason এবং Maskell (1928) এর গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ুগত এবং অন্যান্য কারণে সৃষ্ট কতকগুলো সমস্যা, যেমন- ফুলের কুঁড়ি এবং অপরিপক্ব ফলের পতন, লিন্ট তন্তুতে চিনি ঘনীভূত হয়ে সেলুলোজ উৎপাদন এবং স্বভাব ও বিকাশের ভিন্নতার কারণ উদঘাটনের জন্য চিনির পরিবহণ এবং উদ্ভিদ দেহে এই পরিবহণের হার ও দিক নির্ণয়ের জন্য দায়ী প্রভাবকগুলো সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করা।

শস্য সালোকসংশ্লেষণের (Crop Photosynthesis) মতো এ বিষয়ে গবেষণা তেমন অগ্রসর হয় নি, এমন কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বহুল ব্যবহারের ফলে পরিবহণ সংক্রান্ত গবেষণা সহজতর হওয়া সত্ত্বেও পরিবহণ সংক্রান্ত অনেক বর্ণনামূলকও গবেষণা হয়েছে, কিন্তু এটি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এটি শস্যের ফলনের উপর প্রভাব বিস্তার করে কি-না, সেসব বিষয় জানা যায় অনেক পরে।

সঞ্চয়-ক্ষমতা (Storage capacity)

শস্য বিবর্তনের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে, অনেক শস্য উদ্ভিদের ফলন অঙ্গের সঞ্চয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদসত্ত্বেও ফলন সীমায়িত হওয়ার জন্য এখনও সঞ্চয়-ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সঞ্চয়-ক্ষমতার উপাদানগুলোর বিশ্লেষণ শস্য শারীরবিজ্ঞানের গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিত্রিত হওয়া উচিৎ। যদিও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Engledow এবং Wadham ১৯২৩ সালে এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, তথাপিও এই বিষয়টি অবহেলিত রয়েছে। এই অবহেলার জন্য দায়ী দুটি মূল কারণের মধ্যে একটি হলো সে

সময়ে বৃদ্ধি বিশ্লেষণকে অনেক আপেক্ষিক বিষয় বলে মনে করা হতো বলে এই বিষয়ে গবেষণার দিকেই বিজ্ঞানীরা বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কারণ হলো প্রায়–সর্বোত্তম কৃষি পরিচর্যায় ফলনের উপাদানগুলোর মধ্যে প্রায়ই ঋণাত্মক (negative) সম্পর্ক পাওয়া যায়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফলনের সীমাবদ্ধতার জন্য সঞ্চয়ের ক্ষমতার চেয়ে এসিমিলেটের সরবরাহ বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সালোকসংশ্লেষণের হার, এসিমিলেট স্থানান্তর এবং সঞ্চয় ক্ষমতার মধ্যে ফিড ব্যাক (feed back) সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি এবং সঞ্চয়ের হার ও বর্ধিষ্ণুকালের কৌশলের বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য পরিবর্তনশীল মডেলিং–এর চাহিদার কারণে শস্য শারীরবিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ভবিষ্যতে আরও গুরুত্ব দেয়া হবে

আদর্শ উদ্ভিদ প্রকার (Ideal plant type)

ভবিষ্যতে শস্য শারীরতত্ত্ববিদদের দায়িত্ব হবে শস্যের ফলন এবং গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য ফলন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে সেগুলোকে সনাক্ত করে উদ্ভিদ প্রজননবিদদেরকে প্রদান করা। ইতোমধ্যে অবশ্য উদ্ভিদ প্রজননবিদরা বিভিন্ন শস্যের ফলনে গুণগত মান বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন, তবে ফলন আরও বৃদ্ধি করতে হলে ফলনের শারীরতাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে আরও জ্ঞান থাকা দরকার।

প্রকৃত আদর্শ উদ্ভিদ প্রকার সম্পর্কে উদ্ভিদ প্রজননবিদদের সুস্পষ্ট ধারণা অনেকদিনের। ১৯২৩ সালে Engledow এবং Wadham বলেছেন যে, *উদ্ভিদের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য একর প্রতি ফলনকে নিয়ন্ত্রণ করে তা বের করতে হবে এবং সংকরায়ণের মাধ্যমে এসমস্ত গুণাবলী একটি উদ্ভিদ প্রকারে সমাবেশিত করতে হবে।* এরকম ধারণা অবশ্য সে সময়কার অনেক প্রজননবিদদের ছিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যাদির অভাবে তারা খুব একটা অগ্রসর হতে পারেননি।

পরবর্তী বছরগুলোতে বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের তালিকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সাথে সহজে দৃশ্যমান অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের তুলনায় শারীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জাপানের ধান প্রজননের উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে।

জাপানের জাতীয় কৃষি গবেষণা স্টেশনের প্রথম দিকের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে একটি ছিল বেশি সার প্রয়োগের ফলে ধানের লজিং (lodging) বন্ধকরণের বিষয়টি। উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ একমত হন যে, ধানের এমন ভ্যারাইটি উদ্ভাবন করতে হবে যাতে খাটো কাণ্ড, উচ্চ হারে কুশি (tiller) উৎপাদনের ক্ষমতা এবং মঞ্জরীর (panicle) সংখ্যা বেশি থাকে। এই ভ্যারাইটি যাতে বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে, সে দিকটিতেও নজর দেয়া হয়।

Monsi এবং Saeki এর মডেল এবং উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের সম্পর্কের বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে, ক্ষুদ্রাকার, খাড়া ও পুরু পাতা এবং ঘনসন্নিবিষ্ট (compact) কুশি অবস্থার সুবিধা অনেক (Tsunoda, 1959 ; Murata, 1961)।

জাপানের এই ধারণা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে ও স্থানান্তরিত করা হয় এবং আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের নিম্নভূমিতে অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করলেও যাতে এই ভ্যারাইটি অভিযোজিত হতে পারে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন (Jennings, 1964)।

মেক্সিকান গম এবং আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (IRRI) গবেষণা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো এমন ভ্যারাইটি উদ্ভাবন করা যা বিভিন্ন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারে। এর জন্য সাধারণভাবে আদর্শ উদ্ভিদ প্রকারের প্রয়োজন হয়, তবে সেই সাথে অন্যান্য শারীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যেমন পুষ্পায়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য দিবা–দৈর্ঘ্যে সংবেদনশীল না হওয়া এবং জীবন চক্রের ব্যাপ্তিকাল কম হওয়া। তবে এসকল বৈশিষ্ট্য সর্বজনীনভাবে অভিপ্রেত নয়। যেমন উচ্চ অক্ষাংশে জন্মানোর জন্য গমের কিছুটা দিবা–দৈর্ঘ্যের সংবেদনশীলতার প্রয়োজন আছে এই জন্য যে, তুষারপাত শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যাতে এদের মঞ্জরীর বিকাশ ঘটে একইভাবে, ভাসমান ধানের (floating rice) ক্ষেত্রে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর পুষ্পায়নের প্রয়োজন হয়, তা না হলে শস্য কর্তনের সময় অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী শস্যের উন্নতমানের ভ্যারাইটি উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে এবং সেই সাথে শস্য উৎপাদনের কৃষিতাত্ত্বিক (agronomic) পদ্ধতির পরিবর্তনের উপরেও জোর দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি অজৈব নাইট্রোজেন সার, আগাছানাশক ও কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার কমানোর জন্য সামাজিক চাপের সৃষ্টি হয়েছে এবং এর জন্য আদর্শ উদ্ভিদ প্রকারের ধারণারও পরিবর্তন ঘটছে।

যেহেতু বৃদ্ধির স্বভাবের এবং শস্যের গঠন শস্য সালোকসংশ্লেষণকে প্রভাবিত করে, সেহেতু অতীতের মতো বর্তমানেও সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দ্রব্যের স্থানান্তর, সঞ্চয়ের কৌশল ও ক্ষমতা এবং প্রোটিন ও লিপিড সংশ্লেষণের বিষয়েও ভবিষ্যতে আরও গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এটি শস্যের ফলন আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে শস্য শারীরতত্ত্ববিদদের জন্য প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করবে।

শস্য শারীরবিজ্ঞানের পরিসর (Scope of crop physiology)

শস্য উদ্ভিদের বংশগতীয় গঠন এবং যে পরিবেশে এটি জন্মে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর শস্যের ফলন নির্ভর করে। জিনোটাইপ ও পরিবেশের বিভিন্নতা জলবায়ুগত এবং কালচারাল পদ্ধতিসহ শারীরতাত্ত্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রিয়াশীল এবং যা আবার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই শারীরতাত্ত্বিক পদ্ধতিগুলো এমন যন্ত্র যার মাধ্যমে বংশগতীয় গঠন ও পরিবেশ উভয়েই ক্রিয়াশীল হয়ে বৃদ্ধির পরিমাণ এবং গুণগত মান তৈরি করে, যাকে আমরা ফলন বলি। তাই, শস্য শারীরবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো কিভাবে শস্যের অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য ও শারীরতাত্ত্বিক ক্রিয়া কলাপ পরিবেশের সাথে ক্রিয়া করে শস্যের ফলন নির্ধারণ করে, সে বিষয়টি জানা। শস্য শারীরবিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক হলো বিভিন্ন মৃত্তিকা ও জলবায়ুগত পরিবেশে কি কি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া ফলনকে সীমায়িত করে, তা উদঘাটন করা। এই তথ্যাদি পরিবেশের পীড়নকে (stress) সহ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভ্যারাইটি উদ্ভাবনে উদ্ভিদ প্রজননবিদদেরকে সাহায্য করবে।

তাই এটি প্রতীয়মান হয় যে, শস্য উৎপাদনের গবেষণায় শস্য শারীরবিজ্ঞান মধ্যমণি হয়ে থাকবে এবং কৃষিতত্ত্ববিদ, মাটিবিজ্ঞানী এবং উদ্ভিদ প্রজননবিদদের গবেষণা এমন দিকে নিয়ে যেতে হবে, যাতে করে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলো সনাক্তকরণ এবং সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে করে এই প্রক্রিয়াগুলো ভালভাবে প্রকাশ পায়। অতীতে উদ্ভিদ প্রজননবিদরা ফলন বৃদ্ধি করেছেন শস্যের সহজে দৃশ্যমান দোষ–ত্রুটিগুলো পর্যায়ক্রমে বিলুপ্তির মাধ্যমে। এই ত্রুটিগুলো হলো বিভিন্ন রোগ, পোকামাকড়, শুষ্ক আবহাওয়া, উচ্চ তাপমাত্রা এবং লজিং প্রতিরোধী ইত্যাদি।

একটি সমস্যা হলো এই যে, প্রতিটি শারীরতাত্ত্বিক ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য বিভিন্নভাবে ফলনকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন গমের পাতার কোণ (angle), সালোকসংশ্লেষণের উচ্চ হার, হুলযুক্ত (awn) মঞ্জরী, খর্বাকৃতি কাণ্ড অথবা স্বল্পসংখ্যক কুশি বাছাই করে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। শুষ্ক আবহাওয়ায় হলো সুবিধাজনক, কিন্তু ভেজা আবহাওয়ায় এটি বিঘ্ন সৃষ্টি করে। খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির কাণ্ড ক্যানোপিতে আলো বিস্তারের ক্ষেত্রে অসুবিধা ঘটায়। ব্যাপক শারীরতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে কতিপয় অবাঞ্ছিত সম্পর্ক ভাঙা সম্ভব, তবে বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন কি কি বিষয় ফলনকে সীমায়িত করে সে সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করা।

ভবিষ্যতে মালটিপল ক্রপিং-এর দিকেও নজর দিতে হবে। সেইসাথে স্বল্পচাষে শস্য উৎপাদন, জ্বালানির ব্যবহার কমানো এবং শস্য উদ্ভিদ যাতে দক্ষতার সাথে ফসফেট এবং অন্যান্য সার ব্যবহার করতে পারে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। সেচের পানির দুষ্প্রাপ্যতা এবং সেচ খরচ কমানোর জন্য শস্য যাতে অধিক দক্ষতার সাথে পানি ব্যবহার করতে পারে, সে বিষয়টিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্তিকা পরিবেশ

ভূ-পৃষ্ঠের উপরের কঠিন স্তর যা শিলা খনিজের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক পদ্ধতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে জীব ও তাদের পচনক্রিয়ার ফলে উৎপাদিত পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয়ে যা সৃষ্টি হয় সেটি মৃত্তিকা নামে পরিচিত।

শিলার শ্রেণীবিভাগ

তিন প্রকারের শিলা আছে (১) আগ্নেয় (Igneous) শিলা, (২) পাললিক (Sedimentary) শিলা এবং (৩) রূপান্তরিত (Metomorphic) শিলা।

১. আগ্নেয় শিলা : সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে পৃথিবী ছিল গলিত বস্তুর মতো কঠিন এবং ধীরে ধীরে শীতল হতে হতে এটি কঠিন হয়। এই প্রাথমিক গলিত বস্তু কঠিন হয়েই আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়েছে। এটি আবার দুটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। যথা– (ক) প্লুটোনিক (Plutonic) শিলা এবং (খ) ভলকেনিক (Volcanic) শিলা।

(ক) প্লুটোনিক শিলা : পৃথিবী পৃষ্ঠের বিশাল শিলা মূলত ভূ–তলের অভ্যন্তরে গলিত বস্তু জমাট বেঁধে সৃষ্টি হয় এবং প্রাক ভূ-তাত্ত্বিক সময়ে (Pre-geological) বিভিন্ন প্রকার ভূ আন্দোলনের কারণে এটি ভূ–পৃষ্ঠে চলে আসে। ভূ–তলের অভ্যন্তরে শীতলীকরণ প্রক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে হয়। শীতলীকরণের সময় কেলাস তৈরি হয় এবং তাই সে সময়কার তৈরি শিলা অধিকতর কেলাসিত। শীতলীকরণ খুব ধীরে ধীরে হলে বড় কেলাস এবং খুব দ্রুত হলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কেলাস তৈরি হয়।

(খ) ভলকেনিক শিলা : কখনো কখনো ভূ–তলের অভ্যন্তর হতে তরলাকার গলিত লাভা ভূ–পৃষ্ঠে উঠে আসে। একে বলা হয় আগ্নেয়গিরি। ভূ-পৃষ্ঠে এই লাভা দ্রুত শীতল হয়ে কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। একেই বলা হয় ভলকেনিক শিলা।

২. পাললিক শিলা : প্রাথমিক অবস্থায় ভূ পৃষ্ঠে যে শিলা তৈরি হয়েছিল তা বর্তমানে সে অবস্থায় নাই। বিভিন্ন প্রকার ক্ষয়ীভবনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এর পরিবর্তন ঘটেছে। শিলার ক্ষয়ীভূত অংশগুলো বায়ু, পানি এবং মাধ্যাকর্ষণজনিত শক্তির প্রভাবে অন্যত্র সরে যায়। প্রকৃতপক্ষে আগ্নেয় শিলা থেকেই পাললিক শিলার উদ্ভব হয়েছে। যেমন– ছোট ছোট পাথরখণ্ড, বালি, পলিমাটি ইত্যাদি নদী বহন করে মোহনার দিকে নিয়ে যায়। পৃথিবীর পৃষ্ঠেদৃষ্ট শিলার ৫ ভাগের ৪ ভাগই হলো পাললিক শিলা। তবুও, পাললিক শিলা সমগ্র শিলার ৫% বেশি নয়; বাকি অংশ আগ্নেয় শিলা।

৩. রূপান্তরিত শিলা : অত্যধিক চাপ ও তাপে আগ্নেয় ও পাললিক শিলার গঠন পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তরিত শিলা তৈরি হয়েছে। এভাবে বেলেপাথর (sand stone) কোয়ার্টজাইট (quartzite), ক্লেশেল স্লেটে, চুনাপাথর ক্যালসাইট (Calcite) অথবা মার্বেলে, গ্রানাইট নিসে (gneiss) পরিবর্তিত হয়েছে।

তিন প্রকার শিলার উদাহরণ নিচে উপস্থাপিত হলো :

আগ্নেয় শিলা : গ্রানাইট, সিয়েনাইট (syenite), ব্যাসাল্ট (basalt), ডায়োরাইট(diorite), গ্র্যাব্রো (gabbro) এবং পেরিডোটাইট(peridotite)।

পাললিক শিলা : চুনাপাথর, ডলোমাইট (dolomite) বেলেপাথর, শেল (shale) এবং কংগ্লোমারেট (conglomerate)।

রূপান্তরিত শিলা : নিস (gneiss), স্কিস্টস (schists), শ্লেট, মার্বেল, ক্যালসাইট এবং কোয়ার্টজাইট।

শিলায় খনিজ কণা (Rock Minerals)

অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিলায় নিম্নলিখিত খনিজ কণা প্রচুর পরিমাণে থাকে।

কোয়ার্টজ (Quartz) : এটি সিলিকা বা সিলিকন ডাই–অক্সাইড ; অধিকাংশ শিলায় এটি উপস্থিত। যেসব শিলায় মুক্ত সিলিকা প্রচুর পরিমাণে থাকে (অর্থাৎ ক্ষারকের সাথে যুক্ত নয়), তাদেরকে এসিড (acid) শিলা বলে। এসিড শিলার উদাহরণ গ্র্যানাইট। ক্ষারীয় (basic) শিলায় (যেমন- ব্যাসাল্ট) খুব সামান্য পরিমাণে, যদি কিছু থাকে, মুক্ত সিলিকা আছে।

ফেলসপার (Felspar) : এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মৃত্তিকা সৃষ্টিকারী খনিজ পদার্থ ; পটাশ ফেলসপার অর্থোক্লেজ ফেলসপার গঠন করে এবং এটি পটাশিয়াম অ্যালুমিনো সিলিকেট এবং এর সংকেত হলো $K_2O.\ Al_2O_3.\ 6SiO_2$, অ্যালবাইট (albite) বা সোডা ফেলসপার $Na_2O.\ Al_2O_3$ এবং অ্যানোরথাইট (anorthite) বা লাইম ফেলসপার $CaO.\ Al_2O_2$।

মাইকা (Mica) : মাইকা অপর একটি মৃত্তিকা সৃষ্টিকারী খনিজ পদার্থ। পটাশ মাইকা সাদা এবং স্বচ্ছ এবং এটি মাস্কোভাইট (muscovite) মাইকা নামে পরিচিত। এর সংকেত $K(OH)_2\ Al_2Si_3O_{10}$। ম্যাগনেশিয়াম মাইকাকে বলা হয় বায়োটাইট (biotite) মাইকা। ফেলসপার এবং অন্যান্য সিলিকেট খনিজ পদার্থের মতো মাইকা সহজে ক্ষয়ীভবন হয় না।

অলিভিন (Olivine) : এটি ম্যাগনেশিয়াম সিলিকেট।

লোহাঘটিত খনিজ : হেমাটাইট (Fe_2O_3), ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4) এবং পাইরাইট (FeS_2)।

ক্যালসাইট : এটি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট।

ডলোমাইট (Dolomite): এটি ক্যালসিয়াম- ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট।

অ্যাপাটাইট (Apatite): এটি ক্যালসিয়াম ফসফেট।

ভূ–ত্বকে মৃত্তিকা সৃষ্টিকারী গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের আনুপাতিক হার হচ্ছে : ফেলসপার ৬০%, কোয়ার্টাইজ ১২%, মাইকা ৩%, ফেরোম্যাগনেশিয়াম খনিজ ১৫% এবং অন্যান্য ১০%।

শিলার ক্ষয়ীভবন ও মৃত্তিকার উৎপত্তি (Weathering of rocks and formation of soil)

মৃত্তিকার উৎপত্তির প্রথম ধাপে শিলার খনিজ কণার ক্ষয়ীভবনের ফলে মাতৃ পদার্থের উদ্ভব হয়। ক্ষয়ীভূত এই অজৈব পদার্থের সাথে উদ্ভিজ কাঁচা জৈবপদার্থ এবং অণুজীবের ক্রিয়ার ফলে পচনশীল বস্তু জমা হয়। উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ড মৃত্তিকার পৃষ্ঠে এবং মৃত মূল মৃত্তিকার অভ্যন্তরে জৈব পদার্থ সরবরাহ করে। বিভিন্ন অণুজীবের ক্রিয়ার ফলে এটি দ্রুত ভেঙে যায়। বায়ুজীবী অবস্থায় এবং পর্যাপ্ত পানি থাকলে এই ভাঙন দ্রুততর হয় এবং পরিশেষে হিউমাসে পরিণত হয়।

কতকগুলো ভৌত প্রক্রিয়ায় ক্ষয়ীভবন হয়ে শিলা এবং শিলা খণ্ডগুলো কোনো প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। ভৌত ক্ষয়ীভবনের মাধ্যমগুলোর মধ্যে বরফ জমা ও গলা, তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি, হিমবাহ, নদীপ্রবাহ, ঢেউ এবং বায়ুপ্রবাহ প্রধান।

(১) বরফ জমা ও গলা : ঠাণ্ডায় পানি যখন বরফে পরিণত হয় তখন এর আয়তন শতকরা ৯ ভাগ বেড়ে যায়। ফাটলের মধ্যে পানি ঢুকে জমে গেলে যে চাপের সৃষ্টি হয়, তার ফলে শিলা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ঠাণ্ডা ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি, সেখানে বরফ গলা ও জমা শিলার ক্ষয়ীভবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(২) তাপমাত্রা : তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে পদার্থের আয়তনের সংকোচন এবং প্রসারণ ঘটে। তবে শিলা তাপ কুপরিবাহী বলে শিলাপৃষ্ঠের উচ্চ তাপ কেবলমাত্র সামান্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। উচ্চতাপে শিলাপৃষ্ঠ আয়তনে বৃদ্ধি পায় বলে তা অবশিষ্টাংশ থেকে আলগা হয়ে আসে। আবার, দিন ও রাতের তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে পাশাপাশি সংলগ্ন ভিন্ন ভিন্ন খনিজে বিভিন্ন ধরনের প্রসারণ ও সংকোচন ঘটে। ফলে শিলাস্থ স্ফটিকগুলো আলগা হয়, যাতে করে শিলা ভেঙে যায়।

(৩) হিমবাহ : চলমান বরফ পানির স্রোতের নিয়ম অনুযায়ী চলে এবং স্রোতের মতোই কাজ করে। তবে এদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বরফ একটি কঠিন পদার্থ এবং কঠিন শিলাকে বিচূর্ণ করার ক্ষমতা পানির তুলনায় বেশি।

(৪) নদীপ্রবাহ : নদীপ্রবাহের সাথে যে প্রচুর পলি, নুড়িপাথর এমন কি স্থানচ্যুত বড় পাথর থাকে তাতে করে শুধু যে, উপত্যকাই গভীর ও বিস্তৃত হতে থাকে তাই নয়, এগুলো বিভিন্ন পদার্থকে বিচূর্ণ করে মৃত্তিকা গঠন করার মতো অবস্থায় নিয়ে যায়।

(৫) ঢেউ : ঢেউ এর ক্রিয়া সমুদ্র ও নদীর তীরেই সীমাবদ্ধ। অনেক জায়গায় ঢেউ এর ফলে সমুদ্রতীরবর্তী পাহাড়ের শিলা ভেঙে ছোট ছোট টুকরো ও নুড়িতে পরিণত হয়।

(৬) বায়ুপ্রবাহ : বায়ুপ্রবাহ, বিশেষ করে ধুলিকণায় পূর্ণ থাকলে, শিলাস্থ খনিজ পদার্থকে এক ঘষণের সৃষ্টি করে। ধুলিঝড় বিপুল ওজনের পদার্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যায় এবং সে সময় কণাগুলোর একে অপরের সাথে ঘষণ হয়।

রাসায়নিক ক্ষয়ীভবনের ফলে আদি শিলা বিগলিত হয়ে নতুন বস্তুর সৃষ্টি হয়। তাই, আদি শিলার কোনো কোনো খনিজ আংশিকভাবে, আবার কোনোটি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়, আর নতুন যে বস্তুর সৃষ্টি হয়, তা আদি খনিজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকারের।

বায়ুর উপস্থিতিতে রাসায়নিক ক্ষয়ীভবন প্রধানত ঘটে পানিতে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন এবং জৈব পদার্থ পচনের ফলে সৃষ্ট জৈব অ্যাসিড খনিজে চোয়ানোর ফলে। এক্ষেত্রে জারণ, পানিযোজন, কার্বোনেটযোজন এবং আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটে। ফেরাস এবং সালফাইড অধিক জারিত হয়। রাসায়নিক ক্ষয়ীভবন তীব্রতর হয় যদি তার পূর্বে শিলাতে ভৌত ক্ষয়ীভবন ঘটে থাকে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে রাসায়নিক পরিবর্তন বৃদ্ধি পায়। তাই নিম্ন তাপমাত্রা অপেক্ষা উচ্চতাপে রাসায়নিক ক্ষয়ীভবন বেশি হয়।

জিপসামের মতো খনিজ কণা সহজে এবং দ্রুত পানিতে দ্রবীভূত হয়ে শিলা থেকে পৃথক হয়। বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হয়ে ক্যালসাইটের উপর ক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট তৈরি করে, যা সহজেই পানিতে দ্রবীভূত হয়। পানিযোজিত হয়ে লৌহের অক্সাইড নতুন পদার্থে পরিণত হয় যা রাসায়নিক ক্ষয়ীভবনে কম বাধার সৃষ্টি করে। পানিতে দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পটাশ ফেলসপারের উপর ক্রিয়ার ফলে ক্লে, সিলিসিক

(silicic) অ্যাসিড এবং পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডে পরিণত হয়। ক্লে হলো এক প্রকার অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট।

$$K_2O.\ AL_2O_3.\ 6SiO_2 + 11H_2O = AL_2O_3.\ 2SiO_2.2H_2O + 4H_4\ SiO_4 + 2KOH$$

কেয়োলিন অথবা চীনা ক্লে — সিলিসিক এসিড — পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড

শিলার অধিকাংশ সিলিকেট কণা এভাবেই ক্ষয়ীভূত হয়। তাই পানি শুধুমাত্র দ্রাবক হিসেবেই কাজ করে না, শিলার আর্দ্রবিশ্লেষণও ঘটায়।

বায়ুমণ্ডলের খুব সামান্য মাত্রার কার্বন ডাই–অক্সাইড, নাইট্রিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া এবং সালফিউরিক অ্যাসিড পানি কর্তৃক খনিজ কণার ক্ষয়ীভবনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের অক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া বৃষ্টির পানির সাথে মিশে নাইট্রিক অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে পরিণত হয়। খুব সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত হয়ে লোহাঘটিত যৌগের জারণ ঘটায়।

ভৌত ও রাসায়নিক ক্ষয়ীভবন ছাড়াও জীবন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রভাবেও ক্ষয়ীভবন হয়, একে জৈবিক ক্ষয়ীভবন বলে। জীব অবশ্য সরাসরি শিলার ক্ষয়ীভবন করে না। উদ্ভিদের মূল শ্বসনের সময় কার্বন ডাই- অক্সাইড তৈরি করে। এতে ক্ষয়ীভবন ত্বরান্বিত হয়। আবার মূল শিলার ভিতরের ফাটল ও ছিদ্রকে বড় করে, যার ফলে সেগুলোর ভিতর দিয়ে পানি অতি সহজে চোয়াতে পারে। কীটপতঙ্গ মৃত্তিকায় গর্ত করে। তাতে পানি ও বায়ু মৃত্তিকার নিচের স্তরে প্রবেশ করে এবং অন্তর্ভূমি এভাবে কীটপতঙ্গ দ্বারা ক্ষয়ীভবনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়।

ভাঙা শিলাখণ্ডে প্রথমে লাইকেন ও মস জন্মায় এবং জীবনচক্র সমাপ্তির পর এদের দেহাবশেষ খনিজ কণার সাথে মিশে যায়। এর ফলে শৈবাল, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া এবং বিভিন্ন কীটপতঙ্গ এতে বসবাস শুরু করে। মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর এদের ক্রিয়ার ফলে জৈব পদার্থ খনিজ কণার সাথে মিশে যায়। মৃত্তিকায় বসবাসকারী কেঁচো উদ্ভিদের পচা অংশ খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণ মাটিও খেয়ে ফেলে এবং পৌষ্টিক–নালীর ভিতর দিয়ে এটি আবার বেরিয়ে আসে এসময় অবশ্য মৃত্তিকার গঠনের পরিবর্তন হয় এবং জৈব পদার্থের সাথে ভালভাবে মিশে যায়। তাই এই মৃত্তিকা বেশ উর্বর।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, ক্ষয়ীভবনের ফলে মৃত্তিকার উৎসবস্তু তৈরি হয়। আর পরের ধাপ হলো উৎসবস্তু থেকে মৃত্তিকা তৈরি হওয়া। এ দুটি প্রক্রিয়ার একটি শেষ হলে অপরটি শুরু হয়, তা নয়। ক্ষয়ীভবনের জন্যই মৃত্তিকা গঠন সম্ভবপর হয়, তবে সঙ্গে ক্ষয়ীভবনও চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষয় হওয়ার মতো খনিজ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে।

মৃত্তিকার গঠন প্রক্রিয়ার সাথে সাথে মৃত্তিকার প্রোফাইল বিকাশ শুরু হয়। মৃত্তিকা সাধারণত বিভিন্ন স্তরে স্তরীভূত থাকে। ভূ–পৃষ্ঠ হতে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে মৃত্তিকা বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত। প্রতিটি স্তরকে বলা হয় হরাইজন (horizon)। যে মৃত্তিকার প্রোফাইল গঠন হয়েছে তাকে 'পরিণত প্রোফাইল' বলা হয়।

মৃত্তিকা প্রোফাইল প্রধানত তিনটি স্তরে বিভক্ত। সর্বোচ্চ স্তরকে 'শীর্ষমৃত্তিকা' (top soil or A), মধ্যের স্তরকে অন্ত:মৃত্তিকা (sub-soil or B) এবং সর্বনিম্ন স্তরকে ক্ষয়ীভূত শিলাস্তর (weathered rock or C) বলা হয়। খনিজ পদার্থ এবং হিউমাসের প্রকৃতি অনুসারে মৃত্তিকার রঙের তারতম্য ঘটে। 'A' স্তরে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে, কিন্তু অজৈব পদার্থের পরিমাণ

কম থাকে। এই স্তরের মৃত্তিকার রঙ গাঢ় বর্ণের এবং উদ্ভিদের মূল ভালভাবে বিস্তারলাভ করে। 'B' স্তরে অজৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি, কিন্তু জৈব পদার্থের পরিমাণ কম। এ অংশে পানি চলাচল ক্ষমতা কম এবং বায়ুর পরিমাণ কম থাকায় এখানে মূলের বৃদ্ধি সীমিত। এ অংশের রঙ হাল্কা রঙের। তৃতীয় বা সর্বনিম্ন স্তর 'C'—আলগা কঠিন শিলা ও শিলাচূর্ণ দ্বারা গঠিত।

মৃত্তিকা সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহ

প্রধানত মাতৃ-পদার্থ, জলবায়ু, উদ্ভিদরাজি (vegetation), ভূ সংস্থান (topography) , সময় এবং জীবসমূহকে মৃত্তিকা সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

(১) **মাতৃ-পদার্থ :** মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদান, বিক্রিয়া, বুনট এবং গঠন প্রধানত নির্ভর করে মাতৃ পদার্থের উপর। সুনিষ্কাশিত অবস্থায়, লোহাসমৃদ্ধ মাতৃ-পদার্থ (যেমন– ব্যাসল্ট, ডোলিরাইট) থেকে যে মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়, তাতে লোহার পরিমাণ বেশি এবং এর গঠন ও ভাল। অপরপক্ষে, যে সমস্ত মাতৃ-পদার্থে লোহার পরিমাণ কম, কিন্তু কোয়ার্টজ বেশি, সেক্ষেত্রে মৃত্তিকার গঠন ভাল নয় এবং এটি সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কি প্রকারের ক্লে তৈরি হবে তাও মাতৃ-পদার্থ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু অক্সিজেনের উপস্থিতিতে যদি চোয়ানো চলতে থাকে, মাতৃ-পদার্থের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, অধিকাংশ মৃত্তিকায় কেয়োলিনিটিক (kaolinitic) ক্লে তৈরি হয়। পাললিক শিলা এমন পদার্থ দিয়ে গঠিত যাতে কমপক্ষে একবার ক্ষয়ীভবন হয়েছে এবং এতে ক্ষয়ীভবনের জন্য সামান্যই পদার্থ থাকে এবং এ থেকে যে মৃত্তিকা তৈরি হয় তাতে পুষ্টি উপাদান খুব কম থাকে।

(২) **জলবায়ু :** মৃত্তিকা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী। তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত মৃত্তিকার গঠনকে প্রভাবিত করে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে সারা বছরই তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি এবং যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং বিস্তার পরিমিত, সেক্ষেত্রে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তুলনায় মৃত্তিকা তাড়াতাড়ি সৃষ্টি হয়। কেননা নিম্নতাপে রাসায়নিক ক্ষয়ীভবন এবং অণুজীবের ক্রিয়া হ্রাস পায়। যেহেতু রাসায়নিক ক্ষয়ীভবন এবং চোয়ানোর পরিমাণের উপর বৃষ্টিপাতের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে, সেহেতু বৃষ্টিপাতের পরিমাণগত ও কালগত পরিবর্তনের সাথে মৃত্তিকা সৃষ্টির সম্পর্ক আছে।

শুষ্ক এলাকায়, যেখানে বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীয়ভবন বেশি, রাসায়নিক ক্ষয়ীভবন কেবল মৃত্তিকার উপরিস্তরে সীমাবদ্ধ এবং এর গতিও বেশ মন্থর। ক্ষয়ীভবনের জন্য সৃষ্ট দ্রবণীয় পদার্থগুলো চুইয়ে নিচে চলে যেতে পারে না, কিন্তু বাষ্পীভবনের জন্য উপরিস্তরে জমা থাকে। এর প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষারধর্মী। মৌসুমী (monsoon) এলাকায় যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি এবং বর্ষাকালের যে সময়ে বাষ্পীভবনের তুলনায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়, কেবল তখনই চোয়ানো হয়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত দ্রবীভূত লবণ অপসারিত হয় এবং মৃত্তিকার বিক্রিয়া নিরপেক্ষ কিংবা সামান্য অম্লধর্মী হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় যে সমস্ত এলাকায় বছরের অধিকাংশ সময়ই বাষ্পীভবনের তুলনায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়, যে সমস্ত এলাকায় মৃত্তিকা বেশ ক্ষারধর্মী হয়। চোয়ানো বৃদ্ধির সাথে সাথে সেসকুই-অক্সাইডের (Sesquioxide)–এর তুলনায় বালি বেশি অপসারিত হয় বলে এই মৃত্তিকার ক্লে অংশে সিলিকা/সেসকুই–অক্সাইডের অনুপাত কম। চোয়ানো বৃদ্ধি পেলে কেয়োলিনিটিক (kaolinitic) ক্লে (ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা (CEC) ২-৪ মিলিইকুইভ্যালেন্ট/১০০ গ্রাম)তৈরি হয়। যদি চোয়ানো কম হয়, তবে সোমেইলিটিক (someillitic) এবং মন্টমোরিলোনিটিক (montmorillonitic) ক্লে (এদের CEC যথাক্রমে ১০ থেকে ৪০ এবং ১০০ থেকে ১৫০ মিলিইকুইভ্যালেন্ট/১০০ গ্রাম) তৈরি হয়।

(৩) **উদ্ভিদরাজি :** বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক উদ্ভিদরাজি, যা বৃষ্টিপাতের পরিমাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে উদ্ভিদের অংশ, যেমন– মূলতন্ত্রের স্বভাব ও গভীরতা, চোয়ানো প্রতিরোধ এবং ক্ষারক মৌল ধরে রাখার মাধ্যমে মৃত্তিকা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

(৪) ভূ-সংস্থান : কোনো জমির ভূ-সংস্থানের প্রকৃতি অনুযায়ী জলবায়ুর কাজকে মন্থর কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারে। যেমন- নিম্নাঞ্চলে পানি জমে স্থায়ী জলাভূমির সৃষ্টি করে কিংবা সাময়িক বন্যা দেখা দেয়। সমতল এলাকায় মৃত্তিকা প্রোফাইল ভালভাবে বিকশিত হতে পারে বলে এখানে পরিণত মৃত্তিকা দেখা যায়। আবার ভূমিক্ষয় ঢাল থেকে কিছু ক্ষয়ীভূত পদার্থ সরিয়ে নেয় বলে সুস্পষ্ট মৃত্তিকা প্রোফাইলের বিকাশ ও গঠন ব্যাহত হয়। এক্ষেত্রে ঢাল বেয়ে দ্রুত পানি অপসারিত হয় বলে চোয়ানো খুব কম হয়। ভূ-সংস্থান মৃত্তিকার তাপমাত্রাকেও প্রভাবিত করে।

(৫) সময় (Time) : শক্ত শিলার (যেমন- গ্র্যানাইট) ক্ষয়ীভবন হতে কয়েক হাজার বছর সময় লাগে, কিন্তু নরম শিলার (যেমন- চুনাপাথর) ক্ষয় হতে কম সময় লাগে। মাতৃ-পদার্থের উপর জৈবিক এবং রাসায়নিক নিয়ামকগুলোর বহু বছর ক্রিয়ার ফলে মৃত্তিকার হরাইজনের সৃষ্টি হয়। মাতৃ-পদার্থ বহু বছর ধরে থাকলেও যদি সুবিকশিত হরাইজন না থাকে, অপরিণত (Young) মৃত্তিকা বলে। পরিণত মৃত্তিকায় তিনটি হরাইজন থাকে। কাজেই মৃত্তিকার বয়স পরিমাপ করা হয় তার প্রোফাইল বিকাশের পূর্ণতা দিয়ে, মাতৃ-পদার্থের ভূ-তাত্ত্বিক বয়স দিয়ে নয়।

(৬) মৃত্তিকাস্থ জীবকূল : উদ্ভিদের মূল শিলা ও খনিজ পদার্থ ভেদ করে যায় এবং বায়ু ও পানি চলাচলের পথ তৈরি করে। মৃত মূল পচে বিভিন্ন প্রকার জৈব ও অজৈব অ্যাসিড তৈরি করে। এই পচনের জন্য ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক অংশগ্রহণ করে। শ্বসনের জন্য মূল থেকে নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বোনিক অ্যাসিড তৈরি করে। এসব পদার্থ মৃত্তিকার প্রোফাইল ও গঠনকে প্রভাবিত করে। প্রাণীজগতের অন্তর্ভুক্ত যেসব জীব মৃত্তিকা সৃষ্টিতে সহায়তা করে তাদের মধ্যে কেঁচো, ইঁদুর, পিঁপড়া ইত্যাদি প্রধান। এরা গর্ত করে মৃত্তিকার হরাইজনগুলোকে মিশিয়ে দেয় এবং মৃত্তিকার গঠন ব্যাহত করে।

মৃত্তিকার ভৌত গুণাগুণ (Physical Properties of Soil)

মৃত্তিকার বুনট (texture), গঠন (structure), আপেক্ষিক ঘনত্ব (apparent density), সচ্ছিদ্রতা (porosity), রঙ ইত্যাদি মাটির ভৌত গুণাবলীর অন্তর্গত।

মৃত্তিকার বুনট (Soil texture) : এটি মৃত্তিকার গুরুত্বপূর্ণ ভৌত গুণাবলী। নুড়ি, বালি, পলি (silt) এবং কর্দম (clay) ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের মৃত্তিকার কণার আনুপাতিক হারকে মৃত্তিকার বুনট বলে। নুড়ি এবং কাঁকর ব্যতীত, মৃত্তিকার খনিজ কণার ব্যাস অনুযায়ী কতকগুলো শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। আমেরিকান কৃষি বিভাগ (USDA) এবং আন্তর্জাতিক পদ্ধতির (International System) শ্রেণীবিন্যাস ২.১ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.১ : মৃত্তিকার কণার শ্রেণীবিন্যাস

মৃত্তিকার কণা		কণার ব্যাস (মিলিমিটার)	
		আমেরিকান কৃষি বিভাগ	আন্তর্জাতিক পদ্ধতি
(ক)	নুড়ি	২.০ এর বেশি	
(খ)	অত্যন্ত মোটা বালি	২.০ থেকে ১.০	
(গ)	মোটা বালি	১.০ থেকে ০.৫০	২.০০ থেকে ০.২
(ঘ)	মধ্যম বালি	০.৫০ থেকে ০.২৫	
(ঙ)	মিহি বালি	০.২৫ থেকে ০.১০	০.২ থেকে ০.০২
(চ)	অত্যন্ত মিহি বালি	০.১০ থেকে ০.০৫	
(ছ)	পলি	০.০৫ থেকে ০.০০২	০.০২ থেকে ০.০০২
(জ)	কর্দম	০.০০২ এর কম	০.০০২ এর কম

মাঠে মাটির কণাগুলো, বিশেষ করে ক্ষুদ্রাকার কণাগুলোর অবশ্য পৃথকভাবে থাকে না, এক সঙ্গে দলা বেঁধে থাকে। উপরোক্ত ব্যাসের কণাগুলোর অনুপাতের উপর মৃত্তিকার গুণাগুণ অনেকাংশে নির্ভর করে। বিভিন্ন শ্রেণীর বুনট উপরোক্ত কণাসমূহের বিভিন্ন হারে সংমিশ্রণের জন্য সৃষ্টি হয়। এর উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকার বুনটকে নিম্নলিখিত কয়েকভাবে ভাগ করা হয়েছে :

(১) **বেলে মাটি** : এ মৃত্তিকায় শতকরা ০ থেকে ২০ ভাগ কর্দম এবং ৮০ থেকে ১০০ ভাগ বালি এবং নুড়ি-পাথর থাকতে পারে। এগুলোর মাঝে বড় আকারের রন্ধ্রস্থান থাকে, তাই বায়ু চলাচল ভাল হয়। বেলে মৃত্তিকা তাড়াতাড়ি শুকোয় এবং এর পানি ধারণক্ষমতা বেশ কম। বালি ও নুড়িতে কোনো পুষ্টি উপাদান থাকে না বলে, এ মৃত্তিকায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভাল হয় না।

(২) **পলি মাটি** : এ মৃত্তিকা নদীবাহিত। এতে প্রায় ২০% থেকে ৩০ % কর্দম, ৫০% থেকে ৬০% পলি এবং ভিতর দিয়ে সহজে বাতাস ও পানি চলাচল করতে পারে। অবশ্য এতে জৈব পদার্থের পরিমাণ কম থাকে।

(৩) **কাদা মাটি** : এ মৃত্তিকায় কর্দমের পরিমাণ ৩০% এর বেশি। মোটা কণার অনুপাত নিতান্ত কম। এর পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি, কিন্তু বায়ু চলাচল ভালভাবে হয় না। এ মাটি ভেজা অবস্থায় আঠালো এবং ধীরে ধীরে শুকায়। তখন একে কর্ষণ করা বেশ কঠিন এবং বড় বড় ঢেলার সৃষ্টি হয়।

(৪) **দো-আঁশ মাটি** : এতে সাধারণত ০% থেকে ২০% কর্দম, ০% থেকে ৫০% বালি এবং ৩০% থেকে ৫০% পলি থাকে। দো-আঁশ মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা, পানি শোষণ ক্ষমতা, নমনীয়তা এবং বায়ু চলাচল ক্ষমতা মধ্যম। এ মৃত্তিকা বেশ উর্বর এবং শস্য উৎপাদনের জন্য বেশ উপযোগী।

(৫) **বেলে-দো-আঁশ** : এ মাটি অনেকাংশে দো-আঁশ মাটি অনুরূপ। দো-আঁশ মৃত্তিকার তুলনায় এতে কিছু বেশি পরিমাণে বালি (৫০% থেকে ৮০%) থাকে।

মৃত্তিকার বুনটের পার্থক্যের জন্য মৃত্তিকার গুণাগুণ কিভাবে পরিবর্তিত হয় তা ২.২ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ২.২ : মৃত্তিকার বুনট দ্বারা প্রভাবিত কতিপয় মৃত্তিকার গুণাবলী

মাটির গুণাবলী	বুনট শ্রেণী		
	বালি	দো-আঁশ	কর্দম
১। বাতাসায়ন (aeration)	খুব ভাল	ভাল	খারাপ
২। ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা (CEC)	কম	মধ্যম	উচ্চ
৩। পানি নিষ্কাশন	খুব ভাল	ভাল	খারাপ
৪। ক্ষয়সাধন (erodibility)	সহজ	মধ্যম	কষ্টকর
৫। প্রবেশ্যতা (permeability)	দ্রুত	মধ্যম	ধীর গতিতে হয়
৬। তাপমাত্রা	তাড়াতাড়ি গরম হয়	মাঝারি গতিতে গরম হয়	ধীর গতিতে গরম হয়
৭। চাষাবাদ (tillage)	সহজে হয়	মোটামুটি হয়	কষ্টকর
৮। পানি ধারণ ক্ষমতা	কম	মাঝারি ধরনের	উচ্চ

বুনট সম্পর্কে ধারণা মাটি ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে। মোটা বুনটের মাটি খুব সহজে প্রবেশ করে এবং এর ভেতর দিয়ে বাতাস ও পানি সহজেই চলাচল করতে পারে। কিন্তু এ মাটি পানি অথবা

উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান ধরে রাখতে পারে না এবং সেজন্য এ মাটি অনুর্বর এবং দ্রুত শুকিয়ে যায়। মিহি কর্দম কণা অধিকাংশ পুষ্টি উপাদান আটকিয়ে রাখে, কিন্তু এ মৃত্তিকায় বাতাস, পানি ও উদ্ভিদের মূল সহজে প্রবেশ করতে পারে না। মূলের বৃদ্ধি ব্যাহত হলে উৎপাদনও কমে যায়। মাঝামাঝি বুনটের মৃত্তিকা শস্য উৎপাদনের জন্য বেশি উপযোগী। কারণ এ মৃত্তিকায় যেমন বাতাস ও পানি সহজে চলাচল করতে পারে, তেমনি পানি ও পুষ্টি উপাদান ভালভাবে আটকে রাখতে সক্ষম। মোটা বুনটের মাটির বেশি পরিমাণে সার লাগবে এবং পানি ও পুষ্টি উপাদান ধরে রাখার জন্য এর জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। মোটা বুনটের মৃত্তিকায় পানি বেশিক্ষণ আটকিয়ে থাকে না, তাই ঘন ঘন অল্প পরিমাণ সেচ দেয়া ভাল। ভারি কর্দম মৃত্তিকার ভিতর দিয়ে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়; এজন্য এতে যথোপযুক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মিহি বুনটের মৃত্তিকাতে বেশি ভেজা অবস্থায় কাজ করা উচিত নয়, সেক্ষেত্রে জমাট বেঁধে বড় বড় ঢেলায় পরিণত হতে পারে। শস্য উৎপাদনের ব্যাপারে জমির গুণাগুণ যাচাইয়ের সময় জমির উপরিতল এবং অন্তঃতল মাটি, উভয়েরই বুনট বিবেচনা করতে হবে।

মাটির গঠন

মাটি গঠন বলতে বুঝায় বালি, পলি এবং কর্দম কণার অবস্থান এবং একটি বিশেষভাবে দলাবদ্ধ হয়ে থাকে। এ কণাগুলো বিভিন্ন আকার ও আয়তনের গুচ্ছ বা পেড (ped) হিসেবে একত্রিত হয়ে থাকে। এই কণাগুলোর একত্রিকরণের ফলে ফাঁকা জায়গা বা রন্ধ্রস্থানের (pore space) সৃষ্টি হয়। যখন ছোট ছোট কণাগুলি বড় বড় কণার রন্ধ্রস্থানে পুঞ্জীভূত অবস্থায় থাকে, তাকে পুঞ্জিভূত গঠনবিন্যাস (aggregate Structure) বলে। আবার যখন একটি ছোট দানার চারদিকে অনেকগুলো অধিকতর ছোট দানা একত্রিত হয়ে একটি বৃহত্তর যৌগিক দানা তৈরি করে, তাকে গুচ্ছতা (flocculation) গঠন বিন্যাস বলে। পুঞ্জীভূত গঠনবিন্যাস অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী ভেঙে এবং কর্ষণ, বৃষ্টিপাত, অণুজীব ইত্যাদির ক্রিয়ার ফলে ভেঙে যায়।

মাটি গঠনবিন্যাস শস্য উৎপাদনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ মাটিকার রন্ধ্রস্থান (pore space) মৃত্তিকার ভৌত অবস্থা নির্দেশ করে, যার উপর শস্যের মূলের বৃদ্ধির উপযুক্ততা নির্ভর করে। রন্ধ্রস্থান থেকে মূল অক্সিজেন গ্রহণ করে। রন্ধ্রস্থানে জমাকৃত পানি মূল কর্তৃক শোষিত হয়। রন্ধ্রস্থান বড় হলে, চোয়ানোর জন্য পানি মৃত্তিকার অনেক গভীরে চলে যায়। এর জন্য মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ার মূল কর্তৃক পানি পরিশোষণ অপর্যাপ্ত হয়। অপরদিকে রন্ধ্রস্থান ছোট হলে মৃত্তিকা বেশি পানি ধরে রাখতে পারে, ফলে মূলের পানি পরিশোষণ পর্যাপ্ত হয়।

মাটির মৃত্তিকার মোট আয়তন (V) থেকে ঐ আয়তনে অবস্থিত কঠিন পদার্থ (Vs) বিয়োগ করলে যে আয়তন পাওয়া যায় তাকে রন্ধ্রস্থান বলে। এক আয়তনে যে রন্ধ্রস্থান থাকে তার শতকরা হারকে রন্ধ্রময়তা (porosity) বলে।

অর্থাৎ রন্ধ্রময়তা $=(V-Vs)/V \times 100$

মাটির একক ওজনকে এর আয়তন দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায় মৃত্তিকার ঘনত্ব। একে আপাত ঘনত্ব বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, অধিকাংশ কর্ষিত মৃত্তিকার রন্ধ্রময়তার পরিসর ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ (সারণি ২.২); তবে পুঞ্জীভূত হওয়ার মাত্রার তারতম্যের জন্য একই মৃত্তিকায় এটি ভিন্ন ভিন্ন হয়। আপাত ঘনত্বের পরিসর হলো ১ থেকে ২ গ্রাম কঠিন পদার্থ প্রতি ঘনসেন্টিমিটার ভেজা মৃত্তিকায়। এটি নির্ভর করে মৃত্তিকার উপাদান, পুঞ্জীভূত হওয়ার মাত্রা এবং পানির পরিমাণের উপর।

সাধারণত মৃত্তিকার গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে রন্ধ্রময়তা হ্রাস পায় এবং আপাত ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। ২.৩ নং সারণি বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার রন্ধ্রময়তা ও আপাত ঘনত্ব দেখানো হয়েছে।

২.৪ সারণি বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার রন্ধ্রস্থানের বিস্তার দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে রন্ধ্রস্থানের আকার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা - (ক) বৃহদাকার রন্ধ্রস্থান যা মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে পানি ধরে রাখতে পারে না (এদের ব্যাস ৩০ মাইক্রোমিটারের বেশি), (খ) অতিক্ষুদ্র রন্ধ্রস্থান যা শক্তভাবে পানি ধরে রাখতে পারে (০.২ মাইক্রোমিটার ব্যাসের কম) এবং (গ) মাঝামাঝি রন্ধ্রস্থান (০.২ থেকে ৩০ মাইক্রোমিটার) যা উদ্ভিদের পরিশোষণের জন্য মোটামুটি পানি ধরে রাখতে পারে।

সারণি ২.৩ : কতিপয় মৃত্তিকার রন্ধ্রতার রন্ধ্রময়তা এবং আপাত ঘনত্ব

মাটি	রন্ধ্রময়তা (%)	আপাত ঘনত্ব (গ্রাম প্রতি ঘনসেন্টিমিটার)
বেলে	৩৫	১.৭
দো-আঁশ	৪৬	১.৪
ভারি কর্দম	৫৩	১.২
অধিক জৈব পদার্থযুক্ত কর্দম	৬০	১.০

সারণি ২.৪ : তিন প্রকার মৃত্তিকার রন্ধ্রস্থানের বিস্তার।

শ্রেণী		সম্পূর্ণ আয়তনের অনুপাত		
		মোটা বেলে	কর্দম দো-আঁশ	ভারী কর্দম
কঠিন বস্তু		০.৬৮	০.৪৪	০.৩৮
পানি ও বায়ুপূর্ণ >৩০			০.১০	০.০৪
রন্ধ্রের ব্যাস	মাইক্রোমিটার	০.২৪	০.২৭	০.২৫
	০.২ থেকে ৩০	০.০৭	০.১৯	০.৩৩
	মাইক্রোমিটার	০.০১		
	< ০.২			
	মাইক্রোমিটার			

বর্ষজীবী উদ্ভিদের মূলের ব্যাস ৫×১০^{-২} থেকে ৫×১০^{-৩} সেন্টিমিটার এবং মূলরোমের ব্যাস আনুমানিক ১×১০^{-৩} সেন্টিমিটার। মৃত্তিকার উপরের স্তরে যেখানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মূল থাকে, সেখানে মৃত্তিকার আয়তনের ০.৫ থেকে ১.০ শতাংশের বেশি মূল থাকে না এবং কর্দম মৃত্তিকার তুলনায় বেলে মৃত্তিকায় বেশি থাকে। পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, প্রায় ২০০ মাইক্রোমিটার কম ব্যাসের রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে মূল প্রবেশ করতে পারে না। বর্ষজীবী উদ্ভিদের মূল ১ থেকে ২ মিটার পর্যন্ত গভীরে যায়। মৃত্তিকার পৃষ্ঠীভূত কণার আকারের পার্থক্যের জন্য মূলের বিস্তারের বিভিন্নতা হয়।

মাটির জৈব পদার্থ

উদ্ভিদ ও জীবজন্তু মৃত অবস্থায় মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে মাটি জৈব পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি মৃত্তিকার এমন একটি উপাদান যা মৃত্তিকার ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ, মৃত্তিকাস্থ অণুজীবের কার্যকলাপ এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। তাই শস্য উৎপাদনের জন্য মৃত্তিকার জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অপরিহার্য।

বিভিন্ন উৎস থেকে মাটি জৈব পদার্থ পায়। প্রধান প্রধান উৎস হলো : (১) মূল ও শস্য কর্তনের পর শস্যের অবশিষ্টাংশ থেকে, (২) উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য পতনশীল অঙ্গ থেকে, (৩) জৈব সার প্রদানের মাধ্যমে এবং (৪) মৃত্তিকায় বসবাসকারী প্রাণীর মলমূত্র ও মৃতদেহ এবং অণুজীব থেকে। টাটকা জৈব পদার্থ মৃত্তিকায় প্রদান করলে, কতকগুলো অণুজীবের ক্রিয়ার ফলে এটি আকার ও গঠন হারায় এবং বিগলিত হয়ে মাটির সাথে পুরোপুরি মিশে যায়। জৈব পদার্থের অর্ধ-পচা অবস্থাকে বলে হিউমাস এবং হিউমাস তৈরির পদ্ধতিকে বলে হিউমিফিকেশন।

উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ অবশেষ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বা উপরে বিভিন্ন অবস্থায় বিগলিত হয়। তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু ও কার্বন ঃ নাইট্রোজেন অনুপাত (C ঃ N) এবং অণুজীবের উপর বিগলনের হার ও উৎপাদিত বস্তুর প্রকৃতি নির্ভর করে। তাপমাত্রা বেশি হলে বিগলন দ্রুত হয়; এর জন্য গ্রীষ্মমণ্ডলের উচ্চস্থানের মৃত্তিকায় প্রধানত হিউমাস কম থাকে। জৈবিক বিগলনের জন্য আর্দ্রতার প্রয়োজন, কিন্তু পানি অতিরিক্ত হলে বায়ুর অভাব দেখা দেয় এবং বিগলনের হার হ্রাস পায়। মৃত্তিকাস্থ কতিপয় ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া বিগলনে অংশগ্রহণ করে। টাটকা জৈব পদার্থে থাকে সরল কার্বোহাইড্রেট, যেমন- চিনি ও শ্বেতসার, প্রোটিন, সেলুলোজ, লিগনিন, মোম এবং রেজিন। শক্তির জন্য অণুজীব দ্রুত চিনি ও শ্বেতসার ব্যবহার করে। জারণযোগ্য কার্বন প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য হয় বলে মৃত্তিকায় ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং অ্যাকটিনোমাইসিটিসের সংখ্যা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। কার্বোহাইড্রেট নিঃশেষ হলে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ এবং কার্বনের পরিমাণ কমে যায়। ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহারের জন্য সেলুলোজ সহজলভ্য নয়, কিন্তু এর উপর প্রথমে ছত্রাক ক্রিয়া করে সরল পদার্থ তৈরি হলে ব্যাকটেরিয়া ক্রিয়াশীল হয়। প্রোটিন ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। কার্বোহাইড্রেট নিঃশেষ হলে ব্যাকটেরিয়ার কার্যকলাপ থেমে যায়। মাটির লিগনিন, মোম এবং রেজিনের খুব একটা পরিবর্তন হয় না এবং এর সাথে মৃত ব্যাকটেরিয়ার কোষ মিশে মৃত্তিকায় স্থায়ী যৌগ পদার্থের সৃষ্টি হয়। একেই বলে হিউমাস এবং এটি কলেজীয় প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। এটি গাঢ় রঙের দানাহীন এবং কর্দমের সাথে ভালভাবে মিশে থাকে। কর্দমের মতো হিউমাস ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট, তাই এটি ক্ষারক ধরে রাখে। হিউমাসের ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা বেশি, প্রতি গ্রামে ২০০ থেকে ৬০০ মিলিইক্যুইভ্যালেন্ট; কর্দমের এই মান ৮০ থেকে ১০০ মিলিইক্যুইভ্যালেন্ট। মৃত্তিকার দ্রবণ থেকে হিউমাস ফসফেট উপশোষণ (adsorption) করে, কিন্তু অন্যান্য অ্যানায়ন, যেমন- সালফেট, নাইট্রেট ইত্যাদি পারে না।

মাটির জৈব পদার্থের ভূমিকা বিবিধ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শস্য উৎপাদন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের পক্ষে উপকারী। মৃত্তিকার উপর জৈব পদার্থের উপকারী প্রভাবগুলো হলো- মৃত্তিকার দলা গঠন ও দলা স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ সরবরাহ করে, মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায়, মৃত্তিকার উপরিতল দিয়ে পানি গড়ানো ও ভূমিক্ষয় উপরিতল সহায়তা করে এবং অণুজীব ও উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে।

মাটির উপর জৈব পদার্থের উপকারী প্রভাব থাকায় মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। কর্ষণের ফলে মাটির বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায়, ফলে জৈব পদার্থের জারণও বেশি হয়; মূল এবং শস্যের অবশিষ্টাংশ মৃত্তিকায় কিছুটা জৈব পাদার্থের যোগান দেয়। জৈব সার, বিশেষ করে আবর্জনা সার ও সবুজ সার জমিতে প্রয়োগ করে জমির জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

মাটির পানি (Soil Water)

মাটির একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে পানি বা আর্দ্রতা যা কঠিন মৃত্তিকা কণার মাঝের রন্ধ্রস্থানের অংশবিশেষ পূর্ণ করে। পানি মৃত্তিকার অনেক ভৌত ও রাসায়নিক বিক্রিয়াকে এবং

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলনকে প্রভাবিত করে। উদ্ভিদ যে পানি ব্যবহার করে তার অধিকাংশই উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকা থেকে পরিশোষণ করে নেয়, যদিও অল্প পরিমাণে বৃষ্টি বা শিশির থেকে প্রত্যক্ষভাবেও গ্রহণ করতে পারে। অনেক সময়ই উদ্ভিদ জন্মানোর পক্ষে পানি একটি সীমাবদ্ধতা হয়ে দাঁড়ায়। মৃত্তিকার পানি মৃত্তিকার বায়ু ও তাপমাত্রার সম্পর্ক নির্ধারণ করে। মৃত্তিকা ও পানির যথাযথ ব্যবস্থাপনা শস্যকে ভালভাবে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করে। মৃত্তিকার রন্ধ্রস্থানের আয়তন, আকার ও অবস্থান এবং তার জমাট বাধার মাত্রার উপর মৃত্তিকাস্থ পানির পরিমাণ নির্ভর করে।

একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মৃত্তিকায় (V) থাকে কিছু আয়তনের কঠিন পদার্থ (Vs), পানি (Vw) এবং বায়ু ও জলীয় বাষ্প (Va)। সুতরাং V=Vs+Vw+Va। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, (V-Vs) হলো মৃত্তিকার রন্ধ্রস্থান এবং (V-Vs)/V হলো রন্ধ্রময়তা।

মাটির পানির পরিমাণকে (Q) আয়তনের ভিত্তিতে Vw/V অথবা ওজনের ভিত্তিতে Mw/Ms (Mw=মৃত্তিকার পানির ওজন এবং Ms=১০৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মৃত্তিকা শুকানোর পর ওজন) প্রকাশ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই পানির পরিমাণকে শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়। মাটির পানির ওজন ভিত্তি থেকে আয়তন ভিত্তিতে রূপান্তরের জন্য মৃত্তিকার আপাত ঘনত্বের (ρb) প্রয়োজন। ρb=Ms/V এবং মৃত্তিকার গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আপাত ঘনত্বও বৃদ্ধি পায়।

ভালভাবে দানাবাধা কোনো মৃত্তিকা পানিতে সম্পৃক্ত হওয়ার পর যদি চোয়ানোর যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়, তখন কিছু পানি মাধ্যাকর্ষণের টানে নিচে নেমে যায় এবং এর আর্দ্রতা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অবস্থায় আসে। ১/৩ অ্যাটমোসফিয়ার টানে যে পানি ধরা থাকে তা এরূপ চলাচলের আওতায় পড়ে। এভাবে স্থূল রন্ধ্রের সবটুকু এবং এমন কি বড় কৈশিক রন্ধ্রের পানিও নিচে নেমে যায়। কোনো হরাইজন থেকে যখন অতিরিক্ত পানি সরে যায়, মৃত্তিকার তখনকার অবস্থাকে মাঠের ধারণ ক্ষমতা (field capacity) বলে। ভারি দুনটের মৃত্তিকার এবং উচ্চ কলয়েডযুক্ত মৃত্তিকার মাঠ ধারণ ক্ষমতা বেশি। জৈব পদার্থও অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করে। স্বাভাবিক অবস্থায় পানি চোয়ানোর পর মৃত্তিকার আর্দ্রতার পরিমাণ মাঠের ধারণ ক্ষমতার সমান হয়। উইল্টিং বিন্দুতে (wilting point) এসে উদ্ভিদ স্থায়ীভাব মিইয়ে পড়ে।

উদ্ভিদের জন্য কি পরিমাণ পানি লভ্য তা এই দুই সুস্থিতি মানের পার্থক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়। উইল্টিং বিন্দু হচ্ছে মৃত্তিকার আর্দ্রতার সেই অবস্থা যখন উদ্ভিদের মূলের জন্য পানি মুক্ত করা তেমন অনায়াসে হয় না যা প্রস্বেদনের দ্বারা যতটুকু হারায় তার ক্ষতিপূরণ করতে পারে। যখন স্থায়ী উইল্টিং ঘটে তখন মৃত্তিকাতে টানের পরিমাণ প্রায় ১৫ অ্যাটমোসফিয়ার। এ টানের সময় পানির পাতলা ফিল্ম মৃত্তিকার কণাগুলো ঘিরে থাকে। এসময় কৈশিক পরিবাহকতা শূন্য হয় এবং পানির চলাচল ঘটতে পারে তার বাষ্পীয় অবস্থায়।

মাটিতে পানি থাকলেই যে, উদ্ভিদের জন্য লভ্য হবে তা নয়। তাই পানি পটেনশিয়াল (water potential, ψ) মৃত্তিকায় পানির পরিমাণের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। পানি পটেনশিয়ালের সংজ্ঞা হলো : তুল্য পরিমাণ তাপবিশিষ্ট অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় এবং একক স্ট্যান্ডার্ড বায়ুমণ্ডলীয় চাপে রক্ষিত কিছু পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি থেকে অতি অল্প পরিমাণ পানি মৃত্তিকার পানিতে স্থানান্তর করতে যে পরিমাণ কাজ করতে হবে, তাকে বলে পানি পটেনশিয়াল।

এটি একটি সুবিধাজনক শব্দ, কারণ বিশুদ্ধ পানির তুলনায় এই পানি কি পরিমাণ কাজ করতে সক্ষম তা নির্দেশ করে। বিশুদ্ধ পানির পটেনশিয়াল শূন্য। যেহেতু কৈশিক বল এবং দর্বীভূত পদার্থের জন্য তরল পদার্থের মুক্ত শক্তি কমে যায়, সেহেতু মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়াল সবসময়ই ঋণাত্মক। উচ্চ পটেনশিয়াল থেকে পানি সবসময়ই নিম্ন পটেনশিয়ালে স্থানান্তরিত হয়।

পানি পটেনশিয়াল সাধারণত প্রকাশ করা হয় প্রতি একক ভর (mass), আয়তন (অর্থাৎ চাপের একক) অথবা মোল (mole) এ। উল্লেখ্য যে, $1\ Kg^{-1} \equiv 1KPa(1Pa=1Jm^{-3}) \equiv 0.018Jmol.^{-1}$ $\equiv 0.01$ bar $\equiv 0.00987$ atm. $\equiv 10.1$ / m পানি।

মাটির পানির পটেনশিয়ালের তিনটি উপাদান আছে। (১) অসমোটিক পটেনশিয়াল (ψ_π)। অসমোটিক পটেনশিয়াল আবির্ভূত হয় মৃত্তিকার পানিতে দ্রব যুক্ত হওয়ার জন্যে। লঘু (dilute) দ্রবণে দ্রবের প্রকৃতি (অর্থাৎ আয়ন, অবিভক্ত নন-ইলেক্ট্রোলাইট অথবা বৃহৎ কণা) দ্বারা এটি প্রভাবিত হয় না, কেবলমাত্র সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নের সমীকরণের সাহায্যে এটি প্রকাশ করা হয় : $\Psi\pi = -RTCs$. এক্ষেত্রে Cs=মোলাল ঘনত্ব (Cs=১, যখন প্রতি কেজি পানিতে ১ মোল অবিভক্ত দ্রব থাকে), R=গ্যাস ধ্রুবক ($=8.315\ JK^{-1}mol^{-1}$) এবং T=তাপমাত্রা (K)। দ্রব কণা পানির শক্তির অবস্থা প্রভাবিত করে, কিন্তু প্রদেয় চাপ অথবা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য পানি চলাচল প্রভাবিত করে না। তবে অবশ্য অর্ধভেদ্য পর্দার ভিতর দিয়ে পানি চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(২) ম্যাট্রিক পটেনশিয়াল (ψ_τ) : এটি মৃত্তিকার ম্যাট্রিক্সের শোষণ ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। কর্দম এবং হিউমাসের কলয়েডের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনীর মাধ্যমে পানি দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। এদের সাথে যখন অতিরিক্ত পানির স্তর জমা হয়, তখন ক্রমাগত দৃঢ়তা কমতে থাকে। সর্বশেষ স্তরের পানি তেমন দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে না বলে উদ্ভিদ কর্তৃক এটি পরিশোষিত হয়। তাই দৃঢ়ভাবে উপশোষিত (adsorbed) পানি উদ্ভিদের তেমন কোনো কাজে লাগে না।

মাটির ম্যাট্রিক্সের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্রের মধ্যেও কিছু পানি অপেক্ষাকৃত শিথিলভাবে লেগে থাকে পৃষ্ঠটান (surface tension) বলের এখানে প্রাধান্য আছে। যে বলে পানি লেগে থাকে তা রন্ধ্রের ব্যাসের সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ রন্ধ্রের ব্যাস কম হলে বল বৃদ্ধি পায় এবং উদ্ভিদ কর্তৃক পানি পরিশোষণের জন্য শক্তি বেশি ব্যয় করতে হয়। পানির মুক্ত শক্তির পরিবর্তনের সাথে পানিপূর্ণ মৃত্তিকার রন্ধ্রের ব্যাসের (Dμm) সম্পর্ক নিম্নরূপ :

$\psi_\tau = -4\delta/D\ dyn\ cm^{-2} \equiv -2.9\times10^2/D\ JKg^{-1}$, এক্ষেত্রে δ হলো পানির পৃষ্ঠটান।

(৩) প্রেসার পটেনশিয়াল ($\psi\rho$) : মৃত্তিকার শীর্ষে অবস্থিত মুক্ত পানি যে চাপ দেয় তাকেই বলে প্রেসার পটেনশিয়াল। তাই সম্পৃক্ত মৃত্তিকায় ওয়াটার টেবিলের নিচে পানির প্রেসার পটেনশিয়াল ধনাত্মক হয়, কিন্তু অসম্পৃক্ত মৃত্তিকায় মান শূন্য। সম্পৃক্ত মৃত্তিকায় ψ_τ এর মান শূন্য এবং অসম্পৃক্ত মৃত্তিকায় এটি ঋণাত্মক এবং ψ_π এর মান সবসময়ই ঋণাত্মক।

সুতরাং মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়ালকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়-

$$\psi_s = \psi_\pi + \psi_\tau + \psi_\rho$$

যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ψ_ρ এর মান খুব কম এবং ψ_π সবসময়ই ঋণাত্মক এবং সাধারণত কম, তাই ψ_τ মৃত্তিকার পানি পটেনশিয়ালের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ম্যাট্রিক পটেনশিয়াল এবং আর্দ্রতার সম্পর্ক থেকে মৃত্তিকার পানির বৈশিষ্ট্য সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় (চিত্র ২.১)। মৃত্তিকার অনুর্ধ্ব ৩০ মিলিমাইক্রন ব্যাসের মাঝারি যদি পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাকে বলে মাঠের ধারণ ক্ষমতা ($\psi\tau$ প্রায় $10J\ kg^{-1}$) ; উইল্টিং বিন্দুতে ম্যাট্রিক পটেনশিয়ালের মান প্রায় $-1500\ J\ Kg^{-1}$। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী পানি উদ্ভিদের লভ্য পানি। এখানে উল্লেখ্য যে, ২.১ চিত্রের বক্র রেখার কিছুটা স্থানচ্যুতি ঘটেছে এবং এটি ঘটেছে মৃত্তিকা ভিজানো হচ্ছে না শুকানো হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে। একে বলে হিস্টেরিসিস (hysteresis) প্রভাব।

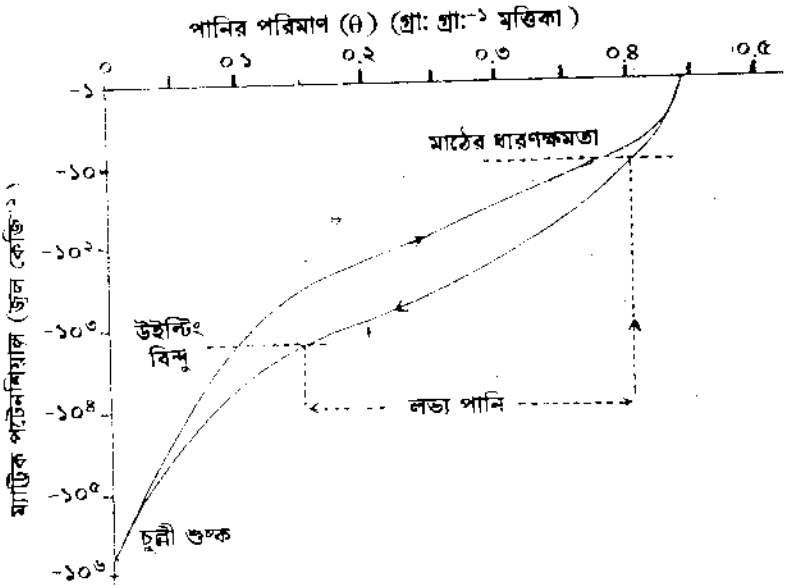

চিত্র ২.১ : ম্যাট্রিক পটেনশিয়াল এবং দো-আঁশ মৃত্তিকার পানির পরিমাণের সম্পর্ক।

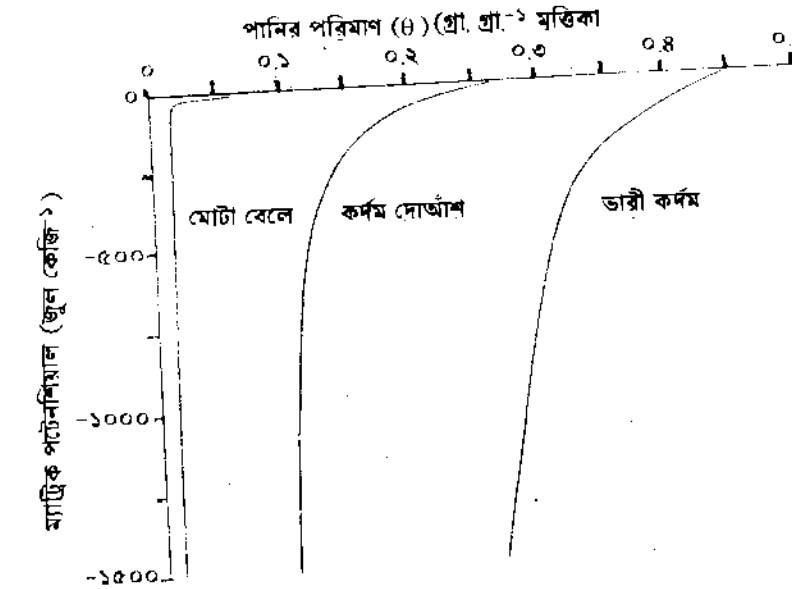

চিত্র ২.২ : ম্যাট্রিক পটেনশিয়াল এবং তিন প্রকার মৃত্তিকার লভ্য পানির পরিসরের সম্পর্ক।

ম্যাট্রিক পটেনশিয়াল এবং তিন প্রকার মৃত্তিকার লভ্য পানির পরিসরের সম্পর্ক ২.২ চিত্রে দেখানো হয়েছে। মোটা বেলে, দো–আঁশ এবং মৃত্তিকার লভ্য পানির পরিমাণ যথাক্রমে ০.০৬, ০.১৬ এবং ০.৪০ গ্রাম প্রতি গ্রাম মৃত্তিকায়। এখানে মৃত্তিকার আপাত ঘনত্ব ধরা হয়েছে যথাক্রমে ২.০, ১.৪ এবং ১.২ গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে এবং এটি নির্দেশ করে যে, মৃত্তিকার প্রতি মিটার গভীরে পানি জমা রাখার ক্ষমতা ১২০, ১৯৬ এবং ২৩৩ মিলিমিটার।

মাটি বায়ু (Soil air)

মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতার জন্য মৃত্তিকার কঠিন ও তরল অংশের মতো মৃত্তিকার বায়ুর বিভিন্ন উপাদান সমানভাবে প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদের মূল, মৃত্তিকায় বসবাসকারী প্রাণী ও অণুজীবের শ্বসনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। পুষ্টি উপাদান দ্রবীভূতকরণে ও উদ্ভিদের জন্য এগুলো লভ্যকরণে কার্বন ডাই–অক্সাইড সাহায্য করে। মিথোজীবী ও অ মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংবদ্ধকৃত নাইট্রোজেন উৎপাদনের উৎস হচ্ছে নাইট্রোজেন গ্যাস। জলীয় বাষ্প উদ্ভিদ ও অণুজীবকে শুষ্ককরণ থেকে রক্ষা করে এবং মৃত্তিকার অভ্যন্তরে পানি স্থানান্তরে সহায়তা করে।

বায়ুমণ্ডলের বায়ুর তুলনায় মৃত্তিকার বায়ুতে প্রায় দশ গুণ বেশি কার্বন ডাই–অক্সাইড, দুই গুণ বেশি জলীয় বাষ্প এবং অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থাকে (সারণি ২.৫)। এই মাত্রা অবশ্য মৃত্তিকার অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণীর কার্যকলাপের জন্য সবসময় পরিবর্তনশীল। এই কার্যকলাপ এবং মৃত্তিকায় গ্যাসের ব্যাপন বাধাগ্রস্ত হয় বলে সাম্যাবস্থায় পৌঁছতে পারে না। অধিকাংশ বিনিময় ঘটে আণবিক ব্যাপনের (moleculor diffusion) মাধ্যমে এবং এটি Fick এর সূত্র মেনে চলে। এক্ষেত্রে মৃত্তিকার ব্যাপন সূচক (coefficient) ধরা হয় $0.66SD_a$, D হলো মুক্ত বায়ুতে গ্যাসের ব্যাপন সূচক, S হলো মৃত্তিকার আংশিক আয়তন যা বায়ুপূর্ণ এবং রন্ধ্র অসরল হওয়ার জন্য 0.66 হলো ব্যাপন পথের অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের পরিমাপ। অর্থাৎ পানিতে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত মৃত্তিকার ব্যাপন সূচক শূন্য এবং উইল্টিং বিন্দুর দিকে শুকানোর জন্য এটি বৃদ্ধি পায়। কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরির হার প্রায় ২ থেকে ২০ গ্রাম প্রতি বর্গমিটারে প্রতিদিন এবং এটি নির্ভর করে তাপমাত্রা, উদ্ভিদের উপস্থিতি এবং পানির পরিমাণের উপর। এত বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি এবং বিনিময়ের হার মন্থর হলেও, কেবল দীর্ঘ সময়ের জন্য জলাবদ্ধতা বাদ দিলে শস্যের মূল তেমন অক্সিজেন ঘাটতির সম্মুখীন হয় না।

সারণি ২.৫ : বায়ুমণ্ডল ও মৃত্তিকার বায়ুর উপাদানের তুলনা (আয়তনের শতকরা হার)

	নাইট্রোজেন	অক্সিজেন	কার্বন ডাই–অক্সাইড	জলীয় বাষ্প
বায়ুমণ্ডল	৭৮.২	২০.৭	০.০৩	১.০
মৃত্তিকার বায়ু	৭৭.৪	২০.২	০.৯০	২.৩

মৃত্তিকার সঠিক বায়ু ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে মোট রন্ধ্র পরিসরের সেই অংশ যা বায়ু দ্বারা ভর্তি, পানি দ্বারা নয়। আর্দ্রতার পরিমাণের সাথে এই মান সবসময় পরিবর্তিত হয়। মৃত্তিকার গঠনের সাথেও এর পরিবর্তন হয়। মৃত্তিকার বায়ুতে ঋতু অনুযায়ী অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্বের তারতম্য ঘটে। এ তারতম্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋতু অনুযায়ী আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধির জন্য ঘটে। উপরিস্তরের ৩০ সেন্টিমিটারের মধ্যে মৃত্তিকার বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ উষ্ণ মাসগুলোতে শীতল মাসের চেয়ে বেশি। এসব পরিবর্তন জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের সাথে জড়িত।

মাটির তাপমাত্রা (Soil Temperature)

পানি, বায়ু বা খনিজ উপাদানের মতো মৃত্তিকায় তাপমাত্রা এবং উদ্ভিদ ও অণুজীবের কার্যকলাপ এবং মৃত্তিকায় সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তাপের প্রধান উৎস সূর্য। মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের জারণের ফলেও সামান্য পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকার অভ্যন্তরভাগ থেকে পরিবাহিত তাপের পরিমাণ খুব নগণ্য। সৌরবিকিরণের ৮৬% শোষণ করে কৃষ্ণ কটন মৃত্তিকা, নদীবাহিত (alluvial) মৃত্তিকা ৪০% এবং তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকা শোষণ করে প্রায় ৬০%।

বিভিন্নভাবে মৃত্তিকা তাপ হারায়। কিছু পরিমাণ তাপে দিবাভাগ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে পরিবাহিত হয়, আবার রাতে ভূ-পৃষ্ঠে পুনরায় পরিবাহিত হয়। রাতে অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ুমণ্ডলে মৃত্তিকা তাপ বিকিরণ করে। কিছু পরিমাণ তাপ ব্যয় হয় মৃত্তিকার পানির বাষ্পীভবনের জন্য।

মাটির রঙ সৌরবিকিরণ শোষণকে প্রভাবিত করে। কৃষ্ণ বর্ণের মৃত্তিকা সবচেয়ে বেশি তাপ শোষণ করে এবং পিঙ্গল, লাল, ধূসর এবং সাদা মৃত্তিকা ক্রমাগত কম তাপ শোষণ করে। উদ্ভিদের আবরণ মৃত্তিকা কর্তৃক সৌরবিকিরণ শোষণের মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং রাতে মৃত্তিকা থেকে তাপের পুনঃবিকিরণ হ্রাস করে ; তাই তাপমাত্রার উঠানামা কমিয়ে আনে। উন্মুক্ত মৃত্তিকার তাপমাত্রার উঠানামা বেশি দেখা যায়। এটি তাড়াতাড়ি গরম হয় এবং বেশি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়।

মাটির বিভিন্ন উপাদানের আপেক্ষিক তাপের (specific heat) পরিসর ০.১ থেকে ১.০। বালির আপেক্ষিক তাপ সর্বনিম্ন (০.১), অন্যান্য খনিজ কণার প্রায় ০.১৫, হিউমাসের ০.২১ এবং পানির ১.০। মৃত্তিকার অন্যান্য উপাদানের তুলনায় পানির আপেক্ষিক তাপ ৫ থেকে ৬ গুণ বেশি, তাই মৃত্তিকার আপেক্ষিক তাপের উপর পানির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। গড়ে মৃত্তিকার আপেক্ষিক তাপের পরিসর ০.২০ থেকে ০.২৩।

বালির তাপ পরিবাহকতা (conductivity) অপেক্ষাকৃত বেশি এবং মৃত্তিকার মিহি কণা খুব কম তাপ পরিবহন করে। ভেজা মৃত্তিকার তাপ পরিবাহকতা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আর্দ্রতা নিজের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণ তাপ শোষণ করে, তাই প্রাথমিক অবস্থায় কম তাপ পরিবাহিত হয়। যখন মৃত্তিকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তখন মৃত্তিকার পানির বেশি বাষ্পীভবন হয়, ফলে মৃত্তিকার তাপমাত্রা কমে যায়। এর ফলে মৃত্তিকার উপরের স্তরের তুলনায় নিম্নস্তরে তাপমাত্রা কম থাকে। হাল্কা মৃত্তিকার তুলনায় ঘন সন্নিবিষ্ট মৃত্তিকা বেশি তাপ পরিবহণ করে ; কর্ষণের জন্যে উপরিতলের মৃত্তিকা হাল্কা হয়ে যাওয়ায় মৃত্তিকার নিম্নতলের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পায় না।

পানি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের মৃত্তিকা তাপমাত্রাকে কমিয়ে দেয়। যেহেতু মৃত্তিকার তুলনায় পানির আপেক্ষিক তাপ ৫ গুণ বেশি, সেহেতু সৌরবিকিরণের জন্য শুষ্ক মৃত্তিকার মতো ভেজা মৃত্তিকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় না। দ্বিতীয়ত, ভেজা মৃত্তিকায় সবসময় বাষ্পীয়ভবন হয় যা মৃত্তিকার তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। এক গ্রাম পানির বাষ্পীভবনের জন্য যে তাপের প্রয়োজন তা ৫৩৯ গ্রাম পানি অথবা ২৬৯৫ গ্রাম মৃত্তিকার তাপমাত্রা ১° সেলসিয়াস কমিয়ে দেয়, যদি বাষ্পীভবনের জন্য সম্পূর্ণ তাপশক্তি মৃত্তিকা থেকেই পায়। প্রকৃতপক্ষে, সম্পূর্ণ তাপশক্তি মৃত্তিকা থেকে আসে না, এতে বায়ুমণ্ডলের অবদানও কিছুটা আছে।

দিনে ও রাতে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন হয় এবং এর প্রভাব মৃত্তিকার তাপমাত্রার উপর পড়ে। মৃত্তিকার তাপমাত্রার তারতম্য দু'ভাবে প্রকাশ করা যায় — দৈনন্দিন

(diurnal) তারতম্য (চিত্র ২.৩) এবং ঋতু অনুযায়ী (seasonal) তারতম্য (চিত্র ২.৪)। মৃত্তিকার গভীরতার জন্যও তাপমাত্রার তারতম্য হয়। শুধুমাত্র উপরিতলের মৃত্তিকায় দৈনন্দিন তারতম্য বেশি হয়। ৩০ সেন্টিমিটার গভীরতায় তা কদাচিৎ ৩° সেলসিয়াসের বেশি, ৬০ সেন্টিমিটারে তা ১ সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে এবং এক মিটার গভীরে দৈনন্দিন তাপমাত্রার তারতম্য প্রকৃতপক্ষে শূন্য।

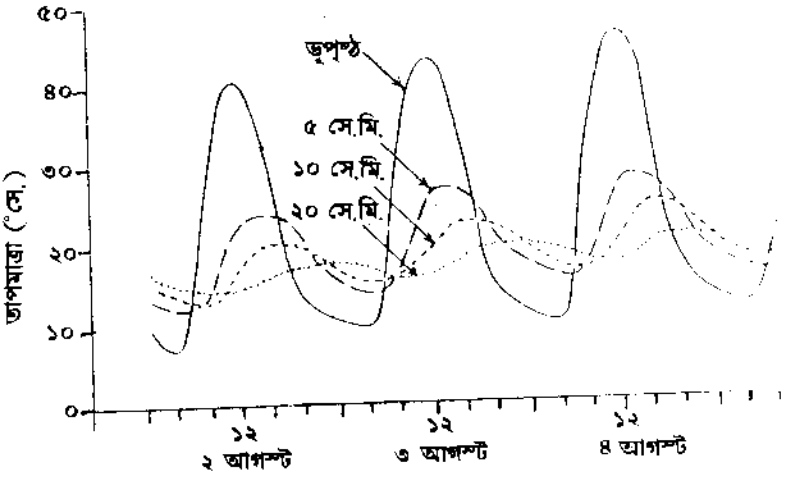

চিত্র ২.৩ : উন্মুক্ত মৃত্তিকার পৃষ্ঠে (০) ও ৫, ১০ এবং ২০ সেন্টিমিটার গভীরে গ্রীষ্মকালে পর পর তিন দিনের তাপমাত্রার দৈনন্দিন তারতম্য।

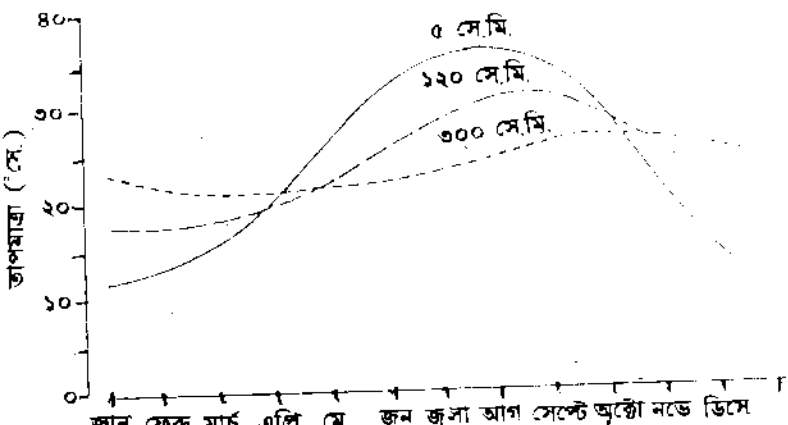

চিত্র ২.৪ : উত্তর গোলার্ধের উন্মুক্ত মৃত্তিকার ৫, ১২০ এবং ৩০০ সেন্টিমিটার গভীরে তাপমাত্রার ঋতুগত পরিবর্তন।

দিনে সূর্যরশ্মি যতক্ষণ মৃত্তিকায় পতিত হয়, তাপ ততক্ষণ নিচের দিকে চলাচল করে। কিন্তু রাতে মৃত্তিকার উপরিতল অন্তঃতলের মৃত্তিকার চেয়ে শীতল হয়ে যায় এবং তাপ উপরিতলের দিকে চলাচল করে এবং এরপর বায়ুমণ্ডলে চলে যায় যদি বায়ুমণ্ডল মৃত্তিকার চেয়ে ঠাণ্ডা হয়। এভাবে মৃত্তিকায় তাপমাত্রার বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। তাপমাত্রার নিয়মিত দৈনন্দিন পরিবর্তন ছাড়াও, মৃত্তিকার তাপমাত্রার ঋতুগত পরিবর্তন হয়। ঋতু অনুযায়ী তাপমাত্রার তারতম্য ভূ-পৃষ্ঠের অনেক নিচে পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এটি ১০ মিটার বা আরো গভীরে পৌঁছতে পারে। ঋতু অনুযায়ী তাপমাত্রার সর্বাধিক তারতম্য দেখা যায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মহাদেশীয় জলবায়ুতে। কারণ, গ্রীষ্মকাল ও শীতকালে মৃত্তিকার উপরিতলের তাপমাত্রার পার্থক্য সর্বাধিক।

কৃত্রিমভাবে মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সীমিত। মাটির তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করার সবচেয়ে কার্যকর একটি পদ্ধতি হচ্ছে বাষ্পরোধক ব্যবহার। এর জন্য শস্যের অবশিষ্টাংশ, কাগজ এবং প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়। পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পলিথিনের ভিতর দিয়ে তাপশক্তি প্রবেশ করে, কিন্তু মৃত্তিকা থেকে বিকিরণ খুব কমিয়ে দেয় ও বাষ্পীভবন দমন করে এবং এভাবে মৃত্তিকার তাপমাত্রাকে খুব বাড়িয়ে দিতে পারে।

মাটির বিক্রিয়া

মাটির দ্রবণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর বিক্রিয়া। যেসব অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাতের জন্য উপরিস্তর থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বিনিময়যোগ্য ক্ষারক চুইয়ে নিচে চলে যায়, সে অঞ্চলে হাইড্রোজেন আয়নের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। তাই আর্দ্র অঞ্চল অম্লমৃত্তিকা (acid soil) ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। অপরদিকে, যেখানে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে ক্ষারক সম্পৃক্তি ঘটে, সেখানে ক্ষার মৃত্তিকা (alkaline soil) ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং সোডিয়ামের কার্বোনেট জাতীয় লবণও মৃত্তিকা দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন অপেক্ষা হাইড্রোক্সিল আয়নকে প্রাধান্য দেয়। শুষ্ক এবং প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে ক্ষার মৃত্তিকা বেশি পাওয়া যায়। যে অঞ্চলে হাইড্রোজেন আয়ন হাইড্রোক্সিল আয়নকে পুরোপুরি ভারসাম্যে আনে, সেখানে নিরপেক্ষ মাটি পাওয়া যায়।

কর্দম কণা ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট। তাই এর চারদিকে ক্যাটায়ন লেগে থাকে। শস্য উদ্ভিদের মূল এগুলোকে পরিশোষণ করে। ক্ষয়ীভবনের ফলে সৃষ্ট দ্রবণীয় লবণ বৃষ্টির পানিতে চুইয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে চলে গেলে উদ্ভিদ কর্তৃক পরিশোষণের জন্য ক্যাটায়ন আর বেশি অবশিষ্ট থাকে না, তাই কর্দম কণায় এদের স্থান দখল করে হাইড্রোজেন আয়ন। সিক্ত হলে মৃত্তিকার দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন পৃথক হয়ে যায় এবং অম্ল বিক্রিয়া দেখায়।

অধিকাংশ উদ্ভিদ নিরপেক্ষ এবং সামান্য অম্ল মৃত্তিকায় জন্মাতে পারে। কিন্তু মৃত্তিকার অম্লতা বৃদ্ধি পেলে সাধারণ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং মৃত্তিকায় ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়াকলাপ কমে যায়। কিন্তু মৃত্তিকাস্থ ছত্রাক এবং কতকগুলো অম্ল প্রতিরোধী উদ্ভিদ উচ্চ অম্লতা সহ্য করতে পারে। তবে অম্লতার একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং স্বাভাবিক শস্য উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে মৃত্তিকার অম্লতা হ্রাসের প্রয়োজন হয়। এর জন্য কখনো কখনো জমিতে চুন প্রয়োগ করা হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে মৃত্তিকার চুন অনবরত দ্রবণীয় বাইকার্বোনেটে পরিণত হয় এবং চোয়ানোর জন্য নিচে চলে যায়। তাই প্রতি বছর না হলেও ২/৩ বছর পর পর জমিতে চুন প্রয়োগ করা দরকার।

কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ক্ষয়ীভবনের ফলে সৃষ্ট দ্রবণীয় লবণ সম্পূর্ণরূপে চুইয়ে যায় না এবং মৃত্তিকার উপরি স্তরে এর পরিমাণ বেশি থাকে। দ্রবণীয় লবণে যদি অধিক মাত্রায় সোডিয়াম থাকে,

তাহলে কর্দম মৃত্তিকায় এটিকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষারক হিসেবে গণ্য করা হয়। সিক্ত হলে কণাদের চারদিকে দ্বৈত আয়নিক স্তরের সোডিয়াম আয়ন-সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করে এবং এর জন্য মৃত্তিকা ক্ষারীয় বিক্রিয়া দেখায়। মৃত্তিকাস্থ বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যুক্ত হয় এবং সোডিয়াম কার্বোনেট তৈরি করে এবং মৃত্তিকার pH ৮.৫ থেকে ১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে।

মৃত্তিকায় যে দ্রবণীয় লবণ জমা হয় তা প্রধানত ক্লোরাইড এবং সালফেট, কদাচিৎ নাইট্রেট। যখন মৃত্তিকার লবণের অধিক ঘনমাত্রার জন্যে শস্যের বৃদ্ধি প্রভাবিত হয়, সেই মৃত্তিকাকে লবণাক্ত মৃত্তিকা বলে। সোডিয়াম কার্বোনেটও যদি মৃত্তিকায় থাকে, সেই মৃত্তিকা ক্ষারীয় বিক্রিয়া দেখায় এবং এই মৃত্তিকাকে ক্ষার মৃত্তিকা বলে। এই দুপ্রকার মৃত্তিকার সীমারেখা অবশ্য খুব কাছাকাছি। লবণাক্ত মৃত্তিকা সহজেই ক্ষার মৃত্তিকায় পরিণত হতে পারে, অবশ্য দুপ্রকার মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যে পার্থক্যও আছে। লবণাক্ত মৃত্তিকার বাষ্পীভবনের ফলে দ্রবীভূত লবণ মৃত্তিকার উপরিস্তরে জমা হয়ে সাদা আবরণের সৃষ্টি করে, একে বলা হয় সাদা ক্ষার। ক্ষার মৃত্তিকার সোডিয়াম কার্বোনেট জৈব পদার্থ দ্রবীভূত করে এবং বাষ্পীভবনের ফলে মৃত্তিকার উপরিস্তরের ধূসর অথবা কালো রঙের আবরণ সৃষ্ট করে, একে বলে কালো ক্ষার।

শুষ্ক এলাকায় শস্য উৎপাদনের জন্য জমিতে সেচ দেয়া হয়। কিন্তু সেচের জল সুনিষ্কাশিত না হলে, ঐ জমিতে প্রচুর পরিমাণে লবণ জমা হয়ে অনুর্বর হয়ে যায়। আবার সেচের পানিতে যদি অধিক পরিমাণে লবণ থাকে, তাহলে, মৃত্তিকায় দ্রবীভূত লবণের মাত্রা বেড়ে যায়।

লবণের উপস্থিতিতে কর্দম কণার আকুঞ্চনের (flocculation) হ্রাস পায়। বেশি পরিমাণ দ্রবীভূত লবণের জন্য মৃত্তিকার দ্রবণের অসমোটিক পটেনশিয়াল বেড়ে যায়, ফলে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনমতো পানি মৃত্তিকা থেকে পরিশোষণ করতে পারে না। অপরদিকে শোষকের মূল দিয়ে পানি উদ্ভিদ থেকে মৃত্তিকায় ঘন দ্রবণে বের হয়ে আসে। ফলে প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়ে উদ্ভিদটি মিইয়ে পড়ে। বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষার মৃত্তিকা সহ্য করার ক্ষমতা বিভিন্ন। লবণাক্ত মৃত্তিকার pHএর মাত্রা ৭.৫ থেকে ৮.৫। লবণাক্ত মৃত্তিকা পুনরুদ্ধারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষতিকারক, লবণমুক্ত পানি প্রয়োগ; এর ফলে লবণ দ্রবীভূত হয়ে ধুয়ে দূরে সরে যায়।

ক্ষার মৃত্তিকা পুনরুদ্ধারের জন্য কতকগুলো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ক্ষতিকারক লবণ দূর পানি দিয়ে ক্ষার মৃত্তিকা ভালভাবে ধুয়ে নিলে ক্ষারত্বের পরিমাণ কমে যায়। জিপসাম (ক্যালসিয়াম সালফেট) মৃত্তিকায় প্রয়োগ করলে, এটি সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং সোডিয়াম সালফেট তৈরি হয়। মৃত্তিকার অ-আকুঞ্চন পদার্থ সোডিয়াম কার্বোনেট প্রতিসারিত হয় সোডিয়াম সালফেট দ্বারা যা কর্দমকে আকুঞ্চন করে। কর্দমের সোডিয়াম আবার ক্যালসিয়াম দ্বারা প্রতিসারিত হয় এবং ক্যালসিয়াম কর্দম তৈরি হয়। এর জন্য মৃত্তিকার সচ্ছিদ্রের উন্নতি হয় এবং প্রবেশ্যতা বৃদ্ধি হয় বলে মৃত্তিকায় পানি চলাচল বৃদ্ধি পায়। এখন এ মৃত্তিকা স্বাভাবিকভাবে কর্ষণ করা যায় এবং এতে স্বাভাবিক শস্য জন্মানো যায়। তবে এক্ষেত্রে পানি খেত বেশি দিলে সোডিয়াম সালফেট এবং অন্যান্য দ্রবণীয় লবণ দ্রবীভূত হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জিপসামের পরিমাণ অনেক লাগে, প্রতি একরে প্রায় চার টন যা খুব ব্যয়বহুল এবং অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

ক্ষার মাটি পুনরুদ্ধারের জন্য সালফার ব্যবহার করা হয়। প্রতি একরে এক থেকে দেড় টন সালফার ব্যবহৃত হয়। মৃত্তিকাস্থ সালফার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জারিত হয়ে সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। চুনের সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সালফেট তৈরি হয় যা

আবার মৃত্তিকার সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে বিক্রিয়া করে সালফার থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির হার খুব মন্থর এবং সালফার প্রয়োগ ব্যয়সাপেক্ষ।

জমিতে চুনের ঘাটতি হলে এটি প্রয়োগ করে ক্ষার মৃত্তিকা পুনরুদ্ধার করা যায়। কিন্তু এটি দ্রবণীয় এবং চলনশীল না করতে পারলে মৃত্তিকার নিম্নস্থ স্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের দ্রবণীয়তার হার নির্ভর করে মৃত্তিকার কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপর। জৈব পদার্থ প্রয়োগ করলে মৃত্তিকার জৈবিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং অধিক পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। এটি ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে দ্রবীভূত হতে সহায়তা করে এবং উৎপাদিত বাইকার্বোনেট দ্রবণের নিম্নস্তরে প্রবেশে সহায়তা করে। একই সাথে সোডিয়াম কার্বোনেট বাইকার্বোনেটে পরিণত হয় এবং এর জন্য মৃত্তিকার pH হ্রাস পায়।

নিম্ন জলাভূমি অঞ্চলে যেখানে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভাল না, সেক্ষেত্রে ক্ষারকত্ব পরিলক্ষিত হয়। বদ্ধ পানিতে ধান গাছের বৃদ্ধি সন্তোষজনক, কারণ এর মূলে অক্সিজেন সরবরাহের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। জলাভূমি পুনরুদ্ধারের একটি প্রধান পদক্ষেপ হলো পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করা।

মাটির ক্ষয় (Soil erosion)

অনেক দেশেই মৃত্তিকার ক্ষয় একটি বিরাট সমস্যা। মৃত্তিকা কর্তৃক শোষণের তুলনায় বৃষ্টিপাত যদি বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত পানি গড়িয়ে চলে যায়। মৃত্তিকার উপর দিয়ে পানি বেশি দূর গড়ালে, আশপাশ থেকে আরো পানির ধারা যোগ হয়ে এর আয়তন ও বেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এতে ধাবমান পানির মৃত্তিকা ক্ষয় করার ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং এর সাথে প্রচুর পরিমাণ মৃত্তিকা কণা অন্যত্র বাহিত হয়। একেই বলা হয় মৃত্তিকার ক্ষয়। শুষ্ক চাষাবাদ (dryland farming) এবং মৃত্তিকা ক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সমস্যা সম্পর্কযুক্ত ; উভয়ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য এক এবং তা হলো পানির গড়ানো হ্রাস করা এবং মৃত্তিকায় পানি ও মাটি কণা সংরক্ষণ করা। মৃত্তিকার পানিশোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এই সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায়। মাটির ব্যবহার সঠিকভাবে না করার জন্য, মানুষও অনেক সময় মৃত্তিকা ক্ষয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং এর জন্য উর্বর ভূমিও অনুর্বর ভূমিতে পরিণত হতে পারে

প্রাকৃতিক অবস্থায়ও বৃষ্টিপাত এবং বায়ুপ্রবাহ মৃত্তিকা কণা দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। তবে গাছপালার আচ্ছাদন থাকলে প্রাকৃতিক মৃত্তিকা ক্ষয়ের মাত্রা অনেক কমে যায়। বর্তমানে যে হারে গাছপালা নিধন চলছে, তাতে ব্যাপক এলাকা ভূমিক্ষয়ের আওতায় পড়ছে। চাষের জমি অনেকদিন পতিত রাখলে এদের ভূমি ক্ষয় হয়।

বায়ুপ্রবাহ এবং ধাবমান পানি মৃত্তিকা ক্ষয়ে প্রধান নিয়ামক। বিশাল এলাকায় যদি পাহাড় কিংবা অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহলে বায়ুপ্রবাহের বেগ বেড়ে যায়, বিশেষ করে পাশাপাশি এলাকায় যদি তাপমাত্রার পার্থক্য বেশি হয় এবং এর ফলে বায়ুমণ্ডলের চাপের খুব বেশি তারতম্য হয়। মৃত্তিকা গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকলে বায়ুপ্রবাহ তেমন ক্ষতি করতে পারে না। যদি মৃত্তিকা উন্মুক্ত থাকে এবং কর্ষণের ফলে মৃত্তিকা ধুলিকণায় পরিণত হয়, তাহলে প্রবল বায়ুপ্রবাহ প্রচুর পরিমাণ উপরিস্তরের মৃত্তিকা অন্যত্র সরিয়ে দেয়। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর উপরিস্তরের মৃত্তিকা দরীভূত হওয়াতে এসব জমিতে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। কখনো কখনো বায়ুপ্রবাহ বালিকণা চাষের উৎপাদন ব্যাহত হয়। কখনো কখনো বায়ুপ্রবাহ বালিকণা চাষের জমিতে ছড়িয়ে দেয়, এজন্য চাষাবাদের ক্ষতিসাধন হয়। বায়ুপ্রবাহের দিকে ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালা লাগালে বায়ুপ্রবাহ জনিত মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা যায়।

নিম্নলিখিত প্রভাবকসমূহ মৃত্তিকার ক্ষয় নিয়ন্ত্রিত করে

১. বৃষ্টিপাত : বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং এর পতনের হার মৃত্তিকা [illegible] মৃত্তিকা দ্রুত পানি শোষণ করে এবং মৃত্তিকা পানি দ্বারা সম্পৃক্ত হলে [illegible] যায়। মৃত্তিকার ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পানি গড়িয়ে চলে যায়।

২. মাটির বৈশিষ্ট্য : মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মৃত্তিকার ক্ষয় কম [illegible] কতকগুলো বৈশিষ্ট্য যেমন- বুনট, গঠন, সংশক্তি প্রবণতা ইত্যাদি [illegible] করে।

(ক) পানির শোষণ ও চোয়ানো : মৃত্তিকার বৃষ্টির পানির [illegible] করে মৃত্তিকার বুনট, গঠন এবং জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর [illegible] কণা দিয়ে গঠিত হয়, তাহলে বৃষ্টির পানি সহজেই চুঁইয়ে মৃত্তিকার [illegible] ভারী মৃত্তিকার কণাগুলো খুব সূক্ষ্ম হওয়ায় পানির চোয়ানো বাধাপ্রাপ্ত হয়। জৈব পদার্থ মৃত্তিকা দলাবাধাতে সহায়তা করে, তাই পানি শোষণ ও চোয়ানো বৃদ্ধি করে। তাছাড়া, জৈব পদার্থ [illegible] বেশ কিছু পরিমাণ পানি শোষণ করে।

(খ) মাটি সংশক্তি প্রবণতা (cohesiveness) : যদিও হাল্কা মৃত্তিকার পানি শোষণ ক্ষমতা বেশি, তথাপি ভারী মৃত্তিকার কণাগুলো দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে, কিন্তু হাল্কা মৃত্তিকার কণাগুলো হাল্কাভাবে লেগে থাকে, তাই এর সংশক্তি প্রবণতা কম। কর্দম মৃত্তিকার [illegible] পানি শোষণ ক্ষমতা কম এবং গড়িয়ে পড়া বেশি হওয়ার জন্য ক্ষয় বেশি হয়।

(গ) মাটির ঢাল (slope): ভূমির ঢালের উপর পানি গড়ানো [illegible] বেশিক্ষণ বৃষ্টির পানি শোষণ করতে পারে না, গড়িয়ে অন্যত্র চলে যায় [illegible] গড়িয়ে যায়।

(ঘ) মৃত্তিকার পানি : শুষ্ক মৃত্তিকা দ্রুত পানি শোষণ করে। [illegible] না। সিক্ত হওয়ার সাথে সাথে এর শোষণ ক্ষমতা কমে যায় এবং পানি গড়ানো বৃদ্ধি পায়।

৩. মাটির আচ্ছাদন : মৃত্তিকার উপর প্রাকৃতিক উদ্ভিদরাজির আচ্ছাদন মৃত্তিকা ক্ষয় [illegible] কার্যকরী। উদ্ভিদবর্জিত চাষ করা জমির মৃত্তিকার ক্ষয় বেশি হয়। [illegible] মৃত্তিকার কণা পৃথক হয়ে যায়। পলি ও কর্দমের ক্ষুদ্র কণাগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গড়িয়ে [illegible] পানির সাথে মিশে যায়। পানিতে দ্রবীভূত ক্ষুদ্র কণাগুলো মৃত্তিকার রন্ধ্রকে বন্ধ করে দিয়ে পানি চোয়ানো ব্যাহত করে। মৃত্তিকায় বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতজনিত ক্ষতি উদ্ভিদের [illegible] শস্য উদ্ভিদের কাণ্ড ভূমির উপর দিয়ে পানির গড়িয়ে চলাকে বাধা [illegible] গড়ানো নেই বললেই চলে। যে সমস্ত শস্য উদ্ভিদের কুঁশি (tiller) বেশি হয়, [illegible] প্রতিরোধে অধিক কার্যকরী। সাধারণ শস্য উদ্ভিদের তুলনায় স্থায়ী [illegible] ভূমি মৃত্তিকা [illegible] বিস্তার লাভ করে মৃত্তিকাকে ভালভাবে ধরে রাখে। উপরন্তু, [illegible] হারকে মন্থর করে। এসমস্ত কারণে পানি গড়ানো এবং মৃত্তিকার [illegible] আচ্ছাদনকারী উদ্ভিদ।

প্রাকৃতিক বনাঞ্চলও মৃত্তিকার ক্ষয় হ্রাস করে। বনভূমিতে বৃক্ষ [illegible] থাকে। বৃক্ষের বড় বড় পাতা প্রচুর পরিমাণে পানি ধরে রাখে এবং ধীরে ধীরে মৃত্তিকায় [illegible] বনাঞ্চলের মৃত্তিকায় পচনশীল জৈব পদার্থ বেশি থাকে [illegible] হয়।

মাটির শোষণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হলে মৃত্তিকার ক্ষয় হয়। [illegible] নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়; তবে মৃত্তিকার শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব [illegible] সাধারণত এটাই অনুসরণ করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

বায়বীয় পরিবেশ

শস্যের বৃদ্ধি ও ফলনের উপর বায়বীয় পরিবেশের (Aerial Environment) যথেষ্ট প্রভাব আছে। গ্রীন হাউজের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সৌরবিকিরণ, তাপমাত্রা, ফটোপিরিয়ড, পানির সরবরাহ এবং বায়ুর গ্যাসীয় উপাদান শস্যের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু মাঠে জন্মানো শস্যের ক্ষেত্রে বায়বীয় পরিবেশের এ সকল উপাদানের পরিবর্তন ঘটানো প্রায় অসম্ভব। এই নিয়ন্ত্রণের অভাব এবং বায়বীয় পরিবেশের পরিবর্তনশীল প্রকৃতির জন্য, শস্য উৎপাদনের সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়, আবার একদিনের বিভিন্ন সময়েও এর যথেষ্ট তারতম্য হয়। শস্যের সর্বোচ্চ বৃদ্ধির জন্য সৌরবিকিরণ অপর্যাপ্ত হতে পারে। পানির সরবরাহ অত্যন্ত কম কিংবা অতিরিক্তি হওয়ার জন্যও শস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। বায়ুপ্রবাহ বিভিন্নভাবে শস্যের বৃদ্ধি ও ফলনকে প্রভাবিত করে।

যেহেতু বায়বীয় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান শস্যের বৃদ্ধি ও ফলনকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেহেতু শস্যের উপর এসব উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তবে অনেকক্ষেত্রেই এই প্রভাব জটিল এবং তথ্যের স্বল্পতা আছে। বায়বীয় পরিবেশের প্রধান প্রধান উপাদান সারণি ৩.১ এ উপস্থাপিত হয়েছে।

সৌরবিকিরণ বা আলো

শস্য উৎপাদনে সৌরবিকিরণ বায়বীয় পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি প্রধানত অক্ষাংশ দ্বারা প্রভাবিত হয়; নিরক্ষরেখা বরাবর এর মান সারা বছরে প্রায় একই রকম, কিন্তু ৫০° অক্ষাংশের উপরে সারা বছরের দশ গুণ বা ততোধিক তারতম্য হয়। যেমন সিঙ্গাপুরে বছরে অধিকাংশ সময়ে ৪০০ থেকে ৪৫০ ক্যালোরি/বর্গসেন্টিমিটার/প্রতিদিন। অপরপক্ষে, যুক্তরাজ্যে ডিসেম্বর মাসের গড় ৫০ এবং জুন মাসে ৪০০ থেকে ৪৫০ ক্যালোরি/বর্গসেন্টিমিটার/প্রতিদিন। এটি মেঘের জন্যও প্রভাবিত হয়। অক্ষাংশের জন্য দিবা দৈর্ঘ্য বা আলোককালেরও তারতম্য হয় এবং কতিপয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, যেমন পুষ্পায়ন এবং কন্দ তৈরিকরণ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সারণি ৩.১ : বায়বীয় পরিবেশের প্রধান প্রধান উপাদান

সৌরবিকিরণ
আলো : প্রখরতা, গুণগত মান এবং আলোককালে
তাপমাত্রা
ঋতুগত এবং প্রাত্যহিক তারতম্য তুষারপাত
আর্দ্রতা
বায়ুপ্রবাহ : বেগ, চাপ এবং দিক
মেঘ, কুয়াশা (mist) এবং ঘন কুয়াশা (fog)
অধঃক্ষেপণ (precipitation) :বৃষ্টিপাত, শিশির, বরফ, শিলাবৃষ্টি (sleet)
বায়ুর গঠন : কার্বন ডাই অক্সাইড এবং দহণ

আলোর নিম্নলিখিত তিনটি দিক শস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ; যথা–

(ক) কি পরিমাণ প্রখরতা,

(খ) কতটুকু আলোককাল বা ফটোপিরিয়ড এবং

(গ) গুণগত মান–আলোক বর্ণালীর বিস্তার।

শস্য উদ্ভিদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যা আলো দ্বারা প্রভাবিত হয় তা ৩.২ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। এটি সুস্পষ্ট যে, বীজের অঙ্কুরোদগম থেকে শুরু করে অঙ্গজ বৃদ্ধি, পুষ্পায়ন এবং বীজ ও মুকুলের সুপ্তাবস্থার জন্য আলোর প্রয়োজন।

সারণি ৩.২ : উদ্ভিদের আলো–নিয়ন্ত্রিত কতিপয় প্রক্রিয়া

প্রক্রিয়া	আলোর প্রভাব
অঙ্কুরোদগম	অন্ধকার–এবং আলো–আবশ্যক বীজের উপর প্রভাব
কাণ্ড দীর্ঘীকরণ	পাণ্ডুরতা (etiolation) প্রভাব
পাতার প্রসারণ (expansion)	পূর্ণ প্রসারণের জন্য দীর্ঘ সময় আলোর প্রয়োজন
ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ	ক্লোরোফিল সংশ্লেষণের জন্য আলোর প্রয়োজন
কাণ্ড এবং পাতার চলন	শস্য উৎপাদনে এর গুরুত্ব কম
পুষ্পায়ন	ফটোপিরিওডিজম এবং পুষ্পায়ন নিয়ন্ত্রণ
মুকুলের সুপ্তাবস্থা	ছোট দিনে ফটোপিরিওডিক সংবেদনের জন্য প্রয়োজন

(ক) আলোর প্রখরতার গুরুত্ব

সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া আলোর প্রখরতার উপর নির্ভরশীল। সালোকসংশ্লেষণের হারের সঙ্গে আলোর প্রখরতার সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে (Gaastra, 1962)। যদি তাপমাত্রা এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড সীমিত না হয়, তাহলে আলো বৃদ্ধির সাথে সাথে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি পায় (চিত্র ৩.১)। তাই প্রাথমিক অবস্থায় শস্যের বৃদ্ধির হার নির্ভর করে আলোর প্রখরতা এবং এর শোষণের (interception) অনুপাতের উপর। কি পরিমাণ আলো ভূপৃষ্ঠে কিংবা শস্যে পতিত হয়, তা নির্ভর করে আলোর প্রখরতা এবং দিবা–দৈর্ঘ্যের উপর। বছরের বিভিন্ন সময়ে আলোর প্রখরতার তারতম্য হয়। যেমন উত্তর গোলার্ধে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত আলোর প্রখরতা বেশি এবং এ সময় শস্যের পর্যাপ্ত পাতা না থাকলে এই আলো শোষণ সম্পূর্ণ হয় না।

শস্য কর্তৃক আলো শোষণের কার্যকারিতা অনেকগুলো প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল। যেসব শস্যের পাতার বৃদ্ধি ও বিকাশ দ্রুত হয়, সে সব শস্য আলো শোষণে অধিকতর কার্যকর। প্রতি একক ভূমিতে শস্য উদ্ভিদের ঘনত্বও গুরুত্বপূর্ণ ; শস্যের জীবনচক্রের প্রাথমিক অবস্থায় কাছাকাছি সারির শস্যের তুলনায় দূরে দূরে অবস্থিত সারির শস্য আলো শোষণে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর। এছাড়া, পাতার বিন্যাসও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন সুগারবিটের শায়িত পাতার বিন্যাস কম কার্যকর, অপরদিকে দানাশস্যের পাতার ক্যানোপি অধিকতর কার্যকর। পাতার কোণ (angle) আলো শোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবশ্য শস্য উৎপাদনকারীর এ বিষয়গুলোর উপর কোনোই নিয়ন্ত্রণ নেই, উদ্ভিদ প্রজননবিদদের এ বিষয়ে ভাল ভূমিকা আছে। খাড়া ভাবে (erect) বিন্যস্ত পাতা আলো শোষণে অধিকতর কার্যকর, কারণ শায়িত পাতার তুলনায় এদের পারস্পারিক ছায়া প্রদান কম।

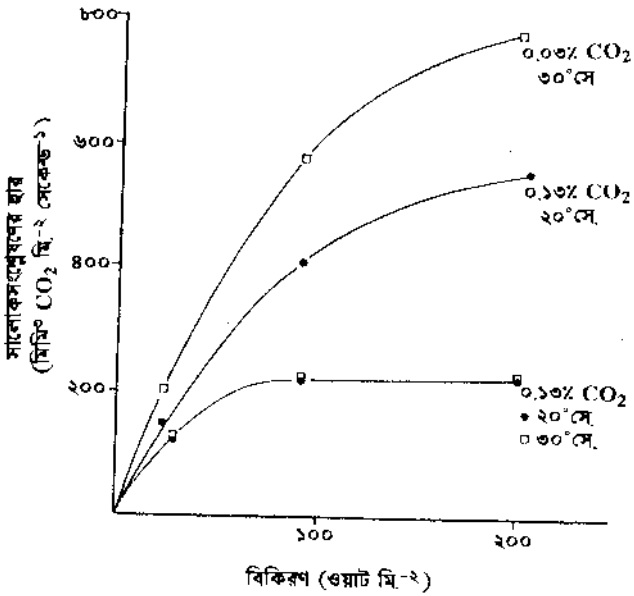

চিত্র ৩.১ : ২০° এবং ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হারের উপর আলো এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রভাব।

পাতার বৃদ্ধিও আলো দ্বারা প্রভাবিত হয়। দানাশস্যের পাতার প্রসারণের হার এবং পাতার সর্বোচ্চ প্রস্থ এবং পুরুত্ব আলোর প্রখরতা বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে, প্রখর আলোয় পাতার সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল এবং পাতার দৈর্ঘ্য হ্রাস পায়।

শস্য উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে আলোর প্রখরতার প্রভাবের অপর একটি উদাহরণ হলো দানাশস্যের কুশি (tiller) তৈরি। প্রধান কাণ্ডের পাতার অক্ষ থেকে উৎপন্ন সেকেন্ডারি (secondary) বিটপ হলো কুশি ; এটি অবশ্য নাইট্রোজেন দ্বারাও প্রভাবিত হয়। আলোর প্রখরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে কুশির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

দানাশস্যের পরিপক্কতার পূর্বে লজিং (lodging) হলে এটি ভালভাবে দেখা যায়। লজিং-এর জন্য শস্যের গোড়াতে আলো পৌঁছায় যা নতুন নতুন কুশি তৈরিকে উদ্দীপিত করে ; এই কুশি অবশ্য অধিকাংশই নিষ্ফলা এবং শস্য সংগ্রহের সময় বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করে।

খুব কম আলোতে কিংবা সম্পূর্ণ অন্ধকারে বিটপ পাণ্ডুর এবং লিকলিকে হয়। তাপমাত্রা এবং আলোর প্রখরতা নিয়ন্ত্রণ করে বপনের পূর্বে গোল আলুর অঙ্কুরিত হওয়া বন্ধ করা যায়। নিম্ন তাপমাত্রা এবং অপেক্ষাকৃত প্রখর আলোতে সবল চারাগাছ হয়, তাই রোপণের সময় এদের কম ক্ষতি হয়।

(খ) আলোককালের গুরুত্ব

আলোককালের সময়সীমা (একে দিবা–দৈর্ঘ্য বা ফটোপিরিয়ড বলে) শস্যের বৃদ্ধি ও বিকাশকে প্রভাবিত করে। যে সকল শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় যেমন- আলোকসংশ্লেষণ, [illegible] পরিমাণে শক্তি স্থানান্তরিত হয়, তাদের ক্ষেত্রে আলোককালের সময়সীমা এবং আলোকরশ্মির ফ্লাক্সের (flux) প্রভাব পৃথক করা যায় না। শস্য উদ্ভিদের বৃদ্ধির কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বল্প সময় স্থায়ী উচ্চ আলোকরশ্মির ফ্লাক্সের প্রভাব এবং দীর্ঘ সময় স্থায়ী নিম্ন আলোকরশ্মির ফ্লাক্সের প্রভাব প্রায় একই রকম। অপরদিকে, উদ্ভিদের দিবা–দৈর্ঘ্যের প্রতি সংবেদনশীলতা আলোকরশ্মির ফ্লাক্স ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। প্রকৃতপক্ষে, ২৪ ঘণ্টার দিন–রাত্রি চক্রের আলোক পর্যায়ের তুলনায় অন্ধকার পর্যায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের ফটোপিরিয়ডিক আবেশ ঘটাবার জন্য নিম্ন ফ্লাক্স ঘনত্বের আলোকশক্তি যথেষ্ট। অক্ষাংশভেদে পৃথিবীর উপর সূর্যকিরণ কোথাও লম্বভাবে এবং কোথায় হেলে পড়ে। নিরক্ষরেখা অঞ্চলে সূর্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয় এবং এখান থেকে উত্তর মেরুর দিকে সরতে থাকলে অক্ষাংশ বাড়ে, ফলে সূর্যকিরণ তীর্যকভাবে হেলে পড়ে। নিরক্ষরেখা অঞ্চলে সারা বছরেই দিবা–দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ ঘণ্টা থাকে।

অক্ষাংশ বাড়ার সাথে সাথে সারা বছরে দিবা দৈর্ঘ্যের তারতম্য বাড়তে থাকে। যেমন [illegible] অক্ষাংশে ২১ ডিসেম্বর দিবা-দৈর্ঘ্য হয় ১০ ঘণ্টা ২০ মিনিট এবং তা বেড়ে [illegible] শে জুন [illegible] ঘণ্টা [illegible] মিনিটে দাঁড়ায়। ৬০° অক্ষাংশে (যেমন অসলো, নরওয়ে) জুন মাসে ১৯ ঘণ্টা এবং ডিসেম্বর মাসে হয় ৬ ঘণ্টা অর্থাৎ ১৩ ঘণ্টার পার্থক্য। সুমেরু বৃত্তের উপরে (৬৬.৫° অক্ষাংশ), গ্রীষ্মকালে কিছু সময়ের জন্য সবসময়ই দিন থাকে, অপরপক্ষে, শীতকালে দিগন্তের (horizon) উপরে সূর্য ওঠে না এবং ২৪ ঘণ্টাই অন্ধকার থাকে। মার্চের ২১ তারিখে (মহাবিষুব, vernal equinox) সব অক্ষাংশেই দিবাদৈর্ঘ্য প্রায় ১২ ঘণ্টা। দক্ষিণ গোলার্ধের ঋতু উত্তর গোলার্ধের বিপরীত, অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল তখন উত্তর গোলার্ধে শীতকাল। অক্ষাংশ পরিবর্তনের সাথে দিবাদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন দুই গোলার্ধে একই রকম।

এ পর্যন্ত দিবাদৈর্ঘ্য সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাপ্তিকাল সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। উদ্ভিদ অবশ্য দিবাকাল ছাড়াও ঊষাকালে এবং গোধূলী লগ্নের (twilight) আলোতে সাড়া দেয়। গ্রীষ্মকালে ৪০° উত্তর অক্ষাংশে সূর্যাস্তের সময় বিকিরণ ফ্লাক্স ঘনত্ব হলো [illegible] ফুট-ক্যান্ডেল। সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পরে যখন সূর্য দিগন্তের ৬° নিচে থাকে সিভিল টুইলাইটের আরম্ভ ও শেষ হওয়ার সময়কালে সূর্যের অবস্থান, এসময় বিকিরণ ফ্লাক্স ঘনত্ব হলো ০.৪ ফুট-ক্যান্ডেল। বিকিরণ ফ্লাক্স ঘনত্ব ১ থেকে ২ ফুট ক্যান্ডেলের বেশি হলে চন্দ্রমল্লিকা *(Chrysanthemum)* অঙ্গজ অবস্থায় থাকে। এক ফুট-ক্যান্ডেল ইনক্যানডেসেন্ট বিকিরণের ফলে *Xanthium pennsylvanicum* এর পুষ্পায়ন বন্ধ হয়ে যায়। অ্যাস্টারের *(Callistephus chinesis)* কাণ্ডের দীর্ঘীকরণ, পুষ্পায়ণের পূর্বে এটি হওয়া প্রয়োজন, এ প্রক্রিয়া ঘটে [illegible] থেকে ০.৩ ফুট-ক্যান্ডেল বিকিরণ ফ্লাক্স ঘনত্বে। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের সর্বোচ্চ মাত্রা [illegible] ফুট-ক্যান্ডেল যা ফটোপিরিয়ডে সংবেদনশীল উদ্ভিদ দিবালোকের মতো গ্রহণ করতে পারে না। যখন কোনো নির্দিষ্ট অক্ষাংশে ফটোপিরিয়ডিজম সম্পর্কিত দিবা–দৈর্ঘ্য উল্লেখ করা হয়, সেক্ষেত্রে দিবা দৈর্ঘ্যের সাথে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে যখন বিকিরণ ফ্লাক্স ঘনত্ব একটি নির্দিষ্ট ফটোপিরিয়ডিক প্রতিক্রিয়া ঘটানোর জন্য সর্বনিম্ন মাত্রার বেশি হয় তার উল্লেখ থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের সাথে সিভিল গোধূলী লগ্নের সময় যোগ করে দিবা দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হয়। ৪১° অক্ষাংশে সিভিল গোধূলী লগ্নের পরিসর হলো মহাবিষুব ও জলবিষুব সময়ে ২৮ মিনিট থেকে উত্তর–অয়নান্ত (summer soltice) এবং দক্ষিণ–অয়নান্তে (winter soltice) ৩৬ মিনিট পর্যন্ত।

Garner এবং Allard ১৯২০ সালে ফটোপিরিয়ডিজম আবিষ্কার করেন। মেরিল্যান্ডের বেল্টসভিলে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Department of Agriculture এর Plant Industry Station-এ কাজ করার সময় Garner এবং Allard এক সমস্যায় পড়েন। তা হলো কেন মেরিল্যান্ড ম্যামথ ভ্যারাইটির তামাক গ্রীষ্মকালে মাঠে ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হওয়া সত্ত্বেও ফুল ফোটে না, কিন্তু শীতকালে গ্রীনহাউজে ১.৫ মিটারের কম লম্বা হওয়া সত্ত্বেও ফুল ফোটে। তাঁদের সামনে আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয় তা হলো বাইলক্সি (Biloxi) ভ্যারাইটির সয়াবিন মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত দু'সপ্তাহ পর পর বপন করলে, সবগুলোরই সেপ্টেম্বর মাসে একই সময় পুষ্পায়ন হয়। অথবা গ্রীনহাউজে শীতকালে ক্ষুদাকার সয়াবিন উদ্ভিদের পুষ্পায়ন হয়। এটি সুস্পষ্ট যে, গ্রীনহাউজে শীতকালীন একটি পরিবেশীয় প্রভাবকের সাথে পুষ্পায়ন সম্পর্কযুক্ত। বিকিরণ ফ্লাক্স ঘনত্ব, তাপমাত্রা, মৃত্তিকার পানি এবং উর্বরতার প্রভাব সম্পর্কে Garner এবং Allard অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি প্রকল্প উপস্থাপন করেন যে, এ সকল প্রজাতির পুষ্পায়ন নিয়ন্ত্রণের পরিবেশীয় প্রভাবক হলো দিবা-দৈর্ঘ্য। বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে দিবা-দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে অথবা-উদ্ভিদ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রেখে দিবা-দৈর্ঘ্য হ্রাস করে তাঁরা পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, ম্যারিল্যান্ড ম্যামথ তামাক এবং বাইলক্সি সয়াবিনের পুষ্পায়নের জন্য হ্রস্ব-দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন। অন্যান্য উদ্ভিদ প্রজাতি নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় যে, কতকগুলো উদ্ভিদের পুষ্পায়নের জন্য দীর্ঘ-দিবাদৈর্ঘ্যের প্রয়োজন এবং আবার কতকগুলো উদ্ভিদের পুষ্পায়নে দিবা-দৈর্ঘ্যের কোনো প্রভাব নেই।

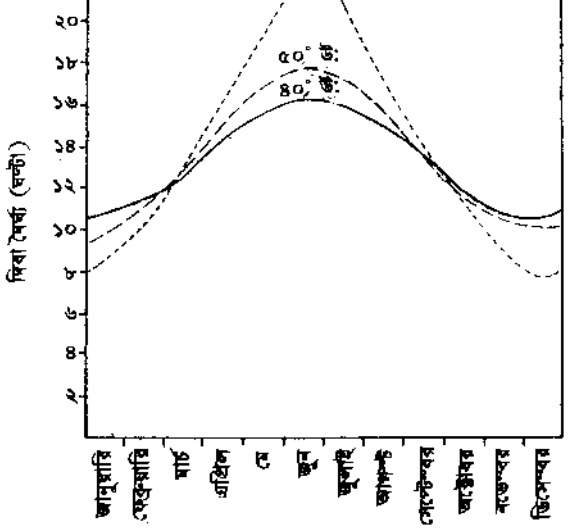

চিত্র ৩.২ : উত্তর গোলার্ধের দিবা-দৈর্ঘ্যের ঋতুগত পরিবর্তনের উপর অক্ষাংশের প্রভাব।

অধিকাংশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শস্য দীর্ঘ দিবালোক প্রাপ্ত উদ্ভিদ। দীর্ঘ-দিবালোকে শীতকালীন গমের পুষ্পায়ন হয়। অন্যান্য দানাশস্য ও ঘাসের ক্ষেত্রেও একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। দীর্ঘ দিবালোক গমের পাতা তৈরি পর্যায়ের সময়কাল, প্রতিটি কাণ্ডে পাতার সংখ্যা এবং

স্পাইকলেটের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। আবার কতকগুলো শস্য, যেমন [illegible] অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিসরের দিবালোকে এদের পুষ্পায়ন হয়।

পুষ্পায়ন ছাড়াও, শস্যের বৃদ্ধি ও বিপরিণতির আরো [illegible] প্রভাবিত হয়। হ্রস্ব দিবা–দৈর্ঘ্যে গোল আলুর কন্দ তৈরি সম্পন্ন হয়। [illegible] (runner) তৈরি দীর্ঘ দিবা–দৈর্ঘ্যে হয়। যদিও শস্যের উপর দিবা দৈর্ঘ্য [illegible] কৃষকেরা মাঠে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। তবে এই তথ্যের ভিত্তিতে [illegible] অবস্থিত তার জন্য উপযুক্ত শস্য কৃষকেরা নির্বাচন করতে পারেন।

(গ) আলোর গুণগত মানের গুরুত্ব

এটি সুবিদিত যে, উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য আলোক বর্ণালীর [illegible] সালোকসংশ্লেষণের জন্য কেবল ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার [illegible] (একে Photosynthetically Active Radiation বা PAR [illegible] সালোকসংশ্লেষী রঞ্জক পদার্থ কর্তৃক এই পরিসরের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের [illegible] ভিন্নতর। উপরন্তু, আলোক বর্ণালীর বিভিন্ন অংশের উপর [illegible] নির্ভরশীল। যেমন লাল এবং অবলোহিত (infrared) অংশ ফটোপিরিয়ডিজমে [illegible] অবশ্য মাঠ পর্যায়ে আলোর গুণগত মান পরিবর্তন সম্ভব নয়।

তাপমাত্রা (Temperature)

শস্য উদ্ভিদের অনেক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে [illegible] ও ফলনের জন্য সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন। তাপমাত্রা হলো [illegible] অর্থাৎ গড় গতীয় শক্তি। সৌরবিকিরণ জীবমণ্ডলের (biosphere) [illegible] পৃথিবী পৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডল থেকে এটি বিকিরণ, পরিচলন এবং [illegible] বাষ্পীভবন (evaporation) এবং ঘণীভবনের (condensation) [illegible] শক্তির প্রখরতার বিষয়টি অর্থাৎ তাপমাত্রা জীবের জন্য নিম্নলিখিত [illegible]

(ক) উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন প্রকার ভৌত–রাসায়নিক প্রক্রিয়া তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(খ) বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের দ্রবণীয়তা তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(গ) গ্যাসীয় এবং তরল পদার্থের ব্যাপনের হার তাপমাত্রার [illegible]

(ঘ) রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তনশীল।

(ঙ) বিভিন্ন সিস্টেম এবং যৌগ পদার্থের সাম্যাবস্থা তাপমাত্রা দ্বারা [illegible]

(চ) এনজাইমের স্থায়ীত্ব তাপমাত্রার উপরে নির্ভরশীল।

উষ্ণ রক্তের (homeothermic) প্রাণীর মতো উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ [illegible] তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারে না। তাই এদের বৃদ্ধি ও বিপাক পারিবেশিক তাপমাত্রা [illegible] প্রভাবিত হয়। তবে উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় এবং পরিবেশীয় তাপমাত্রার সাথে একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্ণয় করা খুব কঠিন। কারণ মৃত্তিকা এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা দ্রুত পরিবর্তনশীল। উদাহরণস্বরূপ একটি পাতার তাপমাত্রা নির্ভর করে : (১) দিনের বিভিন্ন সময় (নিয়মিত [illegible] পরিবর্তন), (২) বছরের বিভিন্ন মাস (নিয়মিত ঋতুগত পরিবর্তন), (৩) [illegible] বায়ুপ্রবাহের গতি (অনিয়মিত স্বল্পকালীন পরিবর্তন), (৪) [illegible] সূর্যালোকিত অথবা ছায়াযুক্ত), (৫) ভূ–পৃষ্ঠের উপরে উচ্চতা, [illegible] আকৃতি। মৃত্তিকার তাপমাত্রা (১) এবং (২) এর উপর নির্ভরশীল [illegible] মৃত্তিকা পৃষ্ঠে শক্তির সমতা এবং মৃত্তিকার অভ্যন্তরে তাপ স্থানান্তর [illegible] ধর্মাবলীর (যেমন– মৃত্তিকায় পানির পরিমাণ, আয়তনী ঘনত্ব (bulk density), [illegible] অথবা জঞ্জালের আচ্ছাদন) উপরও নির্ভরশীল।

তাই, পাতার ক্যানোপি এবং মৃত্তিকা প্রোফাইল দ্রুত পরিবর্তনশীল তাপমাত্রার মধ্যে অবস্থান করে। এজন্য, মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার (যেমন– সালোকসংশ্লেষণ) উপর তাপমাত্রার প্রভাব নির্ণয় করা বেশ কঠিন। দীর্ঘকালীন পরীক্ষার ক্ষেত্রে আরো জটিলতার সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার এক বা একাধিক তাপীয় প্যারামিটারের উপর নির্ভর করে। এগুলো হলো গড়, সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবং সারা বছরে অথবা স্বল্পকালীন সংকটকালীন সময়ে একটি থ্রেস-হোল্ড তাপমাত্রার উপরে সঞ্চয়শীল (accumulated) তাপমাত্রা (ডিগ্রি ঘন্টা, ডিগ্রি দিন)।

উপরোক্ত সমস্যা ছাড়াও, উদ্ভিদের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার সর্বোত্তম তাপমাত্রার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু, কতকগুলো প্রজাতির জনন বৃদ্ধি দিনের তাপমাত্রার পরিবর্তে রাতের তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং কতকগুলো প্রক্রিয়া, বিশেষ করে অঙ্কুরোদ্গম ত্বরান্বিত করা যায় আকস্মিক হ্রাস বৃদ্ধি (fluctuating) তাপমাত্রা দ্বারা (Thomson and Grime, 1983)। আরো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকা এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় আরো বেশি জটিল। ঘাস এবং সেজের (sedges) অঙ্গজ বৃদ্ধির সময় এটি আরো ভালভাবে প্রযোজ্য; এক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের খুব নিকটে অবস্থিত কাণ্ড শীর্ষ থেকে নবীন পাতার বৃদ্ধি হয় (মৃত্তিকার তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত), অপরপক্ষে, পূর্ণাঙ্গ সালোকসংশ্লেষণকারী পাতা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

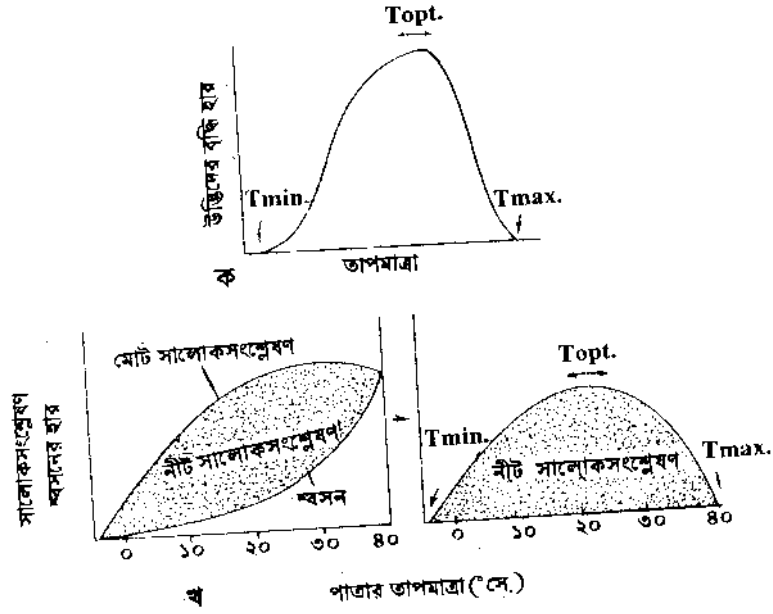

চিত্র ৬.৩ : উদ্ভিদের উপর তাপমাত্রার প্রতিক্রিয়া রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। (ক) উদ্ভিদের বৃদ্ধির হারের উপর তাপমাত্রার সাধারণ প্রভাব এবং তিনটি কার্ডিনাল তাপমাত্রা অর্থাৎ সর্বনিম্ন (T min), সর্বোচ্চ (T max) ও সর্বোত্তম তাপমাত্রা (T opt) দেখানো হয়েছে। (খ) একটি আদর্শ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসনের উপর তাপমাত্রার প্রভাব।

বিস্তীর্ণ পরিসরে অপরিবর্তনীয় তাপমাত্রার উদ্ভিদের বৃদ্ধির হারের উপর প্রতিক্রিয়া সাধারণত একটি অপ্রতিসাম্য (asymmetric) ঘন্টা-আকৃতির কার্ভের দ্বারা প্রকাশ করা যায় (চিত্র ৩.৩)। এই কার্ভ থেকে তিনটি কার্ডিনাল তাপমাত্রা সহজেই বোঝা যায়। এগুলো হলো সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, এর চেয়ে কম বা বেশি হলে বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং সর্বোত্তম তাপমাত্রার পরিসর, এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি, যদি তাপমাত্রাই বৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক হয়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর কার্ডিনাল তাপমাত্রার পরিসর বিস্তীর্ণ এবং এই পরিসর ১০ থেকে ৬০° সেলসিয়াস পর্যন্ত বিস্তৃত (চিত্র ৩.৪)।

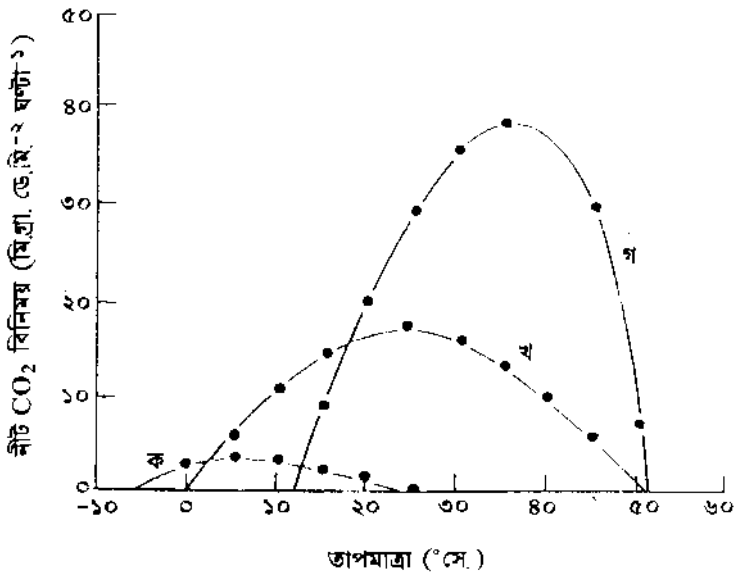

চিত্র ৩.৪ : ভিন্নতর পরিবেশের তিনটি Graminae গোত্রের উদ্ভিদের নিট সালোকসংশ্লেষণের কার্ডিনাল তাপমাত্রা। (ক) *Chionochloa* প্রজাতি (অ্যালপিন C_3 উদ্ভিদ), (খ) গম (নাতিশীতোষ্ণ C_3 উদ্ভিদ) এবং (গ) ভুট্টা (অব-নিরক্ষীয় C_4 উদ্ভিদ)।

উদ্ভিদের বৃদ্ধির উপর তাপমাত্রার প্রতিক্রিয়া এজন্য ঘটে যে, তাপমাত্রার বৃদ্ধি দুটি পরস্পর বিরোধী প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। প্রথমত, উদ্ভিদ কোষের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অণুগুলোর চলনের গতি (ভাইব্রেশনাল, রোটেশনাল এবং ট্রান্সলেশনাল) বেড়ে যায় এবং এর ফলে আন্তঃআণবিক সংঘর্ষের মাত্রা বেড়ে যায়, তাই বিক্রিয়ার হারও বেড়ে যায়। অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এরকম ঘটে। তবে, প্রকৃতপক্ষে কোষে সংঘটিত সকল রাসায়নিক বিক্রিয়া এনজাইমের জন্য ত্বরান্বিত হয়, যার কার্যকারিতা নির্ভর করে এর সঠিক টারশিয়ারি গঠন রক্ষার উপর। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত আণবিক সংঘর্ষ এই টারশিয়ারি গঠনের ক্ষতি করে, ফলে এনজাইমের কার্যকারিতা হ্রাস পায় এবং বিক্রিয়ার গতি হয় মন্থর। সর্বোত্তম তাপমাত্রার বেশি তাপমাত্রা এনজাইম নষ্ট করে অথবা যে কিল্লীতে এটি লেগে থাকে তা নষ্ট করে। উদ্ভিদের বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উপর তাপমাত্রার প্রভাব একই রকম নয়। যেমন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অনেক উদ্ভিদ প্রজাতির মোট (gross) সালোকসংশ্লেষণ ০° সেলসিয়াস

(সর্বনিম্ন) এবং ৪০° সেলসিয়াস থেকে (সর্বোচ্চ) বন্ধ হয়ে যায় ; সর্বোত্তম তাপমাত্রার পরিসর হলো ২০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস। অপরদিকে, ২০° সেলসিয়াসের নিচে শ্বসনের হার হ্রাস পায় ; উচ্চ তাপমাত্রায় বিপাকের তাপীয় বিচ্ছিন্নকরণের জন্য শ্বসনের হার ক্ষতিপূরণ (compensation) তাপমাত্রা পর্যন্ত দ্রুত বাড়তে থাকে, এক্ষেত্রে শ্বসনের হার এবং মোট সালোকসংশ্লেষণের হার সমান অর্থাৎ নিট সালোকসংশ্লেষণ শূন্য।

Vant Hoff-এর সূত্র বা তাপমাত্রা গুণাঙ্ক (Q_{10})

যেহেতু বিভিন্ন প্রজাতির এবং বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার উপর তাপমাত্রার সংবেদনশীলতা ভিন্নতর হয়, সেহেতু এই সংবেদনশীলতার একটি পরিমাণগত প্রকাশ প্রয়োজন, বিশেষ করে অব-সর্বোত্তম (sub-optimal) পরিসর তাপমাত্রায়। এক্ষেত্রে Vant Hoff-এর সূত্র, যা সাধারণভাবে Q_{10} নামে পরিচিত, ব্যবহার করা হয়।

$$Q_{10} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় হার (T) + ১০° সেলসিয়াস}}{\text{কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় হার (T)}} \quad \text{............ (৩.১)}$$

পরীক্ষাগারে এটি দেখা গেছে যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার Q_{10} এর মান সাধারণত ২ এর কাছাকাছি, তাই ধারণা করা হয় যে, পরিমিত (measured) Q_{10} এর মান ২ এর বেশি হলে নির্দেশ করে যে, উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া বিপাকীয় নিয়ন্ত্রণে, অপরদিকে ২ এর কম হলে বুঝতে হবে যে, এই প্রক্রিয়ার হার সম্পূর্ণভাবে ভৌত প্রক্রিয়া, যেমন ব্যাপন অথবা আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (Sutcliffe, 1977 ; Berry and Raison, 1981)। তবে যদিও এই ধারণাগুলো (assumptions) সাধারণত প্রয়োজনীয়, শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় সাবধানতার সাথে Q_{10} ব্যবহার করা উচিৎ। কারণ এগুলো নিজেরাই তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদের কতিপয় প্রক্রিয়ার Q_{10} এর মান ৩.৩ সারণিতে দেখানো হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ্য করা হয়েছে যে, শস্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকার তাপমাত্রাও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মূলের বৃদ্ধি ও কার্যাবলী এর উপর নির্ভরশীল। ৩.৫ নং চিত্রে মৃত্তিকার তিনটি ভিন্ন গভীরতায় গড় মাসিক তাপমাত্রা দেখানো হয়েছে। সকল গভীরতায় তাপমাত্রার পরিবর্তনের প্যাটার্ন মূলত বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার মতোই। তবে ২০ সেন্টিমিটারের তুলনায় ৫ সেন্টিমিটার গভীরতায় তাপমাত্রার পরিসর বেশি ; ২০ সেন্টিমিটার গভীরতায় শীতকালে তাপমাত্রা খুব নিচে নামে না এবং গ্রীষ্মকালে খুব বেশি উপরে ওঠে না।

সারণি ৩.৩ : ০–৩০° সেলসিয়াস–তাপমাত্রায় নির্বাচিত কয়েকটি উদ্ভিদ প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা গুণাঙ্কের (Q_{10}) মান

প্রক্রিয়া	Q_{10}
ক্ষুদ্র অণুর পানিতে ব্যাপন	১.২ থেকে ১.৫
Arachis hypogea এর বীজত্বকের ভিতর দিয়ে পানির প্রবাহ	১.৩ থেকে ১.৬
বিভিন্ন প্রজাতির অঙ্কুরিত বীজে পানি চলাচল	১.৫ থেকে ১.৮
এনজাইম প্রভাবিত আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়া	১.৫ থেকে ২.৩
শ্বসন	১.১ থেকে ২.৬
সালোকসংশ্লেষণ আলোক বিক্রিয়া	≃১
অন্ধকার বিক্রিয়া	২ থেকে ৩
সূর্যমুখীর মূলের কর্তিত অংশে (disc) ফসফেট পরিশোষণ	০.৮[ক] থেকে ৩[খ]
ভুট্টার শিকড় কর্তৃক পটাশিয়াম পরিশোষণ	২ থেকে ৫

ক. উচ্চ বহিঃস্থ ঘনমাত্রায় (৫০ মিলিমোলার) পরিশোষণ প্রধানত ঘটে নিষ্ক্রিয় ব্যাপনের মাধ্যমে.

খ. নিম্ন বহিঃস্থ ঘনমাত্রায় (০.১ মিলিমোলার) সক্রিয় পরিশোষণ ঘটে।

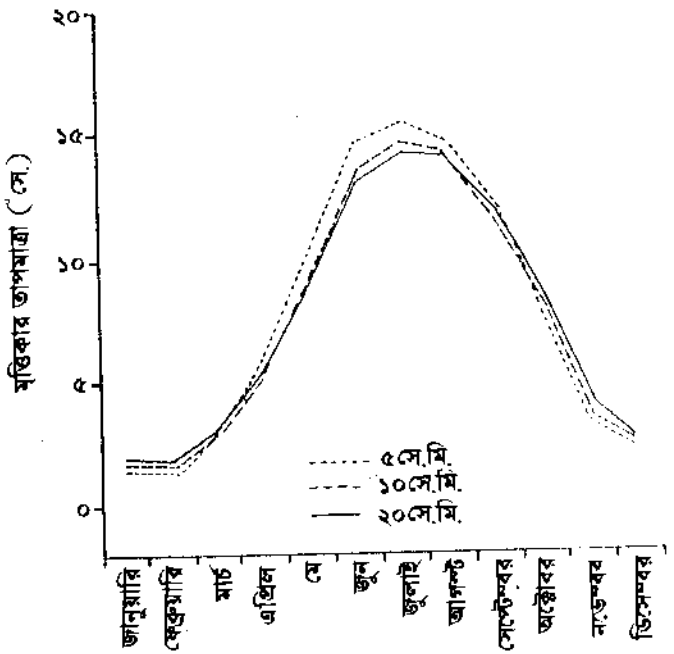

চিত্র ৩.৫ : স্কটল্যান্ডের (১৯৬৫–৭৫) মৃত্তিকার ৫,১০ এবং ২০ সেন্টিমিটার গভীরতায় গড় মাসিক তাপমাত্রা।

শরৎকালে এবং বসন্তকালে শস্যের চারার প্রতিষ্ঠার (establishment) সময় মৃত্তিকার তাপমাত্রা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অঙ্কুরিত বীজের সংখ্যা এবং প্রতিষ্ঠিত চারা গাছের সংখ্যা অংশত তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। অঙ্কুরোদগম এবং চারা নির্গমণের (seedling emergence) হারও তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল এবং বীজতলায় চারাগাছ জীবিত থাকা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ করে যেসব বীজতলা থেকে দ্রুত পানি হ্রাস পায়। অধিকাংশ বীজ ১০ থেকে ৫০ মিলিমিটার গভীরে বপন করা হয় এবং এখানকার মৃত্তিকার তাপমাত্রা শস্যের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাফল্যকে প্রভাবিত করতে পারে। বসন্তকালে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই গভীরতায় মৃত্তিকার তাপমাত্রার দিন-রাতের পরিবর্তন খুব বেশি (চিত্র ৩.৬)। মে মাসের প্রথমের দিকে ব্রিটেনের উত্তরাঞ্চলে বপন গভীরতায় মৃত্তিকার তাপমাত্রার দৈনন্দিন পরিসর ৩°থেকে ১৫° সেলসিয়াস। বপনের পর কালো বিটুমিন আর্দ্রতা রক্ষাকারী (mulch) ব্যবহার করে এই সংকটকালে মাটির ১০ মিলিমিটার গভীরতায় তাপমাত্রা ৪ থেকে ৫° সেলসিয়াস বৃদ্ধি করা যায়।

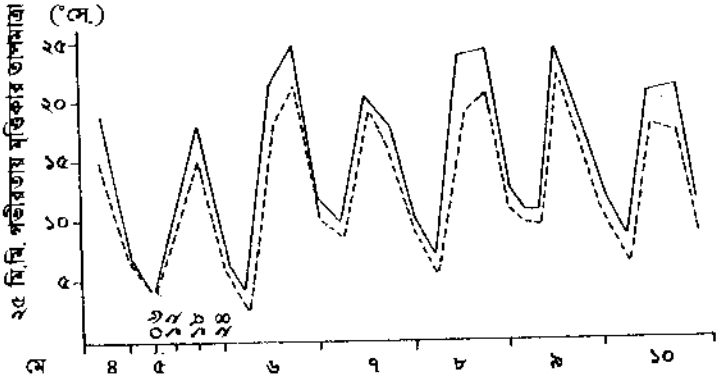

চিত্র ৩.৬ : মে মাসের প্রথমের দিকে দক্ষিণ-পূর্ব স্কটল্যান্ডের উন্মুক্ত মৃত্তিকা (বিচ্ছিন্ন লাইন) এবং বিটুমিন আর্দ্রতা রক্ষাকারী দেয়া মৃত্তিকার (অবিচ্ছিন্ন লাইন) তাপমাত্রার প্রাত্যহিক পরিবর্তন।

অধিকাংশ শস্যের বীজের ৬° থেকে ১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দ্রুত অঙ্কুরোদ্গম হয়, যেমন– গম, যব, সরিষা, কিন্তু অপর কতকগুলো শস্য, যেমন– ভুট্টার জন্য কমপক্ষে ১০° সেলসিয়াসে মৃত্তিকার তাপমাত্রার প্রয়োজন। এ কারণে শস্যের উপযুক্ত বপন সময় নির্ধারণের জন্য মৃত্তিকার তাপমাত্রা জানা দরকার। ৪° সেলসিয়াস এবং ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে গমের অঙ্কুরোদ্গম হয়, তবে সর্বোচ্চ অঙ্কুরোদ্গম হারের জন্য প্রয়োজন ২০°থেকে ২৫° সেলসিয়াস; কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে যখন গম বপন করা হয়, তখন বীজতলায় বপন গভীরতায় তাপমাত্রা থাকে ৫° থেকে ১০° সেলসিয়াস (চিত্র ৩.৫)।

মাটি এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার প্রভাব শস্যের বৃদ্ধি ও বিপরিণতির অন্যান্য পর্যায়েও আছে। অনেক শস্যের পাতার বৃদ্ধি বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইংল্যান্ডে পরিচালিত বসন্তকালীন যবের পাতার প্রসারণ হারের সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক ৩.৭ নং চিত্রে উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়েছে; ৩.৫°থেকে ১৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রার পরিসরে পাতার প্রসারণ হার দিন ও রাতের তাপমাত্রার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এই পরিসরে প্রসারণ ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফলাফলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে, অধিক সৌরবিকিরণ গ্রহণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত পাতার বৃদ্ধির প্রয়োজন, কারণ এর উপর শস্যের ফলন অনেকাংশে নির্ভরশীল।

সয়াবিনের পাতার আবির্ভাবের (appearance) হারও তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল এবং ১৮° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার পরিসরে এই হার বৃদ্ধি পায়; এটি নির্দেশ করে যে, সয়াবিনের জন্য উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন। ভুট্টার সালোকসংশ্লেষণ এবং পাতার বৃদ্ধি ১০° সেলসিয়াসে মন্থর এবং ৩০° থেকে ৩৩ সেলসিয়াসে দ্রুততর হয়। সুগারবিটের পাতার আবির্ভাবের হার ৫° থেকে ১৫° সেলসিয়াস পরিসরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় ও এরপর প্লেটু (plateau) অবস্থায় থাকে এবং ৩০° সেলসিয়াসের বেশি হলে আবার কমতে শুরু করে। সুগারবিটের মূল এবং চিনির ফলন বৃদ্ধির জন্য বসন্তকালের শেষে এবং গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে নিম্ন তাপমাত্রায় পাতার প্রসারণ হার দ্রুত হওয়া প্রয়োজন।

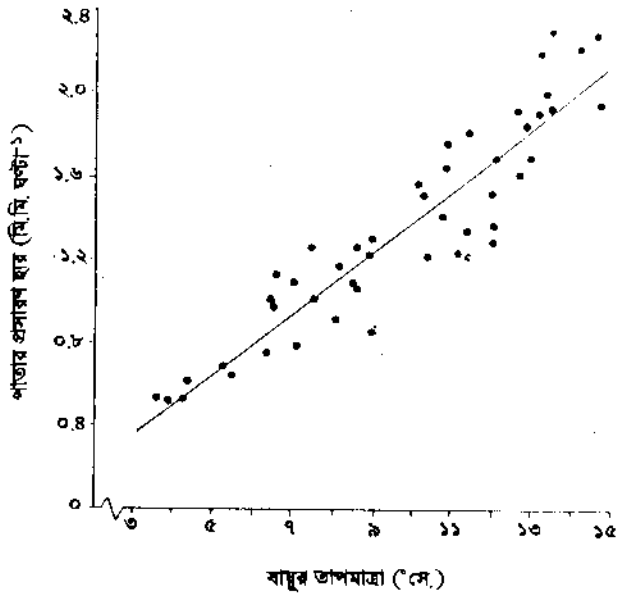

চিত্র ৩.৭ : যবের পাতার প্রসারণ হারের উপর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার প্রভাব

মূলের বৃদ্ধির উপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা খুব কম হয়েছে, তবে মূলের উপর তাপমাত্রার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেমন ভুট্টার সেমিনাল (seminal) মূলের দীর্ঘীকরণের হার ১০° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, এর পর বৃদ্ধি কমে যায়। এই প্রভাবগুলো মূলতন্ত্রের বৃদ্ধির হারকে প্রভাবিত করে এবং সেই সাথে মৃত্তিকা থেকে পানি ও খনিজ মৌল পরিশোষণের ক্ষমতা বাড়ায় যা বিটপের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

নিম্ন তাপমাত্রা অনেক শস্যের পুষ্পায়নকে উদ্দীপিত করে ; একে বলা হয় ভারনালাইজেশন (vernalization)। অধিকাংশ শরৎকালে বপন করা শস্যের, যা দ্বি-বর্ষজীবীর মতো আচরণ করে, অঙ্গজ থেকে জনন অবস্থায় রূপান্তরে কিছু সময়ের জন্য নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।

শরৎকালে বপন করা দানাশস্যের ভারনালাইজেশন দরকার। শীতকালীন গমে ৩° থেকে ৮ সেলসিয়াস হলো ভারনালাইজেশনের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী তাপমাত্রা। প্রায়-শূন্য (sub-zero) তাপমাত্রার প্রয়োজন নেই, যদিও – ৩°সেলসিয়াস থেকে ১৩°সেলসিয়াস তাপমাত্রায়ও ভারনালাইজেশন হয়। শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শীতকালে সাধারণত শস্য বপনের ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে এই তাপমাত্রা হয়। মাতৃ-উদ্ভিদেই সিক্ত বীজের ভারনালাইজেশন করা যায়, তবে কার্যত নবীন চারাগাছেই এটি করা হয়। ভারনালাইজেশনের পর উচ্চ তাপমাত্রা প্রদান করলে এই প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়, তবে মাঠ পর্যায়ে এটি কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না।

গমের ভারনালাইজেশনের প্রয়োজনীয়তায় বাস্তব গুরুত্ব আছে। এই প্রয়োজনীয়তার জন্য শীতকালীন গম জন্মানোর এলাকার সীমাবদ্ধতা আছে এবং উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে গমের শীতকালীন ভ্যারাইটি উপযুক্ত নয়। শস্য বপনের তারিখ নির্ধারণও সংকটপূর্ণ হতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় গম শরৎকালে বপন করা হয়, কিন্তু মৃত্তিকা এবং আবহাওয়াজনিত অসুবিধার কারণে এটি সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে বসন্তের প্রারম্ভে গম বপন করা সম্ভব এবং এ সময়েও ভারনালাইজেশন গ্রহণ করতে পারে। নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন ভ্যারাইটিতে বিভিন্ন হতে পারে এবং কতকগুলো শীতকালীন ভ্যারাইটিকে বসন্তকালে বপনের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। যব, জই (oats) এবং রাই (rye)–এর শীতকালীন ভ্যারাইটি ভারনালাইজেশনের প্রয়োজনীতার ক্ষেত্রে গমের মতো আচরণ করে। তেল–বীজ রেপ (rape) এবং ফিল্ড বিনের শীতকালীন ও বসন্তকালীন ভ্যারাইটি আছে এবং এদেরও ভারনালাইজেশনের প্রয়োজন আছে। এসব শস্যের ভাল ফলনের জন্য ভারনালাইজেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যে সমস্ত দ্বি–বর্ষজীবী শস্য অঙ্গজ অঙ্গের জন্য চাষ করা হয়, তাদের ক্ষেত্রে ভারনালাইজেশন বাঞ্ছনীয় নয়। পাতার বৃদ্ধি দ্রুত হওয়ার জন্য সুগারবিট খুব আগাম (early) বপন করলে, নবীন চারাগাছ বসন্তকালে নিম্ন তাপমাত্রা পায়। এটি অনেকটা ভারনালাইজেশনের মতো কাজ করে এবং প্রথম বর্ষেই পুষ্পীয় কাণ্ড বা বোল্টার (bolter) তৈরি হয়। সুগারবিটে বোলটিং হলে মূল তন্তুময় (fibrous) হয়, এতে সুক্রোজের পরিমাণ কম থাকে এবং যান্ত্রিক উপায়ে মূল সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বোল্টারের অনুপাত বেশি হলে ফলন কমে যায়। বোলটিং প্রতিরোধী সুগারবিটের ভ্যারাইটি আছে যা অন্যান্য ভ্যারাইটির তুলনায় আগাম বপনের জন্য অধিক উপযোগী।

সুইডস (swedes) এবং টারনিপের (turnips)ক্ষেত্রে বোলটিং সমস্যার সৃষ্টি করে। মূলের ভাল ফলনের জন্য এদেরকে আগাম বপন করলে চারাগাছ ভারনালাইজেশনের প্রভাব পেতে পারে। অবশ্য বোলটিং-এর জন্য এই শস্যের আর্থিক ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু এদের ফুলে অধিক পরিমাণে অ্যানিমিয়া সৃষ্টিকারী উপাদান (এস–মিথাইল সিস্টিন সালফোক্সাইড) থাকায় গবাদিপশুর স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হয়।

কোনো শস্য কোন ভৌগোলিক এলাকার জন্য উপযুক্ত তা নির্ভর করে শস্যের তাপমাত্রার আবশ্যকতা এবং সেই এলাকার আবহাওয়ার উপর। উপযুক্ত এলাকা নির্বাচনের জন্য গোটা মৌসুমব্যাপী সঞ্চয়শীল (accumulated) তাপমাত্রার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১০° সেলসিয়াসের উপরে বায়ুমণ্ডলের প্রাত্যহিক গড় সঞ্চয়শীল তাপমাত্রা উপযুক্ত এলাকা নির্বাচনে সহায়তা করে। ভুট্টার ক্ষেত্রে অবশ্য দানা ও সাইলেজের জন্য) অন্টারিও ইউনিট সিস্টেম (Ontario unit বা সংক্ষেপে OU) অধিকতর কার্যকরী এবং এটিই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে: নিম্নলিখিতভাবে OU নির্ণয় করা যায় (Hough, 1978) :

দিনের ক্ষেত্রে, $Y = 3.33 (Tmax - 10) - 0.084 (Tmax - 10)^2$

যদি $Tmax \geq 10°C$ হয়।

যদি $Y < 10°C$ হয়, তবে $Y = 0$

এক্ষেত্রে, Tmax হলো দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°C)।

রাতের ক্ষেত্রে, $X = 1.8 (Tmin - 4.4)$

যদি $Tmin \geq 4.4°C$ হয়।

অন্যক্ষেত্রে $X = 0$।

$OU = (Y + X)/2$.

উদাহরণ

কোনো দিনে যদি Tmax = ১৬.৭° সেলসিয়াস এবং Tmin = ৭.৮° সেলসিয়াস হয়, তাহলে

$$Y = ৩.৩৩ (১৬.৭-১০) - ০.০৮৪ (১৬.৭-১০)^২$$
$$= ৩.৩৩ (৬.৭) - ০.০৮৪ (৪৪.৯)$$
$$= ২২.৩ - ৩.৮ = ১৮.৫$$
$$X = ১.৮ (৭.৮-৪.৪)$$
$$= ১.৮ (৩.৪) = ৬.১$$
$$OU = (১৮.৫ + ৬.১)/২ = ২৪.৬ \div ২ = ১২.৩$$

প্রত্যেক দিনের মান যোগ করে সঞ্চয়শীল মান পাওয়া যায়।

কোনো দেশের বিভিন্ন এলাকায়, যেখানে আবহাওয়ার উপাত্ত পাওয়া যাবে, সম্পূর্ণ মৌসুমের সঞ্চয়শীল OU নির্ণয় করা যায়। পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, ভূট্টার একই পরিপক্কতা (maturity) গ্রুপের ভ্যারাইটিগুলোর সনাক্তযোগ্য বিপরিণতি পর্যায় সুনির্দিষ্ট সংখ্যক OU এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন LGII ভ্যারাইটির ক্ষেত্রে ফলাফল নিম্নরূপ :

পর্যায়	OU_S
বপন থেকে সিল্কিং পর্যন্ত	১৪০০
বপন থেকে শস্যের মোট শুষ্ক পদার্থের শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত	২৩০০
বপন থেকে শস্যের মোট শুষ্ক পদার্থের শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত	২৫০০
বপন থেকে দানায় শতকরা ৪০ ভাগ পানি পর্যন্ত	২৭০০

(প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য সর্বনিম্ন মান)

অপর পদ্ধতি হলো বর্ধমান ডিগ্রি দিন (Growing degree day বা সংক্ষেপে GDD) এবং এটি তাপ একক (heat unit), কার্যকর তাপ একক (effective heat unit) এবং বৃদ্ধি একক (growth unit) নামেও পরিচিত। নিম্নলিখিতভাবে GDD নির্ণয় করা যায় :

$$GDD = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{Tmax+Tmin}{2} - T_b \right)$$

এক্ষেত্রে, $\frac{Tmax+Tmin}{2}$ হলো প্রাত্যহিক গড় তাপমাত্রা এবং T_b হলো কোনো শস্যের জন্য সর্বনিম্ন থ্রেশহোল্ড তাপমাত্রা যার পরিসর ৪.৫° থেকে ১২.৫° সেলসিয়াস। খুব সহজেই GDD নির্ণয় করা যায় বলে এটি বেশ জনপ্রিয় পদ্ধতি।

কতিপয় শস্য তুষারপাতে সংবেদনশীল, তাই কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় তুষারপাতের প্রকটতা এবং সেটি কত বার ঘটে তা জানা থাকলে এ সমস্ত শস্য তুষারপাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে। তিনটি অবস্থায় তুষারপাতের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রথমত, সংবেদনশীল শস্য আগাম বপন করলে যখন মৃত্তিকা ভেদ করে এরা বের হয় (emergence) তখন তুষারপাত হলে ক্ষতি হতে পারে। গোল আলুর ক্ষেত্রে এটি ঘটে। *Phaseolus* বিনের ক্ষেত্রেও এরকম দেখা গেছে।

দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত শস্যের জীবনকাল দীর্ঘ, তাদের সম্পূর্ণ পরিপক্বতার আগেই শরৎকালের প্রারম্ভে তুষারপাতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ভুট্টা এবং নাতিশীতোষ্ণ অবহাওয়ায় ভুট্টার শস্য সংগ্রহ (harvest) প্রায়ই নভেম্বর পর্যন্ত চলে। যদিও প্রচণ্ড শারদীয় তুষারপাতে ভুট্টা গাছ মরে যায় এবং এর ফলে কোষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও পাতা থেকে পানি বেরিয়ে যায় যা এর শুষ্কপদার্থের পরিমাণ বাড়ায় এবং এনসাইলেজের জন্য অধিকতর উপযুক্ত হয়।

তৃতীয়ত, শরৎকালে বোনা শস্য সারা শীতকালে শৈত্য তাপমাত্রা দ্বারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এ কারণে শস্যের মৃত্যু হলে সাধারণভাবে বলে উইন্টার কিল। শীতকালীন দানশস্যে এটি বেশি দেখা যায় এবং যই-এর ফলন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

হিমাঙ্ক তাপমাত্রায় উদ্ভিদ কোষের অভ্যন্তরে বরফের স্ফটিক তৈরি হয়। কোষের ঝিল্লী নষ্ট হয় এবং বরফ গলনের (thawing) সময় কলা (tissue) নষ্ট হয়ে যায়। কেবল প্রজাতি এবং ভ্যারাইটির উপর এই ক্ষতি নির্ভর করে না, কলার বয়স এবং বরফ জমার পূর্বে নিম্ন তাপমাত্রায় কলা কতটা খাপখাইয়ে নিতে পেরেছে তার উপরও নির্ভর করে। তুষারপাতের সময় শস্যের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়ে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই পানি যখন বরফে পরিণত হয়, তখন যে পানি গলনের সুপ্ত তাপ (latent heat of fusion) তৈরি হয় তা কলায় বরফ জমাট বাঁধতে বাধা প্রদানের জন্য যথেষ্ট।

বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity)

বায়ুর আর্দ্রতা অর্থাৎ বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বিভিন্নভাবে শস্যের বৃদ্ধি ও ফলনকে প্রভাবিত করে। এটি সুনিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, বায়ুর আর্দ্রতা প্রস্বেদনকে প্রভাবিত করে, কিন্তু বৃদ্ধির অন্যান্য প্রক্রিয়ার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে খুব বেশি জ্ঞান আহরিত হয়নি। এর একটি কারণ হলো শস্য পর্যায়ে বায়ুর আর্দ্রতা সঠিকভাবে নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন। প্রস্বেদন এবং বায়ুর আর্দ্রতার সম্পর্ক বিষয়ে অধিকাংশ তথ্য পাওয়া গেছে স্বচ্ছ পাতার প্রকোষ্ঠ ব্যবহার করে, যাতে পরিবেশীয় সবগুলো উপাদান সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং মনিটর করা যায়। তথ্য ঘাটতির অপর একটি কারণ হলো অতীতে শস্যের বৃদ্ধির উপর আর্দ্রতার প্রভাবকে খুব কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বায়ুর আর্দ্রতা বিভিন্নভাবে পরিমাপ করা যায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা (relative humidity বা RH) অতি সহজেই স্বল্প মূল্যের যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। এ রকম একটি যন্ত্র হলো সিক্ত এবং শুষ্ক বাল্ব (wet and dry bulb) থার্মোমিটার। তবে উদ্ভিদ অথবা অন্য কোনো বস্তু থেকে বাষ্পীভবনে কেবল আপেক্ষিক আর্দ্রতার গুরুত্ব খুব কম। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হলো এক তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বায়ুর তুলনায় বায়ুতে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে তার পরিমাপ। সম্পৃক্ত বায়ু এবং বিশুদ্ধ পানির জলীয় বাষ্পের চাপ (vapour pressure বা VP) একই থাকায় এদের মধ্যে পানির বিনিময় হয় না। বিভিন্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতায় এবং তাপমাত্রায় বায়ুতে পানির পরিমাণ অর্থাৎ বাষ্পের চাপ ৩.৬ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাপমাত্রা অথবা আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস পেলে বাষ্প চাপ ব্যাপকভাবে কমে যায়। তবে বাষ্পীভবনের হার নির্ভর করে বাষ্প চাপের ঘাটতির (vapour pressure dificit বা VPD) উপর, বাষ্প চাপের উপর নয়। তাই পাতার কোষে, কোষাবকাশে (intercellular space) এবং বায়ুমণ্ডলে পানির বাষ্প চাপের পার্থক্য পাতা থেকে বাষ্পীভবনের পটেনশিয়াল হার নির্ধারণ করে। এই পার্থক্য যতো বেশি হবে পানি স্থানান্তরের হারও ততো বেশি হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে অথবা একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস পেলে বাষ্প চাপ ঘাটতি দ্রুত বেড়ে যায় (চিত্র ৩.৮ ক)।

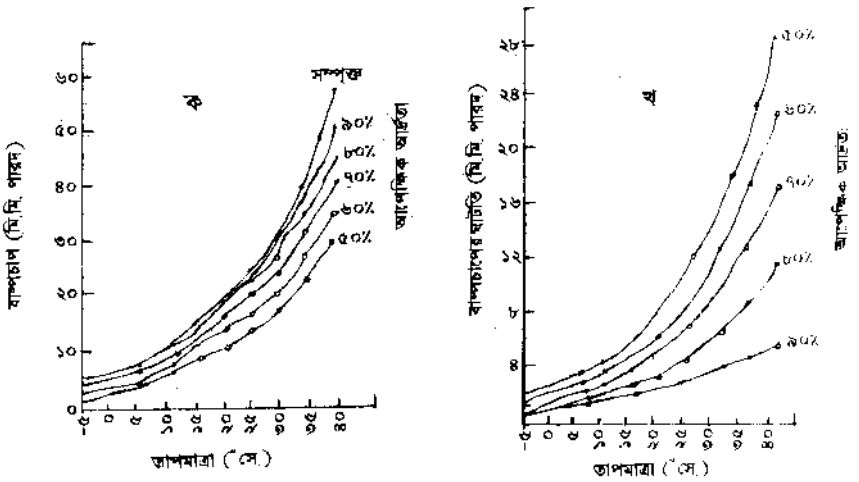

চিত্র ৩.৮ : বিভিন্ন তাপমাত্রায় এবং বিভিন্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতায় বাষ্প চাপ (ক) এবং বাষ্প চাপের ঘাটতির (খ) মান।

পানির মতো তাপমাত্রার সাথে বাষ্প চাপের একই রকম সম্পর্ক আছে কারণ সম্পৃক্ত বায়ুর (শতকরা ১০০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতা) বাষ্প চাপ এবং পানির বাষ্প চাপ এক। এজন্য তাপমাত্রা জানা থাকলে, আপেক্ষিক আর্দ্রতা থেকে বায়ুর বাষ্প চাপের ঘাটতি নির্ণয় করা যায় :

VP = RH × SVP, তাহলে VPD = SVP-VP, এক্ষেত্রে SVP হলো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বায়ুর বাষ্প চাপ যা একই তাপমাত্রার পানির বাষ্প চাপের সমান (সারণি ৩.৪)।

সারণি ৩.৪ : বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি এবং সম্পৃক্ত বায়ুর বাষ্প চাপ (মিলিমিটার পারদ)।

তাপমাত্রা (°সেলসিয়াস)	বাষ্প চাপ	তাপমাত্রা (°সেলসিয়াস)	বাষ্প চাপ
−৫	৩.২	৩০	৩১.৮
০	৪.৬	৩৫	৪২.২
৫	৬.৫	৪০	৫৫.৩
১০	৯.২	৪৫	৭১.৯
১৫	১২.৮	৫০	৯২.৫
২০	১৭.৫	৬০	১৪৯.৪
২৫	২৩.৮	৬৫	১৯৭.৫

বায়ুর আর্দ্রতা এবং প্রস্বেদন

প্রকৃতপক্ষে, উদ্ভিদ কোষের পানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জলীয় বাষ্প উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। এটি মূলত ঘটে প্রস্বেদনের উপর জলীয় বাষ্পের সরাসরি প্রভাবের জন্য যা নিচে দেখানো হয়েছে :

$$\text{প্রস্বেদন} = \frac{e_{\text{পাতা}} - e_{\text{বায়ু}}}{r_{\text{পাতা}} + r_{\text{বায়ু}}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (৩.২)$$

এক্ষেত্রে, $e_{\text{পাতা}}$ –পাতার কোষাবকাশে প্রকৃত বাষ্প চাপ, $e_{\text{বায়ু}}$–পাতার বাইরে বায়ুর প্রকৃত বাষ্প চাপ, $r_{\text{পাতা}}$–পাতার ব্যাপন রোধক (resistance) এবং $r_{\text{বায়ু}}$ –পাতার সন্নিকটে বায়ুর বাউন্ডারি স্তর রোধক। পাতার আন্তঃকোষীয় বায়ু কুঠুরীকে সাধারণত সম্পৃক্ত বলে মনে করা হয় এবং এখানকার বাষ্প চাপ পাতার তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্প চাপের সমান ধরা হয়। বায়ুর বাষ্প চাপ (e) একই তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্প চাপের (e_s) সাথে নিম্নলিখিতভাবে সম্পর্কযুক্ত :

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা (RH)} = e/e_s \times ১০০ \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (৩.৩)$$

বায়ুর তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিবর্তন হয়, যদিও বায়ুর প্রকৃত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ একই থাকে। তাই প্রস্বেদনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক আর্দ্রতার ধারণা মূল্যহীন। যদি পাতা এবং বায়ুর তাপমাত্রা একই থাকে, তাহলে বায়ুর বাষ্প চাপ ঘাটতির মান ($e_{\text{পাতা}} - e_{\text{বায়ু}}$)–এর সমান ; প্রস্বেদনের হারের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে এই তথ্যেরই প্রয়োজন।

প্রকৃতির অবস্থায়, সারা দিনে বাষ্প চাপের পরিবর্তন খুব একটা বেশি নাও হতে পারে, কিন্তু বায়ুর তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। এজন্য তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং বাষ্প চাপের ঘাটতির পরিবর্তন হয়, যদিও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ একই থাকে। যদি পাতার তাপমাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে পাতার অভ্যন্তরে বাষ্প চাপের পরিবর্তন হয় (ধারণা করা হয় যে, অধিকাংশ সময় আন্তঃকোষীয় বায়ু কুঠুরী সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে) এবং এর জন্য পাতা থেকে বায়ুতে বাষ্প চাপের গ্রেডিয়েন্ট বেড়ে যায়। অপর কথায়, সকাল থেকে বিকেলে প্রস্বেদনের হার বৃদ্ধির কারণ হলো পাতার তাপমাত্রার বৃদ্ধি, আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস কিংবা বায়ুর বাষ্প চাপ ঘাটতি বৃদ্ধি নয়।

প্রস্বেদন এবং পাতার বৃদ্ধি

কোষের দীর্ঘীকরণের মাধ্যমে পাতার বৃদ্ধি হয়। আবার কোষের রসস্ফীতি চাপের (turgor pressure) জন্য কোষের দীর্ঘীকরণ হয়। কোষের দীর্ঘীকরণের জন্য একটি সর্বনিম্ন রসস্ফীতি চাপ থাকে, এবং পাতার বৃদ্ধি কোষের প্রকৃত রসস্ফীতি চাপের উপর নির্ভরশীল। তাই কোষের দীর্ঘীকরণের জন্য একটি সংকটকালীন মাত্রার বেশি রসস্ফীতি চাপ থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন উদ্ভিদে এই সংকটকালীন রসস্ফীতি চাপ ভিন্নতর এবং যে অবস্থায় উইল্টিং দেখা যায় তার চেয়ে এই মান অনেক বেশি। কোনো উদ্ভিদ সজীব দেখলেও এবং আপাতভাবে পানি ঘাটতি না থাকলেও, উদ্ভিদের বৃদ্ধি নাও হতে পারে।

প্রস্বেদনের জন্য রসস্ফীতি চাপের মান কমে যায়। এমন কি মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়াল বেশি থাকলেও, পানি পরিশোষণ এবং পাতায় পরিবহণের তুলনায় প্রস্বেদনের হার খুব বেশি হলে পাতার রসস্ফীতি চাপ বেশি হয় না বলে পাতার বৃদ্ধি আনুপাতিক হারে কমে যায় (Miller এবং Gardner, 1972)। এজন্য পাতার বৃদ্ধির সাথে বায়ুর বাষ্প চাপ এবং পাতার পটেনশিয়ালের ভাল সম্পর্ক আছে। যেমন একটি পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, ১০ বার মৃত্তিকার পানির

পটেনশিয়ালে, গমের পাতার পানির পটেনশিয়াল ছিলো–১৮ বার শতকরা ৮০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় এবং –২৪ বার শতকরা ৫০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় (Young এবং De Jong, 1972)। অপর একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মৃত্তিকায় পানির উচ্চ পটেনশিয়ালে (–০.৪ বার) শতকরা ৪৫ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতার তুলনায় শতকরা ৯০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় সুগারবিটের ফলন শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে যায়।

তাই মাঠ পর্যায়ে শস্যের বৃদ্ধি ও ফলনের উপর বায়ুর আর্দ্রতা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশীয় প্রভাবক। যখন শস্যের উপর সৌরবিকিরণ বেশি পড়ে এবং বায়ুর তাপমাত্রা বেশি থাকে, এ অবস্থায় বায়ুর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ শস্যের বৃদ্ধিতে ব্যাপক বাঁধার সৃষ্টি করে।

অনেক এলাকার সেচনির্ভর কৃষিতে এরকম উচ্চ সৌরবিকিরণ, উচ্চ তাপমাত্রা এবং বায়ুর নিম্ন আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় শস্য উৎপাদনের জন্য প্রচুর পানির দরকার। তাই উৎপাদন খরচও বেশি পড়ে। এ অবস্থায় শস্যক্ষেত্র এবং উন্মুক্ত ভূমি যদি পাশাপাশি থাকে, তাহলে সমস্যা আরও ব্যাপক হয়। উন্মুক্ত ভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া উষ্ণ এবং শুষ্ক বায়ু অ্যাডভেকশনের (advection)মাধ্যমে শস্যের পাতার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে। এই অতিরিক্ত তাপ কমানোর জন্য প্রস্বেদনের হারও বেড়ে যায়। যেহেতু এসব এলাকার বায়ুর নিম্ন জলীয় বাষ্প শস্য উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সেহেতু এই এলাকায় আর্দ্রতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন অত্যন্ত জরুরি।

আর্দ্রতা এবং পত্ররন্ধ্র

বায়ুর আর্দ্রতা বাড়লে প্রস্বেদনের হার কমে যায়, কিন্তু পত্ররন্ধ্রের রন্ধ্র (aperture) বড় হয়। শতকরা ৯০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতার তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায়, তুলার প্রস্বেদনের হার মাত্র দ্বিগুণ হয়। যদিও নিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতায় পাতা থেকে বায়ুমণ্ডলে বাষ্প চাপের গ্রেডিয়েন্ট প্রায় ছয় গুণ (Hoffman *et al.*, 1971)। এর কারণ হলো নিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতায় পত্ররন্ধ্রের রন্ধ্র ছোট হয়ে যায়। পাতার ব্যাপন রোধক (diffusion resistance) ছিল শতকরা ২৫ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ৮ সেকেন্ড প্রতি সেন্টিমিটারে এবং শতকরা ৯০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ৫ সেকেন্ড প্রতি সেন্টিমিটারে। আরো অনেক গবেষণার ফলাফল একই রকম পাওয়া গেছে।

পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষের দ্রুত প্রস্বেদনের জন্য রন্ধ্রের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, ফলে প্রস্বেদনের হার কমে যাওয়ায় অন্যান্য কোষে পানি ঘাটতি কম হয়। বায়ুর বাষ্পীভবনের চাহিদা বেশি হলে এবং পাতায় পানি সরবরাহ কম হলে, পত্ররন্ধ্রের রন্ধ্র কমিয়ে (এর ফলে পাতার ব্যাপন রোধক বেড়ে যায়) উদ্ভিদ পানি হ্রাস নিয়ন্ত্রণ করে। যতোক্ষণ পর্যন্ত পাতায় পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করা যাবে, ততোক্ষণ পাতা থেকে বায়ুমণ্ডলের বাষ্প চাপের গ্রেডিয়েন্ট প্রস্বেদন অনুসরণ করবে।

তবে পাতার পানির পটেনশিয়াল উচ্চ রাখার জন্য পত্ররন্ধ্রের রন্ধ্র কমিয়ে দিলে সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন ডাই–অক্সাইড পাতায় প্রবেশে বিঘ্ন ঘটবে। ফলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যাবে। তাই নিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতায় শস্যের ফলন হ্রাসের প্রধান কারণ পাতার পানি ঘাটতি নয়, কম কার্বন ডাই– অক্সাইড গ্রহণ।

আর্দ্রতা এবং লবণাক্ততা

সেচের পানিতে অতিরিক্ত লবণ থাকলে উদ্ভিদে দ্রুত পানি ঘাটতি দেখা দেয়। মূলের চারপাশে লবণাক্ততা বাড়ার সাথে সাথে উদ্ভিদ কোষ অসমোটিক পটেনশিয়াল সমন্বয়সাধন (adjustment) করে।

অসমোটিক পটেনশিয়াল বাড়ার একটি প্রভাব হলো হাইড্রোলিক পরিবাহকতা (hydraulic conductivity) কমে যাওয়া অর্থাৎ মূলে পানি প্রবেশ্যতা কমে যাওয়া। এর অর্থ হলো অসমোটিকালি সমন্বয়সাধনকারী উদ্ভিদে পানি ঘাটতি ঘটে, কারণ যে হারে পাতায় পানি সরবরাহ হয়, তার চেয়ে বেশি প্রস্বেদন হয়। কম আর্দ্রতার তুলনায় যেসব এলাকায় বায়ুর আর্দ্রতা বেশি, সেখানকার উদ্ভিদ অধিক লবণাক্ত পানির সেচ সহ্য করতে পারে।

উচ্চ আর্দ্রতার প্রভাব

বায়ুর আর্দ্রতা খুব বেশি হলে উদ্ভিদের কতকগুলো শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে। এরকম একটি হলো তাপজনিত ক্ষতি। আদ্রতা বাড়ার সাথে সাথে প্রস্বেদন কমতে থাকে, এক্ষেত্রে উদ্ভিদ থেকে তাপশক্তি স্থানান্তরের পদ্ধতি হলো পরিবহণ (conduction) এবং পরিচলন (convection)।

পাতার উপর দিয়ে বায়ু চলাচলের উপর পরিবহণজনিত তাপ স্থানান্তরের কার্যকারিতা নির্ভরশীল। যদি শস্যের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুর আদ্রতা বেশি কিন্তু গতিবেগ খুবই মন্থর হয়, তাহলে পাতার তাপজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি হয়।

উচ্চ আদ্রতার আরেকটি ক্ষতিকারক প্রভাব বায়ুদূষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেহেতু উচ্চ আদ্রতায় পত্ররন্ধ্রের রন্ধ্র খুব বেশি বড় থাকে, সেহেতু উদ্ভিদে বায়ুদূষণজনিত ক্ষতি বেশি হয়। যেসব এলাকায় বায়ুতে ক্ষতিকারক মাত্রায় বায়ুদূষণকারী পদার্থ আছে, সেসব এলাকায় সামান্য পানি ঘাটতির প্রভাব মঙ্গলজনক।

উচ্চ আর্দ্রতায় প্রস্বেদন কম হওয়ায় উদ্ভিদে পানির মাস প্রবাহ ও কম হয় এবং এর জন্য পাতায় মৌল উপাদানের সরবরাহ হ্রাস পায়। একটি পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, বিশেষ করে ক্যালসিয়ামের সরবরাহ হ্রাস পায় এবং কতকগুলো ফলজাতীয় উদ্ভিদের, যেমন টমেটো এবং আপেলে ক্যালসিয়াম ঘাটতির জন্য ফলে শারীরবৃত্তীয় গোলযোগ দেখা যায়।

কতকগুলো উদ্ভিদ হরমোন, যেমন জিবারেলিন এবং সাইটোকাইনিন মূলে সংশ্লেষিত হয় এবং মাস প্রবাহের মাধ্যমে এগুলো পাতায় পৌছায়। তাই উচ্চ আর্দ্রতায় মাস প্রবাহ কম হওয়ায় পাতায় এসকল হরমোনের সরবরাহ কমে যায়। উচ্চ আদ্রতায় জন্মানো উদ্ভিদের কাণ্ডে অস্থানিক মূল হওয়া এবং অঙ্গজ পর্বের পূর্ণতা বৃদ্ধি নির্দেশ করে যে, এ সকল উদ্ভিদে হরমোনের অসমতা হয়, যা ঘটে মূল থেকে পাতায় অল্প পরিমাণে হরমোন স্থানান্তরের জন্য।

বায়ুপ্রবাহ (Wind)

উদ্ভিদের উপর বায়ুপ্রবাহের প্রভাব বিভিন্ন রকমের। এটি উদ্ভিদ ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বিনিময় প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, এবং তাপশক্তি, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং পানির ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে। সম্পূর্ণ উদ্ভিদ কিংবা উদ্ভিদের কিছু অংশ ভেঙে যায় এবং ভূমিক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে। প্রবল বাতাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে উদ্ভিদের বাহ্যিক গঠন এবং অন্তর্গঠনের পরিবর্তন হয়, মরুজ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, পাতার পুরুত্ব বেড়ে যায়, পরিবহণ কলাগুচ্ছের পরিমাণ বেড়ে যায়, পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা ও আকারের পরিবর্তন হয় এবং মূল ও বিটপ অনুপাত বেড়ে যায়।

মুক্ত বায়ুমণ্ডলে বায়ুপ্রবাহ এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ মিটার পর্যন্ত উপরে পৃষ্ঠ বায়ুপ্রবাহের পার্থক্য করা প্রয়োজন। প্রথমটি প্রধানত প্রভাবিত হয় বায়ুর চাপের বিস্তার দ্বারা, অপরপক্ষে, পৃষ্ঠ বায়ুপ্রবাহ প্রভাবিত হয় কয়েক কিলোমিটার বিস্তৃত ল্যান্ডস্কেপ দ্বারা। শস্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে উদ্ভিদের পাতার আচ্ছাদনের জন্য বায়ুপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং ভূপৃষ্ঠের সন্নিকটে বায়ুপ্রবাহের গতি শূন্যের কাছে চলে আসে।

বিউফোর্ট স্কেল (Beaufort scale) থেকে ভূপৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহের মানের একটি ধারণা পাওয়া যায় (সারণি ৭)।

সারণি ৩.৫ : বিউফোর্ট স্কেল

বিউ-ফোর্ট সংখ্যা	বর্ণনা	খোলা সমতল মাঠের ১০ মিটার উপরে বায়ুর গতি				দৃশ্যমান নিদর্শন যার সাহায্যে বায়ুর গতি নির্ণয় করা হয়
		নটস (knots)	মিটার/সেকেন্ড	কিলোমিটার/ঘণ্টা	মাইল/ঘণ্টা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০	শান্ত (calm)	<১	০–০.২	<১	<১	ধোঁয়া খাড়াভাবে উপরে ওঠে
১	হাল্কা বায়ু (Light air)	১–৩	০.৩–১.৫	১–৫	১–৩	ধোঁয়ার গতি বায়ুপ্রবাহের দিক নির্দেশ করে, বায়ুমান যন্ত্র সঞ্চালিত হয় না।
২	ঈষৎ মৃদুমন্দ বায়ু (Light breeze)	৪–৬	১.৬–৩.৩	৬–১১	৪–৭	মুখমণ্ডলে বাতাস অনুভূত হয়, পাতার মর্মর শব্দ হয়, সাধারণ বায়ুমান যন্ত্র সঞ্চালন হয়।
৩	মৃদুমন্দ বায়ু (Gentle breeze)	৭–১০	৩.৪–৫.৪	১২–১৯	৮–১২	পাতা এবং ছোট ছোট ডালপালার নিয়মিত সঞ্চালন হয়, হাল্কা পতাকা উড়তে থাকে।
৪	মধ্যম মৃদুমন্দ বায়ু (Moderate breeze)	১১–১৬	৫.৫–৭.৯	২০–২৮	১৩–১৮	ধুলোবালি ও ছেঁড়া কাগজপত্র উড়তে থাকে, এবং ছোট ছোট ডালপালার সঞ্চালন হয়
৫	সতেজ বায়ু (Fresh breeze)	১৭–২১	৮.০–১০.৭	২৯–৩৮	১৯–২৪	ছোট ছোট গাছপালা আন্দোলিত হয়, এবং জলাশয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।
৬	জোর মৃদুমন্দ বায়ু (Strong breeze)	২২–২৭	১০.৮–১৩.৮	৩৯–৪৯	২৫–৩১	বড় বড় ডালপালার সঞ্চালন হয়, টেলিগ্রাফের তারে শন শন শব্দ হয়, ছাতা ব্যবহার করাও খুব মুশকিল হয়।
৭	মাঝামাঝি রকমের ঝড়ের কাছকাছি (Near gale)	২৮–৩৩	১৩.৯–১৭.১	৫০–৬১	৩২–৩৮	সম্পূর্ণ গাছ আন্দোলিত হয়, বাতাসের বিরুদ্ধে হাঁটতে খুব কষ্ট হয়।
৮	মাঝামাঝি রকমের ঝড় (Gale)	৩৪–৪০	১৭.২–২০.৭	৬২–৭৪	৩৯–৪৬	ছোট ছোট ডালপালা ভেঙ্গে যায়, হাঁটতে খুব কষ্ট হয়
৯	প্রবল মাঝামাঝি রকমের ঝড় (Strong gale)	৪১–৪৭	২০.৮–২৪.৪	৭৫–৮৮	৪৭–৫৪	ঘর-বাড়ির কিছু কিছু ক্ষতি হয়।
১০	ঝড় (Storm)	৪৮–৫৫	২৪.৫–২৮.৪	৮৯–১০২	৫৫–৬৩	স্থলভাগে কদাচিৎ ঘটে, গাছপালা উপড়ে যায়।
১১	ভয়ঙ্কর ঝড় (Violent storm)	৫৬–৬৩	২৮.৫–৩২.৬	১০৩–১১৭	৬৪–৭২	স্থলভাগে কদাচিৎ ঘটে, ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়।
১২	হারিকেন (Hurricane)	>৬৪	>৩২.৭	>১১৮	>৭৩	খুব কদাচিৎ ঘটে, জনমানব, ঘরবাড়ি এবং গাছপালার ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়।

অন্যান্য ফ্লুইডের মতো বায়ুর প্রবাহ দু'রকমের হতে পারে : (১) ল্যামিনার (laminer) হলে প্রবাহের লাইনগুলো সমান্তরাল এবং সুবিন্যস্ত থাকে। অপরদিকে, (২) টারবুলেন্ট (turbulent) হলে প্রবাহের লাইনগুলো বিশৃঙ্খল এবং প্রতিটি লাইনের প্রবাহের দিক গড় প্রবাহ থেকে পৃথক হয়। মসৃণ এবং সমতল পৃষ্ঠদেশ বরাবর ল্যামিনার এবং টারবুলেন্ট প্রবাহের অবস্থান্তর প্রাপ্ত (transition) পরিলক্ষিত হয়। ঘর্ষণজনিত কারণে পৃষ্ঠদেশ বরাবর বায়ুপ্রবাহের গতি হ্রাস পায়। পৃষ্ঠদেশ বরাবর বায়ুপ্রবাহের গতিবেগের প্রোফাইল থাকে এবং পৃষ্ঠদেশে গতিবেগ শূন্য। হ্রাসকৃত গতিবেগ অঞ্চলকে বলা হয় বাউন্ডারি স্তর। পাতা এবং পারিপার্শ্বিক বায়ুর মধ্যে গ্যাস এবং তাপশক্তির ব্যাপনে এই স্তরের প্রকৃতি এবং পুরুত্বের যথেষ্ট ভূমিকা আছে। বায়ুপ্রবাহের বেগ কম হলে, বাউন্ডারি স্তরের পুরুত্ব বেশি হয়, এবং ব্যাপনের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানির অণুকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। অপরপক্ষে, বায়ুপ্রবাহের বেগ বেশি হলে বাউন্ডারি স্তরের পুরুত্ব হ্রাস পায়, ব্যাপনের পথ কমে যায়, ফলে ব্যাপনের হার বেড়ে যায়। পৃষ্ঠদেশের নিকটে বায়ুপ্রবাহ টারবুলেন্ট হলে ব্যাপনের হার আরও বেড়ে যায়। ব্যাপনের উপর সরাসরি প্রভাব ছাড়াও, বায়ুপ্রবাহ পৃষ্ঠ দেশে অবস্থানরত ক্ষতিকারক অণুজীব এবং কীটপতঙ্গের শারীরবৃত্তকে প্রভাবিত করে এবং এদের বিসরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

পাতার বাউন্ডারি স্তর

বাউন্ডারি স্তরের ভিতর দিয়ে ব্যাপনের মাধ্যমে উদ্ভিদের পাতা এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তাপ এবং ভরের (mass) বিনিময় হয়। যখন বহমান বায়ুতে এটি ঘটে তখন তাকে কৃত্রিম পরিচলন (forced convection) এবং প্রায় শান্ত বায়ুতে ঘটলে প্রাকৃতিক পরিচলন (natural convection) বলে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে পত্রপৃষ্ঠ উষ্ণ অথবা শীতল হওয়ার ফলে বায়ু চলাচল করে এবং পারিপার্শ্বিক বায়ুর ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের জন্য উষ্ণ বায়ু উপরে ওঠে এবং শীতল বায়ু নিচে নেমে আসে।

কৃত্রিম পরিচলনে, একটি মসৃণ সমতল প্লেটের চারদিকে প্রথমেই ল্যামিনার বাউন্ডারি স্তর তৈরি করে এবং এক্ষেত্রে প্রবাহের লাইনগুলো পরস্পরের সাথে সমান্তরাল। এই লাইন বরাবর গ্যাস এবং তাপশক্তি স্থানান্তরের কৌশল হলো আণবিক ব্যাপন। এই মসৃণ প্রবাহ ভেঙে বিশৃঙ্খল চলন হওয়ার প্রবণতাকে Reynolds সংখ্যা (Re) দ্বারা প্রকাশ করা যায় :

$$Re = \frac{ul}{v} \quad \text{.....................} \quad (৩.৪)$$

এখানে u হলো বায়ুপ্রবাহের বেগ, l হলো পৃষ্ঠদেশ বরাবর ফ্লুইড যে দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেছে এবং v হলো ফ্লুইডের কাইনেমেটিক ভিসকোসিটি (kinematic viscosity)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাতার উপর (Reynolds সংখ্যা ০-১০^{8}, অপরপক্ষে মসৃণ বায়ুপ্রবাহকে বিশৃঙ্খল প্রবাহ করতে সাধারণত এই মান ১০^{৫}।

তবে প্রকৃতিতে অধিকাংশ সময়ই পাতার উপর দিয়ে টারবুলেন্ট বায়ুপ্রবাহ হয় এবং কদাচিৎ পাতা মসৃণ এবং সমতল। পাতার গঠন, যেমন সুস্পষ্ট শিরা এবং খাঁজ কাটা কিনারা বায়ুপ্রবাহের বাধার সৃষ্টি করে এবং খুব কম Reynolds সংখ্যায় টারবুলেন্স হয়। এমন কি টারবুলেন্ট বাউন্ডারি সত্ত্বেও, পৃষ্ঠদেশের উপরেই একটি অঞ্চল (এক মিলিমিটারের কম পুরু) দেখা যায় এবং এখানে পৃষ্ঠদেশের সাথে বায়ুর লেগে থাকার প্রবণতা টারবুলেন্সকে বাধাগ্রস্ত করে। এই অঞ্চলকে ভিসকাস সাবলেয়ার (viscous sublayer) বা ল্যামিনার সাবলেয়ার বলে।

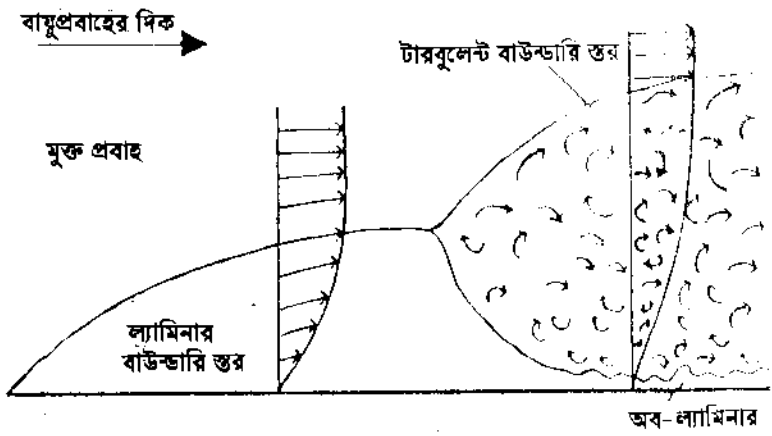

চিত্র ৩.৯ : একটি মসৃণ সমতল প্লেটের উপর দিয়ে বায়ুপ্রবাহ এবং ল্যামিনার থেকে টারবুলেন্ট প্রবাহের স্থানান্তর।

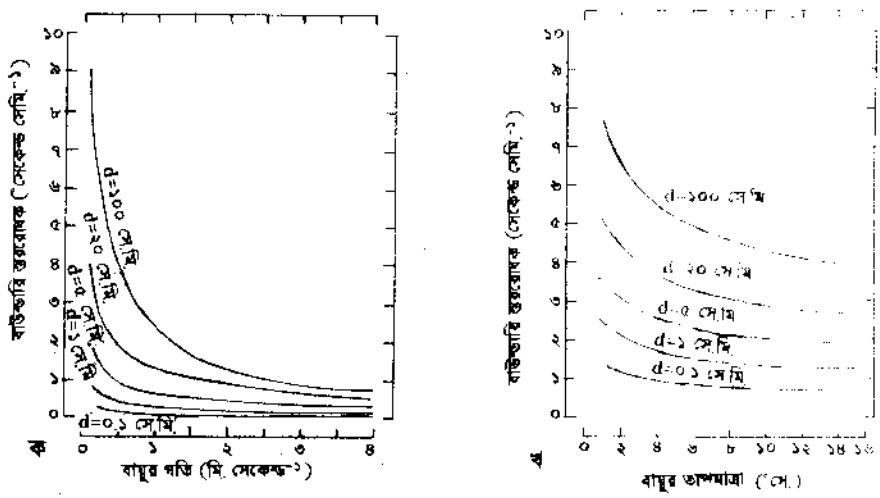

চিত্র ৩.১০ : বিভিন্ন আকৃতির (আ =০.১-১০০ সেন্টিমিটার) পাতার জলীয় বাষ্প প্রবাহের উপর বাউন্ডারি স্তর রোধক। (ক) বায়ুর গতিবেগের সাথে কৃত্রিম পরিচলন রোধক এবং (খ) পাতা ও বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার পার্থক্যের সাথে প্রাকৃতিক পরিচলনের রোধক।

বাউন্ডারি স্তরের গড় পুরুত্ব পাতার আকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ছোট পাতার বাউন্ডারি স্তর হাল্কা (thin) যার বাউন্ডারি স্তরের রোধকও কম এবং এদের তাপমাত্রা কখনোই পারিপার্শ্ব তাপমাত্রা থেকে খুব বেশি হয় না। বড় পাতার বাউন্ডারি স্তর পুরু এবং সেই সাথে বাউন্ডারি স্তরের রোধক বেশি এবং পারিপার্শ্বের তুলনায় এই পাতার তাপমাত্রার পার্থক্য বেশি। বায়ুর বেগ বেশি হলে বাউন্ডারি স্তর হাল্কা এবং কম হলে বাউন্ডারি স্তর পুরু হয় এবং রোধকের মাত্রা কম কিংবা বেশি হয়। সুতরাং বাউন্ডারি স্তর রোধকের প্রধান নিয়ামক পাতার আকার এবং বায়ুর বেগ এবং টারবুলেন্সকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে পাতার আকৃতির গৌণ প্রভাব আছে। ৩.১০ নং চিত্রে বিভিন্ন আকৃতির গৌণ প্রভাব আছে। ৩.১০ নং চিত্রে বিভিন্ন আকৃতির পাতার জলীয় বাষ্প ফ্লাক্সের জন্য বাউন্ডারি স্তর রোধক দেখানো হয়েছে।

ক্যানোপির অভ্যন্তরে বায়ুপ্রবাহ

শস্যের বৃদ্ধির হারের মডেল তৈরির জন্য উদ্ভিদ ক্যানোপির বিভিন্ন প্রোফাইলের বায়ুর বেগ জানা দরকার এবং বিভিন্ন প্রোফাইলের সালোকসংশ্লেষণের হার নির্ণয়ের জন্য এই তথ্য ব্যবহার করা হয়। একক পাতা ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বিনিময় প্রক্রিয়ার ফলাফল সমগ্র শস্যের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য এই তথ্যের প্রয়োজন। যদিও উদ্ভিদ ক্যানোপির অভ্যন্তরে বায়ুর গড় বেগ নির্ণয় এবং সাধারণ আশ্রয় ফালির প্রভাব দেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ, তথাপিও এই ফলাফলের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট নয়। এর সহজ কারণ হলো মাঠ পর্যায়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থায় বায়ুর বেগ, যা কেবল সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল নয়, শস্যের কাণ্ড ও পাতার অসমান বিন্যাসের জন্য স্থানিক (place) পরিবর্তন হয়, পরিমাপ করা খুব কঠিন। এ অসুবিধা সত্ত্বেও অনেক শস্যের ক্যানোপির প্রোফাইলে গড় বায়ুর বেগ নির্ণয় করা হয়েছে। সব শস্যের পত্র ক্ষেত্রফল সূচক (LAI) বাড়ার সাথে সাথে বায়ুর বেগ হ্রাস পায় এবং ক্যানোপির নিম্নাংশে প্রায় শূন্য হয় (চিত্র ৩.১১)।

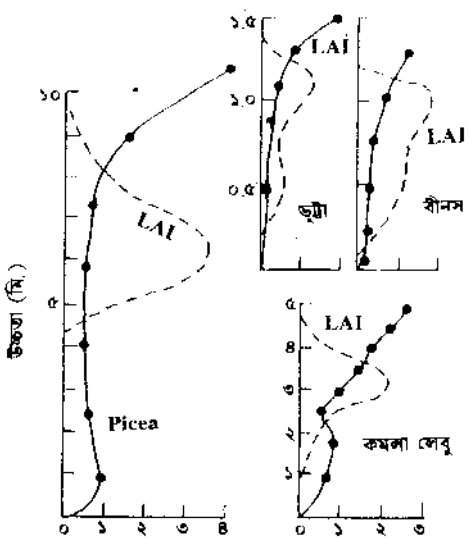

চিত্র ৩.১১ : পত্র ক্ষেত্রফল সূচকের (LAI) (........) সাথে শস্যের অভ্যন্তরে বায়ুর বেগের (●) প্রোফাইল।

বায়ুপ্রবাহের প্রভাব

প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ দ্বারা বাহিত বালিকণা, তুষারকণা প্রভৃতি পাতা, কাণ্ড ও মুকুলের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। প্রবল বেগে প্রবাহিত ঝড়ে উদ্ভিদের ডালপালা ভেঙে যায় এবং শাখা প্রশাখা খুব শক্ত হলে সম্পূর্ণ উদ্ভিদটি মূলোৎপাটিত হতে পারে। প্রবল বায়ুতে খাদ্যশস্য উদ্ভিদ হেলে পড়ে এবং মৃত্তিকায় শায়িত হয়, একে লজিং (lodging) বলে। বায়ুর সাথে বৃষ্টিপাত বেশি হলে লজিং ত্বরান্বিত হয়। কৃষিজ এবং বনজ উভয় শস্যের ক্ষেত্রেই লজিং ক্ষতিকারক, তবে অনেক কৃষিজ শস্য, যেমন ঘাস পুনরায় আংশিকভাবে দাঁড়ায় এবং বৃদ্ধি চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বনজ শস্যের ক্ষেত্রে এটি হয় না এবং পতিত বৃক্ষকে অপরিণত অবস্থায় কষ্ট করে সরিয়ে ফেলতে হয়। বিউফোর্ট স্কেল অনুযায়ী যখন ১০ মিটার উচ্চতায় বায়ুর গড় বেগ প্রতি সেকেন্ডে ২৮.৫ মিটারের বেশি হয়, তখন বৃক্ষের মূলোৎপাটন হয়। আদর্শ উদ্ভিদ প্রকরণ উদ্ভাবনে লজিং সহনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং উদ্ভিদ প্রজননের মাধ্যমে ভ্যারাইটি বাছাইয়ের সময় এটি বিবেচনা করা হয়। শস্যের উপর ccc(2-chioroethyl trimethyl ammonium chloride) ছিটিয়ে দিলে লজিং নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটি কাণ্ডের পর্বমধ্যের (internode) বৃদ্ধি কমিয়ে দেয় এবং কাণ্ডের বাইরের কোষ প্রাচীরের পুরুত্ব বৃদ্ধি করে। শস্যের মূলমন্ত্র সবল হলেও লজিং কম হয়।

দীর্ঘদিন প্রবল বাতাস প্রবাহিত হলে শস্যের কাণ্ডের দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় এবং পরোক্ষভাবে পাতার ক্যানোপির গঠনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সালোকসংশ্লেষণ কম কার্যকর হয়। উপরন্তু, বায়ুপ্রবাহ কাণ্ডের বক্র হওয়ার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে যা পরবর্তীতে ঝড়ের হাত থেকে উদ্ভিদকে রক্ষা করে।

প্রচণ্ড বায়ুতে উদ্ভিদের পাতা ও ডালপালা ভেঙে নষ্ট হয়। তবে নিম্ন বায়ুপ্রবাহের প্রভাব সামান্য হলেও, দীর্ঘসময় এটি স্থায়ী হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর। শস্যের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু প্রস্বেদনের মাধ্যমে শস্য থেকে জলীয় বাষ্প নির্গত হওয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে ও শুষ্ক এলাকায় পানি ঘাটতিকে ত্বরান্বিত করে। এরপর পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং গ্যাসীয় পদার্থের বিনিময় হ্রাস পাওয়ায় শস্যের সালোকসংশ্লেষণ এবং বৃদ্ধির হার কমে যায়। পাতার শীতলীকরণেও বায়ুপ্রবাহের ভূমিকা আছে এবং এর জন্য সালোকসংশ্লেষণের হার আরও কমে যায়।

শস্যের ফলনের উপর বায়ুপ্রবাহের প্রভাব নির্ণয় করা খুব কঠিন, কিন্তু অনাবৃত এবং বায়ুপ্রবাহ রোধক (wind break) শস্যের মধ্যে তুলনা করে ফলন হ্রাসের মাত্রার ধারণা পাওয়া যায়। দানাশস্যের ক্ষেত্রে আশ্রয় ফালি (shelter belt) ব্যবহার করে শতকরা ১৫ ভাগ থেকে [illegible] ভাগ ফলন বেশি পাওয়া যায়। সুগারবিট, গোল আলু এবং সয়াবিনের ক্ষেত্রে এই মান যথাক্রমে শতকরা ১ থেকে ২৩, ১১ থেকে ৫০ এবং ৪ থেকে ২২ ভাগ (Grace, 1977)। বায়ুপ্রবাহের বেগের পরিবর্তন এবং আশ্রয় ফালি থেকে দূরত্বের প্রভাবের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট মান পাওয়া যায় না, তবে এটি সুনিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, আশ্রয় ফালি ব্যবহার করে উন্মুক্ত এলাকায় শস্যের ফলন বৃদ্ধি করা যায়।

দীর্ঘস্থায়ী বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে উদ্ভিদের বহিঃঅঙ্গসংস্থানিক এবং অন্তঃঅঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তন হয়: পাতার সংখ্যা কমে যায়, পাতা কুঁচকিয়ে যায় এবং পাতার সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয় না। বায়ুপ্রবাহ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতি একক ক্ষেত্রফল পাতায় পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরিবহন কলাগুচ্ছ ক্ষুদ্রাকার হয় এবং সংখ্যা হ্রাস পায়। পাতা এবং কিউটিকলের পুরুত্ব বেড়ে যায় এবং বিটপ ঃ মূল অনুপাত বেড়ে যায়।

শুষ্ক মৌসুমে প্রবল বায়ুতে মৃত্তিকার উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। [illegible] বালুকাময় মৃত্তিকার এবং অধিক পরিমাণে জৈব পদার্থযুক্ত মৃত্তিকার ক্ষয় এবং বীজ ও চারাগাছের ক্ষতি বেশি

হয়। এসব এলাকায় মৃত্তিকা ও শস্যকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার দরকার হয়। বীজ বপনের পর চারাগাছের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মৃত্তিকার পৃষ্ঠ সুস্থির করার জন্য নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে চারাগাছ রক্ষার জন্য দুটি সারির মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত বর্ধনশীল শস্য জন্মানো যায়। প্রধান শস্যের প্রতিষ্ঠার পর এই শস্য সরিয়ে ফেলা হয়। দুই সারির মধ্যবর্তীস্থানে খড়–বিচালী ছিটিয়ে দিলেও একই উদ্দেশ্য সাধন হয়।

আশ্রয় ফালি (Shelter belt)

উন্মুক্ত এলাকায় প্রবল বায়ুপ্রবাহ থেকে শস্যকে রক্ষা করার জন্য প্রধান বায়ুপ্রবাহের সমকোণে রোপিত (সাধারণত ১৫ থেকে ৬০ মিটার প্রশস্ত ও প্রয়োজন অনুযায়ী দীর্ঘ) এক ফালি শাখা–প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষকে বায়ুপ্রবাহ রোধক (wind break) বলে। আর যে এক ফালি ভূখণ্ডের উপর বায়ুপ্রবাহ রোধকল্পে বৃক্ষ রোপণ করা হয়, সেই ভূখণ্ডকে আশ্রয় ফালি বলে। শস্য এবং গবাদিপশুকে প্রবল বাতাস থেকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয় ফালির ব্যবহার প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই চলে আসছে। বৃক্ষের প্রাকৃতিক ফালি অথবা কাঠের পাটাতনের কৃত্রিম পর্দা কিংবা প্লাস্টিকের জাল প্রবল বাতাসকে প্রশমিত করতে পারে এবং এর জন্য শস্যের বৃদ্ধি ও ফলনের যথেষ্ট উন্নতি হয়, বিশেষ করে যেসব এলাকায় পানি ঘাটতি দেখা যায়। শস্যের উপর সরাসরি প্রভাব ছাড়াও, শীতকালে আশ্রয় ফালি বরফ সংগ্রহ করে মৃত্তিকায় পানির বিস্তারকে উন্নত করে, বরফ–গলা পানি অধিকতর সমরূপে বণ্টন হয়।

আশ্রয় ফালি বা বায়ুরোধকের ভিতর দিয়ে যদি বাতাস আংশিক প্রবেশ করতে পারে, তাহলে অধিকতর কার্যকর হয়। তাই কঠিন আশ্রয় ফালির (যেমন– দেয়াল) তুলনায় বৃক্ষের আশ্রয় ফালি অধিকতর কার্যকর।

বায়ুরোধকের জন্য ম্যাক্রোক্লাইমেটের কিছু পরিবর্তন হয়। উত্তর–দক্ষিণমুখী আশ্রয় ফালিতে সৌরবিকিরণ সামান্য প্রভাবিত হয়, কারণ সকালে অথবা বিকেলে যে ছায়া হয়, আশ্রয় ফালি থেকে অধিকতর প্রতিফলনের জন্য তা আংশিক পূরণ হয়। তবে পূর্ব–পশ্চিমমুখী আশ্রয় ফালি উত্তর দিকে (উত্তর গোলার্ধে) প্রাত্যহিক নিট সৌরবিকিরণ শোষণ হ্রাস করে, এই প্রভাব নির্ভর করে আশ্রয় ফালির উচ্চতা এবং সৌর উচ্চতার উপর (এটি আবার নির্ভর করে অক্ষাংশে এবং বছরের সময়ের উপর)।

আশ্রয় ফালির পেছনে টারবুলেন্ট স্থানান্তরের হার অনেকাংশে কমে যায়। আপতিত সৌরশক্তি অতি সহজে দূরীভূত হয় না বলে দিনের বেলায় বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। উপযুক্ত শক্তি সমতা সমীকরণের জটিলতার কারণে বায়ুর আর্দ্রতা এবং ক্যানোপির বাষ্পীভবনের উপর আশ্রয় ফালির প্রভাব সাধারণভাবে জানা কঠিন। তবে এটি সাধারণত দেখা যায় যে, আশ্রয় ফালির পেছনে ক্যানোপি বাউন্ডারি স্তর রোধক বৃদ্ধি পাওয়ায় জলীয় বাষ্পের দূরীকরণের হার কমে যায়, এজন্য জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং শস্যের প্রস্বেদন কমে যায়। এই হ্রাসকৃত প্রস্বেদনের জন্য সাধারণত পাতার পানির পটেনশিয়াল বেড়ে যায়। রাতে অবশ্য তাপমাত্রার উপর আশ্রয় ফালির প্রভাব বিপরীত।

ছায়াপ্রদান ছাড়াও আশ্রয় ফালির উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে পানি ও মৌল উপাদান পরিশোষণ করে বলে ক্ষতিকারক। এ কারণে নাইট্রোজেন সংবদ্ধনকারী প্রজাতিকে আশ্রয় ফালিতে ব্যবহার করা উচিৎ। আরেকটি সমস্যা হলো আশ্রয় ফালি, পাখি ও ক্ষতিকারক পোকামাকড় এবং রোগের আশ্রয়স্থল হতে পারে। তা সত্ত্বেও আশ্রয় ফালির জন্য অবশ্য শস্যের ফলন বৃদ্ধি পায়। Grace (1977) অনেক এলাকায় এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি নিয়ে ৬০টিরও বেশি পরীক্ষণ পর্যালোচনা

করেছেন। এসকল পরীক্ষণে আশ্রয় ফালির জন্য ফলনের গড় বৃদ্ধি ছিল শতকরা ২৫ ভাগ এবং এক-চতুর্থাংশের কম ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগের কম ফলন পাওয়া গেছে। সাধারণত অধিক তাপমাত্রা অথবা কম বাষ্পীভবনের জন্য পাতার পানির পরিমাণ বৃদ্ধি হানি ও কারণে ফলনের উন্নতি হয়। পত্ররন্ধ্রীয় পরিবাহকতা বেশি হয় এবং সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি পায়। আশ্রয় ফালির আরেকটি উপকারী প্রভাব হলো বায়ুজনিত ক্ষয় থেকে মৃত্তিকাকে রক্ষা করা।

বৃষ্টিপাত (Rainfall)

পরিমিত পানি সরবরাহের উপর শস্যের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফলন সরাসরিভাবে নির্ভরশীল। এই পরিমিত পানির প্রাপ্যতা বিভিন্ন এলাকায় এবং বিভিন্ন ঋতুতে শস্য বণ্টনে তাপমাত্রার চেয়েও অধিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শস্যের বর্ধনশীল পর্যায়ে এদের সজীব ওজনের শতকরা ৮০ থেকে ৯৫ ভাগ পানি থাকে। পূর্ণতাপ্রাপ্তির সময় দানাশস্যে সাধারণত অধিকাংশ পানি হারায় এবং তা কমে শতকরা ৫ থেকে ৩০ ভাগে দাঁড়ায়। উপরন্তু, প্রস্বেদনের মাধ্যমে উদ্ভিদ থেকে অনবরত পানি বের হয়ে যায় যা মূলতন্ত্র মৃত্তিকা থেকে পরিশোষণ করে পূরণ করে। পূর্ণ সূর্যালোকে এক হেক্টর উদ্ভিদরাজি (vegetation) গ্রীষ্মকালে দিনে প্রায় ২৫ টন পানি ত্যাগ করে। এর জন্য দশ দিন পর পর ২৫ মিলিমিটার পানি সেচের প্রয়োজন।

বেঁচে থাকার জন্যই উদ্ভিদে অব্যাহত পানি চলাচল প্রয়োজন। প্রস্বেদন টান মৃত্তিকা থেকে পরিশোষিত খনিজ যৌগ পরিবহণ করে বিটপের প্রয়োজনীয় স্থানে পৌঁছাতে সহায়তা করে। পানি প্রবাহের মাধ্যমে পাতায় উৎপাদিত খাদ্য উদ্ভিদের বর্ধনশীল এবং সঞ্চয়ী অঙ্গে পরিবাহিত হয়।

অ-কাষ্ঠল (non-woody) উদ্ভিদে পানি যান্ত্রিক সামর্থ যোগায়। পানি শোষণের ফলে কোষের রসস্ফীতিত্ব (turgidity) বেড়ে যায় এবং এটি উদ্ভিদে দৃঢ়তা প্রদান করে। তবে কোষ থেকে অতিরিক্ত পানি বেরিয়ে গেলে কোষ রসস্ফীতিত্ব হারায় এবং উদ্ভিদটি মিইয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময় ধরে পানি ঘাটতি হলে, স্থায়ীভাবে মিইয়ে পড়ার জন্য উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে।

পানির অভাবে শস্য উদ্ভিদের নানা প্রকার শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সাড়া দেয়। কোষ বৃদ্ধি, কোষ প্রাচীর ও প্রোটিন সংশ্লেষণ পানি স্বল্পতায় খুব সংবেদনশীল এবং এগুলো বিরূপভাবে প্রভাবিত হয়। পানি ঘাটতির জন্য পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের বিনিময়ের হার হ্রাস করে, তাই সালোকসংশ্লেষণও হ্রাস পায়। পানি স্বল্পতায় অ্যাবসিসিক এসিড হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং এর জন্য পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয় এবং পাতা থেকে আরো পানি হ্রাসকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। পানি স্বল্পতার জন্য শ্বসনের হার বেড়ে যায় এবং উদ্ভিদে অধিক পরিমাণে [illegible] হয়।

উপরোক্ত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া প্রভাবিত হওয়ায় পানি স্বল্পতার জন্য শস্যের ফলন কমে যায়। তাই, স্বাভাবিক শস্য উৎপাদনে প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ একান্ত দরকার। শস্যের বৃদ্ধির সব পর্যায়ে পানির দরকার হয় না। কয়েকটি সংকটকালীন পর্যায় আছে যখন পানি ঘাটতি হলে ক্ষতি বেশি হয়। শস্যের প্রতিষ্ঠা (establishment) হলো এমন একটি পর্যায় এবং বসন্তের শেষে অথবা গ্রীষ্মকালে সন্তোষজনক অঙ্কুরোদ্গমের জন্য বীজতলায় পানি সেচের প্রয়োজন। অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায়ে পাতা ও কাণ্ডের বৃদ্ধির জন্য পানি দরকার। [illegible] বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধির জন্য পানি দরকার। [illegible] মূলীয় (root) শস্যের [illegible] জন্য পানির প্রয়োজন আছে।

দানাশস্য ও অন্যান্য বীজ- উৎপাদনকারী শস্যে পানির জন্য [illegible] একটি সংকটকালীন পর্যায় আছে তা হলো পুষ্পায়নের সময়। পর্যাপ্ত পরিমাণে সজীব [illegible] তৈরি [illegible] জন্য

পানি প্রয়োজন, এবং এ সময় পানির স্বল্পতা হলে বীজের সংখ্যা কম হয়। নিষেকের পরে যাতে ক্ষুদাকার এবং কুঁচকানো বীজের উদ্ভব না হয়, সেজন্য বীজের বর্ধনের সময় পর্যাপ্ত পানি দরকার। সে সমস্ত শস্য রসালো ফল এবং অপক্ক বীজের জন্য জন্মানো হয় (যেমন–লতানো মটর), তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পুষ্পায়নের পর পানি সরবরাহ দরকার।

কোনো এলাকায় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের উপাত্ত থেকে পানি সেচ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, কোনো এলাকায় মোট বৃষ্টিপাতের তুলনায় সারা বছরে এর বিস্তার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো শস্যের সংকটকালে যদি বৃষ্টিপাত না হয়, তবে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। শস্য ও মৃত্তিকা থেকে পানি ত্যাগের পরিমাণ নির্ভর করে সৌরবিকিরণ, তাপমাত্রা এবং বায়ুপ্রবাহের উপর এবং দ্রুত বর্ধনশীল শস্যের গ্রীষ্মকালে পানি ঘাটতির পরিমাণ খুব বেশি। কোনো স্থানের পটেনশিয়াল বাষ্পীয় প্রস্বেদন (potential evapotranspiration) এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ জানা থাকলে, সেচের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। আবহাওয়া সম্বন্ধীয় উপাত্ত থেকে মৃত্তিকার পানি ঘাটতির পরিমাণ জানা যায় এবং সেক্ষেত্রে সেচের পানির পরিমাণ আরও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। পানি সরবরাহ পর্যাপ্ত হলে, উচ্চ কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় বর্ধনশীল শস্য প্রতিদিন ২ থেকে ৩ মিলিমিটার পানি ত্যাগ করে। গ্রীষ্মের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে পানি ত্যাগের পরিমাণ ৩ থেকে ৬ মিলিমিটার হতে পারে। এ প্রসঙ্গে মৃত্তিকায় লভ্য পানিকে ধরে রাখার ক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বুনটের মৃত্তিকার পানি ধারণক্ষমতা বিভিন্ন।

বৃষ্টিপাতের উপাত্ত, বাষ্পীয় প্রস্বেদনের মাধ্যমে পানি ত্যাগ এবং শস্যের আচ্ছাদনের পরিমাণ মৃত্তিকায় পানি ঘাটতি নির্ণয়ে সহায়তা করে। শস্যের পানি সেচের পরিমাণ নির্ধারণে এই পানি ঘাটতির মান ব্যবহৃত হয়।

বেশি দিন ধরে মাঠে পানি জমে থাকলে শস্যের ক্ষতি হয়। বৃষ্টিপাত বেশি হলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এটা বিশেষ করে ঘটে ভেজা এলাকায় ভারী বুনটের কর্দম মৃত্তিকায় এবং যেখানে মৃত্তিকার পানির টেবিল অনেকখানি উপরে। এখানে পানি নিষ্কাশন করে শস্যের বৃদ্ধি উন্নতি করা যায়।

শস্যের উপর পানির অন্যান্য প্রভাবও আছে। বৃষ্টিপাত বেশি হলে বায়ুর আর্দ্রতার পরিবর্তন হয় এবং উচ্চ আর্দ্রতায় কতকগুলো উদ্ভিদ রোগের মাত্রা বেড়ে যায়। একটি সুন্দর উদাহরণ হলো গোল আলুর নাবি ধ্বসা রোগ। উচ্চ আর্দ্রতা ও উচ্চ তাপমাত্রায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। সরিষার ডাউনি মিলডিউ রোগ আর্দ্রতা বেশি হলে বেশি হয়। উভয়ক্ষেত্রেই আর্দ্রতা রেণুর অঙ্কুরোদ্গমের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগও ভেজা আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়।

শিশির

রাতে তাপ বিকিরণ করে ভূপৃষ্ঠ শীতল হলে এর সংস্পর্শে বায়ু শীতল হয়। যেহেতু শীতল বায়ু বেশি জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে না, সেহেতু অতিরিক্ত বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃক্ষের পাতা, ঘাসপালা প্রভৃতির উপর শিশিররূপে জমা হয়। শীতকালে ভূপৃষ্ঠ অধিকতর শীতল হয় বলে এসময় শিশির বেশি পরিমাণে দেখা যায়। শীতকালে মৃত্তিকায় পানির অভাব প্রকটভাবে দেখা যায়। শীতকালে মৃত্তিকায় পানির অভাব প্রকটভাবে দেখা দেওয়ায়ে, এই শিশিরপাত মৃত্তিকায় কিছু পরিমাণ পানি সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া যে সমস্ত শস্যের জন্য অধিক শৈত্য দরকার, সে সমস্ত শস্যের জন্য শিশিরপাত খুব প্রয়োজন। কোনো কোনো শস্যের পরাগায়নে শিশির সাহায্য করে।

তুষারপাত

শীতপ্রধান দেশে প্রবল ঠাণ্ডায় দরুণ শিশির বিন্দু জমাট বেঁধে কঠিন হয়। এই জমাটবাঁধা শিশির বিন্দুকে তুষার বলে। এটা শস্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। শীতপ্রধান দেশে অবশ্য তুষারপাত সহ্য করতে পারে শস্যের এমন জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। তুষারপাত-প্রতিরোধী জাতের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এদের অন্তঃকোষীয় বরফ তৈরি বাধাগ্রস্থ হয়, যদিও কোষের বাইরের বরফের জন্য ভৌত ক্ষতির পরিমাণও গুরুত্বপূর্ণ। দ্রবণীয় দ্রব্যের (চিনি, জৈব এসিড, অ্যামাইনো এসিড) জন্য এদের কোষগহবরের এবং সাইটোপ্লাজমের পানি হিমাঙ্ক বিন্দু হ্রাস পায়। তাই, এমন কি হার্ডেনিং (hardening)–এর পূর্বে অধিকাংশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উদ্ভিদকে শূন্য ডিগ্রির নিচে শীতল (–১° থেকে –৫° সেলসিয়াস) করলেও এতে বরফ তৈরি হয় না। লবণাক্ত উদ্ভিদের হিমাঙ্ক বিন্দু হ্রাসের মাত্রা–১৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে (Burke *et al.*, 1976)। তুষারপাত–সহাকারী জাতের অ্যাপোপ্লাস্টে প্রচুর পরিমাণে বরফ জমা থাকলেও এদের কোষ প্রাচীর এবং কোষঝিল্লীর কোনো ক্ষতি হয় না।

কুয়াশা

কখনো কখনো জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হয়ে ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুস্তরে ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ধোঁয়ার আকারে ভাসতে থাকে। একে কুজ্ঝটিকা বলে। এই জলীয় বাষ্প যখন বেশি মাত্রায় ঘণীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি কণার আকারে পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর ভাসতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় কুয়াশা। শান্ত মেঘমুক্ত রাতে কুজ্ঝটিকা ও কুয়াশা বেশি পরিমাণে দেখা যায়।

বায়ুর গ্যাসীয় পদার্থ

বায়বীয় পরিবেশের গ্যাসীয় উপাদানের খুব বেশি পরিবর্তন হয় না। শ্বসনের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন, কিন্তু বায়বীয় পরিবেশে সাধারণত এর ঘাটতি হয় না। কিন্তু জলাবদ্ধতা হলে মৃত্তিকায় অক্সিজেনের ঘাটতি হয় এবং মূলের বৃদ্ধি ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। জলবদ্ধতা দীর্ঘস্থায়ী হলে মূল মরে যায় এবং এক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশন একান্ত প্রয়োজন। অবাত শ্বসনে সৃষ্ট বিষাক্ত পদার্থ (অ্যাসিটালডিহাইড, ইথানল এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড) এবং প্রচুর পরিমাণে ইথিলিন তৈরি হয়ে মূলের ক্ষতি করে। একটি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে, ইথিলিনের মাত্রা ০.১ থেকে ১০ পি পি এম বাড়ার সাথে সাথে যবের মূলের দীর্ঘকরণ হ্রাস পায়।

মাঠ পর্যায়ে সালোকসংশ্লেষণের জন্য কদাচিৎ কার্বন ডাই–অক্সাইড সীমিত হয় এবং সাধারণত শস্যের ক্যানোপিতে পর্যাপ্ত বায়ুপ্রবাহের জন্য সাময়িক কার্বন ডাই–অক্সাইডের ঘাটতি হলেও তা পূরণ হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও গবেষণার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, গম গাছ ৩৫০ এবং ১,০০০ পি পি এম কার্বন ডাই–অক্সাইডে এবং মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত পানি অথবা পানি ঘাটতি অবস্থায় জন্মিয়ে দেখা গেছে যে, উচ্চ মাত্রার কার্বন ডাই–অক্সাইড পানি ঘাটতি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে (Sionit *et al.*, 1980) । অর্থাৎ মৃত্তিকায় পানির ঘাটতি হলে কার্বন ডাই–অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি করে শস্যের ফলনের উন্নতি সম্ভব। Ford এবং Thorne (1967) –এর পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, ৩০০ পি পি এম–এর তুলনায় ১,০০০ পি পি এম–এ C_3 এবং C_4 উভয় প্রকার উদ্ভিদেই সালোকসংশ্লেষণের হার বেড়ে যায় এবং উচ্চ এবং নিম্ন আলোকে এই বৃদ্ধির শতকরা হার প্রায় একই রকম।

উচ্চ মাত্রার কার্বন ডাই-অক্সাইডে উদ্ভিদের অঙ্গজ বৃদ্ধি, পুষ্পায়ন, বীজ ও ফলের বৃদ্ধি, আর্সসমিলেটের বণ্টন, অর্বুদ (nodule) তৈরি এবং সিম্বায়োটিক নাইট্রোজের সংবন্ধন প্রভাবিত হয়। বর্ধিত নিট সালোকসংশ্লেষণে জন্য বেশি পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট তৈরি হওয়ায় এই পরিবর্তন ঘটে।

উচ্চ মাত্রার কার্বন ডাই-অক্সাইডে পত্ররন্ধ্র আংশিক বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, কিন্তু বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রাপ্তির জন্য সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি থাকায় বায়ুদূষণ থেকে উদ্ভিদ রক্ষা পায়। বেশি মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইডে জন্মানো আলফালফা উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড এবং সালফার ডাই-অক্সাইডজনিত ক্ষতি কম হয়। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্ভিদের কিছু সুবিধা হয়েছে সত্য, কিন্তু পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে নানা সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে।

গ্যাসীয় বায়ুদূষক

বায়ুমণ্ডলে শস্যের জন্য ক্ষতিকারক দূষণকারী গ্যাসের মধ্যে সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), নাইট্রোজেনের অক্সাইডস (NO_x), ওজোন (O_3) এবং ফ্লোরাইড (F) প্রধান। এদের মধ্যে সালফার ডাই-অক্সাইড, ওজোন এবং ফ্লোরাইড শস্যের ক্ষতি করার মতো যথেষ্ট মাত্রায় থাকে। অপরপক্ষে, নাইট্রোজেনের অক্সাইড সাধারণত ক্ষতিকারক মাত্রায় থাকে না, কিন্তু এটি ওজোন তৈরির অগ্রবর্তী পদার্থ হিসেবে কাজ করে এবং এর উপস্থিতিতে শস্য সালফার ডাই-অক্সাইডে অধিকতর সংবেদনশীল হয়। বিভিন্ন শস্য উদ্ভিদের মধ্যে শুধু যে, বিভিন্ন দূষণকারী গ্যাসে সংবেদনশীলতায় ভিন্নতা দেখা যায় তাই নয়, পরিবেশীয় উপাদান, যেমন- আলোর প্রখরতা, বায়ুপ্রবাহের গতি এবং তাপমাত্রা দ্বারা এই সংবেদনশীলতা প্রভাবিত হয়। আবার একই প্রজাতির বিভিন্ন জাতের মধ্যে সংবেদনশীলতার ভিন্নতা দেখা যায়। তাই উদ্ভিদ প্রজননের কলাকৌশল প্রয়োগ করে অর্থকরী শস্যের বায়ুদূষণ প্রতিরোধী জাতের উদ্ভাবন হয়তো ভবিষ্যতে সম্ভব হবে।

বায়ুমণ্ডলে বায়ুদূষণকারী গ্যাসের উৎস বিভিন্ন। যেমন- সালফারঘটিত জীবাশ্ম জ্বালানির দহনে সালফার ডাই-অক্সাইড এবং মোটর ইঞ্জিনে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের দহনের উপজাত বস্তু হিসেবে নাইট্রোজেনের অক্সাইড তৈরি হয়। এই বিক্রিয়ার প্রাথমিক বস্তু নাইট্রোজের মনোক্সাইড (NO) যা বায়ুমণ্ডলে ধীরে ধীরে জারিত হয়ে নাইট্রোজেন মনোক্সাইড ছাড়াও, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড এবং ইথিলিন তৈরি হয়। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বিভিন্ন আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ওজোন এবং পারঅক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট-এ (PAN) পরিণত হয়। উষ্ণ এবং সূর্যালোকিত এলাকায় এই বিক্রিয়া দ্রুত ঘটে। তবে বর্তমানে জানা গেছে যে, যুক্তরাজ্যের মতো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা দেশেও গ্রীষ্মকালে মেঘমুক্ত আকাশ থাকলে শস্যের জন্য ক্ষতিকারক মাত্রায় ওজোন তৈরি হয়। রাসায়নিক শিল্প-কারখানা থেকেও বায়ুদূষণকারী গ্যাস তৈরি হয়।

বিভিন্ন এলাকার বায়ুমণ্ডলে দূষণকারী গ্যাসের মাত্রার ভিন্নতা দেখা যায়। আবার বিভিন্ন শস্য প্রজাতির সংবেদনশীলতারও ভিন্নতা হয়। তাই এলাকা ভিত্তিতে অথবা অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শস্যের উপর বায়ুদূষণকারী গ্যাসের প্রভাব নিরূপণ বেশ কঠিন। সাধারণভাবে স্থানীয় মাত্রা নির্ভর করে দূষণকারী গ্যাস নির্গমণের উপর (অর্থাৎ শিল্পায়নের উপর) এবং কত সময় সেই এলাকার বাতাসে তা থাকছে তার উপর। ভেজা অথবা শুষ্ক পতনের জন্য অথবা অন্যান্য গ্যাসের সাথে বিক্রিয়ার জন্য বায়ুদূষণের মাত্রা কমে যায়। গড়ে ১০ থেকে ৩০ পিপিবি (parts per billion) সালফার ডাই অক্সাইড এবং ৫০ থেকে ১০০পিপিবি নাইট্রোজেনের অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে থাকে।

শস্যের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ঋতুতে দূষণকারী গ্যাসের প্রভাবের ভিন্নতা হয়। যেমন যুক্তরাজ্যে ১৯৭০ সাল থেকে পরিচালিত পরীক্ষায় দেখা যায় যে, ঘাসের সালফার ডাই-অক্সাইডজনিত ক্ষতির পরিমাণ শীতকালে বেশি হয়। শীতকালে যে সালফার ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায়, তা নয়, প্রতিকূল পরিবেশের জন্য (নিম্ন তাপমাত্রা এবং আলোর কম প্রখরতা) ঘাসের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়।

পাতা এবং দূষিত বায়ুর মধ্যে গ্যাস বিনিময়

দূষিত পরিবেশে জন্মানো শস্যের সমস্যা হলো, যেসব বৈশিষ্ট্য কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণ বৃদ্ধি করে তা আবার পাতার মেসোফিল কলায় অন্যান্য গ্যাসের প্রবেশেও সহায়তা করে। অনেক শস্য প্রজাতি রাতের তুলনায় দিনে সালফার ডাই-অক্সাইডে বেশি সংবেদনশীল, কারণ দিনে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে। শান্ত বায়ুতে অথবা বায়ুপ্রবাহের গতি খুব কম হলে বাউন্ডারি স্তর রোধক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুপ্রবাহের গতি বৃদ্ধি পেলে এই রোধক হ্রাস পায়, এক্ষেত্রে দূষণকারী গ্যাস গ্রহণে পত্ররন্ধ্র প্রধান ভূমিকা পালন করে, কারণ কিউটিকলের ভিতর দিয়ে গ্যাসের বিনিময় বাধাপ্রাপ্ত হয়। সালফার্ ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে পত্ররন্ধ্র ফুলে যায়, এমন কি মৃত্তিকায় পানি ঘাটতি হলেও সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। ফলে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্রহণ এবং জলীয় বাষ্প ত্যাগের পরিমাণ বেড়ে যায়। ওজোনের প্রভাবেও পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়। কিউটিকলের ভিতর দিয়ে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড অপেক্ষাকৃত দ্রুত প্রবেশ করতে পারে। অনেক বায়ুদূষণকারী গ্যাসের প্রভাবে কিউটিকল নষ্ট হয়ে যায়।

পাতার কোষে গ্যাসীয় দূষণকারী বস্তুর চলাচলে জটিলতার সৃষ্টি হয়, যখন মেসোফিল অথবা এপিডারমাল অ্যাপোপ্লাস্টে (apoplast) পানিতে দ্রবীভূত হয়ে এসব বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন সালফার ডাই-অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইড্রেটের সালফার ডাই-অক্সাইড ($SO_2.H_2O$) হয় যা বিশ্লিষ্ট হয়ে HSO_3 এবং SO_3^{2-}-আয়নে পরিণত হয়। কোষের অভ্যন্তরে সালফার ডাইঅক্সাইডের প্রবেশ মন্থর গতিতে হয় ; কোষ-প্রাচীর ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট হওয়ায় কেবল অ-আধানবিশিষ্ট (uncharged)হাইড্রেটেড সালফার ডাই-অক্সাইড কোষে প্রবেশ করতে পারে। এটি সাইটোপ্লাজমে বিশ্লিষ্ট হয়ে শস্যের জন্য ক্ষতিকারক বস্তু SO_3^{2-} এ পরিণত হয়, যা আবার জারিত হয়ে কম ক্ষতিকারক বস্তু সালফেটে পরিণত হয়। একইভাবে, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত হয়ে একই অনুপাতে নাইট্রেট এবং নাইট্রাইট আয়ন হয়। যদিও নাইট্রাইট শস্যের জন্য ক্ষতিকারক, তবে নাইট্রাইট রিডাকটেজ এনজাইমের প্রভাবে এটা অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়ে পাতার নাইট্রোজেন বিপাকে অংশগ্রহণ করে। নাইট্রোজেন মনোঅক্সাইড পানিতে অপেক্ষাকৃত কম দ্রবীভূত হয় এবং এর রূপান্তরের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে জ্ঞান খুব সীমিত।

শস্য উদ্ভিদের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব

বায়ুদূষণকারী বস্তু কোষে প্রবেশের পর এদের প্রাথমিক প্রভাব আণবিক পর্যায়ে অথবা আল্ট্রাস্ট্রাকচারাল পর্যায়ে হয়। তবে ওজোন প্রধানত কোষ-ঝিল্লীর উপর ক্রিয়া করে, এজন্য কি পরিমাণ ওজোন সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে তা এখনো নিশ্চিত নয়। শস্য উদ্ভিদের উপর বায়ুদূষণকারী গ্যাসীয় পদার্থের প্রধান প্রধান প্রভাব নিম্নরূপ :

(ক) পত্ররন্ধ্র : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইডস এবং ওজোনের পত্ররন্ধ্রের খোলার ব্যাপারে দ্রুত এবং স্থায়ী প্রভাব আছে। সম্ভবত এটি

ঘটে সাবসিডিয়ারি এবং অন্যান্য এপিডারমাল কোষের ক্ষতির কারণে। তাই সালফার ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদের বিপাকে সরাসরি বিঘ্ন সৃষ্টি না করেও পরোক্ষভাবে পানি ঘাটতি সৃষ্টি করে পাতার কলাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

(খ) ক্লোরোপ্লাস্ট : নিম্ন মাত্রার সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইড এবং ওজোন পাতায় প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, দৃশ্যত লেজিন তৈরি না হলেও, ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেন-তন্ত্র ভেঙে যায়। ওজোনের প্রভাবে কোষ ঝিল্লী ভেঙে যায় এবং এটি সরাসরি সম্পৃক্ত লিপিড অণুর দ্বৈত বন্ধনীর সঙ্গে ক্রিয়া করে।

(গ) কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণ : সালফার ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণ হার কমে যায়। রাইবুলোজ-ডাইফসফেট কার্বোঅক্সিলেজ এনজাইমের ক্রিয়ার ব্যাঘাত, সালফাহাইড্রাল গ্রুপের নিষ্ক্রিয়তা ঘটানো এবং কোষের pH এর পরিবর্তনের জন্য এটি ঘটে। অপরপক্ষে, নাইট্রাইট ক্লোরোপ্লাস্টের রেডক্স সিস্টেম (redox system) বাঁধা প্রদান করে।

(ঘ) সালোকসংশ্লেষণ এবং বায়োমাস উৎপাদন : যেহেতু দূষণকারী গ্যাসের প্রভাবে পত্ররন্ধ্রের শারীরতত্ব, ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন, কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণ বিক্রিয়া এবং সালোকসংশ্লেষণীয় ইলেকট্রন পরিবহণ তন্ত্রের পরিবর্তন ঘটে, সেহেতু এটি সহজবোধ্য যে, অপেক্ষাকৃত নিম্নমাত্রার দূষণকারী গ্যাসের প্রভাবেও সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যেতে পারে। কোনো এলাকার শস্য অনেক দিন ধরে নিম্নমাত্রার দূষণকারী গ্যাসের মধ্যে থাকলে দৃশ্যত কোনো লক্ষণ দেখা না গেলেও বায়োমাস এবং সেই সাথে ফলনও কমে যায়।

অধিক মাত্রায় বায়ুদূষণের ফলে পাতায় নানা রকম লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন ক্লোরোসিস এবং পাতার অকাল পতন। এছাড়াও পাতায় সুস্পষ্ট লেজিন দেখা যায় এবং পাতা শুকিয়ে যায়। বিভিন্ন দূষণকারী গ্যাসের জন্য লক্ষণও বিভিন্ন হয়। যেমন- সালফার ডাই-অক্সাইডের জন্য আন্তঃশিরায় (intervenial) ক্লোরোসিস হয়, নাইট্রোজেনের অক্সাইডের প্রভাবে আন্তঃশিরায় অথবা পাতার কিনারায় অনিয়ত ধূসর এবং কালো দাগ হয় ; ওজোনের জন্য পাতার উপরিপৃষ্ঠে সাদা, হলুদ অথবা ধূসর দাগ হয় ; হাইড্রোজেন ফ্লোরাইডের জন্য পাতার শীর্ষ পুড়ে যায় (tip burning) অথবা পাতার ধারে নেক্রোসিস হয়।

সালফার ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইডস বায়ুমণ্ডলে পানিতে দ্রবীভূত হয়ে সালফিউরিক এবং নাইট্রিক এসিডে পরিণত হতে পারে। দূষণমুক্ত পরিবেশে বৃষ্টির পানির pH এর মাত্রা প্রায় ৫.৬। কিন্তু ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বৃষ্টির পানির pH ৩ থেকে ৪, কিংবা এর চেয়েও কম। তাই গ্যাসীয় দূষণকারী পদার্থ ছাড়াও, দ্রবীভূত দূষণকারী পদার্থেও শস্য স্নাত হয়- একেই বলে অম্ল বৃষ্টি বা (acid raon)।

বৃষ্টির পানির খুব সামান্য অংশই শস্য উদ্ভিদে লেগে থাকে, অধিকাংশ অংশ পাতা ও কাণ্ড গড়িয়ে মৃত্তিকায় পতিত হয়। পাতার অভ্যন্তরে দূষণকারী পদার্থের প্রবেশ নির্ভর করে কিউটিকলের প্রতিবন্ধকতা এবং পাতার ক্ষতির পরিমাণের উপর। এক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হলো যে, দীর্ঘসময় স্থায়ী বৃষ্টির সময়ে অম্ল দ্রবণে বেশিক্ষণ পাতা ভেজা থাকার জন্য পাতা থেকে খনিজ মৌলের অণু, বিশেষ করে ক্যালসিয়াম বেরিয়ে আসে। পাতার বয়স, পত্রপৃষ্ঠের গুণাবলী এবং কিউটিকলের ক্ষতির পরিমাণের উপর এটি নির্ভর করে। অম্লবৃষ্টির জন্য মৃত্তিকার গুণাবলীর পরিবর্তন ঘটিয়ে পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয়। মৃত্তিকার অম্লতা বৃদ্ধির ফলে শস্যের জন্য ক্ষতিকারক অ্যালুমিনিয়ামের চলাচল বেড়ে যায়।

বাংলাদেশের আবহাওয়া

বাংলাদেশ ২০.৫° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬.৫° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২.৭° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি এলাকা দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে। ফলে এর উত্তরার্ধ অব-নিরক্ষীয় (sub-tropical) এবং দক্ষিণার্ধ নিরক্ষীয় অঞ্চলে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ভূমির কম উচ্চতা, অধিক বৃষ্টিপাত, বঙ্গোপসাগরের নৈকট্য, উত্তরে হিমালয় পর্বতের অবস্থান প্রভৃতি কারণে সমগ্র বাংলাদেশের জলবায়ু নিরক্ষীয় মৌসুমী (tropical monsoon) এবং মৃদুভাপন্ন। বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপাদানের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো।

(১) তাপমাত্রা : গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং আবহাওয়া ঠাণ্ডা রাখে। আবার শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু হিমালয় পর্বতে বাধা পেয়ে উপরে উঠে যায় বলে শীতকালেও তেমন শীতের তীব্রতা থাকে না। বাংলাদেশে শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ১৫° সেলসিয়াস এবং গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ৩০° সেলসিয়াস। গড় বার্ষিক তাপমাত্রা প্রায় ২৫° সেলসিয়াস। এপ্রিল অথবা মে মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে। বর্ষাকালে তাপমাত্রা সামান্য কমে যায় এবং সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে বৃষ্টিপাত কমে গেলে তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়। বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থাকায় সৌরবিকিরণ মৃত্তিকায় অপেক্ষাকৃত কম পৌঁছায় এবং এর জন্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হ্রাস পায়। আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে বেশি সৌরবিকিরণ পায় বলে তাপমাত্রা আবার বেড়ে যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবং তাপমাত্রার পরিসর ৩.৬ নং সারণি দেখানো হয়েছে।

(২) বৃষ্টিপাত : দক্ষিণ-পূর্ব আর্দ্র মৌসুমী বায়ুর প্রবাহে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। কিন্তু শীতকালে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর জন্য বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। এদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২০০০ মিলিমিটার। সিলেট জেলার লালখেল নামক স্থানে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫৭৩০ মিলিমিটার। সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত এলাকা নাটোর জেলার লালপুর নামক স্থান। এখানকার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪০০ মিলিমিটার। বৃষ্টিবহুলদেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত অসমভাবে বণ্টিত। শীতকালে (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি) প্রায় শতকরা ৫ ভাগ, গ্রীষ্মকালে (মার্চ-মে) প্রায় শতকরা ২০ ভাগ এবং বর্ষাকালে (জুন-অক্টোবর) প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানের গড় মাসিক ও বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৩.৭ নং সারণি এবং গড় ঋতুগত ও বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩.৮ নং সারণিতে দেয়া হয়েছে।

(৩) বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা : বাংলাদেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হওয়ার জন্য বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে। এর ফলে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি হয়। শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হওয়ার জন্য বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে। তাই তখন বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস পায়। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা যথাক্রমে শতকরা ৮৪ ভাগ এবং ৬৪ ভাগ। সিলেটে আর্দ্রতা সবচেয়ে বেশি এবং দিনাজপুরে সবচেয়ে কম। বাংলাদেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানের সকাল ৯টা সবং সন্ধ্যা ৬টায় মাসিক গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩.৯ নং সারণিতে উপস্থাপিত হলো।

সারণি ৩.৬ : বাংলাদেশের কয়েকটি নির্বাচিত স্থানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং দৈনন্দিন তাপমাত্রার পরিসর (°সেলসিয়াস)

স্থান	উপাদান	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
বরিশাল	সর্বোচ্চ	২৫.৮	২৮.৩	৩২.৪	৩৩.৮	৩৩.৪	৩১.৮	৩০.২	৩০.৮	৩১.৪	৩১.২	২৮.৮	২৬.৪
	সর্বনিম্ন	১৩.৪	১৬.২	২০.৯	২৪.২	২৫.৬	২৫.৭	২৫.৮	২৫.৮	২৫.৯	২৪.৩	১৯.১	১৪.৬
	পরিসর	১২.৪	১২.১	১১.৫	৯.৬	৭.৮	৬.১	৪.৮	৫.০	৫.৫	৬.৯	৯.৭	১১.৮
বগুড়া	সর্বোচ্চ	২৫.০	২৭.৭	৩৩.১	৩৫.৮	৩৩.৯	৩২.৩	৩১.৪	৩১.২	৩১.৮	৩০.৯	২৮.৬	২৫.৯
	সর্বনিম্ন	১১.৬	১৩.২	১৭.৬	২২.২	২৪.১	২৫.৫	২৬.১	২৬.১	২৫.৮	২৩.১	১৭.৪	১৩.১
	পরিসর	১৩.৪	১৪.৫	১৫.৫	১৩.৬	৯.৮	৬.৮	৫.৩	৫.১	৬.০	৭.৮	১১.২	১২.৮
চট্টগ্রাম	সর্বোচ্চ	২৫.৮	২৭.৬	৩০.৫	৩২.০	৩২.২	৩১.০	৩০.৫	৩০.৩	৩১.১	৩০.৭	২৯.১	২৬.৩
	সর্বনিম্ন	১৩.৮	১৫.৯	২০.৩	২৩.৬	২৪.৯	২৫.২	২৪.৯	২৪.৮	২৫.০	২৩.৭	১৮.৯	১৫.৪
	পরিসর	১২.০	১১.৭	১০.২	৮.৪	৭.৩	৫.৮	৫.৬	৫.৫	৬.১	৭.০	১০.২	১০.৯
কুমিল্লা	সর্বোচ্চ	২৬.৩	২৮.৬	৩২.৬	৩৩.৫	৩২.৯	৩১.৩	৩০.৯	৩১.১	৩১.৫	৩১.১	২৯.২	২৬.৮
	সর্বনিম্ন	১২.০	১৪.৮	১৯.৭	২৩.১	২৪.৬	২৫.৩	২৫.৩	২৫.২	২৪.৪	২৩.৭	১৮.৪	১৩.৮
	পরিসর	১৪.৩	১৩.৮	১২.৯	১০.৪	৮.৩	৬.০	৫.৬	৫.৯	৭.১	৭.৪	১০.৮	১৩.০
ঢাকা	সর্বোচ্চ	২৫.৩	২৮.৩	৩২.৮	৩৪.৪	৩৩.৫	৩১.৫	৩০.১	৩০.৯	৩১.৩	৩০.৭	২৮.৭	২৫.৯
	সর্বনিম্ন	১১.৯	১৪.১	১৯.৩	২৩.৩	২৫.১	২৫.৮	২৬.১	২৬.২	২৫.৮	২৩.৬	১৭.৭	১২.৮
	পরিসর	১৩.৪	১৪.২	১৩.৫	১১.১	৮.৪	৫.৭	৪.০	৪.৭	৫.৫	৭.১	১১.০	১৩.১
দিনাজপুর	সর্বোচ্চ	২৪.৯	২৭.৩	৩২.৩	৩৫.৪	৩৩.৮	৩২.২	৩১.৬	৩১.৬	৩১.৪	৩১.২	২৮.০	২৫.১
	সর্বনিম্ন	১০.৩	১২.৩	১৬.৭	২১.২	২৩.৭	২৫.৩	২৬.২	২৬.০	২৫.৫	২২.৩	১৮.০	১৩.১
	পরিসর	১৪.৬	১৫.০	১৫.৬	১৪.২	১০.১	৬.৯	৫.৪	৫.৬	৬.৪	৮.৯	১০.০	১২.০
ফরিদপুর	সর্বোচ্চ	২৪.২	২৭.৪	৩২.৬	৩৪.৫	৩৩.৩	৩১.৬	৩০.৮	৩০.৭	৩১.২	৩০.৭	২৮.০	২৫.১
	সর্বনিম্ন	১১.৬	১৩.৭	১৮.৪	২২.৭	২৪.৩	২৫.৩	২৫.৭	২৬.১	২৫.৯	২৩.৭	১৮.০	১৩.১
	পরিসর	১২.৬	১৩.৭	১৪.২	১১.৮	৯.০	৬.৩	৫.১	৪.৬	৫.৩	৭.০	১০.০	১২.০

স্থান	উপাদান	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
যশোর	সর্বোচ্চ	২৫.৫	২৮.৪	৩৩.৬	৩৫.৯	৩৫.২	৩২.৯	৩১.৪	৩১.৬	৩২.১	৩১.৪	২৮.৮	২৬.৪
	সর্বনিম্ন	১০.৫	১৩.৩	১৮.৭	২৩.২	২৪.৯	২৫.৬	২৫.৭	২৫.৭	২৫.৪	২২.৯	১৬.৬	১১.৫
	পরিসর	১৫.০	১৫.১	১৪.৯	১২.৭	১০.৩	৭.৩	৫.৭	৫.৯	৬.৭	৮.৫	১২.২	১৪.৯
খুলনা	সর্বোচ্চ	২৬.৩	২৯.২	৩৩.৪	৩৪.৬	৩৪.৬	৩৪.৩	৩২.৬	৩১.২	৩১.৩	৩১.৭	২৯.১	২৬.৭
	সর্বনিম্ন	১৩.৬	১৬.১	২১.০	২৪.২	২৪.২	২৫.৬	২৬.১	২৬.২	২৬.২	২৪.৩	১৯.১	১৪.৭
	পরিসর	১২.৭	১৩.১	১২.৪	১০.৪	১০.৪	৮.৭	৬.৫	৫.৯	৫.১	৭.০	১০.০	১২.০
ময়মনসিংহ	সর্বোচ্চ	২৫.২	২৭.৬	৩২.০	৩৩.৮	৩২.৪	৩১.২	৩১.৩	৩১.৩	৩১.৫	৩০.৭	২৮.৭	২৬.৪
	সর্বনিম্ন	১১.৬	১৩.৮	১৮.২	২২.০	২৩.৫	২৪.৯	২৫.৭	২৫.৬	২৫.৪	২৩.৮	১৮.২	১৩.৬
	পরিসর	১৩.৬	১৩.৮	১৩.৮	১১.৮	৮.৯	৬.৩	৫.৬	৫.৭	৬.১	৬.৯	১০.৫	১২.৮
নোয়াখালি	সর্বোচ্চ	২৫.৯	২৭.৭	৩১.০	৩২.৩	৩১.৯	৩০.৬	২৯.৯	৩০.১	৩০.৫	৩০.৭	২৮.৭	২৬.৪
	সর্বনিম্ন	১৪.০	১৬.৬	২১.১	২৪.৪	২৫.৫	২৫.৭	২৫.৮	২৫.৭	২৫.৭	২৪.৪	১৯.৬	১৫.৩
	পরিসর	১১.৯	১১.১	৯.৯	৭.৯	৬.৪	৪.৯	৪.১	৪.৪	৪.৮	৬.৩	৯.১	১১.১
পাবনা	সর্বোচ্চ	২৫.৭	২৮.৩	৩৩.৪	৩৬.৩	৩৫.১	৩৩.২	৩১.৮	৩১.৮	৩২.৩	৩১.৯	২৯.৩	২৬.৬
	সর্বনিম্ন	১১.৫	১৩.৭	১৮.২	২২.৬	২৪.৬	২৫.৬	২৫.৯	২৬.২	২৫.৯	২৩.৩	১৭.৪	১২.৮
	পরিসর	১৪.২	১৪.৬	১৫.২	১৩.৭	১০.৫	৭.৬	৫.৯	৫.৬	৬.৪	৮.৬	১১.৯	১৩.৮
রংপুর	সর্বোচ্চ	২৪.৫	২৭.২	৩১.৭	৩৪.৫	৩২.৯	৩২.০	৩১.৯	৩২.০	৩২.১	৩০.৯	২৮.৪	২৫.৭
	সর্বনিম্ন	১০.২	১১.৯	১৫.৪	২০.৯	২২.৮	২৪.৭	২৫.৬	২৬.৪	২৫.৭	২২.২	১৬.৪	১২.১
	পরিসর	১৪.৩	১৫.৩	১৬.৩	১৩.৬	১০.১	৭.৩	৬.৩	৫.৬	৬.৪	৮.৭	১২.০	১৩.৬
সিলেট	সর্বোচ্চ	২৪.৯	২৭.২	৩০.৬	৩১.৬	৩০.৮	৩০.১	৩০.৯	৩১.০	৩১.০	৩০.২	২৮.৫	২৬.২
	সর্বনিম্ন	১২.২	১৪.১	১৭.৭	২১.২	২২.৮	২৪.৪	২৫.১	২৫.০	২৪.৭	২২.২	১৭.৪	১৩.৮
	পরিসর	১২.৭	১৩.১	১২.৯	১০.৪	৮.০	৫.৭	৫.৮	৬.০	৬.৩	৮.০	১১.১	১২.৪

সারণি ৩.৭ : বাংলাদেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানের গড় মাসিক ও বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিলিমিটার)

স্থান	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	বাৎসরিক
বরিশাল	১৫.৯	১৯.০	৪৮.১	১০৪.৫	১৯৬.৮	৪২৩.৪	৪৫১.৯	৩৯৫.৭	২৮৫.৩	১৯০.৪	৪২.৩	৯.৯	২১৮৩
বগুড়া	১২.২	১৬.৯	২৮.১	৫৮.৭	১৯৮.২	৩২৪.৫	৩৩৭.১	৩৩২.৭	২৭৫.৮	১৫৩.৯	১৫.৬	২.৭	১৭৫৬
চট্টগ্রাম	১৪.৩	১৫.৪	৪১.১	১৩১.৩	২২৪.৬	৫৬৯.৮	৭৫৮.৬	৬০২.৯	২৭০.২	২০২.৭	৬১.৭	২১.৮	২৯১৪
রাঙ্গামাটি	১৭.৪	২৮.৮	৫৮.৬	১৩৪.৮	২৫১.৩	৪৯৩.৩	৫৪৩.১	৪৬৯.৯	৩০৮.৯	১৫৮.৩	৬৩.৬	৩৮১	২৫৬৬
কুমিল্লা	৮.৫	১৬.০	৪৫.৪	১৭৯.৮	২৪৪.৬	৪৫৭.১	৪৫৩.২	৩৭৬.০	২৩২.৩	২০৪.৮	৫৭.০	২৪.০	২২৯৯
ঢাকা	৫.৬	৫.৩	৪৬.৫	৮৯.৯	২৪৭.৯	৩২৮.৬	৩৩৪.০	৩৩৯.৮	২৩৫.১	১৫২.৩	১০৮.৮	৩৪.৪	১৯২৮
দিনাজপুর	১৫.১	১২.৩	২০.১	৫৩.৪	১৬৬.২	৩৪১.৮	৩৯৮.৫	৩২৭.৬	৩০৫.০	১৩৩.১	৯.৫	০.৮	১৭৭৮
ফরিদপুর	৬.৮	৯.৩	৩৮.১	১৪৮.১	২০৫.২	৩৫৩.৭	৩০৩.৭	৩০৮.১	২৩৪.১	১৬০.১	৩৩.৩	১৩.৩	১৭৭৮
যশোর	১১.১	২৫.০	৪৩.৪	৯২.৪	১৮৫.৬	৩০৫.৮	৩২৯.০	৩০১.৬	২০৬.৬	১২৭.৯	১৯.৭	৪.৭	১৬৫২
খুলনা	১৪.৬	২২.৩	৪০.৯	৯০.৬	১৭৩.৯	৩১৮.৩	৩৫৯.৪	৩০.৯৮	২১৩.৮	১৩৮.০	২৭.৬	৬.৩	১৬৫২
কুষ্টিয়া	১০.৬	১৭.৭	৩৭.৩	৭৫.৫	১৭৮.৪	২৯৩.৩	২৮২.৫	২৮৩.৯	২২২.৮	১৩৯.০	২০.৬	৩.৬	১৫৫৫
ময়মনসিংহ	১১.৭	১৬.৩	৪৬.৫	১১৩.৩	২৯৬.৭	৪৫৬.৪	৩৮৮.৪	৩৯৯.৮	৩১৪.৭	১৭২.০	১৩.৭	২.০	২২৩২
নোয়াখালি	৬.৫	২০.১	৬০.৩	১০৩.৯	২৬৬.৮	৬০৩.৫	৬৪৫.৮	৫৭২.০	৩৯৫.১	২২০.৪	৫৬.২	২৭.৪	২৯৭৮
পাবনা	৮.৯	২০.০	৪২.৭	৭১.৪	১৭৫.৮	২৮৮.৩	২৬৭.৮	২৭৩.৭	২২৪.৩	১৪১.৮	১৬.২	৪.০	১৫৩৫
পটুয়াখালি	১৩.১	২৪.০	৬১.১	১১১.৩	২৬৯.৫	৫৯৫.২	৬৫৯.৩	৫৮৫.৬	৪০৫.৩	২৭৯.২	৫০.৬	১২.৭	৩০৬৭
রাজশাহী	১৩.৬	১৫.৭	২৮.৬	৪২.৫	১৩১.১	২৬৬.৬	৩১৫.০	২৬০.৭	২৩৭.৩	১১০.৯	১৩.০	৩.০	১৪৩৮
রংপুর	১১.৩	১৪.৮	২৮.২	৮৪.৬	২৯৮.০	৪৯২.৬	৪১১.৩	৩৩৩.১	৩১৭.৪	১৬৬.৬	১০.০	১.৪	২১৭০
সিলেট	১৯.৬	৪৭.৪	৮১.৮	৩১৫.০	৪৯৪.২	৯৭৩.৭	৭৩৫.৭	৬০০.৬	৪২৫.৪	১৭৬.৫	৩৫.৩	১৮.০	৩৯২৩
টাঙ্গাইল	১০.৮	১৮.৭	৩৪.৯	৯৫.১	২০১.১	৩৬৩.১	৩০৬.১	৪৩৪.৬	২৩৮.৮	১৮৪.৪	১৬.৭	৮.০	১৮৯২

সারণি ৩.৮ : বাংলাদেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানের গড় ঋতুগত ও বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিলিমিটার)

স্থান	নভেম্বর–ফেব্রুয়ারি	মার্চ–মে	জুন–অক্টোবর	বাৎসরিক
বরিশাল	৮৭.১	৩৪৯.৪	১৭৪৬.৭	২১৮৩
বগুড়া	৪৭.৪	২৮৫.০	১৪২৪.০	১৭৫৬
চট্টগ্রাম	১১৩.২	৩৯৭.০	২৪০৪.২	২৯১৪
রাঙ্গামাটি	১৪৭.৯	৪৪৪.৭	১৯৭৩.৫	২৫৬৬
কুমিল্লা	১০৫.৫	৪৬৯.৮	১৭২৩.৪	২২৯৯
ঢাকা	১৫৪.১	৩৮৪.৩	১৩৮৯.৮	১৯২৮
দিনাজপুর	৩২.৭	২৩৯.৭	১৫০৬.০	১৭৭৮
ফরিদপুর	৬২.৭	৩৯১.৪	১৩৫৯.৭	১৮১৪
যশোর	৬০.৫	৩২১.৪	১২৭০.১	১৬৫২
খুলনা	৭০.৮	৩০৫.৪	১৩৩৯.৩	১৭১৬
কুষ্টিয়া	৫২.৫	২৯১.২	১২১১.৫	১৫৫৫৫
ময়মনসিংহ	৪৩.৭	৪৫৬.৫	১৭৩১.৩	২২৩২
নোয়াখালি	১১০.২	৪৩১.০	২৪৩৬.৮	২৯৭৮
পাবনা	৪৯.১	২৮৯.৯	১১৯৫.৯	১৫৩৫
পটুয়াখালি	১০০.৪	৪৪১.৯	২৫২৪.৬	৩০৬৭
রাজশাহী	৪৫.৩	২০২.২	১১৯০.৫	১৪৩৮
রংপুর	৩৭.৫	৪১০.৮	১৭২১.০	২১৬৯
সিলেট	১২০.৩	৪৯১.০	২৯১১.৯	৩৯২৩
টাঙ্গাইল	৫৪.২	৩৩১.১	১৫০৭.৫	১৮৯২

সারণি ৩.৯ : বাংলাদেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানের সকাল ৯টা এবং সন্ধ্যা ৬টায় মাসিক গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)

স্থান	সময়	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
বরিশাল	৯টা	৭৬	৭৪	৭৪	৭৪	৭৪	৮৩	৮৭	৮৫	৮৩	৭৯	৭৮	৭৮
	৬টা	৬০	৫৬	৫৬	৬৬	৭৪	৮২	৮৩	৮৩	৮২	৭৭	৬৯	৬৪
বগুড়া	৯টা	৭৮	৭২	৬৩	৬৭	৭৮	৮৬	৮৬	৮৭	৮৫	৮৭	৭৮	৭৯
	৬টা	৫৯	৪৮	৩৭	৪২	৬৭	৮২	৮১	৮২	৮২	৭৬	৬৯	৭৫
চট্টগ্রাম	৯টা	৭২	৮৭	৭০	৭৩	৭৫	৮২	৮৫	৮৫	৮৩	৮৯	৭৬	৭৭
	৬টা	৬৫	৬৩	৬৭	৭৩	৭৭	৮৪	৮৬	৮৬	৮১	৮১	৭৩	৬৯
রাঙ্গামাটি	৯	৮৪	৭৫	৬৯	৬৮	৭৬	৮১	৮৩	৮১	৮৩	৮৫	৯০	৯১
	৬টা	৫৯	৫০	৫১	৬৩	৬৭	৮২	৮৯	৮৬	৮৭	৮৩	৬৯	৬৭
কুমিল্লা	৯টা	৮০	৭৫	৭৪	৭৫	৭৯	৮৪	৮৬	৮৬	৮৪	৮০	৭৭	৮০
	৬টা	৬৪	৫৪	৫৫	৬৫	৭৫	৮৩	৮৪	৮৩	৮২	৮০	৭৫	৭০
ঢাকা	৯টা	৭৪	৬৫	৬৪	৭০	৭৮	৮৪	৮৭	৮৬	৮৪	৭৮	৭৩	৭৮
	৬টা	৬১	৪৮	৪৪	৫৪	৭৫	৮১	৮২	৮৩	৮৩	৭৯	৭১	৭০
দিনাজপুর	৯টা	৮০	৭০	৫৭	৬০	৭৬	৮৪	৮৬	৮৫	৮৪	৮০	৭৪	৭৭
	৬টা	৫৯	৪৮	৩৬	৩৯	৬৩	৭৭	৭৯	৮০	৮১	৭৫	৬৮	৬৪
ফরিদপুর	৯টা	৮০	৭৪	৬৮	৭৩	৭৭	৮৫	৮৭	৮৬	৮৩	৭৯	৭৭	৮০
	৬টা	৬৫	৬০	৪৯	৫৮	৭৫	৮৪	৮৫	৮৪	৮৩	৮১	৭৬	৭৫
যশোর	৯টা	৮১	৭৭	৭২	৭৫	৭৯	৮৫	৮৬	৮৮	৮৭	৮৪	৮০	৮২
	৬টা	৬৭	৫৯	৫২	৫৭	৭১	৮২	৮৬	৮৭	৮৬	৮৩	৭৪	৭৪
খুলনা	৯টা	৭৩	৭১	৭৩	৭৬	৭৮	৮৩	৮৬	৮৫	৮৩	৭৮	৭২	৭২
	৬টা	৬২	৫৫	৫৫	৬৫	৭৪	৮২	৮৪	৮৪	৮৩	৭৮	৬৯	৬৭

স্থান	সময়	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
ময়মনসিংহ	৯টা	৬২	৭৭	৭৩	৭৬	৮২	৮৭	৮৭	৮৮	৮৫	৮৫	৮১	৮৪
	৬টা	৬২	৫৪	৪৯	৫৬	৭৪	৮২	৮১	৮১	৮২	৭৯	৭৩	৬৭
নোয়াখালি	৯টা	৭৭	৭৫	৭৫	৭৭	৮০	৮৭	৮৯	৮৯	৮৭	৮২	৭৮	৭৯
	৬টা	৬৩	৬০	৬৫	৭২	৭৯	৮৫	৮৬	৮১	৮৩	৭৯	৭৪	৬৮
পাবনা	৯টা	৭৭	৭১	৬৭	৭১	৭৯	৮৫	৮৬	৮৫	৮৪	৭৯	৭৫	৭৬
	৬টা	৬৮	৫৫	৪৪	৪১	৬১	৮১	৮৫	৮৪	৮৫	৮১	৭৬	৭৫
রংপুর	৯টা	৮৩	৭৫	৬০	৬৭	৭৮	৮৬	৮৫	৮৬	৮৪	৮৩	৮০	৮৬
	৬টা	৬৭	৫৪	৪২	৪৭	৬৫	৮১	৮১	৮২	৮২	৭৭	৭৪	৭৭
সিলেট	৯টা	৭৮	৭৫	৬৩	৭০	৮৪	৮৫	৮৬	৮৫	৮৬	৮৫	৭৪	৭৯
	৬টা	৬৭	৫৭	৫১	৬৩	৭৯	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৪	৭৫	৭৩

(৪) **বায়ুপ্রবাহ :** বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের মাসিক বায়ুর গতি ৩.১০ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। শীতকালে (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) অধিকাংশ সময় সারাদেশে ঈষৎ মৃদুমন্দ বাতাস (বিউফোর্ট স্কেলে ১ থেকে ২) থাকে। মার্চ থেকে আগস্ট মাসে এটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় (বিউফোর্ট স্কেলে ২ থেকে ৩)। দেশের অভ্যন্তরে বায়ুর গতি স্বাভাবিক, কিন্তু উপকূলবর্তী অঞ্চলে বায়ুর গতি বেশি।

সারণি ৩.১০ : বিভিন্ন এককে বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানের গড় মাসিক বায়ুর বেগ

স্থান	একক	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
বরিশাল	মাইল/ঘণ্টা	২.২	২.৭	৪.০	৫.২	৫.৭	৫.৬	৫.৭	৪.৭	৩.৭	১.৯	১.৪	১.২
	কি: মি:/ ঘণ্টা	৩.৫	৪.৩	৬.৫	৮.৪	৯.১	৮.৯	৯.১	৯.১	৬.০	৩.০	২.৩	১.৯
	মিটার/সেকেন্ড	১.০	১.২	১.৮	২.৪	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	১.৬	০.৮	০.৬	০.৫
	ফুট/সেকেন্ড	৩.২	৩.৯	৬.০	৭.৬	৮.২	৮.২	৮.২	৭.০	৫.৪	২.৭	২.০	১.৭
বগুড়া	মাইল/ঘণ্টা	২.০	২.৩	৩.১	৪.০	৪.২	৩.৮	৩.৫	৩.১	২.৭	২.২	১.৯	১.৯
	কি: মি:/ ঘণ্টা	৩.২	৩.৭	৫.০	৬.৫	৬.৭	৬.১	৫.৬	৫.০	৪.৩	৩.৫	৩.০	৩.০
	মিটার/সেকেন্ড	০.৮	১.০	১.৪	১.৮	১.৯	১.৭	১.৫	১.৪	১.২	১.০	০.৮	০.৮
	ফুট/সেকেন্ড	২.৯	৩.৪	৪.৬	৬.০	৬.১	৫.৬	৫.১	৪.৬	৩.৯	৩.২	২.৭	২.৭

BANSDOC Library Dhaka

স্থান	একক	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
চট্টগ্রাম	মাইল/ঘণ্টা	৩.৫	৪.০	৫.৬	৮.২	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	কি: মি:/ ঘণ্টা	৫.৬	৬.৫	৮.৯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	১০.০	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	মিটার/সেকেন্ড	১.৫	১.৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২.৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ফুট/সেকেন্ড	৫.১	৬.০	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	৯.১	[illegible]	[illegible]	[illegible]
কক্স-বাজার	মাইল/ঘণ্টা	২.১	২.৮	৩.৫	৪.৭	৫.০	৫.২	৫.৮	৫.১	৩.৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	কি: মি:/ ঘণ্টা	৩.৩	৪.৫	৫.৬	৭.৬	৮.০	৮.৪	৯.৩	৮.২	৬.০	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	মিটার/সেকেন্ড	০.৯	১.২	১.৫	২.২	২.৩	২.৪	২.৬	২.৩	১.৬	১.১	০.৮	০.৭
	ফুট/সেকেন্ড	৩.১	৪.১	৫.১	৭.০	৭.৫	৭.৬	৮.৩	৭.৪	৫.৪	৩.৬	২.৬	২.৪
কুমিল্লা	মাইল/ঘণ্টা	১.৬	২.২	৪.৫	৬.৯	৭.৪	৭.০	৭.৩	৬.৫	৪.২	২.৪	১.৭	১.৩
	কি: মি:/ ঘণ্টা	২.৬	৩.৫	৭.২	১১.১	১১.৯	১১.৩	১১.৭	১০.৪	৬.৭	৩.৯	৩.৯	২.১
	মিটার/সেকেন্ড	০.৭	১.০	২.০	৩.১	৩.৩	৩.২	৩.৩	২.৯	১.৯	১.০	১.০	০.৬
	ফুট/সেকেন্ড	২.৪	৩.২	৬.৬	১০.১	১০.৮	১০.৩	১০.৬	৯.৪	৬.১	৩.৬	৩.৬	১.৯
ঢাকা	মাইল/ঘণ্টা	৩.৩	৩.৭	৫.৮	৮.২	৯.৯	৮.৪	৮.৬	৭.৪	৭.৫	৫.২	৩.৩	৩.৫
	কি: মি:/ ঘণ্টা	৫.২	৬.০	৯.৩	১৩.২	১৫.৯	১৩.৫	১৩.৯	১১.৯	১২.০	৮.৯	৫.২	৫.৬
	মিটার/সেকেন্ড	১.৪	১.৬	২.৬	৩.৭	৪.৪	৩.৮	৩.৯	৩.৩	৩.৪	২.৫	১.৪	১.৫
	ফুট/সেকেন্ড	৪.৮	৫.৪	৮.৩	১২.০	১৪.৫	১২.৩	১২.৬	১০.৮	১১.০	৮.১	৪.৮	৫.১
দিনাজপুর	মাইল/ঘণ্টা	১.২	১.৬	২.৪	৩.৫	৩.৮	৩.৫	৩.৩	২.৮	২.১	১.১	১.১	১.২
	কি: মি:/ ঘণ্টা	১.৯	২.৬	৩.৯	৫.৬	৬.১	৫.৬	৫.৬	৪.৫	৩.৩	২.৪	১.৭	১.৯
	মিটার/সেকেন্ড	০.৫	০.৭	১.০	১.৫	১.৭	১.৫	১.৫	১.২	০.৯	০.৬	০.৪	০.৫
	ফুট/সেকেন্ড	১.৭	২.৪	৩.৬	৫.১	৫.৬	৫.১	৫.১	৪.১	৩.১	২.২	১.৫	১.৭
ফরিদপুর	মাইল/ঘণ্টা	১.৮	২.৩	৩.৯	৬.৫	৭.৪	৬.৫	৬.১	৬.৬	৪.৪	২.৪	১.৬	১.২
	কি: মি:/ ঘণ্টা	২.৮	৩.৭	৬.৩	১০.৪	১১.৯	১০.৪	৯.৮	১০.৬	৭.০	৩.৯	২.৬	২.৬
	মিটার/সেকেন্ড	০.৮	১.০	১.৭	২.৯	৩.৩	২.৯	২.৮	৩.০	২.০	১.০	০.৭	০.৭
	ফুট/সেকেন্ড	২.৬	৩.৪	৫.৮	৯.৪	১০.৮	৯.৪	৮.৯	৯.৬	৬.৫	৩.৬	২.৪	২.৪

(৫) উজ্জ্বল সূর্যালোকের সময় (Hours of bright sunshine)

উজ্জ্বল সূর্যালোক বলতে এমন প্রখরতার সূর্যালোক বুঝায় যা ছায়া ফেলেত সক্ষম। ৩.১১ নং সারণিতে প্রত্যেক মাসের উজ্জ্বল সূর্যালোকের ঘণ্টার সংখ্যা এবং ৩.১১২ নং সারণিতে বিভিন্ন অক্ষাংশে দিবা–দৈর্ঘ্য দেখানো হয়েছে। যদিও বাংলাদেশে এপ্রিল এবং মে মাস সবচেয়ে বেশি উষ্ণ, কিন্তু এসময় উজ্জ্বল সূর্যালোকের ঘণ্টা সর্বোচ্চ হয়। এমন কোনো নির্দিষ্ট মাস নেই, যখন এই মান সর্বোচ্চ হয়। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের উপকূলবর্তী এলাকায় এই মান সর্বোচ্চ হয় ফেব্রুয়ারিতে, বরিশালের খাড়ি এলাকায় ডিসেম্বরে, যশোর এলাকায় মে মাসে এবং ঢাকায় ফেব্রুয়ারিতে এবং সিলেটে নভেম্বর এবং ফেব্রুয়ারিতে। বর্ষাকালে উজ্জ্বল সূর্যালোকিত সময় অপেক্ষাকৃত কম ; এটি অবশ্য আশা করা যায়, কারণ এসময় আকাশ অধিকাংশ সময় মেঘাচ্ছন্ন থাকে। জুন মাসে সাধারণত কম সময় উজ্জ্বল সূর্যালোকিত থাকে।

সারণি ৩.১১ : বাংলাদেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানের উজ্জ্বল সূর্যালোকের ঘণ্টার সংখ্যা

স্থান	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
বরিশাল	৮.৪	৮.৪	৭.৯	৮.০	৭.৭	৩.৭	৩.৮	৩.১	৫.৮	৭.১	৮.৫	৯.৪
বগুড়া	৮.৭	৯.২	৮.৭	৮.৪	৮.৫	৪.৩	৫.০	৪.৯	৬.৯	৭.৬	৯.০	৮.৮
চট্টগ্রাম	৯.১	৯.৫	৮.৭	৮.৮	৮.২	৪.৩	৪.৮	৫.০	৫.৯	৭.৪	৯.০	৮.৮
কক্সবাজার	৯.৪	৯.৭	৯.৩	৯.৫	৮.১	৪.০	৪.১	৪.৩	৫.৯	৬.৫	৯.৬	৮.৫
ঢাকা	৮.৮	৮.৮	৮.৬	৮.৪	৮.৭	৫.০	৫.৪	৫.৬	৫.৯	৭.৩	৯.১	৯.১
যশোর	৯.১	৯.৫	৮.৭	৮.৯	৯.৭	৪.৮	৫.১	৫.৭	৫.৯	৮.২	৯.৩	৯.৪
সিলেট	৮.৮	৯.০	৮.৪	৭.৫	৬.৬	৩.৫	৪.১	৪.৪	৪.৬	৭.২	৯.০	৭.৮

সারণি ৩.১২ : বিভিন্ন অক্ষাংশে দিবা–দৈর্ঘ্য (ঘণ্টা)

অক্ষাংশ (উত্তর)	প্রতিদিনে ঘণ্টা											
	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
২১	১১.০	১১.৫	১২.[illegible]	১২.[illegible]	১৩.[illegible]	১৩.৪	১৩.[illegible]	১২.৯	১২.[illegible]	১১.[illegible]	১১.২	১০.[illegible]
২২	১১.০	১১.৫	১২.০	১২.[illegible]	১৩.২	১৩.৫	১৩.৪	১২.৯	১২.[illegible]	১১.[illegible]	১১.১	১০.[illegible]
২৩	১০.৯	১১.৪	১২.০	১২.[illegible]	১৩.[illegible]	১৩.[illegible]	১৩.৪	১৩.০	১২.[illegible]	১১.[illegible]	১১.১	১০.[illegible]
২৪	১০.৮	১১.৪	১২.০	১২.[illegible]	১৩.৩	১৩.৭	১৩.৫	১৩.[illegible]	১২.[illegible]	১১.৬	১১.০	১০.[illegible]
২৫	১০.৮	১১.[illegible]	১২.[illegible]	১২.৮	১৩.৪	১৩.[illegible]	১৩.৫	১৩.০	১২.[illegible]	১১.৬	১১.[illegible]	১০.৬
২৬	১০.৭	১১.৩	১২.[illegible]	১২.[illegible]	১৩.৪	১৩.৮	১৩.৬	১৩.১	১২.[illegible]	১১.৬	১১.[illegible]	১০.[illegible]
২৭	১০.৬	১১.৩	১২.[illegible]	১২.[illegible]	১৩.[illegible]	১৩.৯	১৩.[illegible]	১৩.১	১২.[illegible]	১১.[illegible]	১১.[illegible]	১০.[illegible]

* কোনো মাসের মাঝের দিবা–দৈর্ঘ্য

স্থান	একক	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
যশোর	মাইল/ঘণ্টা	২.০	২.৬	৪.০	৬.৪	৬.৮	৫.৬	৪.৮	৪.৪	৩.৪	২.১	১.৫	১.৩
	কি: মি:/ ঘণ্টা	৩.২	৪.১	৬.৫	১০.২	১০.৯	৮.৯	৭.৬	৭.০	৫.৪	৩.৩	২.৪	২.১
	মিটার/সেকেন্ড	০.৯	১.১	১.৮	২.৯	৩.০	২.৫	২.২	২.০	১.৫	০.৯	০.৬	০.৬
	ফুট/সেকেন্ড	২.৯	৩.৮	৫.৯	৯.২	৯.৯	৮.২	৭.০	৬.৫	৪.৯	৩.১	২.২	১.৯
খুলনা	মাইল/ঘণ্টা	১.৯	২.৪	৩.৬	৪.৮	৫.৬	৪.৬	৪.৮	৪.৩	৩.৫	২.৪	২.০	১.৪
	কি: মি:/ ঘণ্টা	৩.০	৩.৯	৫.৮	৭.৮	৮.৯	৭.৪	৭.৮	৬.৯	৫.৬	৩.৯	৩.২	২.৩
	মিটার/সেকেন্ড	০.৮	১.০	১.৬	২.২	২.৫	২.১	২.২	১.৯	১.৫	১.০	০.৮	০.৬
	ফুট/সেকেন্ড	২.৭	৩.৬	৫.৩	৭.১	৮.১	৬.৮	৭.১	৬.৩	৫.১	৩.৬	২.৯	২.১
ময়মন-সিংহ	মাইল/ঘণ্টা	১.৪	১.৮	২.৪	৩.৩	৩.৭	৩.১	৩.৭	২.৯	২.৩	১.৯	১.৪	১.২
	কি: মি:/ ঘণ্টা	২.৩	২.৮	৩.৯	৫.২	৫.৯	৫.০	৬.০	৪.৬	৩.২	৩.০	২.৩	১.৯
	মিটার/সেকেন্ড	০.৬	০.৮	১.১	১.৪	১.৬	১.৪	১.৪	১.২	১.০	০.৮	০.৬	০.৫
	ফুট/সেকেন্ড	২.০	২.৬	৩.৬	৪.৮	৫.৪	৪.৬	৪.৬	৪.২	৩.৪	২.৭	২.০	১.৭
নোয়াখালি	মাইল/ঘণ্টা	৩.৪	৩.৯	৫.২	৬.২	৭.৭	৯.০	১০.২	৮.৬	৬.০	৩.৬	২.৭	২.৯
	কি: মি:/ ঘণ্টা	৫.৪	৬.৩	৮.৪	১০.০	১২.৪	১৪.৪	১৬.৩	১৩.৯	৯.৭	৫.৮	৪.৩	৪.৬
	মিটার/সেকেন্ড	১.৪	১.৭	২.৪	২.৮	৩.৪	৪.০	৪.৫	৩.৯	২.৭	১.৬	১.২	১.২
	ফুট/সেকেন্ড	৪.৯	৫.৮	৭.৬	৯.১	১১.৪	১৩.২	১৪.৯	১২.৬	৮.৭	৫.৩	৩.৯	৪.২
পাবনা	মাইল/ঘণ্টা	১.৯	২.১	৩.১	৪.৭	৫.২	৪.৬	৪.৪	৩.৭	৩.০	২.০	১.৪	৩.৬
	কি: মি:/ ঘণ্টা	৩.০	৩.৩	৫.০	৭.৬	৮.৪	৭.৪	৭.০	৬.০	৪.৮	৩.২	২.৩	৫.৮
	মিটার/সেকেন্ড	০.৮	০.৯	১.৪	২.২	২.৪	২.১	৩.০	১.৬	১.৩	০.৮	০.৬	১.৬
	ফুট/সেকেন্ড	২.৭	৩.১	৪.৬	৭.০	৭.৬	৬.৮	৬.৫	৫.৪	৪.৪	২.৯	২.০	৫.৩
রংপুর	মাইল/ঘণ্টা	১.২	১.৪	২.১	৩.০	৩.৪	৩.০	২.৮	২.৫	২.১	৩.৬	১.১	১.০
	কি: মি:/ ঘণ্টা	১.৯	২.৩	৩.৩	৪.৮	৫.৪	৪.৮	৪.৫	৪.১	৩.৩	৫.৮	১.৭	১.৫
	মিটার/সেকেন্ড	০.৫	০.৬	০.৯	১.৩	১.৪	১.৩	১.২	১.১	০.৯	১.৬	০.৪	০.৪
	ফুট/সেকেন্ড	১.৭	২.০	৩.১	৪.৪	৪.৯	৪.৪	৪.১	৩.৭	৩.১	৫.৩	১.৫	১.৪
শ্রীমংগল	মাইল/ঘণ্টা	১.৫	১.৮	৩.১	৩.৭	৩.১	৩.৪	৩.৫	৩.১	২.৩	১.৫	১.২	১.২
	কি: মি:/ ঘণ্টা	২.৪	২.৮	৫.০	৬.০	৫.০	৫.৪	৫.৬	৫.০	৩.৭	২.৪	১.৯	১.৯
	মিটার/সেকেন্ড	০.৬	০.৮	১.৪	১.৬	১.৪	১.৪	১.৫	১.৪	১.০	০.৬	০.৫	০.৫
	ফুট/সেকেন্ড	২.২	২.৬	৪.৬	৫.৪	৪.৬	৪.৯	৫.১	৪.৬	৩.৪	২.২	১.৭	১.৭

(৬) **পানি সমতা** (Water balance) : বাংলাদেশে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত ভূনিম্নস্থ পানি অথবা অ্যাকুইফার (aquifer) অথবা উভয়কে নবায়ন করে। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে পানি চুইয়ে নবায়ন হয়। ৩.১৩ নং সারণির উপাত্ত এবং অন্যান্য পানি বিজ্ঞান সম্পর্কীয় উপাত্ত এবং মৃত্তিকার বিবরণ থেকে পানি সমতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ৩.১৩ নং সারণিতে পানি সমতা পরিকল্পনায় একটি প্যারামিটার দেখানো হয়েছে তা হলো শুষ্কতার সূচক (aridity index) I বৃষ্টিপাত (RR) এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ (potential) বাষ্পীয় প্রস্বেদনের (PE) মধ্যে সমতা কোনো এলাকার আর্দ্রতা অথবা শুষ্কতা নির্দেশ করে। উদ্ভিদরাজির উপর শুষ্কতা সূচকের (PE/RR) সম্পর্ক আছে। কোনো এলাকাকে শুষ্ক বলা হয় যখন এর শুষ্কতা সূচক ০.৫০ ; এর অর্থ দাঁড়ায় যে, পটেনশিয়াল বাষ্পীয় প্রস্বেদন বৃষ্টিপাতের দ্বিগুণ যদি শুষ্কতা সূচকের মান ১ হয়, তাহলে এলাকাটি ভেজাও নয়, শুষ্কও নয়।

সারণি ৩.১৩ : বাংলাদেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানের পানি সমতা

স্থান	প্যারামিটার	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
বরিশাল	(১)	২৫.৮	২৮.৩	৩২.৪	৩৩.৮	৩৩.৪	৩১.৫	৩০.৬	৩০.৮	৩১.৪	৩১.২	২৮.৮	২৬.৪
	(২)	৩৩.২	৩৮.৫	৪৮.৬	৫২.৬	৫১.৪	৪৭.০	৪৩.৯	৪৪.৪	৪৬.০	৪৫.৪	৩৯.৬	৩৪.৪
	(৩)	১৬.০	১৮.৩	২৩.৯	২৯.৫	৩২.২	৩৩.৩	৩৩.৩	৩২.৯	৩৩.১	৩০.১	২২.৭	১৭.৬
	(৪)	১৭.২	২০.২	২৪.৭	২৩.১	১৯.২	১৩.৪	১০.৬	১১.৫	১২.৯	১৫.৩	১৬.৯	১৬.৮
	(৫)	৯৬.৮	১১৩.৬	১৩৮.৯	১২৯.৯	১০৮.০	৭৫.৪	৫৯.৬	৬৪.৭	৭২.৬	৮৬.১	৯৫.১	৯৪.৫
	(৬)	১৫.৯	১৯.০	৪৮.১	১০৪.৫	১৯৬.৮	৪২৩.৪	৪৫১.৯	৩৯৫.৭	২৮৫.৩	১৯০.৪	৪২.৩	৯৯
	(৭)	---	---	---	---	৮৮.৮	৩৪৮.০	৩৯২.৩	৩৩১.০	২১২.৭	১০৪.৩	---	---
	(৮)	৮০.৯	৯৪.৬	৯০.৮	২৫.৪	---	---	---	---	---	---	৫২.৮	৮৪.৬
	(৯)	০.১৬	০.১৭	০.৩৫	০.৮০	১.৮২	৫.৬২	৭.৫৮	৬.১২	৩.৯৩	২.২১	০.৪৪	০.১০
বগুড়া	(১)	২৫.০	২৭.৭	৩৩.১	৩৫.৮	৩৩.৯	৩২.৩	৩১.৪	৩১.২	৩১.৮	৩০.৯	২৮.৬	২৫.৯
	(২)	৩১.৭	৩৭.১	৫০.৬	৫৮.৮	৫২.৯	৪৮.৪	৪৬.০	৪৫.৪	৪৭.০	৪৪.৭	৩৯.১	৩৩.৪
	(৩)	১৪.০	১৪.৫	১৬.৮	২২.৯	২৯.০	৩২.৮	৩৩.৩	৩৩.৩	৩২.৮	২৮.১	২০.৪	১৫.৫
	(৪)	১৭.৭	২২.৬	৩৩.৮	৩৫.৯	২৩.৯	১৫.৬	১২.৭	১২.১	১৪.২	১৬.৬	১৮.৭	১৭.৯
	(৫)	৯৯.৬	১২৭.১	১৯০.১	২০১.৯	১৩৪.৪	৮৭.৮	৭২.৪	৬৮.১	৭৯.৯	৯৩.৪	১০৫.২	১০০.৭
	(৬)	১২.০	১৬.৯	২৮.১	৫৮.৭	১৯৮.২	৩২৪.৫	৩৩৭.১	৩৩২.৭	২৭৫.৮	১৫৩.৯	১৫.৬	২.৭
	(৭)	---	---	---	---	৬৩.৮	২৩৬.৭	২৬৫.৭	২৬৫.৭	১৯৫.৯	৬০.৫	---	---
	(৮)	৮৭.৬	১১০.২	১৬২.০	১৪৩.২	---	---	---	---	---	---	৮৯.৬	৯৮.০
	(৯)	০.১২	০.১৩	০.১৫	০.২৯	১৪৭	৩.৭০	৪.৭২	৪.৭২	৩.৪৫	১.৬৫	০.১৫	০.০৩

স্থান	প্যারামিটার	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
চট্টগ্রাম	(১)	২৫.৮	২৭.৬	৩০.৫	৩২.০	৩২.৯	৩১.০	৩০.৫	৩০.৩	৩১.১	৩০.৭	২৯.১	২৬.৩
	(২)	৩৩.২	৩৬.৯	৪৩.৭	৪৭.৬	৪৮.১	৪৪.৯	৪৩.৭	৪৩.১	৪৫.২	৪৪.২	৪০.৩	৩৯.২
	(৩)	১৬.২	১৮.৩	২৩.৭	২৯.২	৩০.৯	৩১.৯	৩১.৮	৩১.৯	৩১.৬	২৯.৭	২২.৭	১৮.১
	(৪)	১৭.০	১৮.৬	২০.০	১৮.৪	১৭.২	১৩.০	১১.৯	১১.৩	১৩.৬	১৪.৫	১৭.৬	১৬.১
	(৫)	৯৫.৬	১০৪.৬	১১২.৫	১০৩.৫	৯৬.৮	৭৩.১	৬৬.৯	৬৩.৬	৭৬.৫	৮১.৬	৯৯.০	৯০.৬
	(৬)	১০.৯	১৯.৬	৫৫.১	১১৩.৮	২৫৭.৬	৫৬৬.২	৬৪৩.৯	৫৭৭.১	৩১৯.৫	২২৩.০	৩৬.৮	১৪.৭
	(৭)	—	—	—	১০.৩	১৬০.৮	৪৯৩.১	৫৭৭.০	৫১৩.৫	২৪৩.০	১৪১.৪	—	—
	(৮)	৮৪.৭	৮৫.০	৫৭.৪	—	—	—	—	—	—	—	৬১.২	৭৫.৯
	(৯)	০.১১	০.১৯	০.৪৯	১.১০	২.৬৬	৭.৭৫	৯.৬২	৯.০৭	৪.১৮	২.৭৩	০.৩৭	০.১৬
কুমিল্লা	(১)	২৬.৩	২৮.৬	৩১.৬	৩৩.৫	৩২.৯	৩১.৩	৩০.৯	৩১.১	৩১.৫	৩১.১	২৯.২	২৬.৮
	(২)	৩৪.২	৩৯.১	৪৯.২	৫১.৭	৫০.০	৪৫.৭	৪৪.৭	৪৫.২	৪৬.২	৪৫.২	৪০.৫	৩৫.২
	(৩)	১৫.৭	১৭.১	২২.৯	২৮.০	৩১.৩	৩২.৬	৩২.৮	৩২.৫	৩২.৪	২৯.৩	২২.৫	১৭.৫
	(৪)	১৮.৫	২২.০	২৬.৩	২৩.৭	১৮.৭	১৩.১	১১.৯	১২.৭	১৩.৮	১৫.৯	১৮.০	১৭.০
	(৫)	১০৪.১	১২৩.৮	১৪৭.৯	১৩৩.৩	১০৫.২	৭৩.৭	৬৬.৯	৭১.৪	৭৭.৬	৮৯.৪	১০১.৩	৯৯.৬
	(৬)	৯.৪	৩১.৮	৪৪.২	১৬০.৮	২৮৫.৮	৫৩১.৯	৪৯০.৭	৪০৮.২	৩৩৩	২৩৪.৪	৪৩.৪	৪.৩
	(৭)	—	—	—	২৭.৫	১৮০.৬	৪৫৮.২	৪২৩.৮	৩৩৬.৮	২২৬.২	১৪৫.০	—	—
	(৮)	৯৪.৭	৯২.০	১০৩.৭	—	—	—	—	—	—	—	৫৭.৯	৯৫.৩
	(৯)	০.০৯	০.২৬	০.৩০	১.২১	২.৭২	৭.২২	৭.৩৩	৫৭২	৩.৯১	২.৬২	০.৪৩	০.০৪
ঢাকা	(১)	২৫.৩	২৮.৩	৩২.৮	৩৪.৪	৩৩.৫	৩১.৫	৩০.১	৩০.৯	৩১.৩	৩০.৭	২৮.৭	২৫.৯
	(২)	৩২.২	৩৮.৫	৪৯.৭	৫৪.৪	৫১.৭	৪৬.১	৪২.৭	৪৪.৭	৪৫.৭	৪৪.১	৩৯.৪	৩৩.৪
	(৩)	১৪.৩	১৫.১	১৯.৪	২৬.০	৩০.৭	৩৩.০	৩২.৯	৩২.৮	৩২.৬	২৮.৪	২০.৪	১৬.৩
	(৪)	১৭.৯	২৩.৪	৩০.৩	২৮.৪	২১.০	১৩.২	৯.৮	১১.৯	১৩.১	১৫.৮	১৯.০	১৭.১
	(৫)	১০০.৭	১৩১.৬	১৭০.৪	১৫৯.৮	১১৮.১	৭৪.৩	৫৫.১	৬৬.৯	৭৩.৭	৮৮.৯	১০৬.৯	৯৬.২
	(৬)	১০.৯	২১.৩	৪৫.৭	১১৮.৯	২৪০.৩	৩৫১.৯	৩২৬.১	৩৪৪.৯	২৩৬.৭	১৪৫.৮	২৩.৯	২.৩
	(৭)	—	—	—	—	১২২.২	২৭৭.০	২৭১.০	২৭৮.০	১৬৩.০	৫৬.৯	—	—
	(৮)	৮৯.৮	১১০.৩	১২৪.৭	৪০.৯	—	—	—	—	—	—	৮৩.০	৯৩.৯
	(৯)	০.১১	০.১৬	০.২৭	০.৭৪	২.০৩	৪.৭৩	৫.৯২	৫.১৬	৩.৩১	১.৬৪	০.১১	০.০২

স্থান	প্যারামিটার	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
দিনাজপুর	(১)	২৪.৯	২৭.৩	৩২.৩	৩৫.৪	৩৩.৮	৩১.২	৩১.৬	৩১.৬	৩১.৯	৩১.১	২৮.৮	২৫.৯
	(২)	৩১.৫	৩৬.৩	৪৮.৪	৫৭.৫	৫২.৬	৪৮.১	৪৬.৫	৪৬.৫	৪৭.৩	৪৫.৪	৩৯.৬	৩৩.৪
	(৩)	১৩.৪	১৩.৮	১৫.৪	২০.৫	২৭.৯	৩১.৮	৩৩.২	৩৩.৩	৩২.৫	২৭.৫	১৯.১	১৪.৪
	(৪)	১৮.১	২২.৫	৩৩.০	৩৭.০	২৪.৭	১৬.৩	১৩.৩	১৩.২	১৪.৮	১৭.৯	২০.৫	১৮.৬
	(৫)	১০১.৮	১২৬.৬	১৮৫.৬	২০৮.১	১৬৮.৯	৯১.৭	৭৪.৮	৭৪.৩	৮৩.৩	১০০.৭	১১৫.৩	১০৪.৬
	(৬)	১০.১	১২.৩	২০.১	৫৩.৪	১৬৬.২	৩৪১.৮	৩৯৮.৫	৩২৭.৬	৩০৫.০	১৩৩.১	৯.৫	০.৮
	(৭)	—	—	—	—	২৭.৩	২৫০.১	৩২৩.৭	২৫৩.৩	২২১.৭	৩১.৪	—	—
	(৮)	৯১.৭	১১৪.৩	১৬৫.৫	১২৪.৭	—	—	—	—	—	—	১০৫.৮	১০৩.৮
	(৯)	০.১০	০.১০	০.১১	০.২৬	১.২০	৩.৭৩	৫.৩৩	৪.৪১	৩.৬৬	১.৩২	০.০৮	০.০১
ফরিদপুর	(১)	২৪.২	২৭.৪	৩১.৬	৩৪.৫	৩৩.৩	৩১.৬	৩০.৮	৩০.৭	৩১.২	৩০.৭	২৮.০	২৫.১
	(২)	৩০.২	৩৬.৫	৪৯.২	৫৪.৭	৫১.২	৪৬.৫	৪৪.৪	৪৪.২	৪৫.৪	৪৪.২	৩৭.৮	৩১.৯
	(৩)	১৪.৬	১৬.৮	২০.৬	২৬.৮	৩১.১	৩৩.৬	৩৩.৬	৩৩.৫	৩৩.১	২৮.৮	২১.০	১৬.৭
	(৪)	১৫.৬	১৯.৭	২৮.৬	২৭.৯	২০.১	১২.৯	১০.৮	১০.৭	১২.৩	১৫.৪	১৫.৮	১৫.২
	(৫)	৮৭.৮	১১০.৮	১৬০.৯	১৫৬.৯	১১৩.১	৭২.৬	৬০.৮	৬০.২	৬৯.২	৮৬.৬	৮৮.৯	৮৫.৫
	(৬)	১০.৯	৩০.২	৫৩.৩	১১৮.৬	২৪৪.৪	৩২৪.৯	৩২৩.৬	৩০৮.১	২৩৫.২	১১৩.২	২৭.৯	৩.৮
	(৭)	—	—	—	—	১৩১.৩	২৫২.৩	২৬২.৮	২৪৭.৯	১৬৬.০	৩৬.৬	—	—
	(৮)	৭৬.৯	৮০.৬	১০৭.৬	৩৮.৩	—	—	—	—	—	—	৬১.০	৮১.৭
	(৯)	০.১২	০.২৭	০.৩৩	০.৭৬	২.১৬	৪.৪৮	৫.৩২	৫.১২	৩.৪০	১.৪১	০.৩১	০.০৪
যশোর	(১)	২৫.৫	২৮.৪	৩৩.৬	৩৫.৯	৩৫.১	৩২.৯	৩১.৪	৩১.৬	৩২.১	৩১.৪	২৮.৮	২৬.৪
	(২)	৩৩৬	৩৮.৭	৫২.০	৫৯.১	৫৬.৯	৫০.০	৪৬.০	৪৬.৫	৪৭.৮	৪৬.৭	৩৯.৬	৩২.৪
	(৩)	১৪.৮	১৬.৫	২১.৪	২৭.৬	৩১.৮	৩৩.৬	৩২.৮	৩৩.৮	৩৩.৩	২৯.৩	২১.৮	১৬.০
	(৪)	১৭.৮	২২.২	৩০.৬	৩১.৫	২৫.১	১৬.৪	১৩.২	১২.৭	১৪.৫	১৬.৭	১৮.৬	১৮.৪
	(৫)	১০০.১	১২৪.৯	১৭২.১	১৭৭.২	১৪১.২	৯২.৩	৭৪.৩	৭১.৪	৮১.৬	৯৩.৩	১০৫.৮	১০৩.৫
	(৬)	১১.১	২৫.০	৪৩.৪	৯২.৪	১৮৫.৬	৩০৫.৮	৩২৯.০	৩০১.৬	২০৬.৬	১২৭.১	১৯.৭	৪.৭
	(৭)	—	—	—	—	৪৪.৪	২১৩.৫	২৫৪.৭	২৩০.২	১২৫.০	৩৩.২	—	—
	(৮)	৮৯.০	৯৯.৯	১২৮.৭	৮৪.৮	—	—	—	—	—	—	৮৬.১	৯৮.৬
	(৯)	০.১১	০.২০	০.২৫	০.৫২	১.৫১	৩.৩১	৪.৪৩	৪.১১	২.৫৩	১.০৭	০.১৯	০.০৪

স্থান	প্যারামিটার	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
খুলনা	(১)	২৬.৩	২৯.৯	৩৩.৪	৩৪.৬	৩৪.৩	৩২.৬	৩১.৯	৩১.৩	৩১.৭	৩১.৩	২৯.১	২৬.[illegible]
	(২)	৩৪.৯	৪০.৫	৫১.৪	৫৫.৩	৫৪.১	৪৯.৯	৪৫.৪	৪৫.৭	৪৬.৮	৪৫.৭	৪০.৫	৩৬.২
	(৩)	১৫.৫	১৭.৬	২২.৯	৩০.০	৩২.৭	৩৪.৯	৩৪.৩	৩৩.৭	৩৩.৪	২৯.৩	২১.৩	১৬.[illegible]
	(৪)	১৮.৭	২২.৯	২৮.৫	২৫.০	২১.৪	১৫.০	১১.৪	১২.০	১৩.৪	১৬.৪	১৯.০	১৯.৩
	(৫)	১০৫.২	১২৮.৮	১৬০.৩	১৪০.৬	১২০.৪	৮৪.৪	৬৪.১	৬৭.৫	৭৫.৪	৯৯.৩	১০৬.৯	১০৮.৩
	(৬)	১৪.৬	২২.৩	৪০.৯	৯০.৬	১৭৩.৯	৩১৮.৩	৩৫৯.৪	৩০৯.৮	২১৩.৮	১৩৮.০	২৭.০	৬.৩
	(৭)	—	—	—	—	৫৩.৫	১৩৩.৯	২৯৫.৩	২৪২.৩	১৩৮.৪	৪৫.৭	—	—
	(৮)	৯০.৬	১০৬.৫	১১৯.৪	৫০.০	—	—	—	—	—	—	৭৯.৯	১০২.৩
	(৯)	০.১৪	০.১৭	০.২৬	০.৬৪	১.৪৪	৩.৭৭	৫.৬১	৪.৫৯	২.৮৪	১.৫০	০.২৬	০.০৬
ময়মনসিংহ	(১)	২৫.২	২৭.৬	৩২.০	৩৩.৮	৩২.৪	৩১.২	৩১.৩	৩১.৩	৩১.৫	৩০.৭	২৮.[illegible]	২৬.৪
	(২)	৩২.০	৩৬.৯	৪৭.৬	৫২.৬	৪৮.৬	৪৫.৪	৪৫.৭	৪৫.৭	৪৬.২	৪৪.২	৩৯.৪	৩৪.৪
	(৩)	১৪.৫	১৫.৯	২০.০	২৫.৪	২৯.৭	৩২.৫	৩২.৮	৩৩.০	৩২.৪	২৯.০	২২.২	১৭.২
	(৪)	১৭.৫	২১.০	২৭.৬	২৭.২	১৮.৯	১২.৯	১২.৯	১২.৭	১৩.৮	১৫.২	১৭.২	১৭.২
	(৫)	৯৮.৪	১১৮.১	১৫৫.৩	১৫৩.০	১০৬.৩	৭২.৬	৭২.৬	৭১.৪	৭৭.৬	৮৫.৫	৯৬.৮	৯৬.৮
	(৬)	১১.৭	১৬.৩	৪৬.৫	১১৩.৩	২৯৬.৭	৪৫৬.৪	৩৮৮.৪	৩৯৯.৮	৩১৪.৭	১৭২.০	১৩.৭	২.৩
	(৭)	—	—	—	—	১৯০.৪	৩৮৩.৮	৩১৫.৮	৩২৮.৪	২০৭.১	৮৬.৫	—	—
	(৮)	৮৬.৭	১০১.৮	১০৮.৮	৩৯.৭	—	—	—	—	—	—	৮৩.১	৯৪.৮
	(৯)	০.১২	০.১৪	০.১৩০	০.৭৪	২.৭৯	৬.২৯	৫.৩৫	৫.৬০	৪.০৬	২.০১	০.১৪	০.০২
নোয়াখালি	(১)	২৫.৯	২৭.৭	৩১.০	৩২.৩	৩১.৯	৩০.৬	২৯.৯	৩০.১	৩০.৫	৩০.৭	২৮.৭	২৬.৬
	(২)	৩৩.৪	৩৭.১	৪৪.৯	৪৮.৪	৪৭.৩	৪৩.৯	৪২.২	৪২.৮	৪৩.৭	৪৪.২	৩৯.৪	৩৪.৪
	(৩)	১৬.৭	১৮.৬	২৪.৮	২৯.৯	৩২.৬	৩৩.৫	৩৩.০	৩২.৮	৩২.৭	৩০.২	২৩.০	১৮.২
	(৪)	১৬.৭	১৮.৫	২০.১	১৮.৫	১৪.৭	১০.৪	৯.২	১০.০	১১.০	১৪.২	১৬.৪	১৬.২
	(৫)	৯৩.৯	১০৪.১	১১৩.১	১০৪.১	৮২.৭	৫৮.৫	৫১.৮	৫৬.৩	৬১.৯	৭৮.৮	৯২.৩	৯১.১
	(৬)	৬.৪	২৪.৬	৬০.২	১৩৮.৯	২৯০.৮	৫২২.২	৫৯৮.৪	৬১৮.০	৪০৮.৭	২০৬.৫	৩৮.৯	৭.১
	(৭)	—	—	—	৩৪.৮	২০৮.১	৪৬৩.৭	৫৪৬.৬	৫৬১.৭	৩৪৬.৮	১১৭	—	—
	(৮)	৮৭.৫	৭৯.৫	৫২.৯	—	—	—	—	—	—	—	৫৩.৪	৬৪.
	(৯)	০.০৭	০.২৪	০.৫৩	১.৩৩	৩.৫১	৮.৯৩	১১.৫৫	১০.৯৮	৬.৬০	২.৬২	০.৪১	০.০৮

স্থান	প্যারামিটার	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
পাবনা	(১)	২৫.৭	২৮.৩	৩৩.৪	৩৬.৩	৩৫.১	৩৩.২	৩১.৮	৩১.৮	৩২.৩	৩১.৯	২৯.৩	২৬.৬
	(২)	৩৩.০	৩৮.৫	৫১.৪	৬০.৪	৫৬.৬	৫০.৯	৪৭.০	৪৭.০	৪৮.৪	৪৭.৩	৪০.৮	৩৪.৮
	(৩)	১৫.৭	১৬.৮	১৯.১	২৪.৪	৩০.৪	৩৪.৫	৩৪.২	৩৪.১	৩৩.০	২৯.৭	২১.৮	১৭.২
	(৪)	১৭.৩	২১.৭	৩২.৩	৩৬.০	২৬.২	১৬.৪	১২.৮	১২.৯	১৫.৪	১৭.৬	১৯.০	১৭.৬
	(৫)	৯৭.৩	১২২.১	১৮১.৭	২০২.৫	১৪৭.৪	৯২.৩	৭২.০	৭২.৬	৪৬.৬	৯৯.০	১০৬.৯	৯৯.০
	(৬)	৮.৯	২০.০	৪২.৭	৭১.৪	১৭৫.৮	২২৮.৩	২৬৭.৮	২৭৩.৭	২২৪.৩	১৪১.৮	১৬.২	৪.০
	(৭)	—	—	—	—	২৮.৪	১৯৬.০	১৯৫.৮	২০১.১	১৩৭.৭	৪২.৮	—	
	(৮)	৮৮.৪	১০২.১	১৩৯.০	১৩১.১	—	—	—		—	—	৯০.৭	৯৫.০
	(৯)	০.০৯	০.১৬	০.২৪	০.৩৫	১.১৯	৩.১২	৩.৭২	৩.৭৭	২.৫৯	১.৪৩	০.১৫	০.০৪
রংপুর	(১)	২৪.৫	২৭.২	৩১.৭	৩৪.৫	৩২.৯	৩২.০	৩১.৯	৩২.০	৩২.১	৩০.৯	২৮.৪	২৫.৭
	(২)	৩০.৭	৩৬.১	৪৬.৮	৫৪.৭	৫০.০	৪৭.৬	৪৭.৩	৪৭.৬	৪৭.৮	৪৪.৭	৩৮.৭	৩৩.০
	(৩)	১৪.২	১৫.১	১৭.৪	২৩.৫	২৮.৩	৩১.৭	৩৩.২	৩৩.৫	৩২.৯	২৮.৩	২০.৮	১৫.৯
	(৪)	১৬.৫	২১.০	২৯.৪	৩১.২	২১.৭	১৫.৯	১৪.১	১৪.৯	১৪.৯	১৬.৪	১৭.৯	১৭.১
	(৫)	৯২.৮	১১৮.১	১৬৫.৪	১৭৫.৫	১২২.১	৮৯.৪	৭৯.৩	৮৩.৮	৮৩.৮	৯২.৩	১০০.৭	৯৬.২
	(৬)	১১.৩	১৪.৮	২৮.২	৮৪.৬	২৯৮.০	২৯২.৬	৩৩৩.১	৩১৭.৪	৩১৭.৪	১১৬.৬	১০.০	১.৪
	(৭)	—	—	—	—	১৭৫.৯	২০৩.২	২৫৩.৮	২৩৩.৬	২৩৩.৬	৭৪.৩	—	—
	(৮)	৮১.৫	১০৩.৩	১৩৭.২	৯০.৯	—	—	—	—	—	—	৯০.৭	৯৪.৮
	(৯)	০.১২	০.১৩	০.১৭	০.৪৮	২.৪৪	৩.২৭	৪.২০	৩.৭৯	৩.৭৯	১.৮০	০.১০	০.০১
সিলেট	(১)	২৪.৯	২৭.২	৩০.৬	৩১.৬	৩০.৮	৩০.১	৩০.৯	৩১.০	৩১.০	৩০.২	২৮.৫	২৬.২
	(২)	৩১.৫	৩৬.১	৪৩.৯	৪৬.৫	৪৪.৪	৪২.৭	৪৪.৭	৪৪.৯	৪৪.৯	৪২.৯	৩৮.৯	৩৪.০
	(৩)	১৪.৬	১৫.৬	১৭.৯	২৪.১	২৮.২	৩১.১	৩২.৩	৩২.১	৩১.৪	২৭.৭	২০.৫	১৬.১
	(৪)	১৬.৯	২০.৫	২৬.০	২২.৪	১৬.২	১১.৬	১২.৪	১২.৮	১৩.৫	১৫.২	১৮.৪	১৭.৯
	(৫)	৯৫.১	১১৫.৩	১৪৬.৩	১২৬.০	৯১.১	৬৫.৩	৬৯.৮	৭২.০	৭৫.৯	৮৫.৫	১০৩.৫	১০০.৭
	(৬)	১৯.৬	৪৭.৪	৮১.৮	৩১৫.০	৪৯৪.০	৯৭৩.৭	৭৩৫.৭	৬০০.৬	৪২৫.৪	১৭৬.৫	৩৫.৩	১৮.০
	(৭)	—	—	—	১৮৯.০	৪০২.৯	৯০৮.৪	৬৬৫.৯	৫২৮.৬	৩৪৯.৫	৯১.০	—	—
	(৮)	৭৫.৫	৬৭.৯	৬৪.৫	—	—	—	—	—	—	—	৬৮.২	৮২.৭
	(৯)	০.২১	০.৪১	০.৫৬	২.৫০	৫.৪২	১৪.৯১	১০.৫৪	৮.৩৪	৫.৬০	২.০৬	০.৩৪	০.১৮

(১) = সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সেলসিয়াস), (২) = সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ (মিলিবার), (৩) = প্রকৃত বাষ্প চাপ (মিলিবার), (৪) = সম্পৃক্ত ঘাটতি সূচক (মিলিবার), (৫) = পটেনশিয়াল বাষ্পীয় প্রস্বেদন (মিলিমিটার), (৬) = বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার), (৭) = উদ্বৃত্ত (surplus) (মিলিমিটার), (৮) = পীড়ন (ঘাটতি) (মিলিমিটার) এবং (৯) = শুষ্কতা সূচক (Aridity index)

(৭) **সূর্যালোক :** বর্ষাকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সৌরবিকিরণের মাত্রা কম, আবার শীতকালে মেঘশূন্য পরিষ্কার আকাশ থাকায় স্বচ্ছ সূর্যালোক পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অতি সম্প্রতি সৌরবিকিরণ সম্পর্কিত উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। ৩.১২ নং চিত্রে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরের সৌবিকিরণের মাসিক গড় দেখানো হয়েছে।

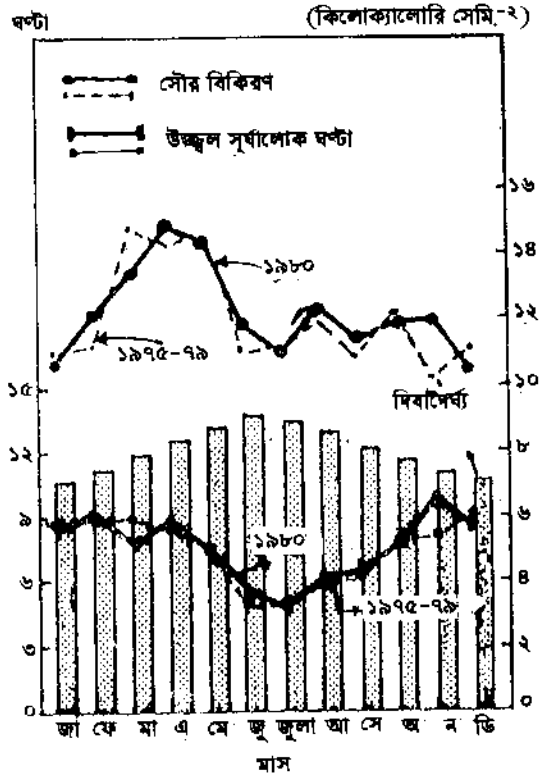

চিত্র ৩.১২ : ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরের সৌরবিকিরণের মাসিক গড় (কিলোক্যালরি/বর্গসেন্টিমিটার)। সেই সাথে দিবা-দৈর্ঘ্য এবং উজ্জ্বল সূর্যালোকের ঘণ্টা দেখানো হয়েছে।

(৮) **শিশির, কুয়াশা ও তুষারপাত :** বাংলাদেশে সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শিশির ও কুয়াশা পড়ে। শীতককালে অনেক সময় এত বেশি কুয়াশা পড়ে যাতে দিনে সূর্য দেখা যায় না। বাংলাদেশের কোথাও তুষারপাত হয় না।

(৯) **বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় দূষণকারী পদার্থ :** বাংলাদেশে কল-কারখানা কম হলেও, সেগুলো পরিবেশ সংরক্ষণ আইন যথাযথভাবে মানে না বলে বায়ুদূষণ হচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ মোটরযান থেকেও নির্গত হয় কালো ধোঁয়া। বাংলাদেশের বায়ুমণ্ডলে কি পরিমাণ বায়ুদূষণকারী পদার্থ আছে তা এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের আবহাওয়ার সাথে বাংলাদেশের আবহাওয়ার তুলনার জন্য যুক্তরাজ্যের অ্যাবেরেসটুইথের আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাত্ত ৩.১৪ নং সারণিতে উপস্থাপিত হলো।

সারণি ৩.১৪ : যুক্তরাজ্যের অ্যাবেরিসটুইয়ের আবহাওয়ার উপাত্ত

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	বাৎসরিক
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেলসিয়াস)	৬.২	৮.৯	১০.৫	৯.৮	১৫.৭	১৮.৪	১৯.৯	১৯.২	১৬.৯	১৫.৭	৯.৫	৯.১	১৩.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (০সেলসিয়াস)	০.৬	৩.৫	৪.৫	৪.৪	৫.৭	৮.৪	১১.৭	১০.৭	৯.৮	৯.৮	৩.৮	৪.৫	[illegible]
সূর্যালোক (ঘণ্টা/মাস)	৪০.৮	৫২.৫	৭৭.৯	১৫০.৯	২৭৫.৯	১৭০.৭	২০৯.৩	১৬৫.২	৯৭.১	১১১.৭	[illegible]	[illegible]	১৪৪১.৮
সৌরবিকিরণ (মেগাজুল/বর্গমিটার/প্রতিদিন)	২.৩	৪.৪	৭.৬	১৩.৫	১৯.৯	১৬.৭	১৭.৫	১৪.৯	৮.৯	৬.১	৩.১	১.৮	৯.৭
বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার/মাস)	৮৬.৩	৭১.৫	[illegible]	৫৫.৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বায়ুর বেগ (কিলোমিটার/ঘণ্টা)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ভর, তাপ এবং ভরবেগের স্থানান্তর (Mass, Heat and Momentum Transfer)

ভর, তাপ এবং ভরবেগ স্থানান্তরের মাধ্যমে বায়বীয় পরিবেশের সাথে শস্য উদ্ভিদ পারস্পরিক ক্রিয়া করে। ভর স্থানান্তরের পদ্ধতিগুলো, যেমন– শস্যের পাতা ও পরিবেশের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্পের বিনিময় এবং তাপের স্থানান্তর খুব নিকট সম্পর্কিত হওয়ায় একসঙ্গে আলোচনা করা হবে। এটিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে—একটি আণবিক পর্যায়ে ক্রিয়াশীল এবং এক্ষেত্রে মাধ্যমের 'ম্যাস' স্থানান্তর হয় না, যেমন– পদার্থের ব্যাপন ও তাপের পরিবহণ এবং অপরটিকে সাধারণভাবে পরিচলন বলে, এক্ষেত্রে ফ্লুইডের ম্যাস চলাচলের জন্য বস্তু চলাচল করে। বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে ভরবেগের স্থানান্তর হয়।

ঘনমাত্রার পরিমাপ (Measures of concentration)

ভর ও তাপ স্থানান্তরের বিভিন্ন কৌশল বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে ঘনমাত্রা বলতে কি বোঝায় তা জানা দরকার। সাধারণভাবে, ভরের অথবা অন্য কোনো সত্ত্বা, যেমন তাপ অথবা ভরবেগের উচ্চ ঘনমাত্রা হতে নিম্ন ঘনমাত্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থানান্তর হয়। অবশ্য কোনো মিশ্রণে একটি সত্ত্বার (i) ঘনমাত্রা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা যায়, যা এক একটি উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত ; নিম্নের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হবে।

(১) ঘনমাত্রা : একটি বহুল ব্যবহৃত পরিমাপক হলো ঘনমাত্রা (Ci) অথবা ঘনত্ব (Pi), যেখানে

$Ci = Pi =$ মিশ্রণের প্রতি একক আয়তনে i-এর ভর .... (৩.৫)

অপরপক্ষে, মোলার ঘনমাত্রা (c^{m}_{i}) ব্যবহার করা যেতে পারে :

C^{m}_{i} = মিশ্রণের প্রতি একক আয়তনে i-এর মৌলের সংখ্যা = C_i/Mi................ (৩.৬)

যেখানে Mi হলো আণবিক ওজন। যদিও গ্যাসের গঠনের পরিমাপক হিসেবে প্রায়ই ঘনমাত্রা ব্যবহার করা হয়, তবে বদ্ধ সিস্টেমে তাপমাত্রা অথবা চাপের পরিবর্তনের সাথে ঘনমাত্রার পরিবর্তন হয়, কারণ এগুলো আদর্শ গ্যাস সূত্র অনুযায়ী আয়তনের পরিবর্তন ঘটায় :

$PV=nRT$................. (৩.৭),

এক্ষেত্রে n হলো উপস্থিত মোলের সংখ্যা, T হলো পরম তাপমাত্রা, P হলো চাপ এবং R গ্যাস ধ্রুবক। যেহেতু গ্যাসের মতো তরল পদার্থ এত সংকোচনশীল নয়, সেহেতু দ্রবণে ঘনমাত্রা চাপ অথবা তাপমাত্রায় অনেক কম সংবেদনশীল।

(২) মোল ভগ্নাংশ (Mole fraction) : মোল ভগ্নাংশ (xi) অনেক বেশি রক্ষণশীল পরিমাপক। এটি হলো মিশ্রণে উপস্থিত সমস্ত মোলের ($\sum n$) এবং i-এর মোলের সংখ্যার (ni) ভগ্নাংশ : $Xi=ni/\sum n$.................. (৩.৮)

তাপমাত্রা, চাপ অথবা আয়তনের পরিবর্তন মোল ভগ্নাংশকে প্রভাবিত করে না, কারণ এরা সকল উপাদানকে সমভাবে প্রভাবিত করে।

(৩) ভর ভগ্নাংশ (Mass fraction) : ভর ভগ্নাংশ (mi) অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক।

mi = প্রতি একক মিশ্রণের ভরে i–এর ভর$=Ci/\rho$................ (৩.৯)

ρ হলো মিশ্রণের ঘনত্ব, এটি তাপমাত্রা এবং চাপের উপর নির্ভরশীল নয়; নিম্নলিখিতভাবে ভর ভগ্নাংশ মোল ভগ্নাংশের সাথে সম্পর্কিত–

$mi = xiMi/M$............... (৩.১০)

এক্ষেত্রে, M হলো মিশ্রণের গড় আণবিক ওজন।

আণবিক স্থানান্তর প্রক্রিয়াসমূহ

ব্যাপন–Fick-এর প্রথম সূত্র

একটি ফ্লুইডের অণুগুলোর দ্রুত তাপীয় গতির জন্য অণুগুলোর পুনর্বিন্যাস ঘটে এবং একটি অসমসত্ত্ব ফ্লুইডে ভর ও তাপের স্থানান্তর ঘটে। এই প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। যেমন, কোনো গতিহীন ফ্লুইডে উচ্চ ঘনমাত্রা থেকে নিম্ন ঘনমাত্রায় অণুর নিট স্থানান্তরের জন্য ভর স্থানান্তর ঘটে। কোনো একমাত্রিক সিস্টেমে কোনো এক সত্তা i-এর ফ্লাক্স ঘনত্ব বা ভর স্থানান্তরের হার (Ji)। এর ঘনমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট এবং ব্যাপন গুণাঙ্ক নামক ধ্রুবকের (Di) সাথে সম্পর্কিত যা গাণিতিকভাবে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় –

$$Ji = -Di\,\frac{\delta ci}{\delta x} \;\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(৩.১১)।}$$

এটিই হলো Fick- এর ব্যাপনের প্রথম সূত্রের একমাত্রিক অবস্থা। এই সমীকরণে ঋণাত্মক চিহ্ন হলো একটি গাণিতিক রীতি, যা নির্দেশ করে যে, ফ্লাক্স হলো নিম্ন ঘনমাত্রার দিকে।

তাপ পরিবহণ

পরিবহণের (conduction) মাধ্যমে তাপ সঞ্চালন ব্যাপনের অনুরূপ। পরিবহণ হলো মাধ্যমের স্থানান্তর ছাড়াই উচ্চ তাপমাত্রা (অর্থাৎ গতীয় শক্তি) নিম্ন তাপমাত্রায় তাপের সঞ্চালন। কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে আণবিক সংঘাতের (collisons) জন্য অণুগুলোর মধ্যে গতীয় শক্তি স্থানান্তরের (অণুগুলো স্থানান্তরিত হয় না) মাধ্যমে শক্তি স্থানান্তর ঘটে, কিন্তু ফ্লুইডের ক্ষেত্রে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অণুর ব্যাপন হতে পারে।

Fourier- এর সূত্রের সাহায্যে পরিবহণজনিত তাপ সঞ্চালন বর্ণনা করা হয়, যেমন প্রতি একক আয়তনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (sensible) তাপ সঞ্চালন (C, এর একক $Wm^{-2} = Jm^{-2}s^{-1}$) নিম্নভাবে প্রকাশ করা হয় :

$$C = -k\,\frac{\delta T}{\delta x} \;\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(৩.১২)}$$

K হলো তাপীয় পরিবাহকতা (thermal conductivity) ($Wm^{-1}K^{-1}$)। যদিও তাপ সঞ্চালনের চালিকা শক্তি হলো তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট, সুবিধাজনক অবস্থায় আনার জন্য সরল গাণিতিক পরিবর্তনের (manipulation) মাধ্যমে সমানুপাতিক ধ্রুবককে ভর স্থানান্তরের একটি রূপান্তরিত করা হয়। যদি T-কে একটি "তাপ ঘনমাত্রা" $C_H = \rho C_p T$, যেখানে C_p হলো ফ্লুইডের আপেক্ষিক তাপ ধারণ ক্ষমতা ($J\,Kg^{-1}$), দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যায়, তাহলে ৩.১১ নং সমীকরণের মতো একটি সমীকরণ পাওয়া যায় :

$$C = -DH\rho\, C_p\,\frac{\delta T}{\delta x} \;\ldots\text{(৩.১৩)},$$ এক্ষেত্রে DH হলো তাপীয় ব্যাপন গুণাঙ্ক।

ভরবেগ স্থানান্তর

যখন কোনো বস্তুর পৃষ্ঠতলের স্পর্শক বরাবর বল প্রয়োগ করা হয়, তখন পৃষ্ঠতলের স্তর নিচের বস্তুর সাথে সম্পর্ক রেখে ধীরে ধীরে গড়িয়ে যায়। একটি শক্ত কঠিন পদার্থ বিকৃত না হয়ে এ রকম শিয়েরিং পীড়ন (shearing stress) স্থানান্তর করে, এর প্রতীক হলো τ (tau) যার একক প্রতি একক আয়তনে বল ($kgm^{-1}s^{-2}$)। একটি ফ্লুইডে অবশ্য সন্নিকটবর্তী স্তরগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে গড়িয়ে চলে, ফ্লুইডের একটি স্তর পরের স্তরকে শিয়েরিং পীড়ন প্রেরণে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য, ফলে একটি ফ্লুইডের পৃষ্ঠতল বরাবর প্রবাহিত হওয়ার সময়

গতিবেগের গ্রেডিয়েন্ট সৃষ্টি হয়। পার্শ্ববর্তী স্তরের অণুগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়ার জন্য অন্তঃস্থ ঘর্ষণজনিত বলের উদ্ভব হয়, আর এটিই হলো কোনো ফ্লুইডের সান্দ্রতার (viscosity) পরিমাপক ; অসান্দ্র (non-viscous) ফ্লুইডের তুলনায় সান্দ্র ফ্লুইড শিয়েরিং পীড়ন প্রেরণে অধিকতর কার্যকর। এই প্রতিক্রিয়াকে নিউটনের সান্দ্রতার সূত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়। এই সূত্রানুসারে পৃষ্ঠতল বরাবর একটি ফ্লুইডের শিয়েরিং পীড়ন গতিবেগের ($\delta u/\delta x$) সাথে সমানুপাতিক–

$$\tau = n\,\frac{\delta u}{\delta x} \qquad (৩.১৪)$$

এক্ষেত্রে, n কে বলা হয় গতীয় (dynamic) সান্দ্রতা ($Kg\ m^{-1}\ s^{-1}$)। এই সমীকরণ পূর্বে উল্লেখিত তাপ এবং ভর স্থানান্তরের মতোই। এক্ষেত্রে শিয়েরিং পীড়নের পরিমাপ ভরবেগ ফ্লাক্স ঘনত্বের ন্যায়, যেখানে ভরবেগ হলো ভড় ×গতিবেগ। তাপ স্থানান্তরের মতো গতিবেগ গ্রেডিয়েন্ট প্রতিস্থাপন করা যায় একটি ভরবেগ ঘনমাত্রা গ্রেডিয়েন্ট দ্বারা (C_M = ভর × গতিবেগ/আয়তন = ρu),তাই ব্যাপন গুণাঙ্কের পরিমাপের মতো একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক পাওয়া যায়। ভরবেগের এই ব্যাপন গুণাঙ্ককে (D_M) কাইনেমেটিক সান্দ্রতাও (kinematic viscosity অর্থাৎ v) বলে।

পরিচলনজনিত এবং টারবুলেন্ট স্থানান্তর

অণুর মধ্যে তাপীয় চলনের জন্য ব্যাপনের মাধ্যমে ভর অথবা তাপের স্থানান্তর হয় এবং শান্ত (still) ফ্লুইডে (যেমন– পাতার কোষাবকাশের বায়ু) ব্যাপনের এটিই প্রধান কৌশল। বায়ুমণ্ডলে উন্মুক্ত পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রে (যেমন– পাতা) পৃষ্ঠতল বরাবর বায়ুপ্রবাহের জন্য ভর ও তাপ স্থানান্তরের হার অনেকাংশে বেড়ে যায়। দুটি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। প্রথমত, বায়ুপ্রবাহ অনবরত পৃষ্ঠতল সন্নিকটবর্তী বায়ুকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাই ঘনমাত্রার খাড়া (steep) গ্রেডিয়েন্ট বজায় থাকে (ব্যাপনের চালিকা শক্তি) ; সুতরাং শান্ত বায়ুর তুলনায় অধিকতর স্থানান্তর ঘটে। দ্বিতীয়ত, পাখাবিশিষ্ট বায়ুপ্রবাহের জন্য স্থানান্তর দ্রুত হয় ; এক্ষেত্রে বায়ুপ্রবাহের সাথে সরাসরি বস্তুও স্থানান্তরিত হয়।

নিম্ন বায়ুমণ্ডলে (lower atmosphere) বায়ু কখনোই শান্ত থাকে না। আনুভূমিক (horizontal) চলাচল ছাড়াও, বায়ুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেটের বিশৃংখল চলনও হয়। বায়ুপ্রবাহের প্রকৃত অবস্থা নির্ভর করে উপস্থিত পরিচলনের প্রকৃতির উপর। এটি ঘটতে পারে মুক্ত পরিচলনের (free convection) জন্য, এক্ষেত্রে বায়ুর ঘনত্বের পরিবর্তনের জন্য বায়ুপ্রবাহ হয় ; যখন উত্তপ্ত বস্তুর সন্নিকটবর্তী বায়ু প্রসারিত হয়ে উপরে ওঠে অথবা শীতল বায়ু কোনো ঠাণ্ডা বস্তুর নিচে নেমে আসে তখন এটি ঘটে। অথবা কৃত্রিম পরিচলনের (forced convection) জন্যও ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে বায়ু কর্তৃক বহিঃস্থ চাপের গ্রেডিয়েন্ট তৈরির জন্য বায়ু চলাচল করে। কক্ষ গরম করার জন্য ব্যবহৃত প্রচলিত রেডিয়েটর প্রধানত নির্ভর করে মুক্ত পরিচলনের উপর, কিন্তু পাখাবিশিষ্ট রেডিয়েটর কক্ষের অভ্যন্তরে তাপ স্থানান্তরের জন্য কৃত্রিম পরিচলন ব্যবহার করে।

তাপ ও ভর স্থানান্তরে মুক্ত এবং কৃত্রিম পরিচলনের তুলনামূলক গুরুত্ব নির্ভর করে তাপমাত্রা গ্রেডিয়েন্টের জন্য সৃষ্ট প্লবতা (buoyancy) বল এবং বায়ুপ্রবাহের জন্য সৃষ্ট ইনারশিয়াল (inertial) বলের (এটি টারবুলেন্স তৈরি করে) সমতার মধ্যে। অধিকাংশ উদ্ভিদ পরিবেশে, কেবল মুক্ত পরিচলনের মাধ্যমে তাপ ও ভরের স্থানান্তর কদাচিৎ ঘটে, যদিও বায়ুপ্রবাহ খুবই মন্থর হলে এটি স্থানান্তর প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরগুলোর মধ্যে স্থানান্তর প্রক্রিয়া (Transfer process within the lower layers of the atmosphere)

বৃহৎ মাত্রার বায়ু স্থানান্তরের মাধ্যমে সাধারণ চলাচল সনাক্ত করা যায়। যেমন– প্রাত্যহিক আবহাওয়ার বিবরণীতে প্রকাশিত তথ্যাবলী। এর ভেতরেও বিভিন্ন রকমের অস্থায়ী চলাচল ঘটে, এটি ঘটে অসমভাবে পৃষ্ঠ তল উত্তপ্ত হওয়া, ঘর্ষণ, স্থানীয় ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন এবং পৃষ্ঠ তল অসমান হওয়ার জন্য। অধিক ইনারশিয়াযুক্ত একটি বৃহদাকার উইন্ড–ভেন (wind vane) কোনো নির্দিষ্ট উচ্চতায় রাখলে এটি সাধারণত সম্পূর্ণরূপে স্থির থাকে ; এটি নির্দেশ করে যে, বায়ু একদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। যদি খুব বেশি সংবেদনশীল একটি উইন্ড–ভেন নিকটবর্তী স্থানে রাখা হয় এবং পরিবর্তন যদি সেকেন্ড অথবা মিনিটের ব্যবধানে অনুসরণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে বায়ুর বেগ ও দিকের পরিবর্তন পুনঃপুনঃ ঘটছে। এর কাছে যদি একটি সংবেদনশীল ব্যারোমিটার রাখা হয়, তাহলে খুব দ্রুত বায়ুর চাপের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। এটিকে টারবুলেন্ট প্রবাহ নামে অভিহিত করা হয় ; এক্ষেত্রে একটি গড় দূরত্ব বরাবর (একে মিশ্রণ দৈর্ঘ্য বলে) একটি আনুভূমিক সমতলক্ষেত্র থেকে অপর একটি সমতল ক্ষেত্রে বায়ুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেট অবিরাম উপর ও নিচের দিকে চলাচল করে। এর ফলে বায়ুস্তরগুলোর মধ্যে অতি দ্রুত মিশ্রণ হয় এবং কোনো বস্তুর, যেমন– তাপ অথবা জলীয় বাষ্পের উচ্চ ঘনমাত্রা থেকে নিম্ন ঘনমাত্রায় সাধারণ আণবিক ব্যাপনের তুলনায় দ্রুত স্থানান্তর হয়।

একটি কঠিন পৃষ্ঠতলের, যেমন– ভূপৃষ্ঠ অথবা একটি পাতা, উপর দিয়ে বায়ু চলাচল করলে ঘর্ষণজনিত বলের জন্য এর প্রবাহ হ্রাস পেতে থাকে এবং যে স্তরটি পুরোপুরি পৃষ্ঠতলে আছে তার কোনো চলন নেই অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণরূপে স্থির। পৃষ্ঠতল থেকে খাড়াভাবে উপরের দিকে পরপর স্তরগুলোতে বায়ুর বেগ ক্রমাগত বাড়তে থাকে, কিন্তু এগুলো ল্যামিনার প্রবাহ দেখায়, অর্থাৎ সম্পূর্ণ বায়ু পৃষ্ঠতল বরাবর একই দিকে প্রবাহিত হয়, স্তরগুলোর মধ্যে খাড়াভাবে স্থানান্তর হয় না। এখান থেকে কিছু দূরত্বে একটি মাঝামাঝি (transition) অঞ্চল থাকে এবং পরিশেষে প্রবাহ সম্পূর্ণ টারবুলেন্ট হয়। এরকম বাউন্ডারি স্তরের মধ্যে বস্তুর স্থানান্তর, যেমন জলীয় বাষ্প, ঘটে আণবিক ব্যাপনের মাধ্যমে এবং টারবুলেন্ট স্থানান্তরের তুলনায় এর গতি অনেক মন্থর। এমন কি টারবুলেন্ট অঞ্চলেও বায়ুর মাধ্যমে পৃষ্ঠতলের ঘর্ষণজনিত ড্র্যাগ (frictional drag) স্থানান্তরিত হয় যা একটি বায়ুর স্তর অপরটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গেলে শেয়ারিং পীড়নের সৃষ্টি করে ; এর জন্য ভরবেগের নিম্নগামী ফ্লাক্স তৈরি হয়।

বৃহদাকার এবং মোটামুটি সমতল পৃষ্ঠতল বরাবর কোনো বস্তুর স্থানান্তর মূলত খাড়া, একক আয়তনের আনুভূমিক সমতলক্ষেত্র বরাবর কোনো বস্তুর স্থানান্তরের হার (অর্থাৎ ফ্লাক্স ঘনত্ব) ঘনমাত্রা গ্রেডিয়েন্টের সমানুপাতিক ; সমানুপাতিকতার গুণাঙ্ককে এডে (eddy) স্থানান্তর গুণাঙ্ক বলে। সাধারণভাবে $F = -kdx/dz$ এবং বিশেষ করে যে সমস্ত বস্তুর সাথে আমরা অধিক পরিচিত তা নিম্নরূপ :

ভরবেগ (প্রতি একক আয়তনে শিয়েরিং পীড়ন)

$M\ (kgm^{-1}s^{-2}) = \rho a\, K_M\, du/dz$ .... (৩.১৫)

তাপ : $H(J\, m^{-2}s^{-1}) = -\rho_a C_p K_H\, dT/dz$ .... (৩.১৬)

জলীয় বাষ্প : $E\ (kgm^{-2}s^{-1}) = -\rho a K_W dq/dz$ .... (৩.১৭)

কার্বন ডাই-অক্সাইড : $P\ (kgm^{-2}s^{-1}) = -\rho_a K_p d\,C/dz$ .... (৩.১৮)

এক্ষেত্রে, ρ_a হলো ঘনত্ব, C_p সিক্ত বায়ুর তাপীয় ক্ষমতা u গড় অনুভূমিক গতিবেগ (velocity), T গড় তাপমাত্রা q গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা (প্রতি গ্রাম সিক্ত বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ গ্রাম), C কার্বন ডাই-অক্সাইডের গড় আপেক্ষিক ঘনমাত্রা, এবং K_M,K_H, K_w এবং K_p হলো নিজ নিজ স্থানান্তর গুনাঙ্ক এবং z হলো পৃষ্ঠতল থেকে উচ্চতা।

উপরোক্ত চার প্রকার স্থানান্তর গুণাঙ্কের মানই প্রধানত নির্ভর করে বায়ুর টারবুলেন্সের উপর। ভূপৃষ্ঠের উর্ধ্বে বায়ুপ্রবাহের বেগের তারতম্য উচ্চতার সাথে বৃদ্ধি পায় ; তাই কোনো নির্দিষ্ট উচ্চতায় বায়ুপ্রবাহের সাথে এগুলোও বেড়ে যায়। সুস্থির পরিবেশে (যেমন– সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের সময়) আদর্শ প্রোফাইল ৩.১৩ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। দিনে সৌরবিকিরণ বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকা ও উদ্ভিদরাজি এটিকে বেশি শোষণ করে এবং তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট স্থাপিত হয়। উপরের স্তরের তুলনায় ভূপৃষ্ঠের সন্নিকটের উষ্ণ বায়ু কম ঘন, ফলে এটি উপরে উঠতে থাকে। এই পরিচলন বায়ুমণ্ডলের অস্থিরতা বৃদ্ধি করে, টারবুলেন্স তথা স্থানান্তর গুণাঙ্ক বেড়ে যায় এবং অধিকতর সমরূপ তাপমাত্রার প্রোফাইল তৈরি হয়। বাষ্পীভবনে সৌরবিকিরণ ব্যবহৃত হয় এবং জলীয় বাষ্পের গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়।

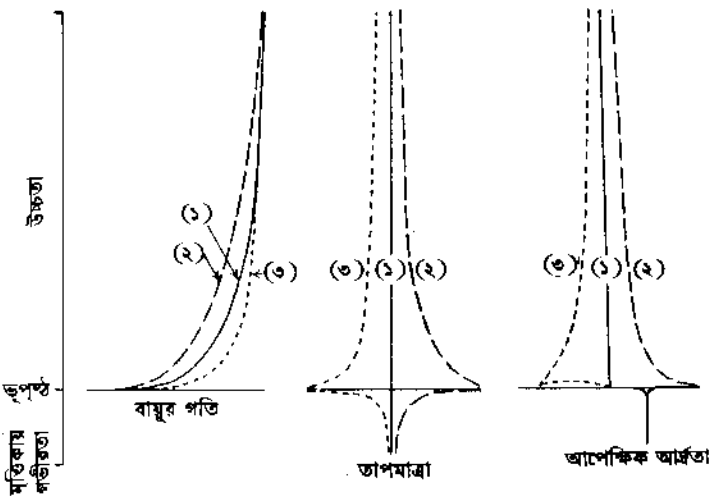

চিত্র ৩.১৩ : একটি ছোট মসৃণ লনের উপরে বায়ুপ্রবাহ, তাপমাত্রা এবং জলীয় বাষ্পের প্রোফাইল সরলীকৃত নকশার সাহায্যে দেখানো হয়েছে। (১) সূর্যোদয়ের সময়, (২) মধ্যাহ্নে এবং (৩) রাতে।

রাতে বিপরীত অবস্থা হয়, বায়ুর নিচের স্তরের তুলনায় মৃত্তিকা এবং উদ্ভিদরাজি অধিক তাপ হারায় এবং এর জন্য নিম্নমুখী তাপ ফ্লাক্স তৈরি হয়। শান্ত পরিবেশে তাপ স্থানান্তর এত মন্থর হতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের শীতলীকরণের জন্য তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কের (dew point) নিচে নেমে যায় এবং পানি ঘনীভূত হয়। মৃত্তিকার পানি থেকে অধিকাংশ শিশির তৈরি হয়।

এই প্রভাবগুলো মেঘ (বিকিরণের মাধ্যমে) এবং বায়ুপ্রবাহ (কাএন পরিচলন বৃদ্ধির মাধ্যমে) কর্তৃক রূপান্তরিত হয়। উপরন্তু, শস্যের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অবস্থা অধিকতর জটিল হয়

শস্য উদ্ভিদের ক্যানোপির অভ্যন্তরে স্থানান্তর

শস্য উদ্ভিদের ক্যানোপির উপরের তুলনায় ক্যানোপির অভ্যন্তরে বায়ুপ্রবাহের প্রোফাইল এবং স্থানান্তর প্রক্রিয়াগুলো অধিকতর জটিল। এটি প্রধানত নির্ভর করে উচ্চতার সাথে পাতার ক্ষেত্রফলের ঘনত্ব এবং বিস্তারের উপর। কোনো কোনো ক্যানোপিতে ভূপৃষ্ঠের কাছে বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ সর্বোচ্চ হতে পারে, বিশেষ করে যেসব বনাঞ্চলের নিম্নাংশে কম উদ্ভিজ্জ থাকে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্যানোপির একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় এমন কি বায়ুপ্রবাহের দিকও ভিন্ন হতে পারে।

ক্যানোপির অভ্যন্তরে বায়ুপ্রবাহ, তাপমাত্রা, জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রোফাইলের পরিমাপ ব্যবহার করে এডে (eddy) স্থানান্তর গুণাঙ্ক নির্ণয় এবং এসকল বস্তুর উৎস ও সিঙ্কের (sink) অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। যদিও এসকল গণনার জন্য তত্ত্ব ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তবে বাস্তব ক্ষেত্রে উক্ত সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতা এবং ক্যানোপির অভ্যন্তরে সময়সংক্রান্ত এবং স্থানসংক্রান্ত অসাদৃশ্যতার জন্য এগুলো ব্যবহার করা বেশ কঠিন।

চতুর্থ অধ্যায়

পানির সরবরাহ ও ব্যবহার

পানির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী

উদ্ভিদ কোষের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান পানি এবং শুষ্ক বীজে প্রায় শতকরা ১০ ভাগ এবং কতকগুলো ফল ও কচি পাতায় প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ পানি থাকে। পানির কতকগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, কক্ষ তাপমাত্রায় পানি তরল এবং শক্তিশালী দ্রাবক হওয়ায় প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার ও পরিবহণের (স্বল্প-দূরত্বের ব্যাপন এবং জাইলেম ও ফ্লোয়েমের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ-দূরত্ব চলাচল উভয় ক্ষেত্রেই) একটি ভাল মাধ্যম। কতকগুলো প্রক্রিয়ায়, যেমন সালোকসংশ্লেষণ এবং আর্দ্রবিশ্লেষণে পানি বিক্রিয়ক (reactant) হিসেবেও অংশগ্রহণ করে; আবার এর তাপীয় ধর্মাবলী তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে এবং এর অসংকোচনীয় বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদে বৃদ্ধি ও দৃঢ়তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পানির গঠনের জন্যই এর ধর্মাবলীর এত ভিন্নতা দেখা যায় (চিত্র ৪.১) এবং এটি হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোক্সিল আয়নে বিশ্লেষিত হয় যা সবসময়েই দ্রবণে থাকে। দুটি সহযোজী (covalent) O H বন্ধনীর মধ্যে কোণ (angle) এবং বন্ধনী বরাবর আধান বণ্টনের অপ্রতিসমতার জন্য আধানের সুস্পষ্ট মেরুপ্রবণতার সৃষ্টি হয় এবং এজন্যই পানি দ্বি-মেরু (dipole)। এই মেরুপ্রবণতার জন্যই পাশাপাশি পানির অণুর মধ্যে অথবা পানি এবং অন্যান্য অণুর মধ্যে তথাকথিত হাইড্রোজেন বন্ধনীর সৃষ্টি হয় (চিত্র ৪.১)। এই হাইড্রোজেন বন্ধনী দুর্বল হলেও (বন্ধনী শক্তি হলো মাত্র ~ ১০ কিলোজুল প্রতি অণুতে এবং এর তুলনায় সহযোগী O-H বন্ধনীর শক্তি ~ ৪৫০ কিলোজুল প্রতি অণুতে) এর জন্য তাৎপর্যপূর্ণ কাঠামো তৈরি হয়, এমন কি তরল পানির ক্ষেত্রেও।

অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনীর জন্যই অন্যান্য ক্ষুদ্র অণুর তুলনায় (যেমন অ্যামোনিয়া, মিথেন অথবা কার্বন ডাই-অক্সাইড) পানি অনেক কম তাপে তরল থাকে। পানিকে প্রায়-সুবিন্যস্ত তরল অবস্থা বজায় রাখতে হাইড্রোজেন বন্ধনী সাহায্য করে। তরল পানির সুবিন্যস্ততার একটি পরিমাপক হলো কঠিন বরফকে তরল পানিতে রূপান্তরে গলনের সুপ্ততাপ; তাপের পরিমাণ হলো ৬.০১ কিলোজুল প্রতি মোল. বরফের সবগুলো হাইড্রোজেন বন্ধনী ভাঙতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় এটি তার প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র।

পানির অণুগুলোর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধনীর দৃঢ়তা পানির শক্তিশালী সংশক্তি বল প্রদান করে। এই সংশক্তি বলের জন্য পানির পৃষ্ঠটান (surface tension) খুব বেশি। ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির পৃষ্ঠটানের পরিমাণ 7.28×10^{-2} নিউটন প্রতি মিটারে। পানির কৈশিক আরোহণে এবং মৃত্তিকার রন্ধ্র ও কোষ-প্রাচীরের সেলুলোজ-নির্মিত ম্যাট্রিক্সে পানি ধরে রাখতে পানির এই ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তরল পানি এবং কৈশিক দেয়ালের কঠিন দশার মধ্যে সংযুক্তি (adhesive) বল ও তরল পানির অণুর মধ্যে সংশক্তি (cohesive) বলের জন্য কৈশিক আরোহণ হয়। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের ম্যাট্রিক্সের রন্ধ্রের ব্যাসার্ধ প্রায় ৫ ন্যানোমিটার এবং এই ম্যাট্রিক্সের শোষণ বল হলো প্রায় ৩০ মেগাপ্যাসকেল (Mpa)। কোষ প্রাচীর থেকে পানি

বের করে আনতে এই পরিমাণ বলের প্রয়োজন। ৩০ মেগাপ্যাসকেল শোষণ করে পানি ৩ কিলোমিটার উঁচু একটি পানির স্তম্ভকে ধরে রাখতে সমর্থ। একইভাবে পানি সম্পৃক্ত মৃত্তিকার অভিকর্ষীয় পানি চুইয়ে যাওয়ার পর মৃত্তিকার যেসব রন্ধ্রের ব্যাস ৬০ মাইক্রোমিটারের কম, মাটির বলের জন্য তা পানিপূর্ণ থাকে (Russell, 1973)।

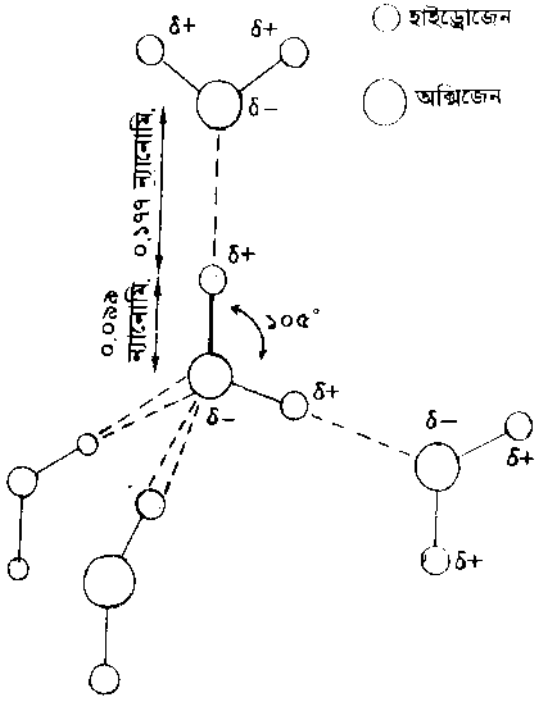

চিত্র ৪.১: পানির অণুর গঠন ; হাইড্রোজেনের নিট ধনাত্মক এবং অক্সিজেনের নিট ঋণাত্মক আধানের জন্য ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক আকর্ষণের জন্য হাইড্রোজেন বন্ধনী তৈরি হয়েছে।

প্রস্বেদনরত উদ্ভিদে পানি পরিবহণের সাথে পানির বিভিন্ন অণুর মধ্যে শক্তিশালী সংসক্তি বল সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। একটি অভগ্ন (unbroken) বিশুদ্ধ পানির স্তম্ভের তন্ত্রীয় প্রসারণীয় শক্তির (tensile strength) সর্বোচ্চ মান হাইড্রোজেন বন্ধনীর শক্তি থেকে নির্ণয় করা যায় এবং এই মান ১,০০০ মেগাপ্যাসকেলের) বেশি। তবে কখনো কখনো প্রায় ৩ মেগাপ্যাসকেলের বেশি প্রসারণীয় শক্তি পানির স্তম্ভকে ভেঙে ফেলে (Milburn, 1979)।

অণুগুলোর মধ্যে অস্বাভাবিক শক্তিশালী হাইড্রোজেন বন্ধনীর জন্য প্রত্যেক বড় অণুর মতো পানির অণু আচরণ করে (Bernal, 1965 ; Davis and Day, 1961)। যেমন পানির (আণবিক ওজন ১৮) গলনাঙ্ক ০° সেলসিয়াস এবং স্ফুটনাঙ্ক ১০০° সেলসিয়াস ; এর খুব নিকট সম্পর্কিত যৌগ হাইড্রোজেন সালফাইডের (আণবিক ওজন ৩৪) গলনাঙ্ক (-৮৬° সেলসিয়াস) এবং স্ফুটনাঙ্কের (-৬১° সেলসিয়াস) তুলনায় অস্বাভাবিক রকম বেশি। তাই স্বাভাবিক পরিবেশে পানি

সাধারণত তরল অবস্থায় থাকে, কিন্তু অন্যান্য ক্ষুদ্র অণুর যৌগ তরল অবস্থায় থাকে না। তবে পানি জমাট বেঁধে উদ্ভিদের নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। একই কারণে পানির আপেক্ষিক তাপ (C_p=৪১৮২ জুল প্রতি কেজি প্রতি ডিগ্রি কেলভিন) (আপেক্ষিক তাপ হলো অপরিবর্তনীয় চাপে ১ কেজি পানির ১° কেলভিন তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে যে তাপশক্তির প্রয়োজন) অনেক বেশি এবং তাপমাত্রার দ্রুত তারতম্যের সময় উদ্ভিদ দেহে এটি বাফারের (buffer) মতো কাজ করে। তেমনি পানির বাষ্পীভবনের লীন তাপের (=২.৪৫৪ মেগাজুল প্রতি কেজি ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়) অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় তাপমাত্রায় ১ কেজি তরল পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে যে তাপশক্তির প্রয়োজন। এতে পাতার শীতলীকরণ হয় (Gates, 1976)।

মেরুদেশীয় (polar) গঠনের জন্য পানির ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবকও বেশি (D= ৮০.২, ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়)। একটি অমেরুদেশীয় (non-polar) তরল পদার্থ, যেমন- হেক্সেনের তুলনায় এই মান ৪০ গুণেরও বেশি। কোনো মাধ্যমের বৈদ্যুতিক আধানগুলোর মধ্যে অপ্রবেশ্যতার পরিমাপক হলো ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক। তাই উচ্চ ডাইইলেকট্রিক মানসম্পন্ন কোনো বস্তু, বিভিন্ন অণুর মধ্যে আয়নিক আকর্ষণের শক্তিকে কমিয়ে দেয়। এই প্রভাবের জন্যই পানি অত্যন্ত শক্তিশালী দ্রাবক এবং অনেক প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য ভাল মাধ্যম। পানির অন্যান্য ধর্ম, যেমন- হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোক্সাইল আয়নে বিশ্লেষিত হওয়া, এর বর্ণালী বিশোষণতা, কঠিন অবস্থার (বরফ) বৈশিষ্ট্যাবলী অনেক গুরুত্বপূর্ণ শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে।

পাতার পানির পটেনশিয়াল (Leaf Water Potential)

কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্ভিদে কি পরিমাণ পানি আছে তা জানলেই যথেষ্ট। তবে সাধারণভাবে উদ্ভিদে পানির পরিমাণ জানার জন্য পানির পটেনশিয়াল পরিমাপ করা হয়; এটি হলো কাজ করার জন্য মুক্ত শক্তি প্রাপ্যতার পরিমাণ। পানির পটেনশিয়ালকে পানির রাসায়নিক পটেনশিয়াল হিসেবে প্রকাশ করা হয়। রাসায়নিক পটেনশিয়ালের একক হলো শক্তির একক (যেমন জুল প্রতি অণুতে), কিন্তু শারীরবিজ্ঞানে একে চাপের এককে প্রকাশ করা হয়। এটি পাওয়া যায় রাসায়নিক পটেনশিয়ালকে পানির আংশিক মোলাল আয়তন (V_w=১৮.০৫×১০$^{-৬}$ ঘনমিটার প্রতি অণু, ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়) দ্বারা ভাগ করে এবং পানির পটেনশিয়ালকে নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় :

$$\psi = \frac{\mu w - \mu_0 w}{V w} \quad \text{.................. (৪.১)}$$

এক্ষেত্রে, μw হলো পানির রাসায়নিক পটেনশিয়াল এবং $\mu_0 w$ হলো একই উচ্চতায়, তাপমাত্রায় এবং চাপে রেফারেন্স অবস্থায় বিশুদ্ধ, মুক্ত পানির রাসায়নিক পটেনশিয়াল। মুক্তভাবে লভ্য পানির পটেনশিয়াল শূন্য এবং পানি ঘাটতি হলে এটি কমতে থাকে এই মান ঋণাত্মক সংখ্যা হয়। তাই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উচ্চ পটেনশিয়াল বলতে বোঝায় কম ঋণাত্মক মান। যদিও প্রায়ই পানির পটেনশিয়ালের একক হিসেবে বার (bar) ব্যবহৃত হয়, তথাপিও এর উপযুক্ত আন্তর্জাতিক একক হলো প্যাসকেল (pascal) (১ প্যাসকেল = ১ নিউটন প্রতি বর্গমিটারে=১০$^{-৫}$ বার) ; সুতরাং পানির পটেনশিয়ালকে মেগাপ্যাসকেল (Mpa) (১ মেগাপ্যাসকেল =১০ বার) হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

পানির মোট পটেনশিয়ালকে নিম্নলিখিত কয়েকটি উপাদানে ভাগ করা যায় :

$$\psi w = \psi p + \psi \pi + \psi m + \psi g \quad \text{.............. (৪.২)}$$

এক্ষেত্রে, ψp, $\psi \pi$, ψm এবং ψg হলো যথাক্রমে চাপ (pressure), অসমোটিক, ম্যাট্রিক এবং অভিকর্ষীয় (gravitational) পটেনশিয়াল।

চাপ উপাদান (ψ_p) হলো রেফারেন্স থেকে হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপের পার্থক্য এবং এটি ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক হতে পারে। দ্রবীভূত দ্রবের (solute) জন্য পানির মুক্ত শক্তি হ্রাসের মাধ্যমে অসমোটিক উপাদানের (ψ_Π) উদ্ভব হয় এবং এর মান সর্বদাই ঋণাত্মক। Van't Hoff-এর তত্ত্ব ব্যবহার করে অনেক জৈবিক (biological) দ্রবণের নিম্নলিখিত সম্পর্ক পাওয়া যায় :

$$\psi_\Pi = RTC_S \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (৪.৩)$$

এক্ষেত্রে C_S হলো দ্রবের ঘনমাত্রা যা প্রতি ঘনমিটার দ্রাবকে মোলের সংখ্যা (অথবা আরো সঠিকভাবে প্রতি ১০^৩ কেজি দ্রাবকে মোলের সংখ্যা) : সাধারণভাবে, অনেক উদ্ভিদের অসমোটিক পটেনশিয়াল হলো প্রায় –১ মেগাপ্যাসকেল। ৪.৩ নং সমীকরণ ব্যবহার করে এবং ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় RT এর মান (২৪৩৭ জুল প্রতি মোলে) প্রতিস্থাপিত করে কোষ রসের সম্পূর্ণ দ্রবের ঘনমাত্রা হবে (–১০^৬/২৪৩৭) ≅ ৪১০ অসমোল (osmole) প্রতি ঘনমিটারে। একটি অসমোল একটি মোলের মতোই, এতে অ্যাভোগ্যাড্রো সংখ্যক অসমোটিক্যালি সক্রিয় কণা থাকে। যেমন ১ মোল সোডিয়াম ক্লোরাইডে ২ অসমোল থাকে।

কঠিন বস্তুর পৃষ্ঠতলের বলের জন্য অর্থাৎ ম্যাট্রিক বলের জন্য ম্যাট্রিক পটেনশিয়াল (ψ_m) উদ্ভব হয় এবং এর মান ঋণাত্মক। কখনো কখনো ψ_Π এবং ψ_m –এর পার্থক্য করা কঠিন, কারণ কণাগুলো দ্রব কিংবা কঠিন বস্তু তা পার্থক্য করা দুষ্কর। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই ψ_mকে ψ_Π –এর সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

রেফারেন্স থেকে উচ্চতার পার্থক্যের জন্য সৃষ্ট পটেনশিয়াল শক্তির পার্থক্যের ফলে অভিকর্ষীয় উপাদানের উপাদানের (ψ_g) উদ্ভব হয়, এবং রেফারেন্সের উপরে হলে এটি ঋণাত্মক এবং নিচে হলে ঋণাত্মক। যদিও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এর মান শূন্য ধরা হয়, তথাপিও ভূপৃষ্ঠ হতে প্রতি এক মিটার উচ্চতার জন্য এর মান ০.০১ মেগাপ্যাসকেল করে বৃদ্ধি পায়, এজন্য সুউচ্চ উদ্ভিদে পানি চলাচলের সময় এটিকে গণ্য করা উচিৎ।

উদ্ভিদ কোষে পানির সম্পর্ক

উদ্ভিদ কোষের অর্ধভেদ্য কোষ ঝিল্লী দ্বারা আবৃত প্রোটোপ্লাস্ট অসমোমিটারের ন্যায় আচরণ করে। যেহেতু কোষ ঝিল্লী দিয়ে পানি অপেক্ষাকৃত দ্রুত প্রবেশ করতে পারে, সেহেতু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পরিবেশের সাথে কোষের পানির পটেনশিয়াল সাম্যাবস্থায় পৌঁছায়। উদ্ভিদ কোষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এদের অপেক্ষাকৃত দৃঢ় এবং প্রসারণে বাধাদানকারী কোষ–প্রাচীর আছে। উদ্ভিদ কোষের পানির পটেনশিয়ালের দুটি প্রধান উপাদান হলো অসমোটিক এবং চাপ পটেনশিয়াল, সুতরাং

$$\psi_w = \psi_p + \psi_\Pi \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (৪.৪)$$

চাপ পটেনশিয়াল (ψ_p) হলো কোষ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে এবং বাইরের পটেনশিয়ালের পার্থক্য। এটি সাধারণত ধণাত্মক এবং এটি রসস্ফীতি (turgor) চাপ নামে পরিচিত। কোষ কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রবের জন্য, পানির মোট পটেনশিয়াল হ্রাসের সাথে সাথে রসস্ফীতি চাপও হ্রাস পায়। প্রস্বেদনরত পাতার পানির পটেনশিয়াল – ০.৫ এবং ৩.০ মেগাপ্যাসকেলের মধ্যে।

Hofler-Thoday চিত্রের (চিত্র ৪.২) সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে উদ্ভিদ কোষের (এবং কলার) পানির সম্পর্ক বর্ণনা করা যায়। কোষের পানি হারানোর সাথে সাথে কোষের আয়তন, ψ_w, ψ_Π এবং ψ_p এর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক এই চিত্রে দেখানো হয়েছে। পূর্ণ

রসস্ফীতি কোষে $\psi_w=0$, তাই $\psi_\Pi = -\psi_p$। এই বিন্দুতে পানির পরিমাণ যা পূর্ণ রসস্ফীতি অবস্থায় পানির পরিমাণের ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হয় (একে বলে আপেক্ষিক পানির পরিমাণ, relative water content,θ)। পানি হারানোর জন্য কোষের আয়তন কমে যায়, তাই কোষ প্রাচীরের স্থিতিস্থাপক প্রসারণের জন্য সৃষ্ট রসস্ফীতি চাপ কোষের আয়তনের সাথে প্রায় একই অনুপাতে হ্রাস পেতে থাকে যতক্ষণ না রসস্ফীতি চাপ শূন্য হয় (যখন $\psi_p=0$)। কোষের আয়তন হ্রাসের সাথে সাথে অসমোটিক পটেনশিয়ালও হ্রাস পায়। রসস্ফীতি চাপ শূন্য হলে সাধারণত উদ্ভিদ মিইয়ে পড়ে (wilting)।

কোষ প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা ৪.২ নং চিত্রের কার্ভের আকৃতি নির্ধারণ করে। যদি কোষ প্রাচীর খুব দৃঢ় হয়, তাহলে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি ঘাটতির জন্য পানির পটেনশিয়াল এবং এর উপাদানগুলোর অপেক্ষাকৃত দ্রুত পরিবর্তন হয়।

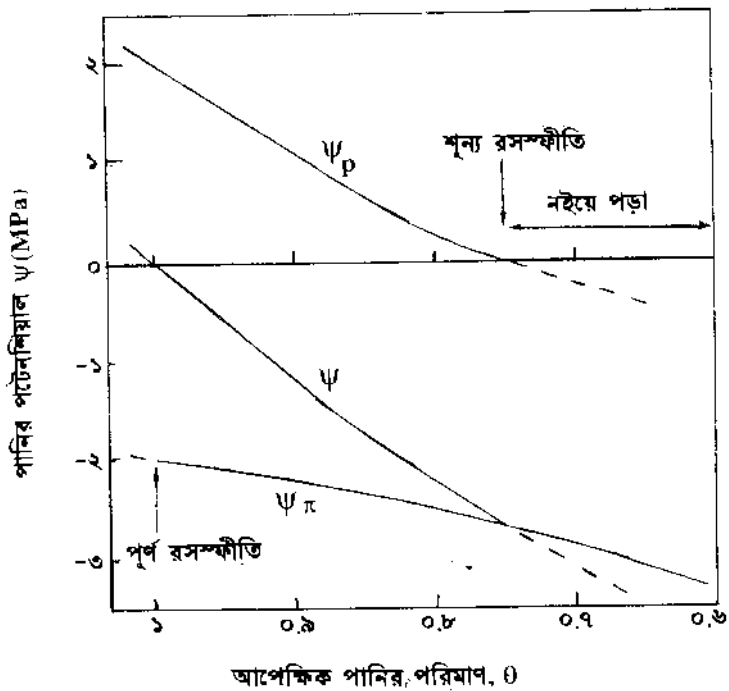

চিত্র ৪.২ : পূর্ণ রসস্ফীতি একটি কোষ কিংবা কলা থেকে পানি হ্রাসের সাথে সাথে মোট পানি পটেনশিয়াল (ψ_w), চাপ পটেনশিয়ালে (ψ_p), অসমোটিক পটেনশিয়ালে (ψ_Π) এবং আপেক্ষিক পানির পরিমাণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক Hoffer-Thoday চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

একক কোষের জন্য Hoffer-Thoday চিত্র উপযুক্ত। কোনো কলায় বিভিন্ন কোষের আকার, আকৃতি, কোষ প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা এবং দ্রব্যের পরিমাণের ভিন্নতা আছে। উপরন্তু পার্শ্ববর্তী কোষগুলো পরস্পরের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য কলার চাপ উপাদান আছে। এসত্ত্বেও, কোনো জটিল কলার সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করতে এই চিত্র ব্যবহার করা সম্ভব।

কোষ প্রাচীরে এবং প্রধান দীর্ঘ দূরত্ব পরিবহণ পথ জাইলেমে সাধারণ খুব কম পরিমাণে দ্রব থাকে, তাই এদের পানির পটেনশিয়াল ০.১ মেগাপ্যাসকেলের কম। জাইলেম নালিকায় ψ_w এর প্রধান উপাদান হলো চাপ যা খুব বেশি ঋণাত্মক মানে পৌঁছতে পারে (খুবই বেশি পানি ঘাটতি মরুজ উদ্ভিদে এই মান–৫.০ মেগাপ্যাসকেলের নিচে)। জাইলেম ভেসেল খুব দৃঢ় হওয়ায় খুব বেশি বিকৃতি না হয়েও এরা এই পীড়ন সহ্য করতে পারে।

মৃত্তিকা কর্তৃক পানি সরবরাহ (Supply of Water by the Soil)

মরু অঞ্চলের উদ্ভিদের জন্য পাতা দ্বারা শোষিত বৃষ্টির পানির ও শিশিরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তবে অধিকাংশ স্থলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা থেকে মূল দ্বারা শোষিত পানির তুলনায় এদের গুরুত্ব খুবই কম।

মৃত্তিকায় পানির পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করে আবহাওয়াজনিত প্রকরণের উপর, বিশেষ করে বাষ্পীয় প্রস্বেদনের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাতের (P–E) উপর। আর্দ্র ও শুষ্ক অঞ্চলের মধ্যবর্তী এলাকায় মৃত্তিকার পানি কেবল বাৎসরিক (P–E)- এর উপর নির্ভরশীল নয়, বছরব্যাপী বৃষ্টিপাতের বণ্টনও গুরুত্বপূর্ণ।

কোনো এলাকায় উদ্ভিদ কর্তৃক পরিশোষণের জন্য পানির প্রাপ্যতা মৃত্তিকার কতকগুলোর বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল (দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। দীর্ঘসময় স্থায়ী বৃষ্টিপাতের পর যখন মৃত্তিকা পানিতে সম্পৃক্ত হয়, তখন মৃত্তিকার রন্ধ্রগুলো সাময়িকভাবে পানিতে পূর্ণ থাকে। তবে উদ্ভিদের ব্যবহারের জন্য এই পানির সবটুকু মুক্ত নিষ্কাশিত মৃত্তিকা ধারণ করতে পারে না।

যেহেতু মৃত্তিকার পানিতে সাধারণত দ্রব্যের পরিমাণ খুব কম থাকে, যেহেতু রন্ধ্রে পানি ধারণ করার প্রধান বল হলো ম্যাট্রিক বল, যা রন্ধ্রের ব্যাস বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। যেমন ১০ মাইক্রোমিটার ব্যাসের মৃত্তিকার রন্ধ্রের ধারণকৃত বিশুদ্ধ পানির পটেনশিয়াল ০.০৩ মেগাপ্যাসকেল, এই রন্ধ্র থেকে পানি গ্রহণের জন্য কমপক্ষে ০.০৩ মেগাপ্যাসকেল চোষণ (suction) বলের প্রয়োজন হবে। একইভাবে, যেহেতু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রায় ৫ কিলোপ্যাসকেল মতো শোষণ শক্তির সমতুল্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রয়োগ করে (Webster and Beckett, 1972), সেহেতু মৃত্তিকা পানিতে সম্পৃক্ত হওয়ার পর ৬০ মাইক্রোমিটারের অধিক ব্যাসের সকল রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পানির চোয়ানো হবে। মুক্তভাবে নিষ্কাশিত মৃত্তিকায় এই চোয়ানো দুই থেকে তিন দিন পর্যন্ত চলতে পারে, এবং এটি শেষ হওয়ার পর মৃত্তিকা ফিল্ড ক্যাপাসিটিতে থাকে। অভিকর্ষীয় পানি সাধারণত উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে না, যদি না চোয়ানো বাঁধাপ্রাপ্ত হয়।

প্রস্বেদনের মাধ্যমে পাতা থেকে পানি বের হয়ে যাওয়ার জন্য উদ্ভিদ-মৃত্তিকা সিস্টেম বরাবর পানির পটেনশিয়ালের একটি গ্রেডিয়েন্ট স্থাপিত হয়। যদি সন্নিকটবর্তী মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়ালের তুলনায় মূলের জাইলেমের পানির পটেনশিয়াল কমে যায়, তাহলে মূলে পানি প্রবেশ করে এবং জাইলেমের মধ্য দিয়ে তা প্রস্বেদনরত অঙ্গে (পাতা) পৌঁছায়। সুতরাং মৃত্তিকার পানি উদ্ভিদের জন্য লভ্য হবে যদি মূলের জাইলেমের পটেনশিয়াল (এবং পরিশেষে পাতার পানির পটেনশিয়াল) মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়ালের চেয়ে কম হয়। –৩ মেগাপ্যাসকেল পটেনশিয়ালেও মৃত্তিকার রন্ধ্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পানি থাকে, কিন্তু এই পানির সবটুকু শোষণ করতে পাতার পানির পটেনশিয়াল এত কমাতে হবে যা খুব সংখ্যক উদ্ভিদ সহ্য করতে পারে।

অধিকাংশ শস্য উদ্ভিদ প্রায় ০.২ মাইক্রোমিটারের বেশি রন্ধ্র থেকে পানি শোষণ করতে পারে যা –১.৫ মেগাপ্যাসকেল পানির পটেনশিয়ালের অনুরূপ। এই রন্ধ্রের সমস্ত পানি পরিশোষণের পর

যখন পাতায় পাঠানোর মতো আর পানি থাকে না, তখন উদ্ভিদ স্থায়ীভাবে মিইয়ে পড়ে এবং মারা যায়, যদি মৃত্তিকায় পানি প্রয়োগ করা না হয়। ফিল্ড ক্যাপাসিটি এবং স্থায়ী উইল্টিং বিন্দুর মধ্যবর্তী পানিই হলো লভ্য পানি।

মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ কর্তৃক পরিশোষণের জন্য লভ্য পানির পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করে মৃত্তিকার রন্ধ্রের পরিসরের উপর। এটি আবার মৃত্তিকার বুনট ও গঠনের উপর নির্ভরশীল। মোটা বুনটের মৃত্তিকার তুলনায় মধ্যম থেকে সূক্ষ্ম বুনটের মৃত্তিকা উদ্ভিদের ব্যবহারের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি পানি ধারণ করতে পারে (চিত্র ৪.৩)। পানির সান্দ্রতার উপর ক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্তিকার তাপমাত্রা ও পানি লভ্যতার উপর প্রভাব আছে। ফিল্ড ক্যাপাসিটি সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনায় ধরে নেয়া হয়েছে যে, ৬০ মাইক্রোমিটারের বেশি ব্যাসের রন্ধ্রের ভেতর দিয়ে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পানি চুঁইয়ে যায়। যুক্তরাজ্যে শীত ও বসন্তকালের মাঠের মৃত্তিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন (Webster abd Beckett, 1972)। কিন্তু Russell (1973) নিরূপণ করেছেন যে, অর্ধ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের উষ্ণ আবহাওয়ায় পানির সান্দ্রতা কমে যাওয়ায় এবং মুক্তভাবে পানি চোয়ানোর জন্য ১০ মাইক্রোমিটার ব্যাসের রন্ধ্রের ভেতর দিয়ে পানি চোয়াতে পারে। রন্ধ্রের আকারের উপর নির্ভর করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লভ্য পানি কমে যেতে পারে। মৃত্তিকার পানিতে দ্রব্যের পরিমাণ বেড়ে গেলে মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়াল কমে যায়, তাই পরিশোষণের জন্য লভ্য পানিও হ্রাস পায়। লবণাক্ত মৃত্তিকায় এই প্রভাব খুব বেশি হয়।

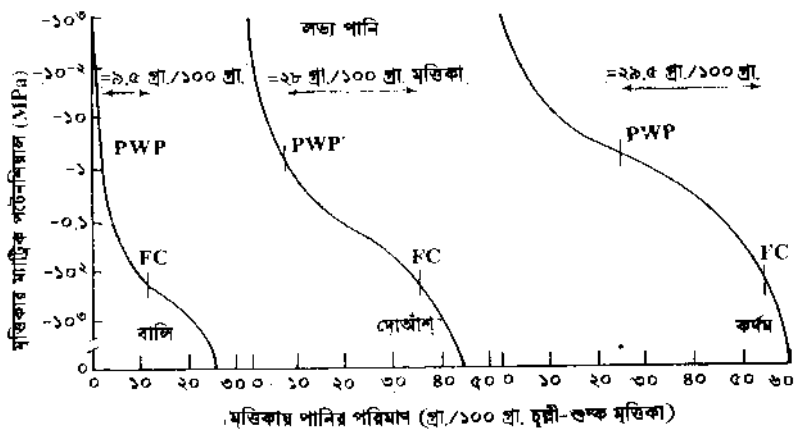

চিত্র ৪.৩ : বেলে, দোআঁশ এবং কর্দম মৃত্তিকার পানি যুক্তকরণ কার্ভ। FC=ফিল্ড ক্যাপাসিটি, PWP=স্থায়ী উইল্টিং বিন্দু। উল্লেখ্য যে, যদিও দো-আঁশ এবং কর্দম মৃত্তিকার লভ্য পানির পরিমাণ প্রায় একই রকম, দো-আঁশ মৃত্তিকায় এই পানির অধিকাংশ অংশ-০.১ মেগাপ্যাসকেলের বেশি ম্যাট্রিক পটেনশিয়ালে (অর্থাৎ চওড়া রন্ধ্রে) ধৃত থাকে।

কেবল সক্রিয়ভাবে পরিশোষণকারী মূলের অব্যবহিত সান্নিধ্য থেকেই উদ্ভিদ পানি পরিশোষণ করে না। মূলের সন্নিকটবর্তী পানি পরিশোষণের সাথে সাথে একটি নিঃশেষকরণ (depletion) অঞ্চল তৈরি হতে থাকে (Hain sworth and Aylmore,1986), ফলে মূলের পৃষ্ঠ

হতে কমপক্ষে কয়েক মিলিমিটার দূরে পানি প্রবাহিত হয়। একই সঙ্গে বড় রন্ধ্র থেকে পানি গ্রহণের জন্য মৃত্তিকা দিয়ে যে পানি প্রবাহিত হয় তার আয়তন কমতে থাকে। এর জন্য মৃত্তিকার হাইড্রোলিক পরিবাহকতা কমে যায়। ফলে ক্রমাগত শুকিয়ে যাওয়া মৃত্তিকা থেকে মূল কর্তৃক অব্যাহতভাবে পানি পরিশোষণের জন্য মূলের জাইলেম ও মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট বজায় রাখতে জাইলেমের পানির পটেনশিয়াল ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে।

মাটি থেকে মূল কর্তৃক পানি পরিশোষণ (Absorption of Soil Water by Roots)

স্থলজ উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা বায়ুমণ্ডলে থাকে এবং ক্রমাগত পানি ত্যাগ করে যা মূলের মাধ্যমে মৃত্তিকা থেকে পরিশোষণ করে পূরণ হয়। পানি সমতার (water balance) ক্ষেত্রে, প্রস্বেদন, পানি পরিশোষণ এবং মূল থেকে প্রস্বেদনকারী অঙ্গে পানি পরিবহণ প্রক্রিয়াগুলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। বায়ুর বাষ্প চাপের ঘাটতি (VPD, সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ প্রকৃত বাষ্প চাপ) বাষ্পীভবনের চালিকা শক্তি এবং মৃত্তিকার পানির পরিমাণ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদ তার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ (surface) বরাবর পানি পরিশোষণ করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ পানি মৃত্তিকা সরবরাহ করে। তাই উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদে বিশেষভাবে তৈরি মূলের উপর এই পানি পরিশোষণের কাজটি অর্পিত হয়েছে।

মূলতন্ত্রের বিস্তার (Extent of root system)

যদিও শস্য উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকার ১ থেকে ৩ মিটার গভীরে প্রবেশ করতে পারে, তবে মৃত্তিকার উপরের স্তরে মূলের পরিমাণ বেশি থাকে (সারণি ৪.১)। প্রতি একক আয়তনের মৃত্তিকায় মূলের দৈর্ঘ্য (R_V) হিসেবে মূলের পরিমাণ প্রকাশ অধিক তর সুবিধাজনক। সুপ্রতিষ্ঠিত শস্যে, ধরা যাক পুষ্পায়নের সময়, মৃত্তিকার উপরের ১৫ সেন্টিমিটারে মূল থাকতে পারে, এবং গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি কমতে কমতে ৮০ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার স্তরে প্রায় ০.৫ সেন্টিমিটার হতে পারে। এরকম একটি শস্য উদ্ভিদে প্রতি বর্গমিটার ভূমিতে প্রায় ২০ কিলোমিটার মূল থাকে।

সারণি ৪.১ : মাঠে প্রতিষ্ঠিত শস্য উদ্ভিদের মূলের পরিমাণ, R_V (প্রতি একক আয়তনে মূলের দৈর্ঘ্য)

প্রজাতি	গভীরতা (সেন্টিমিটার)	R_V (সেন্টিমিটার$^{-2}$)
Poa pratensis	০–১৫	৫০
ঘাস	০–১০	৩০–৫০
জই	০–১৫	৫–১৫
	১৫–৫০	৪
	৭৫–১০০	২
গম	০–১৫	৮
	১৫–২৫	৩
	২৫–৫৫	১
	৫৫–১০০	০.৬
ধান	০–১০	৩.০
	১০–২০	১.২
	২০–৫০	০.৯
	৫০–১০০	০.৫
	১০০–১৩০	০.১
Medicago sativa	০–১০	২০
Glycine max	০–১৫	৪
Camellia sinensis	০–২.৫	৪
	৪৫–৪৭.৫	১
	৬৮.৫–৭০.০	০.৫

চারা অঙ্কুরোদ্গমের ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে ঘনভাবে বোনা গম শস্যের মূল ৪০ থেকে ৫০ সেন্টিমিটার নিচে চলে যেতে পারে এবং মূলের পরিমাণ পূর্বে বর্ণিত মানের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। পুষ্পায়নের পর মূল সাধারণত কিছুটা দীর্ঘ হয় এবং দানা ভর্তির (grain filling) সময় কিছু মূল নষ্ট হয়। অধিকাংশ মূলের ব্যাসের পরিসর প্রায় ৫×১০^{-২} (প্রাইমারি) থেকে $১০^{-২}$ সেন্টিমিটার (টারশিয়ারি)।

মূল কর্তৃক পানি পরিশোষণ

শস্য উদ্ভিদ ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্তিকা থেকে পানি পরিশোষণ করে যতক্ষণ মৃত্তিকার দ্রবণের তুলনায় মূল রোম এবং সূক্ষ্ম মূলের পানির পটেনশিয়াল অধিক ঋণাত্মক থাকে। মূলতন্ত্রের পরিশোষণকারী পৃষ্ঠ বেশি হলে এবং মূল দ্রুত মৃত্তিকার পানির সংস্পর্শে আসলে পানি পরিশোষণও বেশি হয়।

Gardner (1960)-এর সূত্র অনুসারে–

$$\text{পানি পরিশোষণ} = A\frac{\Psi_{\text{মৃত্তিকা}}-\Psi_{\text{মূল}}}{\sum r} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (৪.৫)$$

অর্থাৎ প্রতি একক সময়ে মূল কর্তৃক পরিশোষিত পানির পরিমাণ মূল এবং মৃত্তিকার বিনিময় পৃষ্ঠ তলের আয়তনের (A) (অর্থাৎ প্রতি একক আয়তনের মৃত্তিকায় সক্রিয় মূলের ক্ষেত্রফল) এবং মূল ও মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়ালের পার্থক্যের সাথে সমানুপাতিক ও মৃত্তিকার অভ্যন্তরে এবং মৃত্তিকা হতে মূলের পথে পানি চলাচলের রোধকের (r) সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিভিন্ন শস্যে সক্রিয় মূলের পৃষ্ঠের পরিমাণ প্রায় প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১ বর্গসেন্টিমিটার এবং কাষ্ঠল উদ্ভিদে প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে প্রায় ০.১ বর্গসেন্টিমিটার। মূলের কোষরসের ঘনত্ব সাধারণত বেশি থাকে এবং এর জন্য পানির পটেনশিয়াল মাত্র কয়েক বার (bar) হয় এবং মৃত্তিকার অধিকাংশ কৈশিক পানি পরিশোষণে এটি যথেষ্ট। যদি মূলের পানির পটেনশিয়াল মাত্র –২ বার (bar) হয়, তাহলে বেলে মৃত্তিকায় সঞ্চিত পানির দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি পানি পরিশোষিত হবে। কর্দম মৃত্তিকার রন্ধ্রগুলো খুব সূক্ষ্ম হওয়ায় বেশি পানি ধরে রাখে; যদি মূলের পানির পটেনশিয়াল মাত্র ৬ বার (bar) হয়, তাহলে কৈশিক পানির অর্ধেক পরিশোষিত হয়। কতিপয় উদ্ভিদ তাদের পানির পটেনশিয়াল ও মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়ালের পার্থক্য আরো কিছুটা বৃদ্ধি করতে পারে, এর জন্য বেশি পানি পরিশোষিত হয়। বেলে মৃত্তিকার রন্ধ্র সামান্য টানে (tension) ভেঙে যায়, এর জন্য মৃত্তিকার নিচে থেকে পানি সরবরাহ ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়। কর্দম মৃত্তিকার কৈশিকতা খুব সূক্ষ্ম, তাই টান খুব বেশি হলেও পানি পুনঃস্থাপিত হয়, কিন্তু পানি খুব মন্থর গতিতে চলাচল করে এবং খুব কম দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে (কয়েক মিলিমিটার থেকে কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত)। যখন মূলের সান্নিকটের অনায়াসসাধ্য লভ্য পানি নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন পানির সন্ধানে মূলের বৃদ্ধি হয় এবং মূলের সক্রিয় পানি পরিশোষণকারী ক্ষেত্রফল বেড়ে যায়। মৃত্তিকার অগ্রসর মান শুষ্কতার সাথে সাথে মূলতন্ত্রের কিছু অংশ শুকিয়ে মরে যেতে পারে এবং কিছু অংশের বৃদ্ধি খুব দ্রুত হতে পারে। শুষ্ক এলাকায় জন্মানো উদ্ভিদে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এভাবে এমন একটি অবস্থা আসতে পারে যখন মৃত্তিকার পানির সকল উৎসই শেষ হয়ে যায়। তখন উদ্ভিদ মিইয়ে পড়ে, এমন কি রাতেও স্বাভাবিক হয় না অথবা বাষ্পীয়ভবনের হাত থেকে রক্ষা করলেও নয় (যেমন–পলিথিনের ব্যাগ দিয়ে আবৃত করলে)। এই অবস্থাকে বলা হয় স্থায়ী উইল্টিং। বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের স্থায়ী উইল্টিং বিন্দু –০.৭ থেকে –০.৮ মেগাপ্যাসকেল মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়ালের

সমতুল্য ; অধিকাংশ শস্য উদ্ভিদের এই মান –১.০ থেকে –২.০ মেগাপ্যাসকেল এবং কচ্ছল উদ্ভিদের –২.০ থেকে–৩.০ মেগাপ্যাসকেল।

উদ্ভিদে পানি পরিবহণ (Conduction of Water in Plants)

উদ্ভিদে পানির পথ (Path of water in plants)

উদ্ভিদে প্রস্বেদনীয় ফ্লাক্স ৪.৪ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। জাইলেম হলো উদ্ভিদে দৈর্ঘ্য বরাবর পানি প্রবাহের প্রধান পথ ; এক্ষেত্রে অজীবন্ত, স্থূল প্রাচীরযুক্ত ভেসেল বা ট্রাকিয়া এবং ট্রাকিড পরিবহণ কলার উপাদান। ভেসেলের মধ্যপ্রাচীর থাকে না এবং ভেসেলগুলো পর পর জোড়া লেগে একটি অবিচ্ছিন্ন নালিকার সৃষ্টি করে যার দৈর্ঘ্য কয়েক সেন্টিমিটার থেকে কয়েক মিটার এবং ব্যাস প্রায় ২০ মাইক্রোমিটার থেকে ৫০০ মাইক্রোমিটার। অপরপক্ষে, একটিমাত্র কোষ থেকে ট্রাকিডের উৎপত্তি হয় এবং এর ব্যাস প্রায় ১৫ মাইক্রোমিটার থেকে ৮০ মাইক্রোমিটার।

মূলের কর্টেকীয় কলার ভেতর দিয়ে মৃত্তিকা থেকে পানি অংশত কোষ প্রাচীরের পানিপূর্ণ মুক্ত স্থান (free space) দিয়ে এবং অংশত সিমপ্লাজম (symplasm.কোষ ঝিল্লীর ভেতরে সংযুক্ত প্রোটোপ্লাজম) দিয়ে জাইলেমে প্রবেশ করে। সিমপ্লাজমের আলাদা কোষগুলো প্লাজমোডেজমাটার সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। জাইলেম নালিকাসমূহ কোষ –ঝিল্লীর বাইরে পানিপূর্ণ স্থানকে অ্যাপোপ্লাস্ট বলে। মূলের কর্টেক্স এবং পরিবহণ কলার মধ্যে এন্ডোডার্মিস আছে। এর প্রাচীর সুবেরিনযুক্ত হওয়ায় (ক্যাসপেরিয়ান স্ট্রিপ) কোষ প্রাচীরের ভেতর দিয়ে পানি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং এখানে সকল পানি কোষ–ঝিল্লীর ভেতর দিয়ে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং এর ভেতর দিয়েই পানির পরিবহণ হয়। পরিবহণ কলার প্যারেনকাইমা কোষে মূলজ চাপের (root pressure) উদ্ভব হয় এবং বিপাকীয় শক্তির বিনিময়ে পানি (খনিজ মৌলসহ) অধিকতর দ্রুত গতিতে ভেসেলে প্রবেশ করে। পাতায় জাইলেম নালিকা সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত থাকে এবং এদের শীর্ষে অবস্থিত ট্রাকিডের মাধ্যমে পানি শিরার চারদিকে প্যারেনকাইমা কোষে পৌঁছায় এবং এখান থেকে ব্যাপনের মাধ্যমে মেসোফিল কলায় পৌঁছায়।

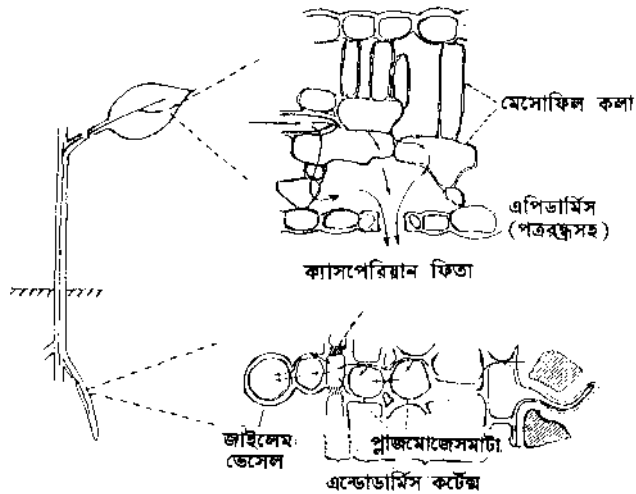

চিত্র ৪.৪ : মৃত্তিকা থেকে পাতায় পানি প্রবাহের পথ : মূল ও পাতার সিমপ্লাস্ট এবং কোষ প্রাচীরের ভেতর দিয়ে (অ্যাপোপ্লাস্ট) সম্ভাব্য পথ দেখানো হয়েছে।

পানি পরিবহণের চালিকা শক্তি পানির পটেনশিয়ালের পার্থক্য

মৃত্তিকা এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে পানির পটেনশিয়ালের গ্রেডিয়েন্টের জন্য উদ্ভিদের উর্ধ্বদিকে পানি পরিবহণ হয়। এতে মূলজ চাপের কিছুটা অবদান আছে ; পানির পটেনশিয়ালের অন্যান্য উপাদান অপর্যাপ্ত হলে (যেমন - অধিক আর্দ্রতা) মূলজ চাপ কাজ করে। ভূ-নিম্নস্থ মূলের তুলনায় বিটপ অনেক বেশি বাষ্প চাপের ঘাটতির সম্মুখীন (resistances) জাইলেম নালিকার মাধ্যমে পাতা থেকে মূল পর্যন্ত পানির পটেনশিয়ালের গ্রেডিয়েন্ট সৃষ্টি করে ; কোষের পানির পটেনশিয়াল উদ্ভিদের গোড়া থেকে অগ্রভাগ (top) পর্যন্ত অধিকতর ঋণাত্মক। পরিবহণ সিস্টেমের (vessel) প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফল বেশি হলে, প্রতি একক সময়ে প্রবাহিত পানির পরিমাণ বেশি হয়। একটি বিটপের অথবা পত্রবৃন্তের (petiole) পরিবহণ সিস্টেমের ক্ষেত্রফল হলো সবগুলো জাইলেম উপাদানের প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফলের সমষ্টি। সাধারণত সরবরাহকৃত উদ্ভিদ অঙ্গের ওজনের প্রেক্ষিতে পরিবহণ সিস্টেমের ক্ষেত্রফল উল্লেখ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ পত্রবৃন্তের পরিবহণ সিস্টেমের ক্ষেত্রফল প্রকাশ করা হয় প্রতি একক পাতার সজীব ওজন হিসেবে, কাণ্ডের ক্ষেত্রে বিটপের সম্পূর্ণ ওজনের তুলনায় ক্ষেত্রফল। যে সমস্ত উদ্ভিদের প্রস্বেদনের হার বেশি, তাদের আপেক্ষিক পরিবহণ সিস্টেমের ক্ষেত্রফল বেশি। কতগুলো মরুজ উদ্ভিদের আপেক্ষিক পরিবহণ সিস্টেমের ক্ষেত্রফল প্রতি গ্রামে ২ থেকে ৩ বর্গমিলিমিটার। অধিকাংশ কাষ্ঠল উদ্ভিদে এবং ছায়াজ উদ্ভিদের (sciophyte) আপেক্ষিক পরিবহণ সিস্টেমের ক্ষেত্রফল প্রতি গ্রামে ০.৫ বর্গমিলিমিটারের কম। জলজ উদ্ভিদ এবং রসালো উদ্ভিদের আপেক্ষিক পরিবহণ সিস্টেমের ক্ষেত্রফল খুবই কম। আবার একটি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশেও এর পার্থক্য আছে। বৃক্ষের গোড়া থেকে অগ্রভাগের দিকে এটি বৃদ্ধি পায়, তাই অগ্রভাগের বিটপ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। দীর্ঘ দূরত্বে পানি পরিবহণে এভাবে ক্ষতিপূরণ হয়।

পরিবহণ রোধক (Conduction resistance)

প্রস্বেদন প্রবাহ উদ্ভিদের গোড়া থেকে অগ্রভাগের দিকে ওঠার সময় কতকগুলো রোধক অতিক্রম করে। প্রবাহ পথের জটিলতার কারণে (চিত্র ৪.৪ এবং ৪.৫), স্টেডি-স্টেট প্রবাহ সাধারণত সরলীকৃত রোধক মডেল (চিত্র ৪.৫) অনুসারে ব্যাখ্যা করা হয়। Van den Honert (1948) কে অনুসরণ করে অনেক গবেষক এমন একটি সিস্টেম হাইড্রোলিক হিসেবে উদ্ভিদকে গণ্য করেছেন যা হাইড্রোলিক রোধকের একটি সরল সিরিজ (catena) দ্বারা গঠিত, এর ভেতর দিয়ে পানির পটেনশিয়ালের গ্রেডিয়েন্ট বরাবর পানি প্রবাহিত হয় (চিত্র ৪.৫গ)। উদ্ভিদের মূলের পৃষ্ঠ হতে পাতার মেসোফিল কলা পর্যন্ত এই রোধকগুলো অবস্থিত। যেহেতু এই প্রবাহ বৈদ্যুতিক পটেনশিয়াল পার্থক্যের জন্য ইলেক্ট্রনের প্রবাহের মতো, সেহেতু একে ওহমের সূত্রের সমীকরণের মতো বর্ণনা করা যায় -

$$F = \frac{\psi_S - \psi_l}{R_S + R_r + R_{St} + R_l} = \frac{\psi_S - \psi_r}{R_S} = \frac{\psi_r - \psi_{St}}{R_r}$$

$$= \frac{\psi_{St} - \psi_x}{R_{St}} = \frac{\psi_x - \psi_A}{R_l} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (৪.৬)$$

এখানে F হলো সিস্টেমের মধ্যে পানির ফ্লাক্স (বাষ্পীভবনের হার), ψ_S, ψ_r, ψ_{St}, ψ_x এবং ψ_l হলো যথাক্রমে মৃত্তিকা, মূলের পৃষ্ঠ, কাণ্ডের গোড়া, কাণ্ডের অগ্রভাগ এবং পাতার বাষ্পীভবনের স্থানের পানির পটেনশিয়াল। R_S, R_r, R_{St} এবং R_l হলো যথাক্রমে মৃত্তিকা, মূল, কাণ্ড এবং পাতার হাইড্রোলিক রোধক (চিত্র ৪.৫গ)।

যদিও উদ্ভিদের হাইড্রোলিক রোধক নির্ণয়ে এবং প্রস্বেদনের হার সীমায়িত করার প্রভাবক নির্ধারণে ক্যাটেনারি মডেল খুবই উপযোগী, কিন্তু কতকগুলো কারণে মাঠ পর্যায়ে উদ্ভিদ পানির সম্পর্ক নির্ণয়ে এর ব্যবহারের কিছু অসুবিধা আছে।

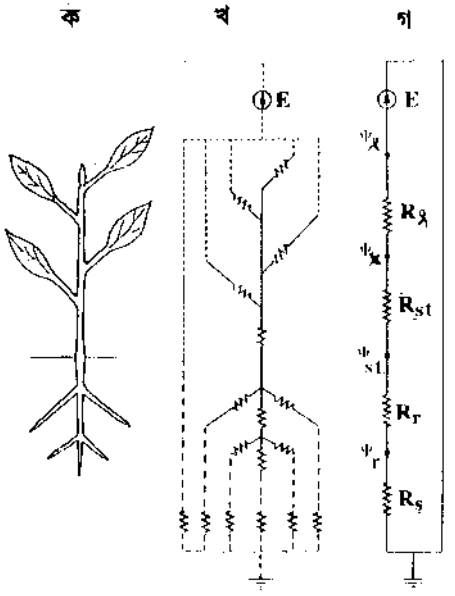

চিত্র ৪.৫ : (ক) একটি উদ্ভিদের সরলীকৃত চিত্র ; (খ) মৃত্তিকা, মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রবাহ রোধক ; প্রতিনিয়ত কারেন্ট জেনারেটর E দ্বারা বাষ্পীভবন হয় ; (গ) সরলীকৃত ক্যাটেনারি মডেল, খ–এর জটিল শাখান্বিত পথকে সরলরৈখিক সিরিজ হিসেবে এবং মৃত্তিকা (R_s), মূল (R_r), কাণ্ড (R_{st}) এবং পাতার (R_l) হাইড্রোলিক রোধক প্রত্যেককে একটিমাত্র রেসিস্টর হিসেবে দেখানো হয়েছে।

প্রথমত, একটিমাত্র মূল, কাণ্ড ও পাতা দ্বারা উদ্ভিদ গঠিত নয়, প্রকৃতপক্ষে, অনেকগুলো মূল, শাখা–প্রশাখা এবং পাতার সমন্বয়ে গঠিত। তাই, উদাহরণস্বরূপ একটি সম্পূর্ণ মূলতন্ত্রের রোধককে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\frac{1}{R_r} = \frac{1}{r_{x1}} + \frac{1}{r_{x2}} + \frac{1}{r_{x3}} + \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (৪.৭)$$

এখানে r_{x1}, r_{x2} ইত্যাদি হলো প্রতিটি মূলের রোধক। একইভাবে শাখা ও পাতার রোধক গণনা করা যায়।

দ্বিতীয়ত, পানি পরিবহণের পথ বরাবর উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকে পানি যোগ হতে পারে কিংবা সংরক্ষণের জন্য জমা হতে পারে, এর ফলে প্রবাহের হার পরিবর্তিত হয়। যেমন, যদিও মৃত্তিকা থেকে বায়ুমণ্ডলে পানি প্রবাহের পথে পাতার কোষ সরাসরি পড়ে না, কিন্তু দ্রুত প্রস্বেদনের

শুরুতে এরা পাতার অ্যাপোপ্লাস্টে পানি সরবরাহ করে। একইভাবে, মূল ও কাণ্ডের কোষগুলো দিনে বেশি চাহিদার সময় পানি হারায় এবং রাতে পানি শোষণ করে। দিন ও রাতের পাতার পুরুত্ব এবং কাণ্ড ও মূলের ব্যাসের তারতম্য পরিমাপ করে এই বিনিময়ের মান নির্ণয় করা যায় (Kozlowski, 1972)।

তৃতীয়ত, প্রস্বেদনের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা থেকে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত সম্পূর্ণ পথই (soil-plant-atmosphere continum) বিবেচনা করতে হয়। তবে মৃত্তিকা ও সিস্টেমের গ্যাসীয় উপাদান অন্তর্ভুক্ত করলে ওহমের সূত্রে সাদৃশ্যতা পুরোপুরি মেনে চলে না, কারণ এর ব্যবহারের মৌল শর্ত পূরণ হয় না। এ বিষয়ে Passioura (1984) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। একটি নির্দিষ্ট বাষ্প চাপ ঘাটতিতে প্রস্বেদনের হার সাধারণত পাতার ব্যাপন রোধক (leaf diffusive resistance) বিশেষ করে, শান্ত বায়ু ব্যতীত, পত্ররন্ধ্রীয় রোধক নির্ধারণ করে। উদ্ভিদে তরল পানির প্রবাহের হাইড্রোলিক রোধক সাধারণত প্রস্বেদনের হারকে সীমায়িত করে না, কিন্তু কতকগুলো বিশেষ অবস্থায় শুকিয়ে যাওয়া মৃত্তিকা থেকে মূলে পানি প্রবেশের রোধক উদ্ভিদে পানির সম্পর্কে প্রভাবিত করে।

উদ্ভিদ থেকে পানি হারানো (Water Loss from plant)

উদ্ভিদ বায়বীয় অবস্থায় পানি হারায় (প্রস্বেদন) এবং কখনো কখনো খুব সামান্য পরিমাণে তরল অবস্থায় হারায় (guttetion)। তবে পানি সমতায় পানি হারানোর গুরুত্ব খুবই নগণ্য। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ বায়বীয় অংশ, বিশেষ করে পাতার পত্ররন্ধ্রের ভেতর দিয়ে অধিকাংশ পানি হারায়, একে পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন বলে। অপরপক্ষে, ত্বকীয় কোষের কিউটিকলের রন্ধ্র দিয়ে (কিউটিকুলার প্রস্বেদন) খুব সামান্য পানি হারায়। মেসোফিল কোষের কোষ প্রাচীরের তরল পানি প্রথমে বাষ্পে পরিণত হয় এবং অব-পত্ররন্ধ্রীয় গহবরে জমা হয় এবং পত্ররন্ধ্রের ভেতর দিয়ে বাউন্ডারি স্তর অতিক্রম করে বায়ুমণ্ডলে পৌঁছায়। বাষ্পীয়করণ পৃষ্ঠ থেকে জলীয় বাষ্প ব্যাপনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে পৌঁছায়। যে ভৌত প্রক্রিয়ায় ভেজা পৃষ্ঠ থেকে পানির বাষ্পীভবন হয়, একই প্রক্রিয়ায় প্রস্বেদনও ঘটে। প্রচুর পরিমাণ পানি সরবরাহ থাকলে এবং জলীয় বাষ্পের ব্যাপনে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না হলে যে বাষ্পীয়ভবন হয়, তাকে পটেনশিয়াল (সর্বোচ্চ) বাষ্পীভবন (Potential evaporation) বলে। ভেজাপৃষ্ঠ (যেমন- মৃত্তিকা, কোষ প্রাচীর) থেকে প্রকৃত (actual) বাষ্পীয়ভবন অবশ্য পটেনশিয়াল বাষ্পীভবনের তুলনায় কম, কারণ প্রায় কখনোই হারানো পানি সম্পূর্ণ পূরণ করা হয় না।

পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন : একে নিম্ন লিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়-

$$E_s = \frac{c_i - c_a}{r_a + r_s} \quad \text{............(৪.৮)}$$

অর্থাৎ পাতার অভ্যন্তরে জলীয় বাষ্পের c_i-প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে গ্রাম পানি) এবং বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের (c_a) পার্থক্য হলো পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদনের (E_sপ্রতি বর্গসেন্টিমিটারে প্রতি সেকেন্ডে গ্রাম পানি) সমানুপাতিক এবং পত্ররন্ধ্রীয় রোধক r_s এবং বাউন্ডারি স্তর রোধক (r_a) দ্বারা এটি সীমায়িত। জলীয় বাষ্পের ব্যাপনের বাউন্ডারি স্তর রোধক বায়ুর বেগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বায়ুর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ০.১ মিটার হলে এই রোধকের মান প্রতি সেন্টিমিটারে ১-৩ সেকেন্ড এবং বায়ুর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ১০ মিটার হলে এটি কমে ০.১-০.৩ সেকেন্ড প্রতি সেন্টিমিটারে দাঁড়ায়।

পত্ররন্ধ্রীয় রোধক

প্রতি একক পাতার ক্ষেত্রফলে পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা (পত্ররন্ধ্রের ঘনত্ব) এবং রন্ধ্রের ব্যাসের উপর পত্ররন্ধ্রীয় রোধক নির্ভরশীল (সারণি ৪.২)। অধিকাংশ উদ্ভিদ প্রজাতির পত্ররন্ধ্র আলোতে খোলা

এবং অন্ধকারে বন্ধ থাকে ; সৌরবিকিরণের সরাসরি প্রতিক্রিয়া অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তঃস্থ সারকাডিয়ান লয়ের (circadian rhythm) নিয়ন্ত্রণে এটি ঘটে। তবে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম আছে। যেমন CAM উদ্ভিদ এবং গোল আলুর (Mansfield, 1976) পত্ররন্ধ্র অন্ধকারে খোলা থাকে। যদি অব পত্ররন্ধ্রীয় গহবরে কার্বন ডাই–অক্সাইডের পরিমাণ একটি সংকটকালীন মাত্রার কম হয়, তাহলে পত্ররন্ধ্র খুলে যায় ; এই সংকটকালীন মাত্রা সালোকসংশ্লেষণের পথের (C_3, C_4 এবং CAM) উপর নির্ভরশীল। পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষ পরীক্ষা করার অসুবিধার কারণে, পত্ররন্ধ্র খোলার জটিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে এখন পর্যন্ত ভালভাবে জানা সম্ভব হয়নি (Jarvis and Mansfield, 1981)। তবে এটি সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, পাতাকে সৌরকিরণে রাখলে অথবা অন্তঃস্থ কার্বন ডাই–অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি করলে রক্ষীকোষের দ্রব্য (প্রধানত পটাশিয়াম, ক্লোরাইড এবং/অথবা জৈব এসিড আয়ন) জমা হয়ে কোষরসের অসমোটিক পটেনশিয়াল ψ_π কমে যায়। তাই রক্ষীকোষে পানি প্রবেশ করে এবং এর রসস্ফীতি চাপ পার্শ্ববর্তী ত্বকীয় কোষের তুলনায় বেড়ে যায় এবং রস্ফীতির পার্থক্যের জন্য পত্ররন্ধ্র খুলে যায় (Meidner and mansfield, 1968 Willmer, 1983)। পত্ররন্ধ্রের রন্ধ্রের আকার এবং এর ভতর দিয়ে গ্যাসীয় ব্যাপনের রোধক রসফীতি চাপের পার্থক্যের মাত্রার উপর নির্ভর করে।

সারণি ৪.২ : কিছু সংখ্যক নির্বাচিত উদ্ভিদ প্রজাতির পূর্ণ প্রসারিত পাতার ঊর্ধ্ব ও নিম্নপৃষ্ঠের পত্ররন্ধ্রের ঘনত্ব, পরিমাপ এবং রন্ধ্রের ক্ষেত্রফল (Meidner and Mansfield (1968) এবং Kramer and Kozlowski (1974) থেকে গৃহীত।

প্রজাতি	পত্ররন্ধ্রের ঘনত্ব (প্রতি বর্গমিলিমিটারে)		পত্ররন্ধ্রের দৈর্ঘ্য (মাইক্রোমিটার)	রন্ধ্রের ক্ষেত্রফল ক
	নিম্ন পৃষ্ঠ	ঊর্ধ্ব পৃষ্ঠ		
একবীজপত্রী বীরুৎ				
Allium cepa	১৭৫	১৭৫	২৪	২.০
Hordeum vulgare	৮৫	৭০	২৭	০.৭
Triticum aestivum	৪০	৫০	২৬	০.৯
Zea mays	১০৮	৯৮	২৪	০.৭
দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ				
Vicia faba	৭৫	৬৫	২৮	১.০
Tradescantia virginiana	২৩	৭	৫২	০.৪
Helianthus annus	১৭৫	১২০	১৬	১.২
Sedum spectabilis	৩৫	২৮	৩১	০.৫
আবৃতবীজী বৃক্ষ				
Carpinus betulus	১৭০	০	১৩	০.৬
Populus deltoides	১১৬	১৮৭	৩০	৩.০
Quercus robur	৩৪০	০	১০	০.৮
Tilia europea	০	৩৭০	১০	০.৯
Eucalyptus globulus	০	৩৭০	১০	০.৯
ব্যক্তবীজী বৃক্ষ				
Pinus sylvestris	১২০		২০	১.২

ক. পত্ররন্ধ্র পূর্ণ খোলা অবস্থায় (বেধ ৬ মাইক্রোমিটার) পাতার মোট ক্ষেত্রফলের (উভয় পৃষ্ঠ) শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং হাইপোস্টোমাটাস বৃক্ষ প্রজাতির ক্ষেত্রে (পত্ররন্ধ্র কেবল নিম্ন পৃষ্ঠে থাকে) রন্ধ্রের ক্ষেত্রফলের মান শতকরা ৫০, কেবল নিম্নপৃষ্ঠের জন্য।

সৌরবিকিরণ অথবা সরকাডিয়ান লয়ে পত্ররন্ধ্রের মৌলিক প্রতিক্রিয়া অন্যান্য প্রভাবকের জন্য পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন– উচ্চ তাপমাত্রায় শ্বসনের হার বেশি হওয়ায় পাতার বায়ুগহবরে কার্বন ডাই–অক্সাইডের মাত্রা বেশি হওয়ায় পত্ররন্ধ্র বন্ধ হতে পারে। এই পদ্ধতি পানি সংরক্ষণের উন্নতি সাধন করে এবং এর জন্যই পাতার উচ্চ তাপমাত্রা ও বাষ্পীয়ভবনের চাহিদা বেশি হওয়ার কারণে দুপুরে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এর ফলে পুনরায় পর্যাপ্ত পানির প্রয়োগ করা সত্ত্বেও কয়েক দিনের জন্য পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পাতার পানি পটেনশিয়াল একটি থ্রেশহোল্ড মানের কম হলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। এই মান *Vicia faba* –এ –১.০ মেগাপ্যাসকেল, *Zea mays* –এ ১.৮ মেগাপ্যাসকেল, *Sorghum bicolor* –এ –২.০ মেগাপ্যাসকেল, *Gossypium hirsutum* –এ –৪.৩ মেগাপ্যাসকেল এবং মরুজ চিরহরিৎ *Larrea divaricata* –এ–৫.৮ মেগাপ্যাসকেল (Ludlow, 1980)।

সাম্প্রতিককালে কতিপয় পরীক্ষা–নিরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, অতিরিক্ত কার্বন ডাই–অক্সাইড ছাড়াও পত্ররন্ধ্র বন্ধের জন্য আরও কতকগুলো প্রভাবক দায়ী। যেমন– হরমোন, বিশেষ করে অ্যাবসিসিক অ্যাসিডের পত্ররন্ধ্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে (Mansfield, 1983)। পানি ঘাটতির সময় ক্লোরোপ্লাস্টে অ্যাবসিসিক এসিড সংশ্লেষিত হয় এবং এটি পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে, আবার পত্ররন্ধ্র খুলতেও এটি বিলম্ব ঘটাতে পারে।

বাউন্ডারি স্তর রোধক

বায়ুপ্রবাহ না থাকলেও, পরিচলনজনিত তাপ বিনিময়ের কারণে একটি পাতার চারদিকের বায়ু টারবুলেন্ট হয়। ফলে বায়ু সম্পূর্ণরূপে মিশে যায় এবং ধীর গতির ব্যাপনের পরিবর্তে ম্যাস প্রবাহের জন্য প্রস্বেদনরত পাতা থেকে অনেক বেশি দ্রুত গতিতে পানির অণু অসম্পৃক্ত বায়ুতে চলে যায়; তবে পত্রপৃষ্ঠে একটি অপেক্ষাকৃত শান্ত বায়ুর স্তর থাকে, বাউন্ডারি স্তর, জলীয় বাষ্পকে টারবুলেন্ট বায়ুতে প্রবেশের পূর্বে এর ভেতর দিয়ে অবশ্যই ব্যাপিত হতে হয়। এই স্তরের পুরুত্ব নির্ভর করে বায়ুর গতিবেগ এবং পাতার আকার এবং আকৃতির উপর।

Holmgren এবং তাঁর সহকর্মীরা (1965) এবং Meidner এবং Sheriff (1976) এর উপাত্ত ব্যবহার করে একটি আদর্শ মেসেউদ্ভিদের কিউটিকল ও পত্ররন্ধ্র এবং বাউন্ডারি স্তরের ভেতর দিয়ে জলীয় বাষ্প ব্যাপনের আপেক্ষিক রোধকের তুলনা করা সম্ভব :

কিউটিকুলার রোধক (r_c) : ২০ থেকে ৮০ সেকেন্ড প্রতি সেন্টিমিটারে (কিছু বৃক্ষ প্রজাতির মান আরো অনেক বেশি),

পত্ররন্ধ্রীয় রোধক (r_s) : —০.৮ থেকে ১৬ সেকেন্ড প্রতি সেন্টিমিটারে,

বাউন্ডারি স্তর রোধক (r_a) : ৩.০ সেকেন্ড প্রতি সেন্টিমিটারের

(বায়ুর বেগ যখন ০.১ মিটার প্রতি সেকেন্ডে, বিউফোর্ট স্কেলে ০), এবং ০.৩৫ সেকেন্ড প্রতি সেন্টিমিটারে (বায়ুর বেগ যখন ১০ মিটার প্রতি সেকেন্ডে, বিউফোর্ট স্কেলে ৬)। উল্লেখ্য যে, পত্ররন্ধ্র সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলে (r_s) এর মান ও (r_c) এর সমান।

যেহেতু পত্ররন্ধ্রীয় এবং কিউটিকুলার পথ সমান্তরাল অবস্থানে থাকে, সেহেতু r_c এর উচ্চ মান নির্দেশ করে যে, যতক্ষণ পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে ততক্ষণ মোট প্রস্বেদনের তুলনায় কিউটিকুলার প্রস্বেদন খুবই কম। একটি প্রস্বেদনরত উদ্ভিদের পাতার ব্যাপন রোধক (leaf diffusive resistance- R_l) হলো r_a এবং r_s –এর যোগফল; অধিকাংশ ক্ষেত্রে r_s —হলো R_l এর প্রধান উপাদান, সুতরাং প্রস্বেদনের হারের প্রধান নিয়ামক হলো পত্ররন্ধ্রের রন্ধ্র। তবে বায়ুর গতিবেগ কমে

গেলে, বাউন্ডারি স্তরের পুরুত্ব বেড়ে যায় এবং তখন r_a এর গুরুত্বও বেড়ে যায়। বায়ুর গতিবেগ খুব কম হলে অথবা শান্ত বায়ুতে (এটি খুব কম ঘটে), পত্ররন্ধ্রের রন্ধ্রের একটি পাতলা r_a প্রস্বেদনকে নিয়ন্ত্রণ করে যা Bange (1953) এর একটি ক্লাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। একইভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইডে অথবা দূষণকারী গ্যাসের পাতার ব্যাপনের হার শান্ত বায়ুতে অনেক কম।

কিউটিকুলার প্রস্বেদন

ত্বকীয় কোষের কিউটিকলের ভেতর দিয়ে জলীয় বাষ্পের ব্যাপনকে কিউটিকুলার প্রস্বেদন বলে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিউটিকুলার ব্যাপন রোধক সাধারণত খুব বেশি। এপিডার্মিসের বহিঃস্থ প্রাচীরে কিউটিন ও মোমের ল্যামেলির বিন্যাস, ঘনত্ব ও সংখ্যা ও কিউটিকলের পুরুত্বের উপর এই রোধক নির্ভর করে। যখন ত্বক শুকিয়ে কুঁচকিয়ে যায়, তখন হাইড্রোফোবিক গুলো খুব নিকটে আসে এবং এর ফলে কিউটিকুলার রোধক দ্বিগুণ হয়ে যায়। নিম্ন তাপমাত্রায় কিউটিকুলার ব্যাপন রোধক বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, প্রস্বেদন হ্রাসের ক্ষেত্রে, কিউটিকল রোধক খুব কার্যকরী। এমন কি ছায়াযুক্ত এবং ভেজা পরিবেশে জন্মানো উদ্ভিদের কিউটিকুলার প্রস্বেদনের মাত্রা, মুক্ত পানির পৃষ্ঠ হতে বাষ্পীয়ভবনের মাত্রার শতকরা ১০ ভাগের কম, চিরহরিৎ কনিফারের পাতার মান শতকরা ০.৫ ভাগ এবং ক্যাকটাসে পটেনশিয়াল বাষ্পীভবন শতকরা ০.০৫ ভাগ।

সুবেরিনযুক্ত ত্বকীয় কোষ থেকে পানি হারানোর মাত্রা কিউটিকুলার প্রস্বেদনের মাত্রার মতই। এটি নির্ভর করে পেরিডার্মের গঠন, লেন্টিসেলের প্রবেশ্যতা এবং বাকলের ফাটলের (Crack) উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতির উপর।

প্রস্বেদন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময়

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উদ্ভিদে প্রস্বেদন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত; পত্ররন্ধ্র দিয়ে জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই অক্সাইড উভয়েরই ব্যাপন হয়। কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণের জন্য উদ্ভিদকে অবশ্যই পানি ত্যাগ করতে হয় এবং যখন পানি হারানো কম হয় তখন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণও কম হয়। জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপনের হার এক রকম নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের বায়ু পানি দ্বারা সম্পৃক্ত না হয়, ততক্ষণ পাতার অভ্যন্তরের এবং বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের চাপের পার্থক্য, বায়ুমণ্ডল এবং ক্লোরোপ্লাস্টের কার্বন ডাই-অক্সাইড ঘনমাত্রার পার্থক্যের তুলনায় অনেক বেশি। ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং শতকরা ৫০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রেডিয়েন্টের তুলনায় জলীয় বাষ্পের গ্রেডিয়েন্ট প্রায় ২০ গুণ বেশি। একমাত্র এ কারণেই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণের তুলনায় পানির বাষ্পীয়ভবন অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে সংঘটিত হয়। উপরন্তু, একই রকম গ্রেডিয়েন্ট থাকলে, কার্বন ডাই-অক্সাইডের তুলনায় পানির অণু ক্ষুদ্র হওয়ায়, দেড় গুণ বেশি দ্রুত পানির ব্যাপন হয় কার্বন ডাই অক্সাইডের ব্যাপনের পথ অধিকতর দীর্ঘ, একে ক্লোরোপ্লাস্টে প্রবেশ করতে হয় এবং দ্রবণীয় অবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের চলাচল খুবই মন্থর। সুতরাং ব্যাপনের যে কোন নিয়ামকের পরিবর্তন হলে প্রস্বেদন/ সালোকসংশ্লেষণের অনুপাত সবসময়ই পরিবর্তন হয়। পত্ররন্ধ্র খোলা থাকলে, পাতার অভ্যন্তরে ব্যাপন রোধকের জন্য (বিশেষ করে কার্বোক্সিলেশন রোধকের জন্য), প্রস্বেদনের তুলনায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ অধিকতর সীমাবদ্ধ হয়। পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকলে, কার্বোঅক্সাইড গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কিউটিকল দিয়ে পানি ত্যাগ অব্যাহত

চলতে থাকে, ফলে প্রস্বেদন/ সালোকসংশ্লেষণ অনুপাত অসীম হয় (infinity)। যখন পত্ররন্ধ্র আংশিক খোলা থাকে, তখন পানি ত্যাগ এবং কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্রহণের মধ্যে একটি সুবিধজনক রফা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে, সকালে কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্রহণের জন্য উদ্ভিদ কম পানি ব্যয় করে, কারণ এসময় প্রস্বেদনের তুলনায় সালোকসংশ্লেষণ দ্রুত হয়। সূর্যকিরণ বাড়ার সাথে সাথে বায়ু উত্তপ্ত হয় এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হ্রাস পায়, তাই কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্রহণের তুলনায় পানি হারানো বেশি হয় এবং প্রস্বেদন/সালোকসংশ্লেষণ অনুপাত বেড়ে যায়।

পানি ব্যবহার এবং খাদ্য তৈরির মধ্যে সমতা বিধান উদ্ভিদ গ্যাস বিনিময়ের একটি প্রধান সমস্যা। অন্য উদ্ভিদের তুলনায় কতকগুলো উদ্ভিদ এটি ভালভাবে করতে পারে, এজন্য এগুলো শুষ্ক পরিবেশে ভালভাবে টিকে থাকে। শস্য উদ্ভিদ ও বনজ উদ্ভিদের মধ্যে সম্পর্ক জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্ক দু'ভাবে প্রকাশ করা যায়।

প্রথমত, উদ্ভিদ বা শস্য কর্তৃক সম্পূর্ণ মৌসুমে প্রতি একক ওজনের শুষ্ক পদার্থের (dry matter) জন্য উদ্ভিদটি কি পরিমাণ শুষ্ক পদার্থ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতিতে এই মান বিভিন্ন। কোনো শস্যের জন্য কি পরিমাণ পানি ব্যবহার করেছে এবং দ্বিতীয়ত, প্রতি লিটার বাষ্পকৃত পানির জন্য কি পরিমাণ সেচের পানির প্রয়োজন তা এই তথ্য থেকে জানা যায়। কয়েকটি উদ্ভিদের শুষ্ক পদার্থ তৈরির সময় গড় পানি ব্যবহার (প্রতি গ্রাম শুষ্ক পদার্থের জন্য ব্যবহৃত গ্রাম পানির পরিমাণ) নিম্নরূপ :

C_4 **উদ্ভিদ :** ভুট্টা ৩৭০, মিলেট ৩০০, *Amaranthus* ৩০০ এবং *Portulaca* ২৮০।

C_3 **উদ্ভিদ :** ধান ৬৮০, রাই (rye) ৬৩০, জই ৫৮০, গম ৫৪০, যব ৫২০, আলফালফা ৮৪০, বিন ৭০০, গোল আলু ৬৪০, সূর্যমুখী ৬০০, তরমুজ ৫৮০ এবং তুলা ৫৭০।

শস্য থেকে বাষ্পীভবন (Evaporation from a Crop)

শস্যের ক্যানোপি থেকে বাষ্পীভবনের মান নির্ণয়ের জন্য, ক্যানোপির ভিতরে নিট বিকিরণের (Q_N) পরিমাণ জানা দরকার। হ্রস্ব–দৈর্ঘ্যের বিকিরণের নিম্নমুখী ফ্লাক্স এবং দীর্ঘ দৈর্ঘ্য বিকিরণের ঊর্ধ্বমুখী ফ্লাক্সের পার্থক্য থেকে ক্যানোপির কোনো এক স্থানের Q_N পাওয়া যায়। Q_N এবং Z–এর (ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা) সম্পর্কিত কার্ভের যে কোনো স্থানের গ্রেডিয়েন্ট থেকে সেই স্থানে পাতা কর্তৃক শোষিত নিট বিকিরণের পরিমাণ জানা যায় (চিত্র ৪.৬)। লীন তাপ (latent heat) এবং ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য (sensible) তাপের বৃদ্ধির মধ্যে এটি বিভেদিত। জলীয় বাষ্প এবং তাপের ফ্লাক্স, আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্টের সাথেও সম্পর্কিত। এই গ্রেডিয়েন্ট ফ্লাক্সের দিক নির্দেশ করে, মান নয়। যেমন ৪.৬ নং চিত্রে Q_N এর ফ্লাক্স নিম্নমুখী, কিন্তু জলীয় বাষ্প ও তাপের ফ্লাক্স সম্পূর্ণ ক্যানোপির ভিতরেই ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু কার্বন ডাই–অক্সাইডের ফ্লাক্সের নিচের ৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী এবং অবশিষ্টাংশে নিম্নমুখী। কেবল উপযুক্ত স্থানান্তর গুণাঙ্ক (K) জানা থাকলে ফ্লাক্সের মান জানা যায়। ক্যানোপির অভ্যন্তরে K –এর মান নির্ণয় এখনও অনেকখানি অনিশ্চিত।

এতদসত্ত্বেও, ক্যানোপির কোনো নির্দিষ্ট উচ্চতায়, পাতার ক্ষেত্রফলের ঘনত্ব, পাতার ব্যাপনের রোধক, বাউন্ডারি স্তর রোধক, আপতিত বিকিরণ, বায়ুর গতিবেগ এবং জলীয় বাষ্পের ঘর্ষতির তারতম্য জেনে শস্য থেকে এবং শস্যের অভ্যন্তরে জলীয় বাষ্প ও তাপের ফ্লাক্স অনুমান করা হয়েছে। এরকম একটি হিসাব থেকে পাতার রোধকের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা গেছে। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে, পাতার রোধকের মান বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্যানোপির বিভিন্ন স্তরে প্রস্বেদনের হার অধিকতর একরূপ হয়, মোট প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায় এবং ক্যানোপির তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তবে ক্যানোপির বাইরের আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে এসকল মানের পরিবর্তন হয়।

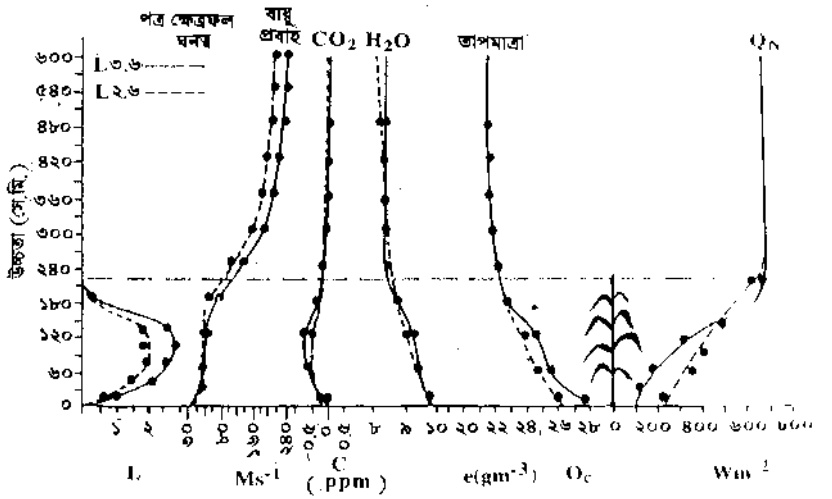

চিত্র ৪.৬ : ভুট্টা শস্যের পাতার ক্ষেত্রফলের ঘনত্ব, বায়ুর গতিবেগ, কার্বন ডাই অক্সাইড ঘনমাত্রা, জলীয় বাষ্পের ঘনমাত্রা, তাপমাত্রা এবং নিট বিকিরণের বন্টন

মৃত্তিকা পৃষ্ঠ থেকে পানি হারানোর ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু মৃত্তিকাপৃষ্ঠের ঠিক উপরে K এর পরিবর্তন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আছে। দিনের অধিকাংশ সময় মৃত্তিকাপৃষ্ঠ নিট বিকিরণের নিম্নমুখী ফ্লাক্স থাকে। যদি মৃত্তিকা পৃষ্ঠ ভেজা হয়, তাহলে বাষ্পীভবনের জন্য অধিকাংশ নিট বিকিরণ ব্যবহৃত হয় ; শস্যের পৃষ্ঠের জলীয় বাষ্পের প্রায় এক চতুর্থাংশ মৃত্তিকার পানি থেকে আসে। তবে পৃষ্ঠ থেকে কয়েক মিলিমিটার মৃত্তিকা শুকিয়ে গেলে জলীয় বাষ্পের ব্যাপনের রোধকের মাত্রা অনেকাংশে বেড়ে যায়। তখন মৃত্তিকা পৃষ্ঠ কর্তৃক শোষিত তাপের কিছু অংশ নিচে ও কিছু অংশ উপরে পরিবাহিত হয় এবং বাষ্পীভবনে ব্যবহৃত তাপের পরিমাণ ক্রমাগত কমতে থাকে। শস্য ও মৃত্তিকা থেকে বাষ্পীভবনের হার ভেজা ও শুষ্ক বাল্ব থার্মো–মিটারের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। শস্যের উপর নিট বিকিরণ $Q_N(O)$ ও মৃত্তিকাপৃষ্ঠের নিট বিকিরণের $Q_N(s)$ পার্থক্য থেকে ক্যানোপি কর্তৃক নিট বিকিরণ শোষণের মাত্রা নির্ণয় করা যায়।

উদ্ভিদে পানির সমতা (Water Balance of Plant)

পানি পরিশোষণ এবং হারানোর হারের পার্থক্য হলো উদ্ভিদে পানির সমতা। অর্থাৎ পানির সমতা = পানি পরিশোষণ–প্রস্বেদন। এক্ষেত্রে প্রস্বেদনকে ভৌত প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা না করে পানি হারানোর পরিমাপক হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং প্রতি একক ক্ষেত্রফলের পরিবর্তে প্রতি একক ওজনে (সাধারণত সজীব ওজন) পানি হারানোর পরিমাণ প্রকাশ করা হয়। পানির সমতার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ পানি হারায় তা পূরণ করা দরকার।

পানি পরিশোষণ, পরিবহণ এবং হারানোর হারের যথোপযুক্ত সমন্বয় ঘটলে, সন্তোষজনক পানির সমতা বজায় থাকে। প্রস্বেদনের মাধ্যমে যে পরিমাণ পানি হারায় তা যদি সরবরাহ করা না হয়, তখনই পানির সমতা ঋণাত্মক হয়। এই পানি ঘাটতির জন্য যদি পত্ররন্ধ্র আংশিক বন্ধ হয়, এতে প্রস্বেদন হ্রাস পায় এবং পানি পরিশোষণ যদি আগের মতোই চলে, তাহলে কিছু সময়ের মধ্যে পানির সমতা ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে, দিনে প্রায় সবসময়ই পানির সমতা ঋণাত্মক। সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত অথবা রাতে (যদি মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত পানি থাকে) উদ্ভিদের পানি পুনরুদ্ধার হয়। শুষ্ক মৌসুমে রাতে উদ্ভিদে পানি সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার হয় না ; এজন্য বৃষ্টিপাত না হওয়া পর্যন্ত দিনের পর দিন এই ঘাটতি বাড়তে থাকে। এজন্য পানি সমতার ঋতুগত তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

পানি পরিশোষণ ও প্রস্বেদনের মান নির্ণয় করে সরাসরি পানি সমতার পরিমাপ করা যায়। মাঠ পর্যায়ে পানি পরিশোষণের মান নির্ণয় খুবই জটিল, এজন্য উদ্ভিদে পানির পরিমাণ অথবা পানির পটেনশিয়াল নির্ণয় করে পরোক্ষভাবে পানির সমতার পরিমাপ করা হয়।

পাতা এবং বিটপের পানির পরিমাণ পুনঃ পুনঃ পরিমাপ করে পানি ঘাটতি নির্ণয় করা যায়। কোনো সময়ে পানির পরিমাণ হয় সম্পৃক্ত অবস্থায় পানির পরিমাণের শতকরা হার (আপেক্ষিক রসস্ফীতিত্ব) অথবা আপেক্ষিক পানির পরিমাণ হিসেবে প্রকাশ করা হয়। কোষের পানির পরিমাণের তারতম্য কোষরসের ঘনমাত্রা এবং কোষের পানির পটেনশিয়ালকে প্রভাবিত করে। কোষের অসমোটিক পটেনশিয়াল কোষের পানির সমতার নির্দেশক। পানির সমতা ঋণাত্মক হলে অসমোটিক পটেনশিয়াল বাড়ে। উদ্ভিদ প্রজাতি, আকার, বৃদ্ধির দশা এবং কলার বিভিন্নতার উপর অসমোটিক পটেনশিয়ালের মান নির্ভর করে। পানি সমতার সবচেয়ে সংবেদনশীল নির্দেশক হলো পাতা ও বিটপের পানির পটেনশিয়াল।

শস্যের পানি সমতা (Water Balance of Crop)

শস্যের এবং যে মৃত্তিকায় এর মূল প্রবেশ করে তার পানি সমতার অবস্থা নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রকাশ করা যায় :

$$P_r = \Delta W + L_E + L_O \text{ .... } (৪.৯)$$

এই সমীকরণে শস্যের জন্য পানির একমাত্র উৎস হলো বৃষ্টিপাত (P_r)। বৃষ্টির পানির কিছু অংশ উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা থেকে বাষ্পীভবন হয় বাষ্পীয় প্রস্বেদন, L_E) এবং কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠ দিয়ে গড়িয়ে এবং মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অনুস্রবণ হয় (Lo)। তবে স্বল্প সময়ের জন্য সংরক্ষিত পানির পরিমাণ বাড়তে (+ ΔW) অথবা কমতে (-ΔE) পারে, কারণ কখনো কখনো বাষ্পীভবন এবং অনুস্রবণের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হয় অথবা উদ্ভিদের প্রয়োজন অনুযায়ী বৃষ্টি হয় না। হাইড্রোলজিতে পানি বলতে কেবল মৃত্তিকায় সঞ্চিত পানি অর্থাৎ কৈশিক এবং লভ্য অভিকর্ষীয় পানিকে বোঝায়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বসন্তকালে বরফ গলার পর সবচেয়ে বেশি পানি মৃত্তিকায় থাকে, গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হলেও মৃত্তিকার পানি কমতে থাকে এবং গ্রীষ্মের শেষে সর্বনিম্ন মাত্রায় পৌঁছায়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বর্ষাকালে মৃত্তিকা পানিপূর্ণ হয়। পরিবেশতাত্ত্বিকভাবে উল্লেখ করা যায়, উদ্ভিদের পানি এবং লিটারের (litter) মধ্যে রক্ষিত পানিও ΔW এর অন্তর্ভুক্ত।

পানি সমতায় বৃষ্টিপাতের সেই পরিমাণ পানি গুরুত্বপূর্ণ যা দ্রুত মৃত্তিকায় প্রবেশ করে। ঘন শস্যক্ষেতে, প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টিপাতের (Pr) সবটুকু পানি মৃত্তিকায় প্রবেশ করে না ; উদ্ভিদ ক্যানোপির ফাঁক দিয়ে পতিত অংশ এবং কাণ্ড ও পাতা দিয়ে গড়িয়ে পড়া অংশ মৃত্তিকায় পৌঁছায়।

কাণ্ড ও পাতায় পতিত পানির কিছু অংশের বাষ্পীভবন হয় এবং খুব সামান্য অংশই উদ্ভিদ শোষণ করে। তাই উদ্ভিদে লেগে থাকা পানি (L_i, বাঁধাপ্রদান ক্ষতি) ক্ষতি বলে পরিগণিত হয়। এজন্য সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে পানি সমতা সমীকরণকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$P_r - L_i = \Delta W + L_E + L_o \quad \text{.............} \quad (৪.১০)$$

মৃত্তিকায় পতিত সবটুকু পানিই বাষ্পীয় প্রস্বেদনের জন্য লভ্য নয়। এদের কিছু অংশ ভূপৃষ্ঠ দিয়ে গড়িয়ে অন্যত্র চলে যায় এবং আরও কিছু অংশ অনুস্রবণের মাধ্যমে মৃত্তিকার অনেক গভীরে চলে যায়। গড়িয়ে যাওয়া পানির পরিমাণ নির্ভর করে ভূ-প্রকৃতি এবং উদ্ভিদরাজির প্রকৃতির উপর।

প্রবল বৃষ্টিপাতের পর মূল অঞ্চলের মৃত্তিকা ফিল্ড ক্যাপাসিটিতে এবং পাতার কোষগুলো প্রায় পূর্ণ রসস্ফীতি অবস্থায় থাকে। সূর্যোদয়ের পর পত্ররন্ধ্র খুলে যায় এবং আপাতিত বিকিরণ বাষ্পীভবনের শক্তি সরবরাহ করে। কোষ প্রাচীর পানি হারায় ও প্রোটোপ্লাজম এবং পার্শ্ববর্তী কোষ থেকে পানি গ্রহণ করে পানির পটেনশিয়ালের সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। পানি হারানোর জন্য কোষের আয়তন ও রসস্ফীতি চাপ হ্রাস পায় এবং পানির পটেনশিয়াল কমে যায়। পার্শ্ববর্তী কোষ থেকে পানি গ্রহণের জন্য শিরা, কাণ্ড, মূল ও মূলের চারপাশের মৃত্তিকা বরাবর পানির পটেনশিয়ালের গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়। একটি সরলীকৃত মডেল ব্যবহার করে, মৃত্তিকা, মূলের পৃষ্ঠ ও পাতার তিন দিনের পানির পটেনশিয়ালের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ৪.৭ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। প্রথম দিনের শুরুতে বহিঃস্থ প্রতিক্রিয়া (যেমন– সৌরবিকিরণ) অথবা অন্তঃস্থ লয়ের (rhythm) পত্ররন্ধ্রের রন্ধ্র ক্রমশ চওড়া হতে থাকে এবং সাথে সাথে প্রস্বেদনের হারও বাড়তে থাকে। উদ্ভিদের হাইড্রোলিক রোধকের জন্য কেবল পানি পটেনশিয়ালের গ্রেডিয়েন্ট স্থাপনের পরই মৃত্তিকা থেকে পাতায় পানি পৌঁছায়। যেহেতু মৃত্তিকা ফিল্ড ক্যাপাসিটি অবস্থায় আছে (ψ মৃত্তিকা = 0), সেহেতু পাতার পানির পটেনশিয়াল –০.৬ মেগাপ্যাসকেল না হলে পানির প্রবাহ পর্যাপ্ত হবে না ; এর জন্য কয়েক ঘণ্টার জন্য পাতায় হাল্কা পানি ঘাটতি হয়। ভেজা মৃত্তিকার হাইড্রোলিক রোধক কম হওয়ায়, পানির পটেনশিয়ালের খুব সামান্য পার্থক্য থাকলেও (< ০.১ মেগাপ্যাসকেল) মৃত্তিকা থেকে মূলে পানি প্রবেশ করে।

সন্ধ্যায়, পত্ররন্ধ্র বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে প্রস্বেদনের হারও কমে যায় এবং পানি হারানোর তুলনায় পাতায় পানির প্রবেশ বেশি হয়। ফলে পাতার অ্যাপোপ্লাস্ট এবং কোষ পানিতে সিক্ত হয় এবং সারা রাতে মৃত্তিকা এবং পাতার পানির পটেনশিয়ালের পার্থক্য থাকে না। তবে প্রথম দিনে উদ্ভিদ কর্তৃক কিছু পানি শোষিত হওয়ায় সাম্যাবস্থায় মৃত্তিকা এবং উদ্ভিদের পানির পটেনশিয়াল এখন প্রায় –০.১ মেগাপ্যাসকেল। দ্বিতীয় দিনে উদ্ভিদ/পানি সম্পর্ক প্রায় প্রথম দিনের মতই। একটি পার্থক্য হলো যে, এখন পানি প্রবাহ বজায় রাখতে পাতার পানির পটেনশিয়ালের হতে হবে প্রায় —০.৯ মেগাপ্যাসকেল। উপরন্তু, মৃত্তিকা শুষ্ক হওয়ার জন্য হাইড্রোলিক রোধক বাড়তে শুরু করেছে এবং মূলে পানি প্রবেশের জন্য পানির পটেনশিয়ালের পার্থক্য হতে হবে ০.১ থেকে ০.২ মেগাপ্যাসকেল।

তৃতীয় দিনের শুরুতে, মৃত্তিকা, মূল ও পাতার সাম্যাবস্থা পানির পটেনশিয়াল হচ্ছে –০.৩ মেগাপ্যাসকেল হয়েছে এবং সারাদিনই পাতার পানির পটেনশিয়াল –১.২ মেগাপ্যাসকেল হওয়া দরকার। মৃত্তিকার রোধকের ক্রমাগত বৃদ্ধির দুটি প্রভাব আছে– প্রথমত, আগের দিনের মতো একই পরিমাণ পানি সরবরাহের জন্য মৃত্তিকা এবং মূলের পানির পটেনশিয়ালের পার্থক্য হতে হবে ০.৩ মেগাপ্যাসকেল, কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, মৃত্তিকায় পানি চলাচল

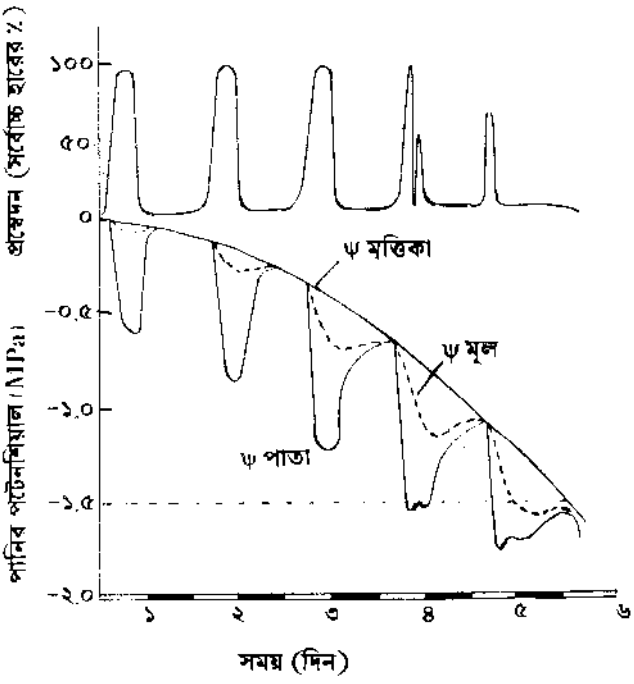

চিত্র ৪.৭ : পাঁচ দিন পর্যন্ত মৃত্তিকার লভ্য পানি নিঃশেষ হওয়ার সাথে পাতা, মূল এবং মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়াল এবং প্রস্বেদনের হারের সম্পর্ক।

পানির পটেনশিয়াল সাম্যাবস্থায় আসছে না। ফলে দিনের অধিকাংশ সময় পাতায় হাল্কা থেকে মধ্যম পানি ঘাটতি হচ্ছে। চতুর্থ দিনে অবস্থা আরও গুরুতর হয় যখন পাতার পানির পটেনশিয়াল –১.৫ অথবা পাতার তাপমাত্রা অতিরিক্ত হওয়ায় দুপুরবেলায় অল্প সময়ের জন্য পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। পরিশেষে, পঞ্চম দিনের শেষে, যখন মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়াল –১.৫ মেগাপ্যাসকেলে দাঁড়ায় (স্থায়ী উইল্টিং বিন্দু), তখন আর কোনো লভ্য পানি থাকে না এবং ৬ষ্ঠ দিনে উদ্ভিদটি মিইয়ে পড়ে এবং মৃত্তিকায় পানি প্রয়োগ না করলে উদ্ভিদটি মারা যায়।

কতকগুলো প্যারামিটারের সাথে, বিশেষ করে মৃত্তিকার হাইড্রোলিক ধর্মাবলী, মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তরে মূলের ঘনমাত্রা, আবহাওয়াজনিত অবস্থা যা বাষ্পীভবনকে প্রভাবিত পত্ররন্ধ্রের উদ্দীপনা এবং শস্যের অভ্যন্তরে পানি প্রবাহের রোধক, ৪.৭ নং চিত্রের কার্ভের আকার পরিবর্তিত হয়। মৃত্তিকা শুকানোর সময় বিভিন্ন স্তরে পানির পরিমাণ তথা পানির পটেনশিয়ালের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় (চিত্র ৪.৮)।

মৃত্তিকার মূলের বিস্তার প্রধানত নির্দেশ করে, যে অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি মূলের ঘনমাত্রা থাকে সে অঞ্চল সবচেয়ে বেশি মূলের ঘনমাত্রা থাকে সে অঞ্চল সবচেয়ে বেশি পানি হারায়। ক্যানোপির বিভিন্ন স্তরেও সুস্পষ্ট পানির পটেনশিয়ালের গ্রেডিয়েন্ট থাকতে পারে, কিন্তু এই গ্রেডিয়েন্টের পরিমাপ খুব কম হয়েছে। ক্যানোপির উপরের পাতা থেকে নিচের পাতায় পানির পটেনশিয়ালের গ্রেডিয়েন্ট তামাকে –১.০ থেকে –০.৪ মেগাপ্যাসকেল, নুনরাশ মিলেটে ১.৮ থেকে –[illegible] মেগাপাসকেল এবং ভুট্টায়-০.৪৫ থেকে –০.১৫ মেগাপ্যাসকেল রেকর্ড করা হয়েছে। অপরপক্ষে, আপেক্ষিক পানির পরিমাণ (অর্থাৎ পূর্ণ রসস্ফীতির তুলনায় কি পরিমাণ পানি আছে) উপরের পাতা থেকে নিচের পাতায় কম, যদিও নিচের পাতা কম নিট বিকিরণ পায় এবং পানি প্রবাহের পত্রবৃন্তক রোধকও কম।

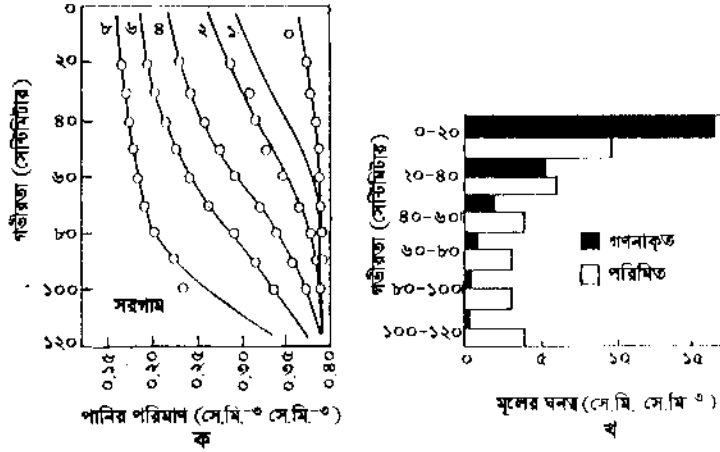

চিত্র ৪.৮ : একটি শুষ্ককরণ (drying) চক্রে (ক) গভীরতার সাথে মৃত্তিকার পানির পরিমাণ এবং (খ) গভীরতার সাথে মূলের ঘনত্বের সম্পর্ক। কার্ভ ০–৮ হলো মৃত্তিকা ভেজানোর পর থেকে দিনের সংখ্যা। বৃত্ত হলো পরীক্ষার উপাত্ত এবং তত্ত্ব থেকে কার্ভগুলো আঁকা হয়েছে। সেরকম, সাদা হিস্টোগ্রাম হলো প্রকৃত পরিমাপ এবং কালো হিস্টোগ্রাম হলো গণনাকৃত (calculated) পরিমাণ।

প্রকৃত প্রস্বেদনের হার, পটেনশিয়াল (সর্বোচ্চ) প্রস্বেদনের হার (অর্থাৎ পত্ররন্ধ্র সম্পূর্ণ খোলা অবস্থায় যে প্রস্বেদন হয় এবং এটি কেবল আবহাওয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) এবং মৃত্তিকার পানির পরিমাপের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে (চিত্র ৪.৯)।

পটেনশিয়াল প্রস্বেদন ঘটতে পারে যখন মৃত্তিকা সিক্ত থাকে ; মৃত্তিকা শুষ্ক হতে শুরু করলে পানির চাহিদা পূরণের জন্য উদ্ভিদে পানি প্রবেশ এবং পরিবহণ দ্রুত গতিতে চলতে পারে না, পাতার পানির পটেনশিয়াল কমে যায়, পত্ররন্ধ্র আংশিক বন্ধ হয় এবং প্রস্বেদনের হার হ্রাস পায়।

পৃথিবীর পানি সমতা এবং উদ্ভিদের উপর এর প্রভাব (The Earth's Water Balance and its Significance for Vegetation)

পৃথিবী পৃষ্ঠে পানির প্রধান আধার হলো সমুদ্র। পৃথিবীর মোট পানির শতকরা ৯৭ ভাগের বেশি (প্রায় ১.৪×১০^{১৮} টন পানি) এতে আছে। প্রায় শতকরা ২ ভাগ পানি বরফ আকারে জমাট বাঁধা অবস্থায় মেরুঅঞ্চলে এবং হিমবাহে থাকে। পৃথিবীর শতকরা ০.৬ ভাগের সামান্য বেশি পানি ভূমিস্থ পানি, এর মাত্র শতকরা ১ ভাগ পানি ভূপৃষ্ঠের এত কাছে থাকে যেখানে উদ্ভিদের মূল প্রবেশ করতে পারে, বাকী অংশ শত শত মিটার নিচে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠ এবং সমুদ্রের উপরে যে পানি মেঘ, কুয়াশা এবং জলীয় বাষ্পাকারে থাকে পৃথিবীর মোট পানির তুলনায় খুবই নগণ্য—শতকরা ০.০০১ ভাগের বেশি নয়।

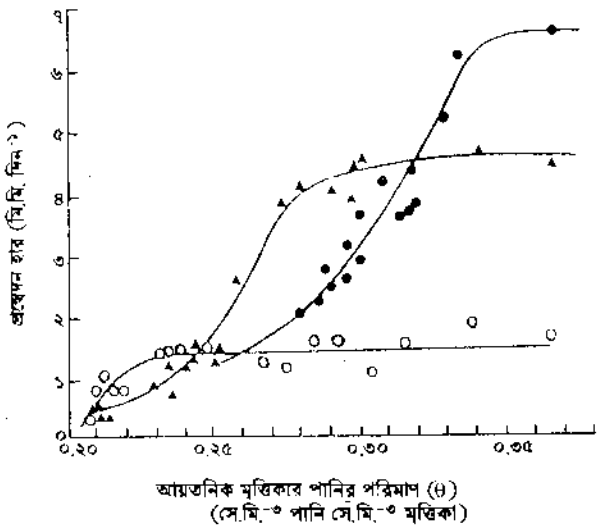

চিত্র ৪.৯ : উচ্চ (বদ্ধ বৃত্ত), মধ্যম (ত্রিভুজ) এবং নিম্ন (মুক্ত বৃত্ত) পটেনশিয়াল প্রস্বেদনের দিনে মৃত্তিকার পানির পরিমাণের সাথে ভুট্টা শস্যের প্রকৃত প্রস্বেদনের সম্পর্ক।

পানির চলাচল এবং জাগতিক পানি সমতা (Water Circulation and Global Water Balance)

বিভিন্ন অবস্থায় সঞ্চিত পানি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পাওয়া পানির তুলনায় সমুদ্রের বেশি পানি বাষ্পে পরিণত হয় এবং অতিরিক্ত

জলীয় বাষ্প স্থলভূমিতে বাহিত হয়। বিশ্বব্যাপী গড়ে প্রতি একক স্থলভূমি যে পরিমাণ পানি গ্রহণ করে তার চেয়ে কম পানি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে হারায়, কারণ ভূ-পৃষ্ঠ খোলা পানির পৃষ্ঠের মতো নয়। উপরন্তু জলভাগের তুলনায় স্থলভাগ কম। বিভিন্ন ভূ পদার্থবিদ এবং আবহাওয়াবিদ পৃথিবীর পানির যে সমতা পত্র (balance sheet) তৈরি করেছেন তা নির্দেশ করে যে, সমুদ্র ৪০,০০০ ঘন কিলোমিটার (৪×১০^{১৩} টন) পানি প্রতি বছর স্থলভাগকে সরবরাহ করে এবং প্রতি বছর একই পরিমাণ পানি নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে ফিরে আসে। এটি আরো নির্দেশ করে যে, পৃথিবীব্যাপী স্কেলে ভূপৃষ্ঠে পতিত বৃষ্টিপাতের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ জলীয় বাষ্প আসে সমুদ্র থেকে। বাকি অংশ আসে ভূপৃষ্ঠের বাষ্পীভবন থেকে, বিশেষ করে উদ্ভিদ থেকে (প্রস্বেদনের মাধ্যমে); মোট বাষ্পীয় প্রস্বেদনের শতকরা ৫ থেকে ২০ ভাগ আসে মৃত্তিকা পৃষ্ঠ থেকে। উচ্চহারে টার্নওভারের (turnover) কারণে (গড়ে জলীয় বাষ্প দশ দিন বায়ুমণ্ডলে থাকে) পৃথিবী পৃষ্ঠের সকল বস্তুর মধ্যে পরিমাণগতভাবে পানির চলাচল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ চক্র। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তির টার্নওভারও এতে অন্তর্ভুক্ত, কারণ ভূপৃষ্ঠে শোষণকৃত সৌরবিকিরণের একটি বিরাট অংশ পানির বাষ্পীভবনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু বায়ুমণ্ডলের পানি বৃষ্টির আকারে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে সেহেতু চক্রের এই অংশটুকু বদ্ধ (closed)।

আর্দ্র ও শুষ্ক অঞ্চল (Humid and Arid Regions)

সমুদ্র ও জলভাগ উভয় জায়গাতেই কতকগুলো অঞ্চল আছে যেখানে বাষ্পীভবনের হার বেশি কিংবা কম এবং অতিরিক্ত কিংবা কম বৃষ্টিপাত হয়। প্রখর সূর্যকিরণ বাষ্পীভবনকে ত্বরান্বিত করে এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে সমুদ্র থেকে প্রতি বছর বাষ্পীভবনের হার ২০০০ মিলিমিটার বা তার চেয়েও বেশি। স্থলভাগে নিরক্ষরেখা বরাবর অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি এবং বাষ্পীভবনের হারও সবচেয়ে বেশি; অবনিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় এবং উচ্চ অক্ষাংশ অঞ্চল শীতল হওয়ায় বাষ্পীভবন কম হয়।

কোনো এলাকার পানি সমতা নির্ণয়ে বৃষ্টিপাত ও বাষ্পীভবনের পরিমাণ চূড়ান্ত বিষয় নয়, এদের পারস্পরিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি বাৎসরিক বাষ্পীভবনের তুলনায় বাৎসরিক বৃষ্টিপাত বেশি হয়, তাহলে সেই এলাকাকে আর্দ্র (humid) এবং বিপরীত অবস্থা হলে তাকে শুষ্ক (arid) এলাকা বলে। স্থলভাগের প্রায় এক–তৃতীয়াংশ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি আছে, এর অর্ধেক (ভূ–পৃষ্ঠের প্রায় শতকরা ১২ ভাগ) খুব বেশি শুষ্ক অর্থাৎ বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫০ মিলিমিটারের কম এবং বায়ুর বাষ্পীভবনের ক্ষমতা প্রতি বছরে ১০০০ মিলিমিটারের বেশি। অপরপক্ষে, অতিরিক্ত আর্দ্র এলাকায়, স্থলভাগের শতকরা ৩ ভাগেরও কম, প্রধানত ১০° থেকে ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে এবং সুউচ্চ পর্বতমালার, যা জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুকে প্রতিহত করে, অনুবাত (leeward) অংশে অবস্থিত। সমুদ্র থেকে দূরবর্তী ভূখণ্ডে ক্রমাগত আর্দ্র আবহাওয়া, মাঝারি ধরণের শুষ্কতা (semi-arid) যেখানে মাঝে মাঝে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে এবং পরিশেষে শুষ্ক অঞ্চল, যেখানে শুষ্ক আবহাওয়া স্থায়ী, পরিলক্ষিত হয়।

কোনো এলাকার বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ও বাষ্পীভবনের মধ্যে সম্পর্ক সেই এলাকার আর্দ্রতা বা শুষ্কতা মোটামুটিভাবে নির্দেশ করে। এই এলাকায় জন্মানো উদ্ভিদের জন্য অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনের সময় (শস্য উৎপাদনের মৌসুমে) পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

সীমিত বৃষ্টিপাত সবসময় শুষ্কতা সৃষ্টি করে না; শীতল মেরু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, কিন্তু এ অঞ্চল শুষ্ক (arid) নয়, কারণ এখানকার বায়ুর বাষ্পীভবনের ক্ষমতা কম। আবার উদ্ভিদ কঠিন অবস্থার অধঃক্ষেপণ (precipitation) সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না।

পঞ্চম অধ্যায়

শস্য উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি

শস্য উদ্ভিদের খনিজ মৌলের প্রধান উৎস মৃত্তিকা। যদিও বীজে যথেষ্ট পরিমাণ খনিজ মৌল থাকে, অঙ্কুরোদ্গমের পর থেকেই মৃত্তিকার খনিজ মৌল পরিশোষণ শুরু হয় এবং যে সমস্ত খনিজ মৌল চারাগাছের মূল ও বিটপে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই আসে মৃত্তিকা থেকে।

মৃত্তিকা থেকে খনিজ মৌল সরবরাহ (Supply of mineral elements from the soil)

যে সমস্ত খনিজ মৌল শস্য উদ্ভিদ ব্যবহার করে তা মৃত্তিকার দ্রবণে আয়ন অবস্থায় থাকে। খনিজ মৌল কর্দম কণা (clay particle) এবং জৈব পদার্থের সাথে আয়ন অবস্থায় লেগে থাকে, দ্রুত বিশ্লেষণশীল অজৈব যৌগে, খুবই স্থায়ী খনিজে, বিশ্লেষণশীল জৈব পদার্থে এবং জীবন্ত অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীতে থাকে। উদ্ভিদের জন্য অবিলম্বে লভ্য মৌলগুলো মৃত্তিকার দ্রবণে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন হিসেবে থাকে, এই দ্রবণ আবার পরিশোষিত আয়নের সাথে (প্রধানত ক্যাটায়ন) সাম্যাবস্থায় থাকে এবং মৃত্তিকার দ্রবণ থেকে উদ্ভিদ কর্তৃক আয়ন পরিশোষণের সাথে সাথে কমপক্ষে আংশিক হলেও পূরণ হয়। তাই শস্যের বৃদ্ধিকালে কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় তা পরিমাপ করা সহজ নয়। কারণ নাইট্রোজেনসহ প্রত্যেকটি মৌলের একটি বিরাট অংশ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী যৌগে থাকে, তাই এদের মোট পরিমাণ নির্ণয় অকার্যকর। মৃত্তিকার দ্রবণ বিশ্লেষণ করলে, কেবল সেই সময়ে অবিলম্বে লভ্য মৌলের পরিমাণ জানা যায়। যা জানা দরকার তা হলো প্রথমে অর্থাৎ বপনের সময়ে কি পরিমাণ মৌল মৃত্তিকার দ্রবণে আছে, শস্য উৎপাদন কালে কি পরিমাণ মৌল লভ্য হবে এবং এই মুক্তকরণে কি কি নিয়ামক ক্রিয়াশীল তা মূল্যায়ন করা। সাধারণত মৃত্তিকার উপরের ২০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার স্তরের পরিমাপ করলেই যথেষ্ট, কারণ এই স্তরে, বিশেষ করে কৃত্রিম সার প্রয়োগকৃত মৃত্তিকায়, সর্বোচ্চ মাত্রায় মৌল থাকে এবং এখানেই অধিকাংশ মূল বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন খনিজ মৌলের আচরণের যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তাই এদেরকে পৃথকভাবে আলোচনা করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এ অধ্যায় কেবল নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P), পটাশিয়াম (K), ক্যালসিয়াম (Ca) এবং ম্যাগনেসিয়াম (Mg) সম্পর্কে আলোচনা করা হবে ; অন্যান্য মৌল যেমন- লোহা (Fe), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), সালফার (S), জিঙ্ক (Zn), কপার (Cu), মলিবডেনাম (Mo) এবং বোরন (B) একই রকমভাবে অত্যাবশ্যকীয়, যদিও খুব কম পরিমাণে প্রয়োজন হয়।

নাইট্রোজেন

মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন চক্রের একটি সরলীকৃত রেখাচিত্র ৫.১ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। মৃত্তিকায় কার্যকর নাইট্রোজেন প্রদান সংঘটিত হয় সার প্রয়োগে, বৃষ্টির মাধ্যমে (০.২ থেকে ২ গ্রাম প্রতি বর্গমিটারে প্রতি বছরে) অথবা মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া *Rhizobium* যা লেগুমের সাথে যুক্ত থাকে (অধিমিশ্র ক্লোভার অথবা লুসার্নি শস্যের মাধ্যমে প্রতি বছরে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম পর্যন্ত)

তার মাধ্যমে। মুক্তজীবী নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী জীব, ডিনাইট্রিফাইং জীব এবং উদ্বায়ীকরণের মাধ্যমে নাইট্রোজেন হারানো বাদ দেয়া যেতে পারে, কারণ শস্য উৎপাদনের সময়কালে (এসময়ই আমাদের বিবেচ্য বিষয়) এদের অবদান খুবই নগণ্য। উদ্ভিদ কর্তৃক পরিশোষিত হওয়ায় এবং/অথবা চোয়ানোর জন্য মূল অঞ্চল থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য মৃত্তিকা নাইট্রোজেন হারায়। অ্যামোনিয়াম (NH_4^+) অথবা নাইট্রেট (NO_3^-) আকারে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন পরিশোষণ করে; প্রথমটি সাধারণত কদর্ম কণা এবং হিউমাসের সাথে লেগে থাকে এবং দ্বিতীয়টি মৃত্তিকার দ্রবণে মুক্ত অবস্থায় থাকে। তাই প্রবল বৃষ্টিপাত অথবা অতিরিক্ত পানি সেচের জন্য মূল অঞ্চল থেকে নাইট্রেট ধৌত হয়ে নিচের স্তরে চলে যায়। জৈব পদার্থের ভাঙনের জন্য অ্যামোনিয়ামের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নাইট্রেট পূরণ হয় এবং অ্যামোনিয়ামের মতো উদ্ভিদ এবং মৃত্তিকাস্থ জীব কর্তৃক পরিশোষিত হয়। সাধারণত *Nitrosomonas*, *Nitrobacter* এবং সম্ভবত অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক অ্যামোনিয়াম আয়ন অতি দ্রুত নাইট্রেটে পরিণত হয়।

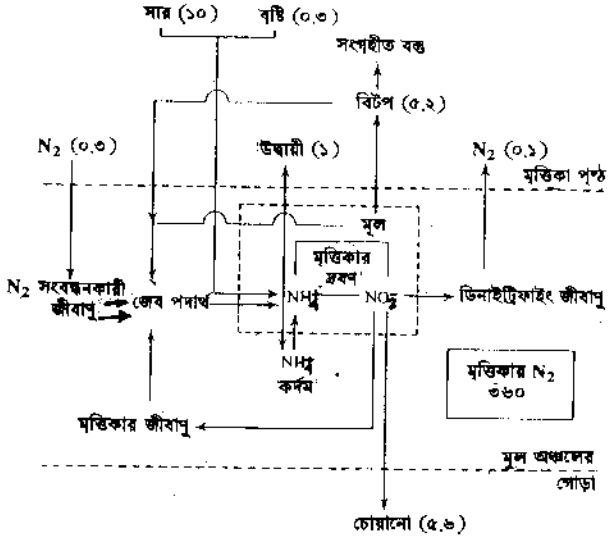

চিত্র ৫.১ : নাইট্রোজেন চক্র। সংখ্যাগুলো হলো ইংল্যান্ডের রথামস্টেডের শস্যায়ন (cropped) মৃত্তিকার উপরের ২২ সেন্টিমিটার অংশে বার্ষিক পরিবর্তন (গ্রাম প্রতি বর্গমিটারে)। উদ্বায়ীকরণ এবং ডিনাইট্রিফিকেশনের মাধ্যমে ঘাটতি সবসময়ই কম, মুক্তজীবী নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী জীবের মাধ্যমে জমা সবসময়ই কম, কিন্তু লেগ্যুমের সাথে সংযুক্ত *Rhizobium* কর্তৃক জমার পরিমাণ প্রতি বছর প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম পর্যন্ত। অন্যান্য উপাদানের অনেকখানি পরিবর্তন হয়, কিন্তু সর্বমোট যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে, তার তুলনায় এটি বেশ কম।

মৃত্তিকার দ্রবণে এবং কর্দম কণায় লেগে থাকা আয়নের ঘনমাত্রা, অর্থাৎ যা দ্রুত উদ্ভিদের জন্য লভ্য, নির্ভর করে ৫.১ নং চিত্রে বর্ণিত প্রতিটি প্রক্রিয়ার অগ্রসর হওয়ার হারের উপর। বিভিন্ন অবস্থায় এগুলো ভিন্নতর হয়। তবে এদের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, মৃত্তিকায় উপস্থিত নাইট্রোজেনের মাত্র শতকরা ১ ভাগ উদ্ভিদ গ্রহণ করে এবং সার হিসেবে প্রয়োগ করা অর্ধেকের বেশি থেকে তিন-চতুর্থাংশ নাইট্রোজেন পরবর্তী শস্য উদ্ধার করে।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে পরিবর্তন ঘটে তা কিছুটা বিস্তারিত জানা যাক। ধরা যাক, আমরা এমন একটি আবাদি জমি নিয়ে শুরু করলাম যা থেকে গম শস্য সদ্য কাটা হয়েছে। আমরা আশা করতে পারি যে, প্রতি কেজি শুষ্ক মৃত্তিকায় ১ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন আছে অ্যামোনিয়াম অবস্থায় এবং ২ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন আছে নাইট্রেট অবস্থায় (অর্থাৎ ৩ পিপিএম)-- ধরা যাক, উপরের ২৫ সেন্টিমিটার মৃত্তিকায় প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ০.৩ গ্রাম। এই স্তরে সর্বমোট নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ২০০ থেকে ৪০০ গ্রাম, অর্থাৎ প্রায় হাজার গুণ বেশি। এরপর এখানে ঘাস-ক্লোভার শস্য বপন করে ধরা যাক পাঁচ বছর ধরে রাখা আছে। এই সময়ে, অ্যামোনিয়াম এবং নাইট্রেট নাইট্রোজেনের পরিবর্তন হবে খুব সামান্য ; নাইট্রেট নাইট্রোজেন প্রায় ১ পিপিএম থাকে এবং অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন ধীরে ধীরে বেড়ে প্রায় ৩ পিপিএম হয়। ৫.১ নং চিত্রে দেখানো সবগুলো প্রক্রিয়া এসময় চলতে থাকে, কিন্তু নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়াম আয়ন যতো তাড়াতাড়ি তৈরি হয়, ততো তাড়াতাড়ি উদ্ভিদ এবং মৃত্তিকার জীব দ্বারা পরিশোষিত হয়। প্রতি বছরে প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ৪ থেকে ১০ গ্রাম হারে মোট নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায়। এই জমি থেকে প্রাণিজ দ্রব্য অথবা হে (hay), যা খুব দ্রুত নিরূপণ করা যায়, বাদ দিলে পাঁচ বছর পর আমরা পাবো প্রতি বর্গমিটারে প্রায় ৩৪০ গ্রাম. এর পর এই জমি চাষ করে পতিত ফেলে রাখা হলো। এখানে দ্রুত নাইট্রেট নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পেতে থাকবে, ধরা যাক প্রতিদিন ০.৩ পিপিএম হারে। নাইট্রোজেন খনিজীকরণ, একে তাই বলে, নির্ভর করে মোট জৈব নাইট্রোজেনের পরিমাণের, C_N গ্রাম প্রতিগ্রাম মৃত্তিকায়, এবং তাপমাত্রার, T (° সেলসিয়াস) উপর। এটি মোটামুটিভাবে প্রকাশ করা হয় $১০^{-৭}(০.১T-১)\,C_N$ দ্বারা (একক গ্রাম প্রতি দিন), যদি মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত পানি থাকে। এখানকার পরিবেশ এমন যে, এখানে ঘন ঘন হাল্কা বৃষ্টিপাত হয়, এজন্য নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার কাজ চলতে থাকে, নাইট্রেট আয়ন চোয়ায় না। যদি মৃত্তিকার পানি ধারণ কিন্তু ক্ষমতার দ্বিগুণ বৃষ্টিপাত হয় তাহলে উপস্থিত অধিকাংশ নাইট্রেট চুইয়ে দূরে সরে যাবে। পতিত রাখার প্রায় ছয় মাস পর, সেখানে প্রায় ৬০ পিপিএম অর্থাৎ ১৮ গ্রাম নাইট্রোজেন প্রতি বর্গমিটারে থাকবে নাইট্রেট আকারে। আবাদি জমিতে এই মান সাধারণত ১০ থেকে ৬০ পিপিএম হয়, এবং শুষ্ক মৌসুমে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৃত্তিকায় এটি বেড়ে ১০০ পিপিএম হতে পারে। এবং এটি জমিতে প্রয়োগকৃত নাইট্রোজেন সার শস্যের বৃদ্ধির জন্য লভ্য হয়। যদি সবুজ সার অথবা অন্য কোনো জৈব পদার্থ মৃত্তিকায় যোগ করা হয়, তাহলে এর জন্য অণুজীবের বৃদ্ধি ব্যাপক হয় এবং এরা লভ্য নাইট্রোজেন পরিশোষণ করে, জৈব পদার্থের ভাঙনের সাথে সাথে লভ্য নাইট্রোজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

ফসফরাস

মৃত্তিকায় কতকগুলো খনিজের ফসফেট গ্রুপ হিসেবে, অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ফসফেটের আকারে এবং হাইড্রেটেড লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পৃষ্ঠে ফসফরাস লেগে থাকে। এটি জৈব পদার্থে, বিশেষ করে ইনোসিটল ফসফেটে ও নিউক্লিক অ্যাসিডেও থাকে। অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, উদ্ভিদ কেবল $H_2PO_4^-$ আয়ন আকারে ফসফরাস পরিশোষণ করে। উদ্ভিদের ফসফরাস প্রাপ্তি নির্ভর করে সাম্যাবস্থা, ক্যালসিয়াম, লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম যৌগ থেকে H_2PO_4

–মুক্ত হওয়ার হার এবং যৌগ পদার্থের ভাঙনের হারের উপর। যখন সুপারফসফেট হিসেবে দ্রবণীয় অবস্থায় মনোক্যালসিয়াম ফসফেট [$Ca(H_2PO_4)_2$] মৃত্তিকায় প্রয়োগ করা হয়, এটি দ্রুত ডাই-ক্যালসিয়ামে ($Ca\ HPO_4$) রূপান্তরিত হয় এবং কর্দম কণার সাথে লেগে থাকে। মৃত্তিকার প্রকারের উপর ভিত্তি করে ০.০০৩ থেকে ৩ পিপিএম পর্যন্ত $H_2PO_4^-$ আয়ন মৃত্তিকার দ্রবণে ক্রমাগত বজায় থাকে। তবে ডাই-ক্যালসিয়াম অবস্থা অধিকতর অদ্রবণীয় অবস্থায় পরিণত হয় যা খুব ধীরে ধীরে লভ্য হয়। তাই, সাধারণত এটি দেখা যায় যে, প্রদেয় সারের কদাচিৎ শতকরা ১০ ভাগের বেশি ফসফরাস প্রথমবারে বপন করা শস্য পরিশোষণ করতে পারে এবং সম্ভবত আরো ১০ ভাগ ফসফরাসের দ্বিতীয়বারে বপন করা শস্য পরিশোষণ করে

এখন পর্যন্ত মৃত্তিকায় ফসফরাসের রসায়ন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত এবং লভ্য ফসফরাসের পরিমাণ নির্ণয়ের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক পদ্ধতি নাই। সাধারণভাবে বলা যায় যে, তিন প্রকার ফসফরাস মৃত্তিকায় সাম্যাবস্থায় থাকে : দ্রবণীয় P ⇄ লেবাইল P ⇄ অ-লেবাইল P। দ্রবণীয় P সম্ভবত প্রধানত $H_2PO_4^-$ আয়ন দ্বারা গঠিত ; লেবাইল P আয়ন আকারে অথবা কর্দম কণায় লেগে থাকা মোটামুটিভাবে দ্রবণীয় স্ফটিক, যেমন– হাইড্রোক্সাল অ্যাপাটাইট হিসেবে থাকে এবং অ-লেবাইল P অদ্রবণীয় যৌগে থাকে। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিণত হওয়ার হার নির্ভর করে সাম্যাবস্থা ধ্রুবক এবং বিক্রিয়কের (reactant) পরিমাণের উপর ; বিভিন্ন মৃত্তিকায় এগুলোর যথেষ্ট ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ

এই মৌলগুলো প্রধানত ক্যাটায়ন আকারে কর্দম কণার সাথে লেগে থাকে এবং বিভিন্ন জৈব যৌগে থাকে। এছাড়াও এগুলো মৃত্তিকার কতকগুলো খনিজে থাকে ; বিশেষ করে পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খনিজ থেকে অধিকতর দ্রুত K^+ আয়ন পাওয়া যায়। কতিপয় মৃত্তিকা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পটাশিয়াম আয়ন ধরে রাখে, তাই মৃত্তিকার উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকায় প্রয়োগকৃত পটাশিয়াম সারের পুনঃপ্রাপ্তি শতকরা ৩০ থেকে ১০০ ভাগ। সংযুক্ত আয়নগুলো অন্য আয়ন, বিশেষ করে মূলের হাইড্রোজেন আয়নের সাথে বিনিময়যোগ্য। কর্দম কণায় সংযুক্ত আয়নের প্রতিস্থাপনের অনায়াসতা (ease) নিম্নরূপ : Na >K>Mg>C>H। বিনিময়যোগ্য আয়নের পরিমাণ থেকে মৃত্তিকার আয়ন সরবরাহকারী ক্ষমতা এবং এজন্য সারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অবশ্য যে সমস্ত মৃত্তিকার দ্রুত ক্ষয়ীভবন হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এটি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক নয়। বিভিন্ন মৃত্তিকায় এই মানের (প্রতি কেজিতে মিলিতুল্যাঙ্ক) পরিসর হলো ক্যালসিয়ামের জন্য ১১ থেকে ৩০০, ম্যাগনেশিয়ামের জন্য ৭ থেকে ৫০, পটাশিয়ামের জন্য ৮ থেকে ১২ এবং সোডিয়ামের জন্য ৫ থেকে ৭০। কোনো মৃত্তিকায় বিনিময়যোগ্য আয়নের মোট পরিমাণ এবং প্রতিটি আয়নের অনুপাত নির্ভর করে যে অবস্থায় মৃত্তিকা গঠিত হয়েছে, কি কি পদার্থ মৃত্তিকায় প্রয়োগ করা হয়েছে (যেমন– চুন প্রয়োগ) এবং বিভিন্ন কর্দম খনিজ এবং হিউমাসের আপেক্ষিক পরিমাণের উপর হিউমাসের বিনিময় যোগ্যতা (প্রতি কেজিতে মিলিতুল্যাঙ্ক) ১,৫০০ থেকে ৩,০০০, মন্টমরিলোনাইটের ১,০০০, ইলাইটের ৩০০ এবং কেয়োলিনাইটের ১০০।

মূল কর্তৃক আয়ন পরিশোষণ

মৃত্তিকায় জন্মানো উদ্ভিদ লভ্য আয়নের সবটুকুই পরিশোষণ করতে পারে না। কেবল মূলের অতি সন্নিকটের আয়নই পরিশোষিত হয় ; মৃত্তিকার এক দিক থেকে অন্য দিকে চলাচলের জন্য আয়ন মূলের সন্নিকটে পৌঁছায় অথবা পূর্বে আয়ন পরিশোষিত হয়নি মৃত্তিকার এমন এলাকায় মূল বৃদ্ধি

পেয়ে আয়নের সন্নিকটে পৌঁছলে অতি সহজেই আয়ন পরিশোষিত হয়। কোনো সময়ে এ দুটি পদ্ধতির কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ভর করে আয়নের প্রকৃতি, মৃত্তিকার প্রকার ও উদ্ভিদ প্রজাতির উপর। তবে চারপাশের সকল আয়ন মূল অত্যাবশ্যকীয়ভাবে পরিশোষণ করে না, আয়ন পরিশোষণের এই পার্থক্য বা নির্বাচনমূলক প্রবেশ্যতা সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

যদি মূলের বৃদ্ধি খুব সামান্য হয়, অথবা হয় না, তাহলেও বৃষ্টিপাতের পর চোয়ানো কিংবা ঘর্মোদন ও বাষ্পীভবনের জন্য মৃত্তিকায় পানি ঘাটতি পূরণের জন্য মৃত্তিকার দ্রবণ চলাচল করে। সুতরাং এই 'ম্যাস প্রবাহের' জন্য মৃত্তিকার দ্রবণে উপস্থিত আয়ন মূলের পৃষ্ঠে স্থানান্তরিত হয় এবং এর ফ্লাক্স হলো $F_f = vC$ ..... (৫.১)

এক্ষেত্রে, v হলো মূলে পানি প্রবেশের আপাত বেগ। মূল কর্তৃক আয়ন পরিশোষণ এবং মৃত্তিকার দ্রবণে আয়নের চলাচলের আপেক্ষিক হারের নির্ভর করে মৃত্তিকার দ্রবণের আয়নের ঘনমাত্রা এবং মূলের পৃষ্ঠের আয়নের ঘনমাত্রার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একটি ব্যাপন গ্রেডিয়েন্ট সৃষ্টি হয় এবং মূলের দিকে অথবা মূল থেকে দূরে আয়ন ব্যাপিত হয় তা এই গ্রেডিয়েন্টের দিকের উপর নির্ভর করে। এই ফ্লাক্স (F_d) নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়–

$F_d = -D\ \xi\ dc/dz$ ..... (৫.২) এক্ষেত্রে, D হলো মৃত্তিকার দ্রবণের আয়নের ব্যাপন গুণাঙ্ক, ξ হলো একক বিহীন (dimension less) একটি ফ্যাক্টর যা একটি নলাকার সিস্টেমে ব্যাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং dc/dz হলো Cr (মূলের পৃষ্ঠে আয়নের ঘনমাত্রা) ও C (মৃত্তিকার দ্রবণে আয়নের ঘনমাত্রা)–এর মধ্যে ঘনমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট। ξ হলো Dt/R^2 এর একটি ফাংশন, এক্ষেত্রে, t হলো পরিশোষণের শুরু থেকে সময় এবং R হলো মূলের ব্যাসার্ধ ; সময়ের সাথে সাথে এটি হ্রাস পায় ও খুব দীর্ঘ পরিসরে Dt/R^2 এর মান প্রায় ১ হয়।

মৃত্তিকার গঠন, মৃত্তিকার পানির পরিমাণ এবং অন্যান্য আয়নের উপস্থিতির উপর ব্যাপনের এই ফ্লাক্স নির্ভর করে।

যখন ব্যাপন এবং ম্যাস প্রবাহ উভয়ের মাধ্যমেই একটি আয়ন চলাচল করে, তখন মূলের দিকে মোট ফ্লাক্স নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$F = F_d + F_f = D\ \xi\ dc/dz + vC$ ..... (৫.৩)

উদ্ভিদ ও মৃত্তিকার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য মৃত্তিকার দ্রবণ থেকে আয়নের ক্রমাগত কমে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মৃত্তিকায় আয়নের ব্যাপন এবং ম্যাস প্রবাহের আপেক্ষিক হার, বাফারিং ক্ষমতা এবং উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আয়ন পরিশোষণের হার, মূলের ঘনত্ব এবং মূলরোমের উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতি অন্যতম। যদিও মূলরোম আয়ন পরিশোষণের জন্য মূলের পৃষ্ঠ আয়তন বৃদ্ধি করে, মৃত্তিকার আয়নের নিয়ন্ত্রিত চলাচলের জন্য মূলরোম অঞ্চল সাধারণত আয়নের ঘনমাত্রা অনেক কমে যায়। সুতরাং মূলরোমের সর্বসাকুল্যে প্রভাব হলো মূলের কার্যকর ব্যাস বৃদ্ধি করা। কোনো অধিকতর সচল আয়নের পরিশোষণ এবং মৃত্তিকায় বিস্তার মূলরোমের উপস্থিতিতে কম সংবেদনশীল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি মূলের চারপাশে আয়নের ঘনমাত্রা হ্রাস পাওয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ পর্যন্ত একটি একক মূলে, মূলতন্ত্রে নয়, আয়ন পরিশোষণই বিবেচনা করা হয়েছে। একটি মূলতন্ত্রে আয়ন পরিশোষণের সময়সীমা শুধু একক মূলের সময় একত্র করে পাওয়া যাবে না, কারণ সময়ের সাথে সাথে এদের যেমন– ফসফেট, এই প্রভাব আরও জটিল। এখানে মূলরোম অঞ্চলে আয়নের হ্রাস অতি দ্রুত হয় এবং মৃত্তিকার কোনো অংশে মূল পৌঁছনোর পাঁচ দিনের মধ্যেই আয়ন পরিশোষণ একেবারে বন্ধ হয়ে যায় (Nye and Tinker, 1977)। ঘন মূলতন্ত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, লভ্য আয়নের জন্য বিভিন্ন মূলের প্রতিযোগিতার কারণে আয়নের

মাত্রা দ্রুত কমে যাওয়ায় পরিশোষণ হ্রাস পায়। মৃত্তিকায় আয়নের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করে (যেমন-- সার প্রয়োগ করে) প্রাথমিক অবস্থায় এই প্রতিযোগিতা কমানো যায়। তবে এই প্রভাব বেশি দিন স্থায়ী হয় না, কারণ অতিরিক্ত পুষ্টি উপাদান সরবরাহের জন্য এই অঞ্চলে পার্শ্বীয় মূলের বৃদ্ধি দ্রুত হয়।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, পুষ্টি উপাদানের নিম্ন মাত্রা বৃদ্ধিকে সীমায়িত করে না, যদি আয়ন পরিশোষণের হারের তুলনায় বেশি হারে ক্রমাগত পুষ্টি উপাদানের সরবরাহ বজায় রাখা হয়। বহমান পুষ্টি দ্রবণে প্রতি ঘনমিটারে ৫ মিলিমোল নাইট্রেটে চার সপ্তাহ পর্যন্ত গম গাছ জন্মানো যায় এবং প্রতি ঘনমিটারে ৭০০ মিলিমোল নাইট্রেটে টমেটোর ভাল ফলন পাওয়া যায়।

যদি সরলভাবে মূলের পৃষ্ঠ বরাবর আয়নের স্থানান্তরকে আয়ন পরিশোষণ হিসেবে ধরা হয়, তাহলে একে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায় :

$F=2\pi \bar{R} \bar{\alpha}$ Lr Cr.................. (৫.৪)

এক্ষেত্রে, R (সেন্টিমিটার) হলো মূলের গড় ব্যাসার্ধ, Lr (সেন্টিমিটার) হলো α এদের মোট দৈর্ঘ্য এবং হলো আপাত স্থানান্তর গুণাঙ্ক যা মূলের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের গড় এবং এটি মূল কর্তৃক আয়ন পরিশোষণের দক্ষতার পরিমাপক। অনেকদিন আগেই জানা গেছে যে, মূল পৃষ্ঠের একক ক্ষেত্রফলে আয়ন পরিশোষণের হার সময়ের সাথে এবং মূলের দৈর্ঘ্য বরাবর পরিবর্তন হয় ; আবার একটি মূলতন্ত্রের বিভিন্ন মূলেও আয়ন পরিশোষণের হারের পরিবর্তন হয়। সুতরাং অধিকতর সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য এই পরিবর্তনগুলো বিবেচনা করা দরকার। যদিও এই প্রভাবগুলোর সাধারণীকরণের জন্য পর্যাপ্ত উপাত্তের অভাব আছে, এরকম একটি বিশ্লেষণের ফলাফল সারণি ৫.১–এ উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ৫.১ : ফসফেট ও ক্যালসিয়াম পরিশোষণে চার সপ্তাহ বয়সের যবের (জাত–মেরিস বেজার) বিভিন্ন প্রকার মূলের অবদান

	সেমিনাল (axes)	নোডাল অক্ষ	পার্শ্বীয় (lateral)
মোট দৈর্ঘ্য (মিটার)	৪.২	৩.৮	৪৮
সম্পূর্ণ পরিশোষণে শতকরা অবদান			
ফসফেট	১০	৩০	৬০
ক্যালসিয়াম	১০	৪৫	৪৫

উপরোক্ত সমীকরণের (৫.১ থেকে ৫.৪) মাধ্যমে যে বিশ্লেষণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা মূলে বিভিন্ন প্রকার আয়নের বিভিন্ন প্রকার চলাচলের পার্থক্য নির্ণয়ে সাহায্য করে, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষণের কাজে ব্যবহার করা খুব কঠিন এবং $\bar{\alpha}$ এর পরিমাপ করাও সহজ নয়। এই বিশ্লেষণকে বর্ধিত করার পথ হলো উদ্ভিদ কর্তৃক আয়ন পরিশোষণ বিবেচনা করা।

যদি একটি উদ্ভিদের মোট ওজন W হয় এবং উদ্ভিদে একটি আয়নের গড় ঘনমাত্রা হয় X, তাহলে উদ্ভিদে আয়নটির ফ্লাক্স নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়-

$$F=\frac{d(wx)}{dt}=\frac{dw}{dt}(x)+\frac{dx}{dt}(w)=(w)(x)\left(\frac{dw}{dt}\cdot\frac{1}{w}+\frac{dx}{dt}\cdot\frac{1}{x}\right) \text{............. (৫.৫)}$$

এবং সমীকরণ (৫.৪) এবং (৫.৫) যুক্ত করে পাওয়া যায়

$2\pi\bar{R}\bar{\alpha}$ = (wx/Lr Cr) {(dw/dt) (1/w) + (dx/dt) (1/x).................. (৫.৬)

এক্ষেত্রে, $\overline{R}$ হলো আয়নটি পরিশোষণে মূলতন্ত্রের গড় দক্ষতার পরিমাপ এবং উদ্ভিদের সবল প্যারামিটার থেকে এর মান পাওয়া যায়। এটি হলো প্রতি একক মূলের দৈর্ঘ্যে উদ্ভিদের শুষ্ক ওজনের অনুপাত (w/Lr), মূলের পৃষ্ঠে এবং উদ্ভিদে আয়নের ঘনমাত্রার অনুপাত (X/Cr), আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার (dw/dt) (1/w) এবং ঘনমাত্রার আপেক্ষিক হারের (dx/dt) (1/X) পরিবর্তন। Cr এর পরিমাপ হলো সবচেয়ে কঠিন ভালভাবে নাড়ানো পুষ্টি দ্রবণে ধারণা করা হয় যে, Cr=C, মৃত্তিকায় আয়নের ঘনমাত্রা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্তিকা ও মূলের ভেতর সুস্পষ্ট ইন্টারফেস আছে। তবে মূলের চারদিকে মিউসিজেল (mucigel, আঠালো বস্তু)-এর উপস্থিতি এবং অনুষঙ্গ অণুজীব নির্দেশ করে যে, ইন্টারফেসের পরিবর্তন সময়ের সাথে হতে পারে। উপরন্তু, মূল অঞ্চলের রোগসৃষ্টি করে না এমন কতিপয় অণুজীব লভ্য আয়নের জন্য মূলের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে। আবার বিপরীতভাবে, কাষ্ঠল উদ্ভিদে এক্টোট্রোপিক মাইকোরাইজা এবং কতকগুলো শস্য উদ্ভিদের ভেসিকুলার আরবাসকুলার মাইকোরাইজা পোষক উদ্ভিদে ফসফেট এবং কখনো কখনো অন্যান্য আয়নের সরবরাহ বৃদ্ধি করে। একইভাবে, নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী *Rhizobium* থেকে কম পরিমাণে নাইট্রোজেন পোষক লেগুমজাতীয় উদ্ভিদে স্থানান্তরিত হয়। একই মৃত্তিকায় মাইকোরাইজাবিহীন মূলের তুলনায় মাইকোরাইজাযুক্ত মূলের ফসফেট পরিশোষণ বেশি হয়, বিশেষ করে মৃত্তিকায় যদি অল্প পরিমাণে ফসফেট থাকে। এর সম্ভাব্য কারণ হলো ছত্রাকের হাইফি কর্তৃক অধিক আয়তনের মৃত্তিকা অনুসন্ধান এবং মৃত্তিকার তুলনায় হাইফিৎ অভ্যন্তরে অধিকতর দ্রুত গতিতে আয়ন চলাচল করে। পোষক উদ্ভিদের নাইট্রোজেন পুষ্টিতে *Rhizobium* এর অবদান এবং মৃত্তিকা থেকে অজৈব নাইট্রোজেন আয়নের মধ্যে বিপরীত সম্পর্কযুক্ত। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ শস্যের প্রাথমিক পর্যায়ে অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেনঘটিত সার প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়, কারণ এই সময় ব্যাকটেরিয়াম দ্বারা মূল আক্রান্ত হয়, অর্বুদ তৈরি শুরু হয় এবং উদ্ভিদের প্রতিষ্ঠা হয়।

মৃত্তিকার মতো উদ্ভিদের মূলে আয়নের মোট ফ্লাক্স দুটি পৃথক ফ্লাক্সে ভাগ করা যায়; একটি হলো উদ্ভিদ কর্তৃক পানি পরিশোষণ এবং অপরটি হলো পানি পরিশোষণ থেকে স্বতন্ত্র (চিত্র ৫.২)। মূলের ভেতর দিয়ে জাইলেমে প্রবাহিত আয়নগুলো প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত স্থান (free space) অর্থাৎ কোষ প্রাচীর এবং কোষ ঝিল্লীর বাইরের রন্ধ্র দিয়ে চলাচল করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য জাইলেমে প্রবেশের পূর্বে এদের কোষ ঝিল্লী দিয়ে স্থানান্তর হয়। এই স্থানান্তর এন্ডোডার্মিসে অথবা এমন কি জাইলেমের আরো সন্নিকটে হতে পারে।

বিভিন্ন ঘনমাত্রার বহিস্থ দ্রবণে আয়ন পরিশোষণের হারের পরিবর্তনের কাইনেটিক বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে, আয়নগুলোর পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার প্রবণতার ভিন্নতার দুটি কৌশল আছে।

যবের মূলের এদের একটির সিস্টেম১—পটাশিয়ামের জন্য Ks বেশ কম এবং প্রতি ঘনমিটারে প্রায় ০.০২৫ মোল (Ks হলো আয়নের বহিস্থ, ঘনমাত্রা যখন পরিশোষণের হার সর্বোচ্চ মানের অর্ধেক); অর্থাৎ পটাশিয়ামের সাথে মূলের সংযুক্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি। *Ricinus*-এর পটাশিয়ামের পানি আমিভরশীল ফ্লাক্সের Ks সিস্টেম ১ এর মতো। সিস্টেম ২-এর Ks এর মান প্রতি ঘনমিটারে প্রায় ১৭মোল, অর্থাৎ K এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা কম, যদিও উভয় সিস্টেমে পরিশোষণের সর্বোচ্চ হার প্রায় ১২ মিলিমোল প্রতিগ্রাম মূলের সজীব ওজন প্রতি ঘণ্টায়। খুব কম ঘনমাত্রার পটাশিয়ামে সিস্টেম ১ সম্পৃক্ত হয়, প্রতি ঘনমিটারে ১ মোলের কম, এই পরিমাণ মৃত্তিকার দ্রবণে পাওয়া যায়। এটি প্রস্তাব করা হয়েছে যে, কোষ ঝিল্লিতে সিস্টেম ১ এবং টনোপ্লাস্টে (কোষগহ্বরের ঝিল্লি) সিস্টেম ২ ক্রিয়াশীল; অবশ্য অপর একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে

যে, উভয়েই কোষ ঝিল্লীতে সমান্তরালভাবে ক্রিয়াশীল। যখন বিটপে আয়ন পরিবহণের উপর বহিঃস্থ আয়নের ঘনমাত্রার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়, এটি সিস্টেম ১ কাইনেটিকস অনুসরণ করে। এটি—এর সাথে আরেকটি পর্যবেক্ষণ যে, যে সমস্ত আয়ন মূলের কোষের কোষগহ্বরে প্রবেশ করে না, তাদের তুলনায় যে সমস্ত আয়ন কোষগহ্বরে প্রবেশ করে তাদের জাইলেমে প্রবেশ করতে অধিক সময় লাগে—এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে যে, মূলের কোষের কোষগহ্বরে আয়নের পরিবহণে সিস্টেম ২ অংশগ্রহণ করে এবং এটি প্রধান পরিবহণ পথ থেকে ভিন্ন।

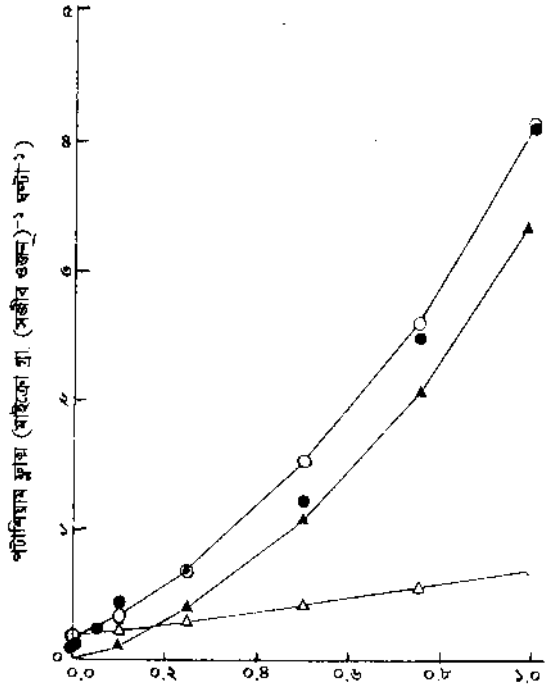

চিত্র ৫.২ : *Ricinus*এর মূলে পটাশিয়াম আয়নের মোট ফ্লাক্সকে (বদ্ধ বৃত্ত) পানি নির্ভরশীল (মুক্ত ত্রিভুজ) এবং পানি অনির্ভরশীল (বদ্ধ ত্রিভুজ) ফ্লাক্সে বিভাজন। আলাদাভাবে নির্ণীত দুটি ফ্লাক্সের যোগফল মুক্ত বৃত্ত নির্দেশ করে।

মুক্ত স্থান অথবা সিমপ্লাজমের (পারস্পরিক সংযুক্ত সাইটোপ্লাজম) মধ্য দিয়ে জাইলেমে এবং পরিশেষে বায়বীয় অংশে আয়ন চলাচলের আপেক্ষিক মাত্রা নির্ভর করে পানি পরিশোষণের হার এবং উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের পরিমাণের উপর। যে সমস্ত উদ্ভিদে অধিক পরিমাণে পুষ্টি উপাদান আছে, তাদের আয়নের মোট ফ্লাক্স প্রস্বেদনের হারের উপর নির্ভরশীল, অপরপক্ষে যে সমস্ত উদ্ভিদে কম পরিমাণে পুষ্টি উপাদান আছে তাদের মোট ফ্লাক্স প্রস্বেদনের হারের উপর নির্ভরশীল নয়। এই পার্থক্যের কারণ হলো, যে উদ্ভিদে কম পরিমাণে পুষ্টি উপাদান আছে তাদের মূলের কলায় অধিক পরিমাণে আয়ন থাকে, অর্থাৎ পরিশোষিত আয়ন মূলের চাহিদা প্রথমে পূরণ করে।

দিন এবং রাতে আয়ন পরিশোষণের হারের পার্থক্য হয় এবং এটি অবশ্যই পানি পরিশোষণের হারের সাথে সম্পর্কযুক্ত (চিত্র ৫.৩)। তবে পানি পরিশোষণের পার্থক্য সত্ত্বেও, নাইট্রোজেন ও পটাশিয়াম উভয়ের পরিশোষণ দিনের দ্বিতীয়ার্ধে বেশি হয়েছিল, দিনের প্রথমার্ধের তুলনায় এসময় আত্তীকারী দ্রব্যের পরিমাণ বেশি ছিল বলে আশা করা যায়।

প্রাথমিক অবস্থায় উদ্ভিদের বায়বীয় অংশে জাইলেমের মাধ্যমে আয়ন সরবরাহ হয়, প্রস্বেদন প্রবাহের সাথে অধিকাংশ আয়ন দ্রবণীয় অবস্থায় চলাচল করে। ক্ষারীয় মৃত্তিকার ধাতুর আয়ন অবশ্য পর্যায়ক্রমিক আয়ন বিনিময় বিক্রিয়ার মাধ্যমে জাইলেম ভেসেলের প্রাচীর বরাবর চলাচল করে।

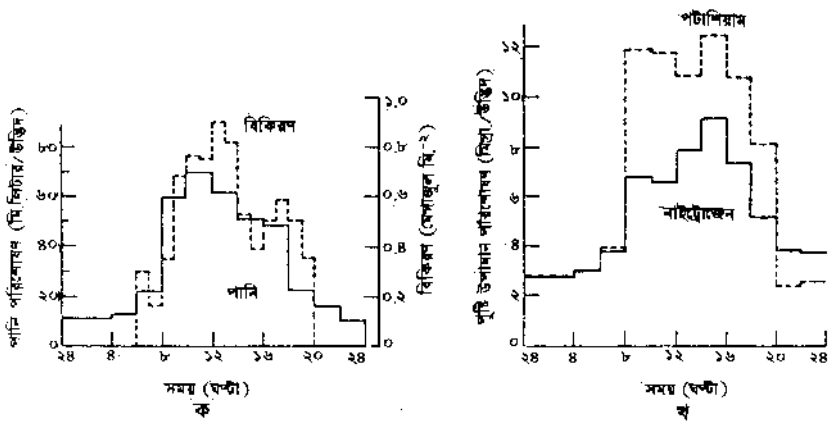

চিত্র ৫.৩ : গ্রীনহাউজে টমেটো শস্যের (ক) সৌরবিকিরণ (বিচ্ছিন্ন লাইন) ও পানি পরিশোষণ (অবিচ্ছিন্ন লাইন) এবং (খ) পটাশিয়াম (বিচ্ছিন্ন লাইন) এবং নাইট্রোজেন (অবিচ্ছিন্ন লাইন) পরিশোষণের দিন রাতের তারতম্য।

যে সমস্ত আয়ন জাইলেমে প্রবেশ করে তা অবশ্যই সরাসরি কর্টেক্স অতিক্রম করে অথবা মূলের কোষে কিছু সময়ের জন্য সঞ্চিত থাকে। যদিও অনেকগুলো আয়ন উদ্ভিদ যে অবস্থায় পরিশোষণ করে সেই অবস্থায় জাইলেমে চলাচল করে, অন্যান্য আয়নের দ্রুত বিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যব গাছ কর্তৃক পরিশোষিত ফসফেটের শতকরা ৩০ ভাগ ১০ সেকেন্ডের মধ্যে নিউক্লিওটাইডে আত্তীকরণ হয় এবং ৬০ সেকেন্ডের পর শতকরা ৯০ ভাগ জৈব যৌগে মিশ্রিত হয়। নাইট্রোজেন সাধারণত অ্যামোনিয়াম অথবা নাইট্রেট অবস্থায় পরিশোষিত হয়, কিন্তু অ্যামাইনো এসিড সংশ্লেষণের পূর্বে একে বিজারিত হতে হয়। সুতরাং উদ্ভিদে এটি কি অবস্থায় পরিবাহিত হয় তা নির্ভর করে উদ্ভিদে নাইট্রেট রিডাকটেজের অবস্থানের উপর। কিছু প্রজাতিতে এটি প্রধানত মূলে এবং অন্যান্য প্রজাতিতে পাতায় থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে পাতা থেকে আত্তীকারী দ্রব্যের সরবরাহের উপর নাইট্রেটের বিজারণ নির্ভরশীল এবং বিটপে অধিকাংশ নাইট্রোজেন বিজারিত অবস্থায়, প্রায়ই গ্লুটামিন অথবা অ্যাসপারজিন হিসেবে পরিবাহিত হয়। এসব কারণে বিটপে সাধারণত নাইট্রেটের ঘনমাত্রা অত্যন্ত কম। অপরপক্ষে, যখন নাইট্রেট বিজারণ

পাতায় ঘটে, তখন জাইলেম দিয়ে নাইট্রেট দ্রুত পরিবাহিত হয় এবং পাতা থেকে ফ্লোয়েম দিয়ে পরিবাহিত বিজারিত নাইট্রোজেনের সরবরাহের উপর মূল নির্ভরশীল।

কোনো অঙ্গে আয়ন সরবরাহের পরিমাণের সাথে সাধারণত এর প্রস্বেদনের হারের সম্পর্ক আছে। যে অঙ্গ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আয়ন গ্রহণ করে, পূর্ণাঙ্গ পাতা, তাদের আবার কচি প্রসারণশীল পাতা, বিটপের শীর্ষ এবং বর্ধনশীল ফলের তুলনায় আয়নের প্রয়োজনীয়তা অনেক কম। পূর্ণাঙ্গ পাতা থেকে ফ্লোয়েম দিয়ে মূলত আয়নের পূর্ণ বণ্টনের মাধ্যমে কচি পাতা, শীর্ষদেশ এবং বর্ধনশীল ফল আয়ন পায়। প্রধানত ফ্লোয়েমের মাধ্যমে কোনো পাতার নিট আয়ন গ্রহণকারী অবস্থা থেকে জাইলেমের মাধ্যমে আয়ন গ্রহণকারী কিন্তু ফ্লোয়েম দিয়ে নিট প্রেরণকারী অবস্থার পরিবর্তন ৫.৪ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

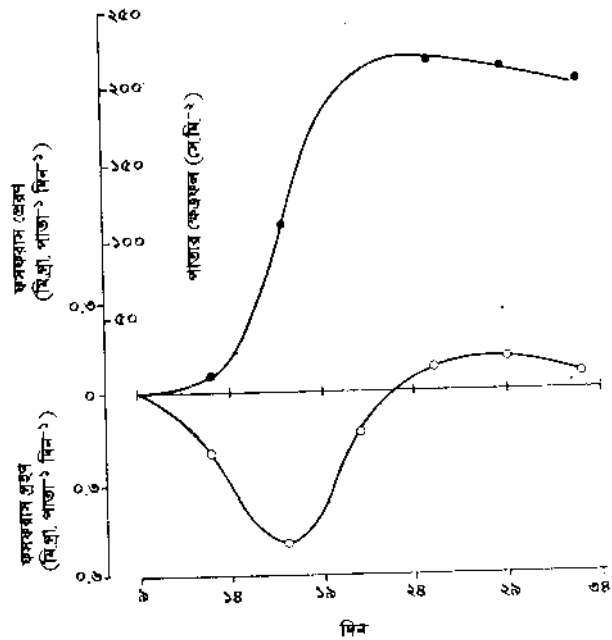

চিত্র ৫.৪ : পাতার ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি (বদ্ধ বৃত্ত) এবং ফসফরাস চলাচলের পরিবর্তনশীল প্যাটার্নের (মুক্ত বৃত্ত) উপর পাতার বয়েসের প্রভাব।

আয়ন সরবরাহের উপর পাতার (এবং অন্যান্য অঙ্গের) কোষের প্রসারণ নির্ভরশীল। যখন পাতা পূর্ণ প্রসারিত অবস্থায় পৌঁছায় এবং আয়নের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেতে থাকে, তখন পাতা থেকে সাধারণত নিট আয়ন প্রেরণ আরম্ভ হয়। ফ্লোয়েমে আয়ন প্রেরণের হার ও জাইলেমে আয়নের সরবরাহের হারের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই বলেই প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, যখন ফ্লোয়েমে চলাচলকারী মৌল, যেমন– নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়ামের সরবরাহ সীমিত, তখন পুষ্টি উপাদানের ঘাটতির প্রথম লক্ষণ পরিণত পাতায় দেখা যায়।

ক্ষারীয় মৃত্তিকার ধাতুর আয়নগুলোর প্রকৃতি আবার ভিন্ন, কারণ এগুলো খুব সহজে সিভ নলে প্রবেশ করতে পারে না, এজন্য পাতায় এসকল আয়নের ঘনমাত্রা সবসময়ই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জাইলেমের মাধ্যমে সরবরাহকৃত ক্যালসিয়ামের উপর কচি পাতা নির্ভরশীল এবং এজন্য ক্যালসিয়াম ঘাটতির প্রাথমিক লক্ষণ কচি পাতায় দেখা যায়। একইভাবে অন্যান্য অঙ্গ যার খুব দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু প্রস্বেদনের হার খুব কম, এদেরও ক্যালসিয়াম ঘাটতির লক্ষণ দেখা যায়।

শস্য কর্তৃক খনিজ মৌল পরিশোষণ (Absorption of Mineral Nutrients by Crops)

পূর্বে বর্ণিত আয়ন পরিশোষণের উপর যে সকল প্রকরণ আলোচনা করা হয়েছে, তা মাঠে জন্মানো উদ্ভিদের আয়ন পরিশোষণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দূরে দূরে বপন করা উদ্ভিদের মূল নিচে এবং পাশে সবদিকেই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পরিশোষণের জন্য লভ্য মৃত্তিকার পরিমাণ হলো মূলের প্রধান অক্ষগুলোর (axes) দৈর্ঘ্যের গড়ের ঘন (cube)। যেহেতু মূলের শীর্ষের দিকের নবীন অংশে সবচেয়ে বেশি আয়ন পরিশোষণ হয়, মৃত্তিকার যেসব অঞ্চল থেকে আয়ন পরিশোষিত হয় তা নির্দেশ করে যে, এই অঞ্চলের মূলের বৃদ্ধির হার এবং আয়নের ঘনমাত্রা বেশি (সারণি ৫.২)।

সারণি ৫.২ : মিলেটের *Pennisetum typhoides* মূলের বিভিন্ন অংশ কর্তৃক ফসফরাস পরিশোষণের শতকরা হার। উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব ১২২ সেন্টিমিটার × ১২২ সেন্টিমিটার।

শস্যের বয়স (দিন)	গভীরতা (সেন্টিমিটার)	উদ্ভিদের গোড়া থেকে দূরত্ব (সেন্টিমিটার)			
		০–১৫	১৫–২৫	২৫–৩৫	৩৫–৪৫
২৮	০–১০	৩৬	৩১	১৩	১
	১০–২০	৪	৪	১	১
	২০–৩০	১	১	৩	–
	৩০–৪০	–	–	–	–
	৪০–৫০	–	–	–	–
৫৩	০–১০	১২	১৭	১১	১১
	১০–২০	১১	১০	৮	৬
	২০–৩০	২	২	২	৩
	৩০–৪০	১	১	১	১
	৪০–৫০			–	
৭৮	০–১০	৮	১৫	১৮	১৩
	১০–২০	৭	৭	৭	৫
	২০–৩০	২	৩	২	৪
	৩০–৪০	১	১	২	২
	৪০–৫০	–	১	১	১
৯৩	০–১০	৭	১১	১৮	১২
	১০–২০	৪	৭	৫	২
	২০–৩০	২	৩	৩	৫
	৩০–৪০	১	২	৩	৩
	৪০–৫০	১	১	৫	২

যখন উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব কম, তখন পার্শ্ববর্তী উদ্ভিদের মূলের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয় এবং যা দু'রকমের যে কোনো একটি অবস্থা হয়। কখনো কখনো একটি উদ্ভিদের মূল পার্শ্ববর্তী উদ্ভিদের মূলের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। এর জন্য মূল অল্প আয়তনের মৃত্তিকা থেকে আয়ন পরিশোষণ করে এবং মৃত্তিকায় যেসব আয়ন অপেক্ষাকৃত অচল তাদের পরিশোষণ কম হয়। অন্য ক্ষেত্রে মূলতন্ত্রগুলো পরস্পরের সাথে মিশ্রিত হয়, যদিও মৃত্তিকায় মূলের চূড়ান্ত ঘনত্ব বেশি হতে পারে, তথাপিও যে কোনো একটি উদ্ভিদের মূলতন্ত্র ক্ষুদ্র হবে ও মূলের পার্শ্বীয় বৃদ্ধির পরিবর্তন হবে। উপরন্তু, যখন আন্তঃপ্রজাতি প্রতিযোগিতা হয়, প্রতিযোগী উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকার যে গভীরতা থেকে আয়ন পরিশোষণ করে তারও পরিবর্তন হয়।

মূলতন্ত্রের প্রতিযোগিতা কেবল মূলের মোট পরিমাণ অথবা মূলের বিস্তারকে হ্রাস করে না, মূলতন্ত্রের আকারেরও পরিবর্তন হয়, যেমন– ক্ষুদ্রাকার পুরু মূলের সৃষ্টি হয়। এই প্রভাব কিভাবে কাজ করে তা এখনও স্পষ্ট নয়। কিছু উদ্ভিদের মূল বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণ করে এবং এটি পার্শ্ববর্তী উদ্ভিদের মূলের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এটি পানি ও পুষ্টি উপাদানের সরবরাহ হ্রাসের সরাসরি প্রতিক্রিয়ার জন্যও হয়।

আয়নের মধ্যে জটিল পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে একটি আয়নের পরিশোষণে অন্যান্য আয়ন ও পানি সরবরাহ প্রভাবিত করে। একটি পরীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে, পুষ্টি দ্রবণের (medium) পানির পটেনশিয়াল –০.২ মেগাপ্যাসকেলের কম হলে ফসফরাস পরিশোষণ হ্রাস পায় এবং –২.০ মেগাপ্যাসকেলে পরিশোষণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। মূলের পৃষ্ঠে মৃত্তিকার দ্রবণের ম্যাস প্রবাহের উপর অসমোটিক পটেনশিয়ালের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে এবং আয়নের ব্যাপনের উপর মৃত্তিকার পানির পরোক্ষ প্রভাব আছে। মৃত্তিকার কোনো নির্দিষ্ট অংশ, যেমন– পৃষ্ঠ স্তর (surface layer) শুকিয়ে গেলে উদ্ভিদের অন্য অংশে ক্ষতিপূরণমূলক বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এর ফলেও মৃত্তিকার পৃষ্ঠ স্তর থেকে আয়ন পরিশোষণ হ্রাস পায়। যেহেতু এই অঞ্চলে সাধারণত সর্বোচ্চ পরিমাণে মূল ও খনিজ উপাদান থাকে, এর ফলাফল খুব খারাপ হয় এবং দীর্ঘ মূলের সংখ্যা কম হলে শস্যের পর্যাপ্ত পানি ও খনিজ উপাদানের সরবরাহ হয় না। এমন কি যখন শুষ্ক পৃষ্ঠ স্তরে পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান থাকে এবং উদ্ভিদ গভীর স্তর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পরিশোষণ করে, তখনও এরকম ঘটে। পানি সরবরাহ সীমিত হলে এবং বেশি পরিমাণে সার প্রয়োগ করলে পাতার পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়, এর জন্য বেশি পানি ব্যবহৃত হয় এবং পরিশেষে ফলন কমে যায়।

উদ্ভিদে পুষ্টি উপাদানের প্রতিক্রিয়া (Plant Nutrient Response)

বৃদ্ধি চলাকালে যদিও সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমেই অধিকাংশ শুষ্ক পদার্থ তৈরি হয়, তথাপিও খনিজ মৌল সরবরাহের উপর মোট ফলন নির্ভরশীল। খনিজ মৌল অবশ্য শুষ্ক ওজনের খুব সামান্য অংশ ; নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম সাধারণত যথাক্রমে প্রায় শতকরা ১.৫, ০.২ এবং ১.০ ভাগ এবং ক্ষুদ্রতর পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ আরও কম। যেমন মলিবডেনামের পরিমাণ শতকরা $১০^{-৫}$ ভাগ। পানি ব্যতীত, সকল পরিবেশীয় প্রকরণের মধ্যে সম্ভবত খনিজ মৌল সবচেয়ে দ্রুত এবং নিপুণতার সাথে শস্য উৎপাদনকারীর সুবিধার উদ্দেশ্যে উপযোগী করা যায়। তবে চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত মৃত্তিকায় সাধারণত মৌল উপাদানগুলো সর্বোত্তম মাত্রার তুলনায় কম থাকে এবং সার প্রয়োগে কদাচিৎ এই মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যাতে করে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক ফলন পাওয়া যায়। পরিবেশীয়, সকল প্রকরণ সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করার জন্য এগুলো অপর্যাপ্ত হওয়ায় সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায় না।

যদি বহিঃস্থ দ্রবণে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়ন থাকে, তাহলে আয়ন ব্যবহারের তুলনায় পরিশোষণের হার বেশি হবে এবং উদ্ভিদে আয়ন সঞ্চিত হবে। অন্তঃস্থ আয়নের মাত্রা বেশি হলে (বিশেষ করে নাইট্রোজেন) নতুন মেরিস্টেমের বর্ধন বেশি হবে এবং এর জন্য আবার আয়নের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এটি আংশিক পূরণ হয় মূলতন্ত্রের বৃদ্ধির জন্য মৃত্তিকার নতুন অঞ্চলে মূল প্রবেশের ফলে, কিন্তু পুরাতন মূলের চারদিকে আয়নের ঘনমাত্রা হ্রাস পায়। মূল কর্তৃক আয়ন পরিশোষণ এবং মৃত্তিকার অচলীকরণ (immobilization) বিক্রিয়ার তুলনায় জৈব পদার্থ ও মৃত্তিকার কলয়েড থেকে আয়ন সরবরাহ কম হয়, এবং বিটপের বৃদ্ধির তুলনায় মূলের বৃদ্ধি হ্রাস পায়, এর জন্য আয়নের পরিশোষণের তুলনায় সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত বস্তু দ্রুত জমা হয়। সুতরাং খনিজ মৌলের ঘনমাত্রা (প্রতি একক শুষ্ক ওজনে মৌলের পরিমাণ) চারাগাছে বেশি ও এর পর সামান্য পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু পরিশেষে এটি হ্রাস পায়।

অধিকাংশ শস্যে এমন একটি পর্যায় আসে যখন খনিজ মৌলের সরবরাহের তুলনায় নতুন বর্ধনশীল অঞ্চলে চাহিদা বেশি ; একে 'অন্তঃস্থ উপবাস' (internal starvation) বলে। প্রকৃতপক্ষে, খনিজ মৌলের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে একটি সমতার চিত্র থেকে পাওয়া যায়। সবচেয়ে দক্ষ ব্যবস্থা এমন যাতে উদ্ভিদকে কেবল অন্তঃস্থ উপবাসের শুরুতে রাখা যায়। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ উদ্ভিদকে বিবেচনা করা হয়, তখন এর গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পায়, কারণ পরিণত পাতা থেকে খনিজ মৌল কচি পাতায় পৌঁছায়। উদ্ভিদ বর্তমানে বৃদ্ধির জন্য পরিশোষণকৃত এবং পুরাতন কলা থেকে স্থানান্তরিত উভয় প্রকার আয়ন ব্যবহার করে, এই দুই প্রক্রিয়ার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ভর করে বৃদ্ধির হার এবং মৃত্তিকায় পুষ্টি উপাদানের লভ্যতার উপর। এর জন্য অবশ্য পাতার বার্ধক্য প্রাপ্তি দ্রুত হয়, এবং এই পাতাগুলো যদি নবীন পাতায় ঢাকা পড়ে সৌরবিকিরণ কম পায়, তাহলে এদের সালোকসংশ্লেষণের হারও বেশ কম হয়, এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে এদের প্রধান অবদান হলো এরা অন্যান্য পাতায় আয়ন সরবরাহ করে। তাই অন্তঃস্থ আয়নের কিছুটা ঘাটতি হলেও উদ্ভিদের বৃদ্ধি কিংবা ফলন খুব হ্রাস পায় না।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিপরিণতির জন্য প্রয়োজনীয় মৌল (Elements Required for Plant Growth and Development)

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিপরিণতির জন্য খনিজ মৌলের প্রয়োজন। শস্য উৎপাদনকারী প্রয়োজনমতো বিভিন্ন প্রকার সার জমিতে প্রয়োগ করে শস্যের ফলন এবং গুণগত মান বৃদ্ধি করতে পারেন। তাই শস্যের পুষ্টির বিভিন্ন কলা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান শস্য উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

শস্যের বৃদ্ধি ও বিপরিণতি নিয়ন্ত্রণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম এই তিনটি মৌলের গুরুত্ব খুব বেশি। অন্যান্য বৃহত্তর অণু পুষ্টি মৌল (macroelements) (যেমন– ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, লোহা, সোডিয়াম, সালফার এবং ক্লোরিন) উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজন, কিন্তু এগুলো ব্যাপকভাবে সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করা হয় না।

আরও কতকগুলো মৌল খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়, এদেরকে ক্ষুদ্রতর পুষ্টি উপাদান (minor or trace elements) বলে। এগুলো হলো ম্যাঙ্গানিজ (Mn), দস্তা (Zn), তামা (Cu), বোরন (B), মলিবডেনাম (Mo) এবং কোবাল্ট (Co)। এই মৌল উপাদানের অভাব হলে বৃদ্ধি ও বিপরিণতি অস্বাভাবিক হয় এবং এক বা একাধিক মৌল অভাবগ্রস্ত উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের অংশ বিশেষ প্রাণীকে খাওয়ালে এসব জন্তুর স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়।

তিনটি প্রধান মৌলের মধ্যে আবার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে নাইট্রোজেনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। নাইট্রোজেন হলো অ্যামাইনো এসিড, প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডের উপাদান এবং শস্যের

শারীরতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্তিকা থেকে অ্যামোনিয়াম এবং নাইট্রেট আকারে নাইট্রোজেন পরিশোষিত হয় এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য নাইট্রোজেনঘটিত যৌগে পরিণত হয়। বিশেষ করে পাতার বৃদ্ধি নাইট্রোজেন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মৃত্তিকায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে পাতার ক্যানোপির আকার এবং স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি করা যায় এবং এজন্যই নাইট্রোজেন প্রয়োগে অধিকাংশ শস্যের ফলন বৃদ্ধি পায়। নাইট্রোজেন পাতার ক্লোরোফিলের পরিমাণকে প্রভাবিত করে এবং নাইট্রোজেন ঘাটতি উদ্ভিদ ধূসর সবুজ অথবা হলুদ হয়। উচ্চ মাত্রায় প্রয়োগকৃত নাইট্রোজেন উদ্ভিদের কোনো বিশেষ অঙ্গের, যেমন– গম অথবা যবের দানার প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে গুণগত মানকে প্রভাবিত করে।

শস্যে নাইট্রোজেন সরবরাহ কতকগুলো নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল। এটি মৃত্তিকায় জৈব ও অজৈব অবস্থায় থাকে এবং মৃত্তিকার ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়াকলাপে নাইট্রোজেন চক্র সবসময়ই একটি পরিবর্তনশীল অবস্থায় থাকে। কিছু নাইট্রোজেন গ্যাসীয় অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় এবং কিছু চোয়ানোর জন্য নষ্ট হয়। মূলের অর্বুদে *Rhizobium* ব্যাকটেরিয়ানের জন্য বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সংবন্ধনের কারণে লেগ্যুমজাতীয় উদ্ভিদের জন্য অবস্থা আরও জটিল হয়। এই অর্বুদের অয়েঃকাল সংক্ষিপ্ত এবং পরিশেষে বিশ্লেষিত হয়ে মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন মুক্ত করে। এসব কারণেই উদ্ভিদের জন্য লভ্য নাইট্রোজেন কি পরিমাণে মৃত্তিকায় থাকে তা নির্ণয় করা কঠিন। শস্যের অনেক ফসফোরাইলেশনের উপর নির্ভরশীল এনজাইমঘটিত বিক্রিয়ায় ফসফরাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এটি নিউক্লিয়াসের একটি উপাদান ও কোষ বিভাজনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল। এজন্য ভাজক কলার বর্ধনে ফসফরাসে অংশগ্রহণ করে এবং বিশেষ করে উদ্ভিদের প্রাথমিক দ্রুত বর্ধনশীল পর্যায়ে এর গুরুত্ব বেশি। চারাগাছের মূলের বৃদ্ধিতে ফসফরাস অংশগ্রহণ করে, তাই অধিকাংশ শস্যের বীজতলায় পর্যাপ্ত ফসফরাস থাকা বাঞ্ছনীয়। ফসফরাসের অভাবে দানাশস্যের বিপরিণতির প্রক্রিয়াগুলো ব্যাহত হয়। ফসফরাস ঘাটতি মৃত্তিকায় মূলীয় শস্যের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। প্রধানত $H_2PO_4^-$ আয়ন আকারে মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ ফসফরাস পরিশোষণ করে।

পটাশিয়াম শস্য উদ্ভিদের কোনো গাঠনিক বস্তুর উপাদান নয়, কিন্তু অ্যামোনিয়াম আয়ন থেকে অ্যামাইনো এসিড এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে এর প্রয়োজন আছে। কার্যকর সালোকসংশ্লেষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পটাশিয়াম দরকার, কোষ প্রাচীরের ভিতর দিয়ে অন্যান্য মৌলের চলাচলে পটাশিয়াম অংশগ্রহণ করে। অনেকক্ষেত্রেই উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পটাশিয়াম মৃত্তিকায় থাকে, কিন্তু যেখানে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসঘটিত সার ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে বৃদ্ধির জন্য পটাশিয়াম একটি সীমায়িত প্রভাবক হতে পারে। পটাশিয়াম ঘাটতির জন্য পাতার কিনারায় ক্লোরোসিস এবং নেক্রোসিস হয় এবং ফল ও বীজ ছোট হয়।

মেরিস্টেমের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন এবং এটি ক্যালসিয়াম পেকটেট হিসেবে কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান। তাই স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। শিম-জাতীয় শস্যের অর্বুদ তৈরি এবং মৃত্তিকা দ্রবণে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজের বিষাক্ততা নষ্ট করে দিয়ে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ক্যালসিয়াম সাহায্য করে।

অধিকাংশ মৃত্তিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চোয়ানোর জন্য এবং উদ্ভিদ কর্তৃক ব্যবহারের জন্য এর ঘাটতি হয়।

অত্যাবশ্যকীয় খনিজ মৌল ছাড়াও, ক্যালসিয়াম মৃত্তিকার একটি প্রধান ক্ষারক এবং মৃত্তিকার বিক্রিয়া নিরপেক্ষ রাখতে সাহায্য করে। যেখানে চোয়ানোর জন্য অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম নষ্ট হয়, সেখানে ধণাত্মক আধান বিশিষ্ট হাইড্রোজেন আয়ন এর স্থান দখল করে এবং মৃত্তিকা অম্লীয়

হয়, অর্থাৎ pH কমে যায়। নিম্ন pH শস্যের বৃদ্ধি দারুণভাবে ব্যাহত হয় এবং যখন এটি হ্রাস পেয়ে ৩ হয়, তখন অধিকাংশ শ্রাবাদি শস্যের বৃদ্ধি খুব কম হয় কিংবা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। গোল আলু এবং তুই হলো সবচেয়ে বেশি নিম্ন pH সহনশীল শস্য।

pH কমে গেলে চুন প্রয়োগের মাধ্যমে এটি বৃদ্ধি করে ৬ এবং ৭ এর মধ্যে হয়, এই pH অধিকাংশ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভাল হয়। তবে চুন প্রয়োগ যেন খুব বেশি না হয়, কারণ উচ্চ pH র কতকগুলো ক্ষুদ্রতর পুষ্টি মৌল অলভ্য হয়। বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক অবস্থায় চুন পাওয়া যায়, তবে সাধারণত চূর্ণকৃত চুনাপাথর থেকে প্রাপ্য ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বেশি ব্যবহৃত হয়।

চোয়ানোর মাধ্যমে ক্যালসিয়াম হারানো ছাড়াও, কর্দম কলয়েড এবং জৈব পদার্থের পৃষ্ঠ থেকে অ্যামোনিয়াম যার ক্যালসিয়াম অপসারণ করে। তাই মৃত্তিকার pH কমে যেতে পারে, এজন্য মৃত্তিকার নির্ণয় এবং চুনের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের জন্য মাঝে মাঝে মৃত্তিকা পরীক্ষা করা দরকার। সুগারবিট এবং সব মৃত্তিকার অনুতয় সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল শস্য।

ম্যাগনেশিয়াম অপর একটি অত্যাবশ্যকীয় বৃহত্তর অণু পুষ্টি উপাদান। ক্লোরোফিল অণুর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও এর অভাবে পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং সালোকসংশ্লেষণের দক্ষতা হ্রাস পায়। আর্দ্র অঞ্চলে হাল্কা বুনটের মৃত্তিকায় ম্যাগনেশিয়াম ঘাটতি অধিক পরিমাণে দেখা যায়। গোল আলু, সুগারবিট এবং সরিষা বিশেষভাবে ম্যাগনেশিয়াম ঘাটতিতে সংবেদনশীল।

শস্যের উচ্চ ফলনের জন্য সোডিয়াম একটি অত্যাবশ্যকীয় মৌল বলে প্রতীয়মান হয় না। তবে সোডিয়াম সরবরাহ পর্যাপ্ত হলে কতকগুলো শস্যের ফলন ভাল হয়। এরকম একটি শস্য হলো সুগারবিট, এর প্রকৃত কারণ হলো যে, সুগারবিট লবণ-সহনশীল উদ্ভিদ (halophyte) এবং সমুদ্র উপকূলে, যেখানে পর্যাপ্ত সোডিয়াম থাকে, এর উৎপত্তি হয়েছে।

শস্য উদ্ভিদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনের উপাদান হলো সালফার এবং বীজ তেল সংশ্লেষণে ও এটি অংশগ্রহণ করে। কোনো কোনো এলাকায় সালফার ঘাটতি থাকতে পারে, তবে সাধারণভাবে শস্যের ফলন সীমায়িত করতে সালফার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক নয়। বৃষ্টির পানির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে সালফার মৃত্তিকায় জমা হয় এবং সাধারণত অধিকাংশ শস্যের প্রয়োজনের জন্য এই উৎস পর্যাপ্ত।

কোষরসে অসমোটিক চাপ এবং আয়নের সমতা নিয়ন্ত্রণে ক্লোরিন অংশগ্রহণ করে। সাধারণত পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্লোরিন মৃত্তিকায় থাকে এবং প্রতি বছর প্রতি হেক্টর ৫০ কেজি পর্যন্ত ক্লোরিন বৃষ্টির মাধ্যমে মৃত্তিকায় জমা হয়।

এখানে শস্যের বৃদ্ধি ও বিপরিণতিতে অংশগ্রহণকারী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এটি সুস্পষ্ট যে, এদের অভাবে শস্যের বৃদ্ধি ও ফলন ভাল হয় না। তাই যে সমস্ত মৃত্তিকায় এদের ঘাটতি থাকে, সেখানে সার প্রয়োগ করে এই ঘাটতি পূরণ করা হয়।

ক্ষুদ্রতর অণু পুষ্টি উপাদানের গুরুত্ব (Importance of Trace Elements)

শস্য উৎপাদনে বৃহত্তর অণু পুষ্টি উপাদানের গুরুত্ব ছাড়াও, ক্ষুদ্রতর অণু পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বও কম নয়। ক্ষুদ্রতর পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত সমস্যা কোনো কোনো মৃত্তিকা এবং কিছু শস্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এদের অভাব হলে বৃহত্তর অণু পুষ্টি উপাদানের (নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম) কার্যকারিতাও ভালভাবে প্রকাশ পায় না।

বোরনের অভাবে সুগারবিটের "হার্ট রট" এবং সুইড এবং টার্নিপের "ব্রাউন হার্ট" হয়। ক্যালসিয়াম বোরেট এবং বোরাক্স ব্যবহার করে বোরনের ঘাটতি পূরণ করা যায়। অতিরিক্ত চুন ব্যবহার করলে বোরনের ঘাটতি প্রকট হয়।

পীট মৃত্তিকা এবং হাল্কা বেলে মৃত্তিকায় সাধারণত তামার ঘাটতি হয় এবং দানাশস্য ও সুগারবিটকে প্রভাবিত করে। তামার অতিরিক্ত ঘাটতি হলে শস্যের শীষ বের হয় না, তাই ফলন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। তামার অভাবে সুগারবিটে কোনো দৃশ্যমান লক্ষণ দেখা যায় না, তবে কপার সালফেট প্রয়োগ করলে এর ফলন বাড়ে। বিভিন্ন প্রকার তামার লবণ পাতায় ছিটিয়ে (foliar spray) এই ঘাটতি পূরণ করা যায়।

পীট মৃত্তিকা এবং অতিরিক্ত ক্ষারীয় বেলে মৃত্তিকায় ম্যাঙ্গানিজ ঘাটতি অধিক পরিলক্ষিত হয়। এর অভাবে দানাশস্য ও সুগারবিটের পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং ফলন হ্রাস পায়। মটর জাতের ফলের অভ্যন্তরে বীজে ফুটফুটে ধূসর দাগের সৃষ্টি হয় এবং এর বাজার মূল্য কমে যায়। অতিরিক্ত চুন প্রয়োগে ম্যাঙ্গানিজ ঘাটতি বৃদ্ধি পায় এবং ম্যাঙ্গানিজ সালফেট প্রয়োগ করে ম্যাঙ্গানিজ ঘাটতি পূরণ করা যায়।

মলিবডেনামের অভাবে ফুলকপির পাতার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় (whip tail) এবং এই মৌলের একটি অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো যে, উচ্চ মাত্রার pH-এ এর লভ্যতা বৃদ্ধি পায়। ফলে অতিরিক্ত মলিবডেনাম থাকলে গবাদিপশুর তামা শোষণে বিঘ্ন ঘটে, তাই এদের তামা ঘাটতির লক্ষণ দেখা যায়।

শস্যের পুষ্টির বিষয় বিবেচনা করতে ক্ষুদ্রতর অণু পুষ্টি উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে সচেতনার প্রয়োজন আছে। এদের অভাব হলে শস্যের ফলন এবং গুণগত মান উভয়েই হ্রাস পায়। তাই এদের ঘাটতি পরিলক্ষিত হলেই এই ঘাটতি পূরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

প্রধান প্রধান মৌলের প্রতি শস্যের প্রতিক্রিয়া (Crop Responses to the Major Elements)

বিভিন্ন মাত্রার সারের সাথে বিভিন্ন শস্যের ফলনের সম্পর্ক জানা দরকার, কারণ এ থেকে প্রতি শস্যের জন্য সারের উপযুক্ত মাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব। বিভিন্ন শস্যের উপর এ জাতীয় গবেষণা বহু বছর ধরে পরিচালিত হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে ভালভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। তবে এসমস্ত পরীক্ষার ফলাফল ব্যবহারের আগে একটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে, তা হলো মৃত্তিকা এবং স্থানীয় আবহাওয়ার তারতম্য যা সারের মাত্রার বৃদ্ধির সাথে ফলন বৃদ্ধির সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে।

সকল সারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে নাইট্রোজেন সার এবং শস্যের প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য একে একটি সুন্দর উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। নাইট্রোজেন সারের মাত্রার বৃদ্ধির সাথে দানাশস্যের ফলনের প্রতিক্রিয়ার একটি আদর্শ কার্ভ (৫.৫ নং চিত্রে) দেখানো হয়েছে। এই কার্ভের আকৃতি প্যারাবোলিক (parabolic)। নিম্ন মাত্রার সারের পরিসরে ফলনের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু যখন নাইট্রোজেনের মাত্রা প্রতি হেক্টরে ১০০ কেজির বেশি হয়, তখন প্রতি কেজি প্রদেয় নাইট্রোজেনে ফলন বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম। এই উদাহরণে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া গেছে, প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৫০ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগে এবং নাইট্রোজেনের উচ্চ মাত্রায় ফলন হ্রাস পেয়েছে। অনেক শস্যেই এরকম সম্পর্ক পাওয়া গেছে এবং এ থেকে সুপারিশ করার জন্য সর্বোত্তম মাত্রার নাইট্রোজেনের পরিমাণ জানা সম্ভব হয়েছে। সুনিশ্চিতভাবে সুপারিশের জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যাপ্ত উপাত্ত প্রয়োজন।

নাইট্রোজেন সারের মাত্রার বৃদ্ধির সাথে সাথে ফলনের বৃদ্ধি একই অনুপাতে না হওয়ায় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের অর্থনৈতিক দিকটাও দেখা দরকার। বিভিন্ন মাত্রার নাইট্রোজেন প্রয়োগে সুগারবিট শস্যের মূল রেখাচিত্রের সাহায্যে ৫.৬ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। শস্যের মূল্যের

ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া কার্ভ আবার প্যারাবোলিক এবং সর্বোচ্চ মূল্য মনে পাওয়া যায় প্রতি হেক্টরে প্রায় ১২৫ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করে।

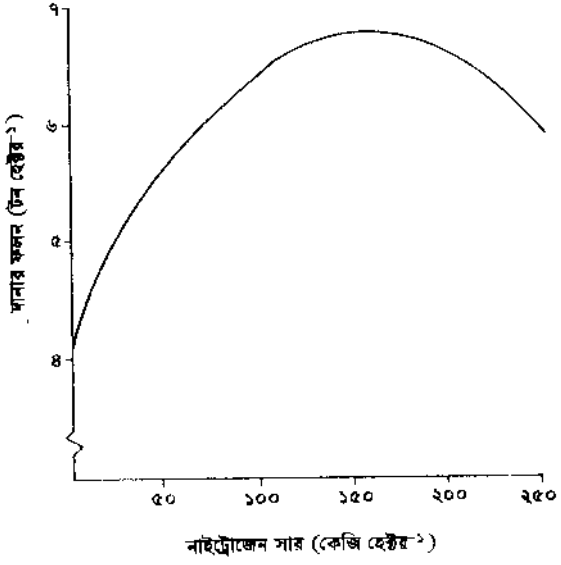

চিত্র ৫.৫ : বিভিন্ন মাত্রার নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে দানাশস্যের ফলনের প্যারাবোলিক প্রতিক্রিয়া।

তবে যদি শস্যের মোট মূল্য থেকে সারের খরচ বাদ দেয়া যায়, তাহলে প্রতি হেক্টরে ৮০ কেজি নাইট্রোজেনের পর লাভ কমে যায়। এক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রার নাইট্রোজেনের জন্য পাতার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়, কিন্তু মূলের চিনির উপর প্রভাব খুব সামান্য। সুগারবিট শস্যের সর্বোচ্চ মোট মূল্য পাওয়া যায় প্রতি হেক্টরে ১২৫ কেজি মাত্রায়, কিন্তু লাভের কথা চিন্তা করলে সর্বোত্তম মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম। তাই, শস্যের জন্য উপযুক্ত মাত্রার সার নির্ধারণে অর্থনৈতিক দিকটাও বিবেচনা করা উচিৎ।

নাইট্রোজেন সারের মাত্রার সাথে শস্যের ফলনের প্যারাবোলিক প্রতিক্রিয়া ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়া কার্ভ নয়, সেটা ধরে নিয়ে এই উপাত্তের ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কার্ভের তুলনায় একটি ক্রমাবনতি বিন্দুর উভয় পাশে সরলরৈখিক সম্পর্ক মাঠের পরীক্ষার ফলাফলকে ভালভাবে প্রকাশ করে (চিত্র ৫.৭)। চিনির ফলন সর্বোচ্চ হয় প্রতি হেক্টরে ১০০ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগে এবং এর পর আর কোনো অতিরিক্ত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না এবং দুটি সরল রেখা উপাত্তকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করে। দানাশস্যের ক্ষেত্রে সরলরৈখিকভাবে ফলন বৃদ্ধির পরিসর অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং শীতকালীন গমে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায় প্রতি হেক্টরে ১৬০ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করে। এর চেয়ে বেশি নাইট্রোজেন প্রয়োগে ফলন খুব সামান্যই বাড়ে এবং প্রকৃতপক্ষে কমে যেতে পারে।

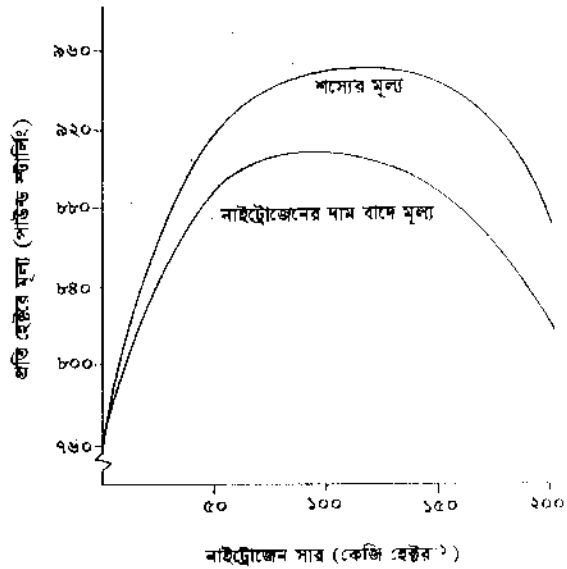

চিত্র ৫.৬ : বিভিন্ন মাত্রার নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের সাথে সুগারবিটের ফলনের সম্পর্ক।

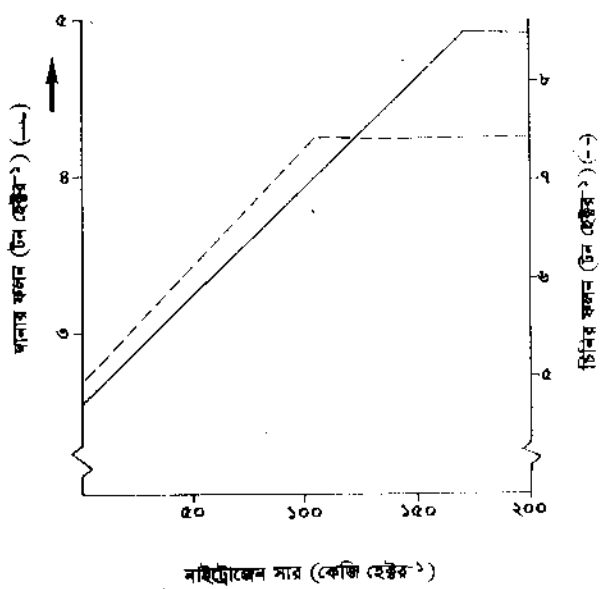

চিত্র ৫.৭ : প্রদেয় নাইট্রোজেন সারের সাথে দানার ফলন ও চিনির ফলনের সরলরৈখিক সম্পর্ক।

নিম্ন মাত্রার নাইট্রোজেনে অধিকাংশ শস্যের সরলরৈখিক প্রতিক্রিয়া প্রায় একই রকম (যদিও স্কেলের পরিবর্তন হবে) এবং ক্রমাবনতি বিন্দুর পরে শস্যের প্রতিক্রিয়ার ভিন্নতা হয় (চিত্র ৫.৮)। গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ঘাসের, যা নাইট্রোজেনে খুব বেশি সংবেদনশীল, ফলন এই বিন্দুর পরেও বাড়তে থাকে। এই বিন্দুর তুলনায় বেশি নাইট্রোজেন প্রয়োগে সুগারবিটের ফলন বাড়ে না। গোল আলু এবং কোনো কোনো দানাশস্যের ফলন উচ্চ মাত্রার নাইট্রোজেনের জন্য ব্যাপকভাবে কমে যায়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যতটা সম্ভব সঠিকভাবে এই বিন্দু, যার বেশি হলে ফলন কমে যায়, সনাক্ত করা দরকার।

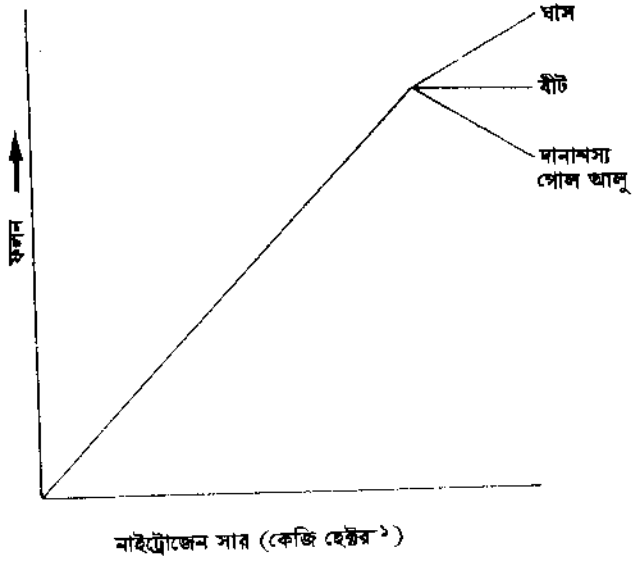

চিত্র ৫.৮ : প্রদেয় সারের সাথে বিভিন্ন শস্যের প্রতিক্রিয়া সম্পর্ক

ফসফরাস এবং পটাশিয়ামঘটিত সারের সাথে শস্যের প্রতিক্রিয়া এত সুন্দরভাবে নিরূপিত হয়নি। যে মৃত্তিকায় লভ্য অবস্থায় এই মৌল দুটির ঘাটতি আছে, সেক্ষেত্রে অল্প পরিসরে সার প্রয়োগ করেই একটি সরলরৈখিক সম্পর্ক পাওয়া যায়। তাই নাইট্রোজেনঘটিত সারের তুলনায় স্বল্প মাত্রায় ফসফরাস এবং পটাশিয়ামঘটিত সার মৃত্তিকায় প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন শস্যের জন্য ফসফরাস এবং পটাশিয়ামের প্রয়োজনীয় মাত্রা বিভিন্ন। অন্যান্য শস্যের তুলনায় সুগারবিটের পটাশিয়ামের চাহিদা এবং গোল আলুর ফসফরাসের চাহিদা বেশি। তাই প্রতিটি শস্যের সারের প্রয়োজনীয়তা সতর্কতার সাথে নির্ণয় করা উচিৎ। লেগুমজাতীয় শস্যের নাইট্রোজেনের প্রয়োজন খুব কম বা নেই বললেই চলে, কিন্তু এদের ফসফরাস এবং পটাশিয়ামের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত বেশি।

সারের মৌলের পারস্পরিক ক্রিয়া (Interaction of Fertilizer Elements)

শস্যের জন্য তিনটি প্রধান মৌল এবং সম্ভবত আরো মৌলের প্রয়োজন। এই পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। সুগারবিটের নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের পারস্পরিক ক্রিয়া ৫.৯ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে নিম্ন মাত্রার ফসফরাস প্রয়োগ মূলের ফলন স্বাভাবিক পারবোলিক প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করে। উচ্চ মাত্রার ফসফরাস প্রয়োগে নাইট্রোজেনের মাত্রার সম্পূর্ণ পরিসরে, ৫০ থেকে ১৫০ কেজি নাইট্রোজেন প্রতি হেক্টরে, ফলন ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে। এটি নির্দেশ করে যে, উচ্চ মাত্রার নাইট্রোজেনের প্রতিক্রিয়া নিম্ন মাত্রার ফসফরাসের জন্য হ্রাস পায়। যেখানে শস্য উৎপাদনের জন্য উচ্চ মাত্রায় সার ব্যবহার করা হয়, সেখানে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া বেশ গুরুত্বপূর্ণ। গোল আলুর ক্ষেত্রেও এরকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। উচ্চ মাত্রায় ফসফরাস এবং পটাশিয়াম প্রয়োগের জন্য উচ্চ মাত্রার নাইট্রোজেনের প্রভাব ফলনের উপর পড়ে। অধিকন্তু এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অন্যান্য মৌলের (যেমন– ম্যাগনেশিয়াম অথবা ম্যাঙ্গানিজ) জন্যও প্রধান প্রধান মৌলের প্রতিক্রিয়া সীমায়িত হতে পারে।

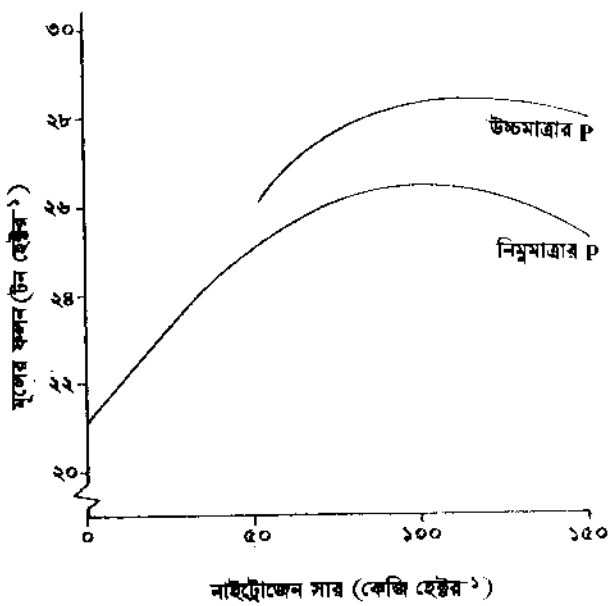

চিত্র ৫.৯ : সুগারবিটে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস সারের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া।

সারের প্রতিক্রিয়ার উপর প্রভাবকসমূহ (Factors Affecting the Response to Fertilizers)

সারের সর্বোত্তম পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সারের মাত্রার সাথে শস্যের প্রতিক্রিয়ার যে সম্পর্কের বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে তা সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা উচিৎ।

নিদেনপক্ষে, কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশের (মৃত্তিকা এবং বায়বীয়) জন্য এটি একটি গড় মাত্র। বিভিন্ন জমি ও পরিবেশে এই সর্বোত্তম মাত্রার পরিবর্তন হয়। অনেকগুলো প্রভাবক এই সম্পর্কের উপর ক্রিয়াশীল ; সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো।

সারের প্রতিক্রিয়ার উপর মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মৃত্তিকায় লভ্য P_2O_5, K_2O এবং ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা যায়। এজাতীয় বিশ্লেষণের মূল্য সীমায়িত হলেও মৃত্তিকায় সঞ্চিত মৌলের পরিমাণ এবং জমিতে প্রদত্ত সারের প্রতিক্রিয়ার নির্দেশক হিসেবে এটি প্রয়োজনীয়। মৃত্তিকা বিশ্লেষণ উপস্থিত লভ্য মৌলের পরিমাণ পরিমাপ করে, এবং এটি মৃত্তিকা সূচক হিসেবে প্রকাশ করা যায়। বিভিন্ন দেশে এই সূচকের মান বিভিন্ন রকম, তবে ব্রিটিশ পদ্ধতিতে এর পরিসর 0 (ঘাটতি) থেকে ৯ (অতিরিক্ত) পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে, এই স্কেলের প্রথম ৪ অথবা ৫ পয়েন্ট আবাদি মৃত্তিকার জন্য প্রাসঙ্গিক (সারণি ৫.৩)।

সারণি ৫.৩ : নির্বাচিত কয়েকটি শস্যের সুপারিশকৃত মাত্রার P_2O_5 এবং K_2O এর উপর লভ্য পুষ্টি উপাদানের মৃত্তিকা সূচকের প্রভাব

সূচক	গোল আলু (কেজি)	সুগারবিট (কেজি)		দানাশস্য (কেজি)		
	P_2O_5 প্রতি হেক্টরে	K_2O প্রতি হেক্টরে	P_2O_5 প্রতি হেক্টরে	K_2O প্রতি হেক্টরে	P_2O_5 প্রতি হেক্টরে	K_2O প্রতি হেক্টরে
0	৩৫০	৩৫০	১০০	১০০	৭৫	৭৫
১	৩০০	৩০০	৭৫	১০০	৪০	৪০
২	২৫০	২৫০	৫০	৭৫	৪০	৪০
৩	২০০	২০০	২৫	৭৫	৪০	০
৪	১০০	১০০	০	৭৫	০	০

বিভিন্ন শস্যের সুপারিশকৃত P_2O_5 এবং K_2O মাত্রার উপর মৃত্তিকা সূচকের প্রভাব ৫.৩ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। সকল মৃত্তিকা সূচকের মান বাড়ার সাথে সাথে সুপারিশকৃত পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ কমে যায়। উপরন্তু, এই সারণি থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, এই দুটি মৌল উপাদানের প্রয়োজন বিভিন্ন শস্যে বিভিন্ন রকম। মৃত্তিকায় সঞ্চিত মৌলের পরিমাণ জানা থাকলে দক্ষতার সাথে সার ব্যবহার করা যায়। মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন গতিশীল (dynamic) প্রকৃতির জন্য লভ্য নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ণয়ে মৃত্তিকা বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি নয়।

সারের সুপারিশকৃত মাত্রার উপর মৃত্তিকার বুনটের প্রভাব আছে এবং নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জৈব পীট মৃত্তিকার তুলনায় খনিজ মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন সারের প্রয়োজন। অন্যান্য বুনটের মৃত্তিকার তুলনায় চকময় (chalky) মৃত্তিকায় অধিক পটাশিয়ামের প্রয়োজন এবং সাধারণত বালিতে ফসফরাস কম থাকে। মৃত্তিকায় পূর্ববর্তী শস্যের অবশেষ (residue) সারের প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। নাইট্রোজেনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং এই মৌলের মৃত্তিকা সূচক নির্ধারণের ভিত্তি মৃত্তিকা বিশ্লেষণ নয়, পূর্ববর্তী শস্যের প্রকৃতি। এর জন্য যে স্কেল ব্যবহার করা হয় তার পরিসর ০–২। যেখানে পূর্ববর্তী সময়ে দানাশস্য জন্মানো হয়েছিল অথবা গবাদিপশুর খাদ্যশস্য (forage) কেটে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যেখানে মৃত্তিকার নাইট্রোজেন সূচক শূন্য। গোল আলু, মটর, তেল উৎপাদনকারী রেপ অথবা চারণকৃত খাদ্যশস্য থাকে, যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন অবশেষ মৃত্তিকায় থেকে যায় এবং এই সূচক ১ হয়। যদি মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে খামারজাত সার (farmyard manure) প্রয়োগ করা হয় অথবা পূর্ববর্তী শস্য যদি লুসার্নি (lucerne) হয়, তাহলে মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে, তখন এই

সূচক ২ হয়। নাইট্রোজেন সারের মাত্রার সুপারিশের উপর মৃত্তিকার নাইট্রোজেন সূচকের প্রভাব ৫.৪ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে।

পূর্ববর্তী শস্যের উপর ভিত্তি করে P_2O_5এবং K_2O-এর সুপারিশকৃত মাত্রার পরিবর্তন হয়। তবে নাইট্রোজেনের তুলনায় এদের পরিবর্তন কম।

সারণি ৫.৪ : খনিজ মৃত্তিকার নাইট্রোজেন সারের মাত্রার (কেজি হেক্টর) সুপারিশের উপর মৃত্তিকার বিভিন্ন নাইট্রোজেন সূচকের প্রভাব।

নাইট্রোজেন সূচক	গোল আলু	সুগারবিট	শতকালীন গম
০	২২০	১০০	১৫০
১	১৬০	৭৫	১০০
২	১০০	৫০	৪০

আবহাওয়াগত পরিবর্তনের জন্যেও সারের, বিশেষ করে নাইট্রোজেনের, প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হয়। নাইট্রোজেন সহজ অবস্থায় পানিতে দ্রবণীয়, তাই বর্ষাকালে চোয়ানের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন সার নষ্ট হয়। তাই এরূপ নাইট্রোজেন সারের মাত্রা হেক্টর প্রতি প্রায় ২৫ কেজি বাড়ানো দরকার। চোয়ানোর জন্য P_2O_5 এবং K_2O ক্ষতি কম হয়, তাই বৃষ্টিপাতের জন্য এই সারের সুপারিশকৃত মাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না। যেখানে জৈব সার প্রয়োগ করা হয়, সেখানে অজৈব সারের মাত্রার সমন্বয় সাধনের প্রয়োগ আছে (সারণি ৫.৫)। শুষ্ক এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে সার ব্যবহারের দক্ষতা হ্রাস পায়। তাই পানি সেচের ব্যবস্থা না থাকলে সারের মাত্রাও কমাতে হয়।

সারের প্রকার (Types of Fertilizers)

সারকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন —

জৈব সার (Organic manures) ;

অজৈব সার (Inorganic fertilizers) বা রাসায়নিক সার ;

অণুজীব সার (Biofertilizers)।

জৈব সার : উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত দেহাবশেষ থেকে যে সার তৈরি হয়, তাকে জৈব সার বলে। সাধারণত এদের আয়তন বেশি, কিন্তু পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ অজৈব সারের তুলনায় কম। আয়তনের উপর ভিত্তি করে জৈব সারকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে — বৃহদাকার জৈব সার (bulky organic manure) এবং ঘনীভূত বা গাঢ় সার (concentrated organic manure)।

বৃহদাকার জৈব সার

১. খামারজাত সার (Farm-yard manure or F.Y.M)

খামারে তৈরি সারকে খামারজাত সার বলে। গবাদি পশু এবং হাস-মুরগির মলমূত্র, গো-শালার আবর্জনা এবং খামারের অন্যান্য পরিত্যাক্ত বস্তুর খামার প্রাঙ্গনে পচনের ফলে খামারজাত সার তৈরি হয়। মূত্রে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান দ্রবণীয় অবস্থায় থাকে, তাই উদ্ভিদ দ্রুত এগুলো পরিশোষণ করতে পারে। কিন্তু গোবরে পুষ্টি উপাদান অদ্রবণীয় অবস্থায় থাকে বলে মাঠে প্রয়োগের অব্যহিত পরেই শস্য উদ্ভিদ গ্রহণ করতে পারে না। মূত্রে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি নাইট্রোজেন আছে। তবে চোয়ানোর জন্য মূত্রের মৌল উপাদান অপেক্ষাকৃত বেশি নষ্ট হয়। জীবজন্তুর প্রকার-ভেদ, বয়স, প্রকৃতি ও খাদ্যের ভিন্নতা এবং উদ্ভিদের পরিত্যাজ্য অংশের গুণাবলীর পার্থক্যের

এবং এর সংরক্ষণের জন্য খামারজাত সারের পুষ্টি উপাদানের ভিন্নতা হয়। এই সারে অপেক্ষাকৃত বেশি পটাশিয়াম থাকে, কারণ গবাদিপশু সামান্য পরিমাণ পটাশিয়াম শোষণ করে, অধিকাংশ অংশ মলমূত্র আকারে দেহ থেকে বের করে দেয়।

২. **আবর্জনা পচা সার বা কম্পোস্ট (Compost)** : গবাদিপশুর উচ্ছিষ্ট খড়কুটো, শস্যের অবশিষ্টাংশ, শুকনো আগাছা, কচুরিপানা প্রভৃতি পচিয়ে খামার প্রাঙ্গণে যে সার তৈরি হয়, তাকে বলে কম্পোস্ট। খামারজাত সারের তুলনায় এর পুষ্টিমান কম।

৩. **সবুজ সার (Green manure)** : সবুজ উদ্ভিদ ও তার পাতা সবুজ অবস্থায় চাষ করে মৃত্তিকার সাথে মিশিয়ে ফেলে যে সার প্রস্তুত করা হয়, তাকে বলে সবুজ সার। সাধারণত যেসব উদ্ভিদ দ্রুত পচনশীল, সেগুলো সবুজ সারের জন্য উত্তম। সবুজ সারের জন্য ধইঞ্চা, শন, বরবটি, সয়াবিন, মুগ, মাশকলাই প্রভৃতি লেগ্যুমজাতীয় উদ্ভিদ ব্যবহার করা হয়। সবুজ সারের জন্য ব্যবহারের উপযোগী উদ্ভিদের যেসব গুণাবলী থাকা দরকার তা হলো দ্রুত বর্ধনশীল, কাণ্ড ও পাতার কোমলতা, পাতার প্রাচুর্য, অনুর্বর মৃত্তিকায় জন্মানোর ক্ষমতা এবং নাইট্রোজেন সংবন্ধনের ক্ষমতা।

ঘনীভূত বা গাঢ় জৈব সার

১. **খৈল (Oil cake)** : তেলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশণের পর যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাকে খৈল বলে। সরিষা, তিল, চিনাবাদাম, তিসি, রেড়ি, নিম, তুলাবীজ, সয়াবিন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার খৈল সাররূপে ব্যবহৃত হতে পারে। খামারজাত সার এবং আবর্জনা সারের তুলনায় খৈলের মান উন্নত। কারণ এতে অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম আছে, এটি খুব তাড়াতাড়ি, এমনকি অজৈব সারের মতো দ্রুত কার্যক্ষম ও এর পুষ্টি উপাদানের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগই মৃত্তিকায় প্রয়োগের প্রথম বছরেই শস্য গ্রহণ করতে পারে।

সারণি ৫.৫ : খামারজাত সার এবং স্লারির পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ (গড় মান)

সারের নাম	পুষ্টি উপাদান			
	N	P_2O_5	K_2O	Mg
গরুর খামারজাত সার (কেজি/টন)	১.৫	২.০	৪.০	০.৮
গরুর স্লারি (কেজি/ঘনমিটার)	২.৫	১.০	৪.০	০.৬
শূকরের স্লারি (কেজি/ঘনমিটার)	৪.০	২.০	২.৭	০.৪
মোরগ–মুরগির স্লারি (কেজি/ঘনমিটার)	৯.০	৫.৫	৫.৫	১.৩

২. **হাড়ের গুঁড়া (Bone meal)** : বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর হাড় সিদ্ধ করে চর্বিজাতীয় পদার্থ দূর করার পর চূর্ণ করে এই সার তৈরি করা হয়। এই সারে শতকরা ২৮ থেকে ৩২ ভাগ P_2O_5 ও ৩ থেকে ৩.৫ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। যে মৃত্তিকায় ফসফরাস ও ক্যালসিয়ামের অভাব আছে, সে মৃত্তিকায় হাড়ের গুঁড়া খুব কার্যকরী। অম্লীয় ও এঁটেল মৃত্তিকায় এই সার ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

৩. **মাছের গুঁড়া (Fishmeal)** : মাছ শুকিয়ে গুঁড়া করে যে সার তৈরি করা হয় তাকে বলে মাছের গুঁড়া সার। সামুদ্রিক মাছ এবং মাছের বর্জ্য অংশ থেকে প্রধানত এটি তৈরি করা হয়। এতে শতকরা ৬ ভাগ নাইট্রোজেন এবং শতকরা ৭ ভাগ P_2O_5 আছে, তবে মাছের প্রকৃতি অনুসারে এই মান

ভিন্ন হয়। এই সারে প্রচুর পরিমাণে তেল থাকে যা মৃত্তিকার ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক দ্রুত ব্যবহৃত হয়ে সারের অন্যান্য উপাদানকে মুক্ত করে।

৪. **গোয়ানো** (Guano) : সমুদ্র সৈকতে পানির বিষ্ঠা (excreta) এবং মৃতদেহের মিলিত অংশ হতে যে সার পাওয়া যায়, তাকে গোয়ানো বলে। প্রশান্ত মহাসাগরে এবং আফ্রিকার উপকূলে কতকগুলো জনমানবহীন নির্জন দ্বীপে বছরেরকোন নির্দিষ্ট সময়ে অনেক পাখি জমা হয় ও এদের বিষ্ঠা এবং মৃতদেহ জমা হয়ে গোয়ানো তৈরি হয়। গোয়ানো সারে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস দুটোই আছে।

৫. **চামড়া কারখানার বর্জ্য** (Tannery refuse) : বর্জ্য পদার্থসহ চামড়ার সাথে লেগে থাকা পশম ও লোম মিলে এটি গঠিত। এতে শতকরা ৮ থেকে ১২ ভাগ নাইট্রোজেন এবং চামড়া পাকা করার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন মাত্রার চূর্ণ থাকে। এটি খুব ধীর গতিতে ক্রিয়াশীল, তাই সাধারণ শস্যের এটি তেমন উপকারে আসে না।

৬. **কসাইখানার বর্জ্য** (Slaughter house refuse): এটি বিভিন্ন প্রকার বস্তু, যেমন– পরিত্যক্ত মাংস, রক্ত, হাড়, চামড়ার অংশ ইত্যাদির মিশ্রণ। এতে শতকরা ৮ থেকে ৯ ভাগ নাইট্রোজেন ও শতকরা ৭ ভাগ P_2O_5 আছে।

৭. **ছাই** (Ash) : গাছপালা পোড়ানোর জন্য ছাই তৈরি হয়। এটি একটি পটাশসমৃদ্ধ সার ও একটি পটাশসমৃদ্ধ সার এবং এতে শতকরা ৩ থেকে ১০ ভাগ পর্যন্ত পটাশিয়াম এবং শতকরা ২ ভাগের মতো ফসফরাস থাকে, কিন্তু কোনো নাইট্রোজেন থাকে না।

৮. **প্রাণীর রক্ত** (Blood meal) : রক্ত শুকানোর পর গুঁড়া করে এটি তৈরি করা হয়। তবে অন্যান্য জৈব সারের তুলনায় এটি ব্যয়বহুল। এতে প্রায় শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগ নাইট্রোজেন আছে।

অজৈব সার

শস্য উৎপাদনে অজৈব বা রাসায়নিক সারের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত নতুন। এগুলো প্রধানত শিল্প-কারখানায় কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়। অজৈব সার দুপ্রকারের হতে পারে। যথা সরল বা একক সার, এতে কেবল একটি পুষ্টি উপাদান থাকে এবং যৌগিক সারে, দুটি অথবা তিনটি উপাদান রাসায়নিকভাবে একত্রিত থাকে। পূর্বে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের একক সারকে মিশিয়ে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে যৌগিক সার তৈরি হচ্ছে।

অধিকাংশ সার কঠিন অবস্থায় (স্ফটিকাকার অথবা দানাদার) বাজারে বিক্রয় হয়। দানাদার সার জমিতে প্রয়োগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তরল সারও তৈরি হচ্ছে, তবে এটি খুব বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। কত মাত্রায় কোন কোন মৌল উপাদান সারে আছে তা সারের ব্যাগের উপর লেখা থাকে। কি পরিমাণ সার জমিতে ব্যবহার করতে হবে তা এটি থেকে নির্ণয় করা যায়। এই পরিমাণ বিভিন্নভাবে লেখা থাকে। ধরা যাক, একটি যৌগিক সারের ব্যাগে লেখা আছে ২০:২০:১০। এটি নির্দেশ করে যে, এই সারে শতকরা ২০ ভাগ নাইট্রোজেন, ১০ ভাগ P_2O_5 এবং ১০ ভাগ K_2O আছে। অনেকক্ষেত্রে ৫০ কেজির ব্যাগে সার সরবরাহ করা হয়। তাহলে প্রতি ব্যাগে আছে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ৫ কেজি P_2O_5 এবং ৫ কেজি K_2O।

অজৈব সারকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়–

১. **নাইট্রোজেন জাতীয় সার :** অন্যান্য সারের তুলনায় নাইট্রোজেনজাতীয় সার অধিক ব্যবহৃত সার, কারণ মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন ঘাটতি বেশি এবং শস্যে নাইট্রোজেনের প্রতিক্রিয়া অন্যান্য সারের তুলনায় বেশি। নাইট্রোজেনজাতীয় সার কয়েক রকমের হয়।

(ক) অ্যামোনিয়াম সালফেট $[(NH_4)_2 SO_4]$: নাইট্রোজেন সারের মধ্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট পৃথিবীতেই এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এটি ধূসর সাদা রঙের স্ফটিকার পদার্থ এবং এতে শতকরা ২০.৬ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। এটি পানিতে সম্পূর্ণ দ্রবণীয় এবং মৃত্তিকায় নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক দ্রুত নাইট্রেটে পরিণত হয়। তাই প্রয়োগের পর পরই নাইট্রোজেন লভ্য হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেটের জন্য মৃত্তিকায় ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যায় এবং মৃত্তিকার অম্লতা বৃদ্ধি পায়।

(খ) সোডিয়াম নাইট্রেট $(NaNO_3)$: এর প্রধান উৎস হলো দক্ষিণ আমেরিকার চিলির প্রাকৃতিক ভাণ্ডার। এজন্য এটি চিলিয়ান নাইট্রেট নামেও পরিচিত। এতে শতকরা ১৫.৬ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। এটি পানিতে সম্পূর্ণ দ্রবণীয় এবং শস্য এটি দ্রুত পরিশোষণ করতে পারে। তবে মৃত্তিকায় নাইট্রেট জমা থাকে না, বৃষ্টির পানির সাথে চুইয়ে দূরে চলে যায়। এই সার ব্যবহারে মৃত্তিকায় অম্লত্বের সৃষ্টি হয় না এবং অম্ল থাকলে দূরীভূত হয়। সোডিয়াম নাইট্রেটের নাইট্রেট উদ্ভিদ পরিশোষণ করে, কিন্তু সোডিয়াম মৃত্তিকায় থেকে যায়। বছরের পর বছর প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহারের ফলে সোডিয়াম জমা হয় এবং এটি মৃত্তিকার গঠনকে প্রভাবিত করে।

(গ) ইউরিয়া $[CO(NH_2)_2]$: নাইট্রোজেনজাতীয় সকল সারের মধ্যে ইউরিয়াতে সবচেয়ে বেশি নাইট্রোজেন (শতকরা ৪৫ ভাগ) আছে। এটি সাদা এবং দানাদার ও পানিতে দ্রুত দ্রবীভূত হয়। বায়ুমণ্ডল থেকে এটি জলীয় বাষ্প শোষণ করে, তাই জলীয় বাষ্প প্রবেশ করতে পারে না এমন পাত্রে একে রাখতে হবে। এটি মৃত্তিকায় দ্রুত অ্যামোনিকাল এবং নাইট্রেটে পরিণত হয়। একই জমিতে ক্রমাগত ইউরিয়া ব্যবহার করলে অম্লত্বের সৃষ্টি হয়, তবে তা অ্যামোনিয়াম সালফেটের মতো এত প্রকট নয়। উচ্চ চাপ এবং তাপে আমোনিয়া ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মিলন ঘটিয়ে কারখানায় ইউরিয়া প্রস্তুত করা হয়।

(ঘ) অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3) : নাইট্রোজেনের পরিমাণ অনুযায়ী নাইট্রোজেনজাতীয় সারের মধ্যে এর স্থান দ্বিতীয়। এতে শতকরা ৩৫ ভাগ নাইট্রোজেন আছে এবং পানিতে সহজেই দ্রবীভূত হয়। এর ব্যবহারের সবচেয়ে অসুবিধা হলো এটি সহজেই বিস্ফোরিত হতে পারে।

অন্যান্য নাইট্রোজেনজাতীয় সারের মধ্যে ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড (এটি নাইট্রোলিম নামেও পরিচিত), ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট এবং পটাশিয়াম নাইট্রেট উল্লেখযোগ্য। ক্যালসিয়াম সায়ানামাইডে শতকরা ২০.৬ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। এটি ক্যালসিয়াম ঘাটতি মৃত্তিকার জন্য উপযোগী। এ থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় এবং এটি সহজেই উড়ে যায়, তাই এই সার মৃত্তিকার গভীরে স্থাপন করতে হয়।

২। ফসফরাসজাতীয় সার

(ক) পাথুরে ফসফেট (Rock phosphate) : এটি খনি থেকে পাথুরে অবস্থায় আহরিত হয়। অ্যাপাটাইট, ফসফোরাইট এবং কপ্রোলাইট হলো প্রধান পাথুরে খনিজ পদার্থ যাতে প্রচুর পরিমাণে ফসফেট থাকে। এদের ফসফোরিক এসিডের পরিমাণের ভিন্নতা আছে এবং এতে শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত, ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকতে পারে।

(খ) সুপার ফসফেট $[CaH_4 (PO_4)_2]$: এই সারটি মনো-ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং জিপসামের সমন্বয়ে গঠিত। এটি পানিতে সহজে দ্রবণীয়, কিন্তু মৃত্তিকাস্থ লোহা, ক্যালসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়ামের সাথে ক্রিয়া করে এক প্রকার জটিল অদ্রবণীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়, তখন আর শস্যের নিকট সহজলভ্য হয় না। ফসফোরিক এসিডের (P_2O_5) পরিমাণ অনুযায়ী একে তিনটি

গ্রেডে ভাগ করা যায়। যথা, সিঙ্গল সুপার ফসফেট — প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ P_2O_5 আছে, ডবল সুপার ফসফেট — প্রায় শতকরা ৩২ ভাগ P_2O_5 আছে এবং ট্রিপল সুপার ফসফেট — প্রায় শতকরা ৪৮ ভাগ P_2O_5 আছে। ট্রিপল সুপার ফসফেট $[3CaH_4(PO_4)_2]$ বা সংক্ষেপে টি.এস.পি. একটি বহুল ব্যবহৃত সার। এটি পানিতে দ্রবণীয়, কিন্তু সুপার ফসফেটের মতো লৌহ, ক্যালসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়ামের সাথে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে মৃত্তিকার অলভ্য অবস্থার থাকে। পরে অবশ্য মৃত্তিকার রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এই সার গ্রহণোপযোগী হয়।

(গ) অ্যামোনিয়াম ফসফেট (Ammonium phosphate) : এই সার প্রধানত P_2O_5 সরবরাহ করলেও, নাইট্রোজেন সারও সরবরাহ করে। এটি আবার দুই প্রকারের। যথা, মনো-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (NH_4PO_4) — এতে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ P_2O_5 ও ১২ ভাগ নাইট্রোজেন আছে, এবং ডাইঅ্যামোনিয়াম ফসফেট $(NH_4)_2PO_4$ — এতে প্রায় শতকরা ৫৩ ভাগ P_2O_5 এবং শতকরা ২১ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। ইউরিয়া ও টিএসপি সারের পরিবর্তে এটি ব্যবহারযোগ্য।

(ঘ) অ্যামোফস (Amophos) : এটি জটিল সার এবং এতে শতকরা ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন এবং শতকরা ২০ ভাগ P_2O_5 আছে। এটি পানিতে খুব দ্রবণীয়, তাই অতি সহজেই শস্য পরিশোষণ করতে পারে।

(ঙ) ক্ষারীয় স্ল্যাগ (Basic slag) : ইস্পাত তৈরির সময় উপজাত বস্তু হিসেবে এটি পাওয়া যায়। ক্ষারধর্মী হওয়ার অম্লীয় মৃত্তিকায় ব্যবহারের জন্য এটি উপযোগী।

৩। **পটাশজাতীয় সার**

(ক) মিউরেট অব পটাশ (KCL) : এর রাসায়নিক নাম পটাসিয়াম ক্লোরাইড। এর রঙ সাধারণ লালচে এবং এতে শতকরা ৫০ থেকে ৫২ ভাগ K_2O আছে।

(খ) পটাশিয়াম সালফেট (K_2SO_4) : সাদা রঙের এই সারে শতকরা ৪৩ থেকে ৪৪ ভাগ K_2O থাকে। এতে সালফার থাকায়, সালফার ঘাটতি মৃত্তিকায় এই সার খুব উপযোগী।

(গ) পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) : এতে শতকরা ৩৭ ভাগ K_2O এবং শতকরা ১৩ ভাগ নাইট্রোজেন আছে।

(ঘ) পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট $(KSO_4.MgSO_4)$: এতে শতকরা ২২ ভাগ K_2O, ১৮ ভাগ ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড (MgO) এবং ১৮ ভাগ সালফার থাকে। যে মৃত্তিকায় ম্যাগনেশিয়াম এবং সালফারের ঘাটতি আছে, সেখানে এই সারের ব্যবহার খুব উপযোগী।

(ঙ) পটাশিয়াম মেটাফসফেট (KPO_3) : এতে শতকরা ৪০ ভাগ K_2O এবং ৬০ ভাগ ফসফেট আছে। এই সার পানিতে খুব দ্রবণীয় না হলেও, এর পুষ্টি উপাদান ধীরে ধীরে শস্যের জন্য লভ্য হয়।

(চ) কেইনিট (Kainit) : এটি পটাশিয়াম ও সোডিয়াম লবণের মিশ্রণ এবং এতে শতকরা ১৪ থেকে ৩০ ভাগ K_2O আছে। কোনো কোনো কেইনিট সারে পর্যাপ্ত পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম থাকে।

এ পর্যন্ত ৩নটি প্রধান মৌল উপাদান সরবরাহকারী সার সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে বর্তমানে মৃত্তিকায় অন্যান্য কিছু কিছু মৌল উপাদানের ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই এই ঘাটতি পূরণের উপযোগী সার ব্যবহার করা উচিৎ। নিচে এরকম কয়েকটি রাসায়নিক সারের বর্ণনা দেয়া হলো।

সালফারজাতীয় সার : অ্যামোনিয়াম বাই সালফাইট (৩২.৩% সালফার), অ্যামোনিয়াম থায়োসালফেট (৪৩.৩% সালফার), অ্যামোনিয়াম সালফেট (২৪.২% সালফার) এবং সালফেট অব পটাশ (১৭.৬% সালফার)।

দস্তাজাতীয় সার : জিঙ্ক সালফেট (৩০% দস্তা) এবং জিঙ্ক অ্যামোনিয়াম ফসফেট (৩৩.৫% দস্তা)।

ম্যাগনেশিয়ামজাতীয় সার : ইপসম লবণ (৯.৬% Mg), ম্যাগনেশিয়া (৫৫% Mg) এবং পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট (১১% Mg)।

লোহাজাতীয় সার : ফেরাস সালফেট ($FeSO_4 . 7H_2O$)।

তাম্রজাতীয় সার : কপার সালফেট ($CuSO_4 . 7H_2O$) (২৫.০% Cu)।

বোরজাতীয় সার : বোরাক্স ($Na_2 B_4O_7 . 10H_2O$) (১০.৬% B) এবং ক্যালসিয়াম বোরেট ($Ca_2B_6O . 5H_2O$)।

ম্যাংগানিজজাতীয় সার : ম্যাঙ্গানাইট [$M_nO(OH)$]।

মলিবডেনামজাতীয় সার : অ্যামোনিয়াম মলিবডেট, সোডিয়াম মলিবডেট এবং মলিবডেনাম ট্রাইঅক্সাইড।

অণুজীব সার (Biofertilizers)

বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকলেও (৩৮.৫×১০^{১৫} মেট্রিক টন) উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদ এটি গ্রহণ করতে পারে না। কেবল কতিপয় অণুজীব এই নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে নিজেদের কাজে লাগায় এবং পরবর্তীকালে উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ তা গ্রহণ করতে পারে। এই অণুজীবগুলো হয় মুক্তভাবে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে, না হয় অন্য উদ্ভিদের সাথে সিম্বায়োটিকভাবে সংবন্ধন করে।

১। সিম্বায়োটিক নাইট্রোজেন সংবন্ধন সিস্টেম

(ক) *Rhizobium* লেগ্যুম সিম্বায়োসিস : লেগ্যুমজাতীয় উদ্ভিদের মূলে অর্বুদে *Rhizobium* নামক ব্যাকটেরিয়াম নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে। উদ্ভিদের মূলে ভালভাবে অর্বুদ হলে বছরে হেক্টর প্রতি ৬০ থেকে ১২০ কেজি নাইট্রোজেন মৃত্তিকায় জমা হতে পারে। বিভিন্ন প্রকার লেগ্যুমের জন্য *Rhizobium* –এর স্ট্রেইন ভিন্ন। অনেকসময় মৃত্তিকায় কোনো নির্দিষ্ট স্ট্রেইনের *Rhizobium* এর ঘাটতি থাকে, তখন কৃত্রিমভাবে তৈরি ইনোকুলাম মৃত্তিকায় যোগ করা হয়।

(খ) *Azolla-anabaena* **সিম্বায়োসিস :** ধানের ক্ষেতে এই সিম্বায়োসিস অধিক কার্যকর। এখানে *Anabaena* নামক নীলা–সবুজ শৈবাল *Azolla* নামক পানি–ফার্নের পাতার অভ্যন্তরে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে। শুষ্ক ওজনের ভিত্তিতে *Azolla* তে শতকরা ৮৫ থেকে ৯৪ ভাগ পানি, ৩ থেকে ৪ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.৫ থেকে ০.৯ ভাগ ফসফরাস, ২ থেকে ৪ ভাগ পটাশিয়াম, ০.৪৫ ভাগ ম্যাগনেশিয়াম, ০.৪০ থেকে ০.৯০ ভাগ ক্যালসিয়াম এবং ০.১১ থেকে ০.১৬ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ থাকে।

২। মুক্তজীবী নাইট্রোজেন সংবন্ধন সিস্টেম

মৃত্তিকাস্থ কতকগুলো বায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া, যেমন *Azotobacter, Klebsiella,* অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া, যেমন- *Clostridium* ও কতকগুলো নীল সবুজ শৈবাল, যেমন- *Nostoc* বায়ু থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এদের দেহের মধ্যে নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত করে। এদের মৃত্যুর পর দেহস্থিত নাইট্রোজেন যৌগ মৃত্তিকায় জমা হয়, তখন শস্য উদ্ভিদ তা গ্রহণ করতে পারে।

সারের প্রকার, পরিমাণ এবং প্রয়োগের সময় নির্বাচন (The Choice of Type, Amount and Timing of Fertilizer Application)

পৃথিবীর অনেক দেশে নাইট্রোজেন সার হিসেবে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ফসফরাস সার হিসেবে অ্যামোনিয়াম ফসফেট এবং পটাশিয়াম সার হিসেবে মিউরেট অব পটাশ ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে ইউরিয়া, ট্রিপল সুপার ফসফেট এবং মিউরেট অব পটাশ খুবই জনপ্রিয়। সারের প্রকার নির্বাচনে সারের মূল্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সার প্রয়োগের পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধাও বিবেচ্য বিষয়। দানাদার সার হাত দিয়ে প্রয়োগ করা যায়, যন্ত্রপাতি না হলেও চলে, তাই অনেকে দানাদার সার পছন্দ করেন। অ্যানহাইড্রাস এবং জলীয় অ্যামোনিয়ার জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি এবং তরল সারের জন্য সিঞ্চন (spray) যন্ত্রের প্রয়োজন, তাই সার প্রয়োগ খরচ বেড়ে যায়।

কতকগুলো সার অতি দ্রুত শস্য উদ্ভিদের লভ্য হয়। যেমন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট দ্রুত লভ্য, কিন্তু ইউরিয়া এবং কতিপয় অ্যামোনিয়াম সার লভ্য হতে সময় লাগে, কারণ এগুলোকে মৃত্তিকায় লভ্য অবস্থায় রূপান্তরিত হতে হয়। একইভাবে বিভিন্ন প্রকার ফসফরাস সারের প্রতিক্রিয়াও ভিন্নতর হয়। পাথুরে ফসফেট চূর্ণের প্রতিক্রিয়া মন্থর, কিন্তু নাইট্রোফসফেটের, এতে ৬০ মাত্রায় পানিতে দ্রবণীয় P_2O_5 আছে, প্রতিক্রিয়া অতি দ্রুত।

শস্যের প্রকার ও সার নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। অধিকাংশ শস্যের তিনটি প্রধান মৌল উপাদানই প্রয়োজন, তাই এদের জন্য যৌগিক সার সুবিধাজনক। বিভিন্ন শস্যের জন্য এই অনুপাত ভিন্ন হবে। যেমন বসন্তকালীন দানাশস্যের এই অনুপাত ২ (N) ঃ ১ (P_2O_5) ঃ ১ (K_2O), কিন্তু গোল আলুর ক্ষেত্রে ১ঃ২.৫ঃ২.৫। লেগ্যুমজাতীয় শস্যের জন্য নাইট্রোজেনের প্রয়োজন হয় না, তাই এদের অনুপাত হবে ০ঃ১ঃ১।

সারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা বিশ্লেষণ, মৃত্তিকার প্রকার, পূর্ববর্তী শস্য, শস্যের প্রকার এবং আবহাওয়া বিবেচনা করা হয়। তাই কোনো শস্যের জন্য এক এলাকার সুপারিশকৃত মাত্রা অন্য এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়।

কি পরিমাণ সার জমিতে প্রয়োগ করা হবে তা নির্ধারণের জন্য আরেকটি বিষয় বিবেচনা করা হয়, তা হলো সম্ভাব্য ফলন কি রকম হবে। আবহাওয়াগত ও মৃত্তিকাগত কারণে কোনো এলাকায় যদি উচ্চ ফলনের সম্ভাবনা কম থাকে, সেখানে বেশি পরিমাণে সার প্রয়োগ করে উৎপাদন খরচ না বাড়ানোই অধিকতর যুক্তিসংগত।

শস্য উৎপাদনে সার প্রয়োগের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফসফরাস এবং পটাশিয়াম খুব একটা চলনশীল (mobile) নয় বলে চোয়ানোর মাধ্যমে এদের ক্ষতি কম হয়। তাই, এই জাতীয় সার চাষের সময় মৃত্তিকায় প্রয়োগ করা হয় এবং এদের কোনো টপ ড্রেসিং (top dressing) করা হয় না। তবে নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগের সময় ভিন্নতর হয়। যে সমস্ত শস্যের, যেমন, উচ্চফলনশীল ধান ও গম, অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের দরকার হয়, সেক্ষেত্রে নাইট্রোজেন সারের মোট পরিমাণের কিছু অংশ বীজ বপনের পূর্বে এবং বাকি অংশ কিছুদিন পর পর একবার বা দুই--তিন বারে প্রয়োগ করা হয়। শস্যের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে পরবর্তী নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা হয়। যেমন-- দানাশস্যের ক্ষেত্রে কুশি উৎপন্ন (tillering), পুষ্পায়ন (flowering) এবং দানা ভর্তির সময় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা হয়। আয়ের মধ্যবর্তী নালি পর্যায়ে নাইট্রোজেন এবং পটাশিয়ামজাতীয় সার ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ভুট্টার ৩০-৬০ সেন্টিমিটার হলে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এভাবে নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো শস্য উদ্ভিদ যেন ব্যবহৃত সারের সম্পূর্ণটাই পরিশোষণ করতে পারে।

সার ব্যবহারের সময় আরেকটা বিষয় বিবেচনা করা হয়, তা হলো মৃত্তিকায় উপযুক্ত স্থানে সার প্রয়োগ। অনেক সময় সার সারা মাঠে ছিটিয়ে দেয়া হয়। এতে অধিক পরিমাণে সারের প্রয়োজন হয় এবং সারের বেশ কিছু অংশ শস্যের কোন কাজে আসে না। এজন্য কোনো কোনো শস্যের, যেমন-- গোল আলু এবং দানাশস্যের বীজ বপনের সময় P_2O_5 এবং K_2O বীজের সন্নিকটে প্রদান করা হয়। শস্যের বীজ সারিতে বপনের জন্য যে বপনযন্ত্র (seed drill) ব্যবহার করা হয়, তার মাধ্যমেই বীজের সাথে সার ড্রিল করা হয়। সারের সংস্পর্শে এলে কোনো কোনো বীজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাদেরকে আলাদাভাবে ড্রিল করা হয়। এর জন্য চারাগাছের বৃদ্ধি ভাল হয় এবং ফলনও বেশি হয়।

যে মৃত্তিকায় P_2O_5 এবং K_2O ঘাটতি থাকে, সে মৃত্তিকায় এভাবে সার স্থাপন খুব কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায়। গোল আলুর ক্ষেত্রে এরকম ফলাফল পাওয়া গেছে। গোল আলুর কন্দের সন্নিকটে, কিন্তু সংস্পর্শে নয়, সার প্রয়োগের জন্য ফলন অনেক বেড়ে যায়। তবে কন্দের খুব কাছে সার দিলে কচি চারাগাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কন্দের পাশে ৫ সেন্টিমিটার এবং নিচে ২.৫ সেন্টিমিটার দূরে P_2O_5 এবং K_2O প্রয়োগ করলে সবচেয়ে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

বেশি দূরত্বের ব্যবধানে সারিবদ্ধভাবে যেসব শস্যের চাষ করা হয়, সেক্ষেত্রে ব্যান্ড পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা হয়। সুগারবিটের দুটি সারির মাঝে ব্যান্ড পদ্ধতিতে সার প্রয়োগের জন্য কচি চারাগাছের ক্ষতি কম হয়।

উপরোক্ত পদ্ধতি ছাড়াও, বর্তমানে আরেকটি পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে মৃত্তিকায় সার প্রয়োগ না করে শস্যের পাতায় সারের দ্রবণ ছিটিয়ে দেয়া হয়। একে পত্রীয় পুষ্টি (Foliar nutrition) বলে। এই পদ্ধতি উদ্যান শস্যের ক্ষেত্রে মূলত প্রয়োগ করা হলেও, মাঠ শস্যের ক্ষেত্রেও বর্তমান ব্যবহৃত হচ্ছে।

যেসব সার মৃত্তিকায় প্রয়োগে জটিলতার সৃষ্টি হয়, সেসব ক্ষেত্রে পত্রীয় পুষ্টি পদ্ধতি খুব উপযোগী। পাতা এই সার দ্রুত শোষণ করে এবং এর জন্য সারের পরিমাণও কম লাগে। কখনো কখনো এটি সম্পূরক পদ্ধতি হিসেবেও কাজ করে। কোনো শস্যের সংকটকালীন বৃদ্ধি পর্যায়ে যদি মৃত্তিকায় সার প্রয়োগ করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে সার পাতায় প্রয়োগ করা হয়।

সার নীতি প্রণয়ন (Formulation of a fertilizer Policy)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, সার প্রয়োগের সাথে শস্যের প্রতিক্রিয়ার উপর অনেকগুলো জটিল প্রকরণ ক্রিয়াশীল। তবে শস্য উৎপাদনকারীকে একটি সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে যে, কি পরিমাণ সার ব্যবহার করবেন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিৎ

(১) শস্যের ধরন এবং এর জন্য কতটুকু সার দরকার,

(২) শস্যের ফলনের প্রতিক্রিয়া,

(৩) মৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ,

(৪) মৃত্তিকার প্রকার এবং বুনট,

(৫) পূর্ববর্তী শস্য এবং তার অবশেষ,

(৬) বৃষ্টিপাতের ধরন;

(৭) পানি সেচের প্রভাব,

(৮) বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া,

(৯) প্রয়োগকৃত সারের পরিমাণ নির্ধারণ,

(১০) কি ধরনের সার ব্যবহার করা হবে তা নির্বাচন করা,

(১১) সার প্রয়োগের পদ্ধতি নির্ধারণ,

(১২) সার প্রয়োগের সময় নির্বাচন এবং

(১৩) সারের মূল্য বিবেচনা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে একটি সার নীতি প্রণয়ন করলে সারের দক্ষ ব্যবহার এবং ফলনের উন্নতি হবে।

সুপারিশকৃত সারের উপাদান সাধারণত প্রতি হেক্টরে কেজি হিসেবে প্রকাশ করা হয়। কোন শস্যের কি পরিমাণ সারের দরকার তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটি জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। নিম্নলিখিত উদাহরণ থেকে সারে পরিমাণ নির্ণয় করা যাবে।

ধরা যাক, ২৭ হেক্টর যবের জমিতে সার প্রয়োগ করা হবে এবং প্রতি হেক্টরে সারের সুপারিশকৃত মাত্রা হলো ১০০ কেজি N, ৫০ কেজি P_2O_5 এবং ৫০ কেজি K_2O।

প্রথমে, একটি যৌগিক সার পছন্দ করা হলো যার পুষ্টি উপাদানের অনুপাত ২ঃ১ঃ১, যেমন ২০ঃ১০ঃ১০। এর পর প্রতি ৫০ কেজি সারের ব্যাগে কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান আছে তা নির্ণয় করা হলো। যেমন ১০ কেজি N, ৫ কেজি P_2O_2 এবং ৫ কেজি K_2O। তারপর প্রতি হেক্টরে কি পরিমাণ সার লাগবে তা নিম্নলিখিতভাবে নির্ণয় করতে হবে : অর্থাৎ ১০০÷১০ নাইট্রোজেনের জন্য =১০ ব্যাগ=৫০০ কেজি সার। সম্পূর্ণ জমির (২৭ হেক্টর) জন্য প্রয়োজন হবে ২৭×৫০০=১৩, ৫০০ কেজি =১৩.৫টন ২০ঃ১০ঃ১০ সার।

সার এবং শস্যের গুণগত মান (Fertilizer and Crop Quality)

এপর্যন্ত শুধু শস্যের ফলনের উপর সারের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক ফলন (economic yield) হিসেবে শস্যের যে অংশ সংগৃহীত হয়, তার গুণগত মানের উপর সারের প্রভাব থাকতে পারে এবং সারের নীতি নির্ধারণে এটিও বিবেচনা করা দরকার। এ বিষয়ে একটি সনাতন সুন্দর উদাহরণ হলো মল্ট (mault) প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত যবের উপর জীবনকালের শেষের দিকে প্রয়োগকৃত নাইট্রোজেন সারের প্রভাব। এসময় উচ্চমাত্রায় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে দানায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাই মল্টিং এর জন্য অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ে। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য মল্ট তৈরির জন্য ব্যবহৃত যব বপনের সময় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা উচিৎ। অপরপক্ষে, রুটি তৈরি জন্য ব্যবহৃত গমের দানায় অতিরিক্ত নাইট্রোজেন উপকারী, সেজন্য এই গমে দেরিতে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করতে হবে। গমের ফ্ল্যাগ পাতা (flag leaf) বের হওয়ার পর নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

উচ্চ মাত্রার নাইট্রোজেন সারের জন্য তেল উৎপাদনকারী রেপ (rape)-এর বীজে তেলের পরিমাণ হ্রাস পায়। দেরিতে প্রয়োগকৃত নাইট্রোজেন সারের জন্য শস্যের পাতার স্থায়িত্বকাল বেড়ে যায়, ফলে শস্য পরিপক্ব হতে বেশি সময় লাগে। এর ফলে শস্য সংগ্রহের সময় খারাপ আবহাওয়ার কারণে সংগৃহীত দ্রব্যের গুণগত মান হ্রাস পায়। লজিং (lodging) সৃষ্টি করে নাইট্রোজেন সার পরোক্ষভাবে দানাশস্যের দানার গুণগত মান হ্রাস করে।

অতি মাত্রার নাইট্রোজেন সারের জন্য গোল আলুর কন্দের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং এর জন্য আলু দিয়ে কতকগুলো দ্রব্য প্রস্তুত করতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সারের প্রভাবে গোল আলুর আকারও বৃদ্ধি পায়।

উচ্চ মাত্রার নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম এবং সোডিয়াম সার প্রয়োগে সুগারবিটের মূলে এই মৌলগুলোর মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং এর জন্য সুক্রোজ নিষ্কাশনের দক্ষতা হ্রাস পায়।

উপরোক্ত কতিপয় উদাহরণ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, সারের প্রভাবে শস্যের গুণগত মানের পরিবর্তন হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রভাব এত প্রকট যে, সার ব্যবহারের নীতি নির্ধারণে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবেশগত পীড়ন

প্রাকৃতিক পরিবেশে শস্য উদ্ভিদ নানা প্রকার পরিবেশগত পীড়নের সম্মুখীন হয়। পানি, তাপমাত্রা ও খনিজ মৌলের তারতম্যের জন্য পীড়নের সৃষ্টি হয় এবং প্রাণরাসায়নিক ও শারীরতাত্ত্বিক সমন্বয় সাধনের (adjustment) মাধ্যমে উদ্ভিদে এসব পীড়নের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। অস্বাভাবিক পরিবেশে শস্য উদ্ভিদকে টিকে থাকার জন্য এরকম সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন। বর্তমানে পরিবেশগত পীড়নের প্রভাবে শস্য উদ্ভিদের কি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এরকম পরিবেশে ভাল ফলনের জন্য শস্য উদ্ভিদে কি ধরনের অভিযোজন হয় তা উদঘাটনের উপর শস্য শারীরবিজ্ঞানীগণ অধিক মনোযোগ দিয়েছেন। শারীরবিজ্ঞানী এবং প্রজননবিদের যৌথ গবেষণায় খরা, উচ্চতাপমাত্রা, নিম্নতাপমাত্রা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু শস্য উদ্ভিদের জাত উদ্ভাবনের কাজ চলছে।

পীড়নের প্রভাব (Effects of Stress)

যে কোনো পীড়নে উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া ইলাস্টিক (elastic) অথবা প্লাস্টিক (plastic) হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সাময়িক এবং উদ্ভিদ তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উদ্ভিদের স্থায়ী পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনগুলো অপরিবর্তনশীল। উদ্ভিদে পীড়নের প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি হতে পারে অথবা পীড়ন অবস্থায় উদ্ভিদ প্রতিরোধী হতে পারে। এ অবস্থাকে বলে হার্ডেনিং (hardening)। কখনো কখনো এই প্রভাব পরবর্তী বংশে স্থানান্তরিত হতে পারে। যেমন নিম্ন তাপমাত্রায় জন্মানো মটর অথবা বিন উদ্ভিদ খর্বাকার হয় এবং এই প্রভাব কয়েক বংশে বাহিত হতে পারে। বর্তমানে প্রতিরোধী জাত বংশগতিও পরীক্ষা করা হচ্ছে।

প্রজননবিদরা এমন বংশগতীয় লাইন উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন যা ধীরে ধীরে বিভিন্ন পরিবেশে খাপখাইয়ে নিতে পারবে। পীড়ন পরিবেশে উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া খুব জটিল এবং কতকগুলো শারীরতাত্ত্বিক উদ্দীপনার মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়।

পীড়নের প্রকার (Types of Stress)

ভৌত পীড়ন (Physical Stress) (Levitt, 1972) পরিমাপ করা হয় প্রতি একক ক্ষেত্রফলে বলের হিসেবে (প্রতি একক ক্ষেত্রফলে চাপ বা চোষণ) এবং এর ফলে সৃষ্ট স্ট্রেইনকে মাপা হয় আকারগত পরিবর্তনের মাধ্যমে (আকৃতি, আয়তন ইত্যাদি)। কমপক্ষে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে ভৌত পীড়ন থেকে জৈবিক (biolgical) পীড়নের পার্থক্য আছে। প্রথমত, পরিবেশগত পীড়নের জন্য উদ্ভিদ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন- খুব শুষ্ক পরিবেশে (পীড়ন) উদ্ভিদ পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে (প্রতিবন্ধকতা) পানি হারানো কমাতে পারে। এই সিস্টেমে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর আগ্রহ পানির উপর। সাধারণত পানির উপর পীড়নের পরিমাপ করা হয় শক্তি হিসেবে, ভৌত সিস্টেমের মতো প্রতি একক ক্ষেত্রেফলে বল হিসেবে নয়। দ্বিতীয়ত, কখনো কখনো পীড়ন উদ্ভিদে স্থায়ী ক্ষতি

করে। এর জন্য সালোকসংশ্লেষণের ক্ষমতা কমে যায় (রাসায়নিক), সাইটোপ্লাজমের চলন (streaming) হয় (রাসায়নিক ও ভৌত) অথবা কোষ প্রাচীরের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে কোষের প্রসারণে বাধা প্রদান করে (ভৌত)। পীড়নের রাসায়নিক ও ভৌত উপাদান পৃথক করা কঠিন এবং এটি নিয়মবদ্ধও নয়।

শস্য উদ্ভিদ প্রধান প্রধান যেসব পীড়নের সম্মুখীন হয় তা হলো পানি ঘাটতি বা শুষ্কতা, অতিরিক্ত পানি বা জলাবদ্ধতা, শৈত্য (নিম্ন তাপমাত্রা), উচ্চ তাপমাত্রা, খনিজ মৌল বা আয়নিক বিষাক্ততা এবং দূষণ।

সাধারণভাবে দু'রকমের পীড়ন প্রতিরোধ আছে — একটি পীড়ন পরিহার এবং অপরটি পীড়ন সহিষ্ণুতা। প্রথমক্ষেত্রে উদ্ভিদ এমন একটি অন্তঃস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে কোষগুলোতে পীড়নের উদ্ভব হয় না। যেমন পাতায় প্রস্বেদন হওয়ায় পাতা শীতল হয়, যদিও পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা খুব বেশি থাকে। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে উদ্ভিদের পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতা আছে। কতকগুলো প্রজাতিতে উভয় কৌশলই কার্যকর। শারীরবিজ্ঞানীদের প্রধান লক্ষ্য হলো এমন শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা যা উদ্ভিদকে পীড়ন সহ্য করতে সাহায্য করে।

পীড়নের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (Stress Interactions)

কোনো কোনো পীড়ন যেমন খনিজ মৌল বা লবণ, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ, কিন্তু পানি ও তাপমাত্রার তারতম্য সর্বজনীন। আবার কোনো পীড়ন প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদকে এককভাবে প্রভাবিত করে না। তাপমাত্রার প্রভাব ছাড়া পানি ঘাটতি কদাচিৎ ঘটে অর্থাৎ মাঠের পানি ঘাটতি এবং উচ্চ তাপমাত্রা একসঙ্গে প্রকৃতিতে থাকে।

একইভাবে হিমাঙ্ক তাপমাত্রার ফলে কোষের পানি বিয়োজন (desication) হয়। তাই শস্য উৎপাদনে, তাপমাত্রা এবং পানির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

সাধারণত থার্মিস্টর (thermistor), থার্মোকাপল (thermocouple) এবং অবলোহিত (infrared) থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। উদ্ভিদ ও মৃত্তিকার পানির পরিমাণ নির্ণয়ের তুলনায় তাপমাত্রার পরিমাপ অপেক্ষাকৃত সহজতর। পানির পরিমাপের বর্তমানে দুটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো আপেক্ষিক পানির পরিমাণ (Relative Water Content বা RWC) এবং পানির পটেনশিয়াল। পূর্ণ রসস্ফীতির তুলনায় নমুনা সংগ্রহের সময় (sampling) উদ্ভিদে কি পরিমাণ পানি আছে তার পরিমাপ হলো RWC (পূর্বে ব্যবহৃত আপেক্ষিক রসস্ফীতি যা প্রথম ব্যবহার করেন Weatherly ১৯৫০ সালে)।

$$RWC = \frac{(wf-wd)}{(wt-wd)} \times ১০০$$

এখানে wf হলো সজীব ওজন (নমুনা সংগ্রহের সময়), wd হলো শুষ্ক ওজন এবং wt হলো কলাকে (যেমন পাতা) পানিতে রেখে রসস্ফীত ওজন। এই পদ্ধতির অবশ্য কিছু অসুবিধা আছে। যেমন পানি শোষণের সময় কোষের বৃদ্ধি হতে পারে, শ্বসনের জন্য ওজন হ্রাস পেতে পারে এবং কাটা অংশ ও কোষাবকাশে (inter cellular space) পানি প্রবেশ করতে পারে।

বর্তমানে উদ্ভিদে পানি পরিমাপের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি সম্ভবত পানির পটেনশিয়াল। উদ্ভিদে পানির পটেনশিয়াল সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পানি স্বল্পতাজনিত পীড়ন (Water Stress)

শুধুমাত্র শুষ্ক (arid) এবং অর্ধ-শুষ্ক (semi-arid) অঞ্চলেই নয়, পানি স্বল্পতার কারণে সারা পৃথিবীতেই শস্যের ফলন হ্রাস পাচ্ছে। যেসব এলাকায় শস্য উৎপাদন মৌসুমে, বৃষ্টিপাতের

পরিমাণের তুলনায় বাষ্পীভবনের চাহিদা বেশি সেসব এলাকায় মৃত্তিকায় পানি ঘাটতি হয়। এখন পানি স্বল্পতার কারণে শস্য উদ্ভিদের যেসব প্রতিক্রিয়া হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। উদ্ভিদ প্রজাতি, মৃত্তিকার প্রকার, পুষ্টি উপাদান ও আবহাওয়াগত কারণে উদ্ভিদে যে শারীরতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় এবং শস্য উৎপাদনে এদের আপেক্ষিক গুরুত্বের তারতম্য হয়, তা সত্ত্বেও পানি স্বল্পতার জন্য উদ্ভিদের কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

পানি স্বল্পতা, মৃত্তিকায় পানি প্রদান না করা প্রভৃতি কারণে শস্যের ভৌত পরিবেশের সরাসরি পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তন পরবর্তীকালে শস্যের শারীরতত্ত্বকে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকা শুকানোর সাথে সাথে মৃত্তিকার পানির পটেনশিয়াল এবং হাইড্রোলিক পরিবাহকতা কমতে থাকে। ফলে উদ্ভিদের পক্ষে পানি পরিশোষণ কঠিন হয়ে পড়ে (Gardner, 1960)। এর জন্য উদ্ভিদের পানির পটেনশিয়াল কমে যায় এবং কতকগুলো শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া সরাসরি প্রভাবিত হয়। যেমন কোষের রসস্ফীতি চাপ কমে যায় এবং পাতার প্রসারণে রসস্ফীতি চাপের অবদান আছে (Hsiao এবং Acevedo, 1974)। রসস্ফীতিত্ব হারানোর ফলে পাতা মিইয়ে পড়ে, এতে করে আলো গ্রহণ (interception) এবং সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়। তবে এমতাবস্থায় মিইয়ে পড়ার চেয়ে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হওয়ার প্রভাব সালোকসংশ্লেষণের হারের উপর বেশি।

উদ্ভিদে পানির পটেনশিয়াল কমে যাওয়ার আরও প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে, কিন্তু পত্ররন্ধ্র প্রভাবের গুরুত্বও কম নয়। পাতার প্রসারণ হ্রাস হওয়া ও পত্ররন্ধ্র বন্ধের উভয়েরই প্রভাব আছে সালোকসংশ্লেষণের উপর এবং আত্তীকারী দ্রব্যের (assimilate) সরবরাহ কম হওয়ায় পরিস্ফুরণ (differention) ও নতুন কলা তৈরিসহ অনেক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে হ্রাস করে। মূলে আত্তীকারী দ্রব্যের স্বল্পতা মূলের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে এবং এই হ্রাসকৃত বৃদ্ধির ফলে মৃত্তিকায় সঞ্চিত সবটুকু পানি মূল ব্যবহার করতে পারে না। পানির পটেনশিয়ালের হ্রাসের কারণে হরমোনের মাধ্যমে উদ্ভিদে অন্যান্য পরোক্ষ প্রভাব ঘটতে পারে।

এসকল প্রভাব ছাড়াও, মৃত্তিকা শুষ্ক হওয়ার জন্য খনিজ মৌলের গতিশীলতা এবং সেই সাথে মূলের কতকগুলো মৌলের পরিশোষণ ক্ষমতাও হ্রাস পায়। খনিজ মৌলের পরিশোষণ কম হলে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এ প্রসঙ্গে ফসফরাসের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ ফসফেট মৃত্তিকার উপরের স্তরে থাকে এবং পানি স্বল্পতা হলে এই স্তর প্রথম শুকিয়ে যায় ফলে ফসফরাসের লভ্যতা কমে যায় (Dunham এবং Nye, 1976)।

শারীরতাত্ত্বিক ও অঙ্গসংস্থানিক প্রতিক্রিয়া (Physiological and Morphological Responses)

শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদ্ভিদের অথবা কিছু অংশের জন্য শুষ্ক পদার্থ তৈরি অর্থাৎ কার্বন সঞ্চয় এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে এর বিভাজন (partition) মূল বিষয়। সাধারণভাবে, কার্বন সঞ্চয় নির্ভর করে পাতার ক্ষেত্রফল, প্রতি একক পাতার ক্ষেত্রফলে সালোকসংশ্লেষণের হার এবং শ্বসনের হারের উপর। পাতার উদ্ভব, পাতার প্রসারণের হার ও স্থায়িত্বকাল (duration) এবং পাতার বার্ধক্য প্রাপ্তির (senescence) উপর নির্ভর করে ক্যানোপি সালোকসংশ্লেষণ।

পাতার প্রসারণ (Leaf expansion)

প্রথম দিককার গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, পানি ঘাটতিতে পাতার প্রসারণ খুবই সংবেদনশীল। একটি নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে, ভুট্টার পাতার পানির

পটেনশিয়াল -০.২ মেগাপ্যাসকেলের নিচে নেমে গেলে পাতার প্রসারণ দ্রুত হ্রাস পায় এবং –০.৭ থেকে -০.৯ মেগাপ্যাসকেলে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তবে বর্তমানের গবেষণা থেকে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা নির্দেশ করে যে মাঠ পর্যায়ে পানি ঘাটতিতে পাতার প্রসারণ কম সংবেদনশীল। বর্তমানে এটিও জানা গেছে যে, পাতার বৃদ্ধির সাথে রসস্ফীতি চাপের সম্পর্ক নাই। Meyer এবং Boyer (1972) এর উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, মৃত্তিকার পানি ঘাটতি বৃদ্ধির জন্য সয়াবিনের হাইপোকটাইল-এর বৃদ্ধি ১.৬ থেকে ০.২ মিলিমিটার/ঘণ্টা হয়, কিন্তু হাইপোকটাইলের রসস্ফীতি চাপের কোনো পরিবর্তন হয়নি। একইভাবে Michelena এবং Boyer (1982) এবং Van Volken-burgh এবং Boyer (1985) লক্ষ্য করেন যে, মৃত্তিকার পানি ঘাটতির জন্য ভুট্টার পাতার প্রসারণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে গেলেও, বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের কোষের রসস্ফীতি চাপ অপরিবর্তিত ছিল (চিত্র ৬.১)।

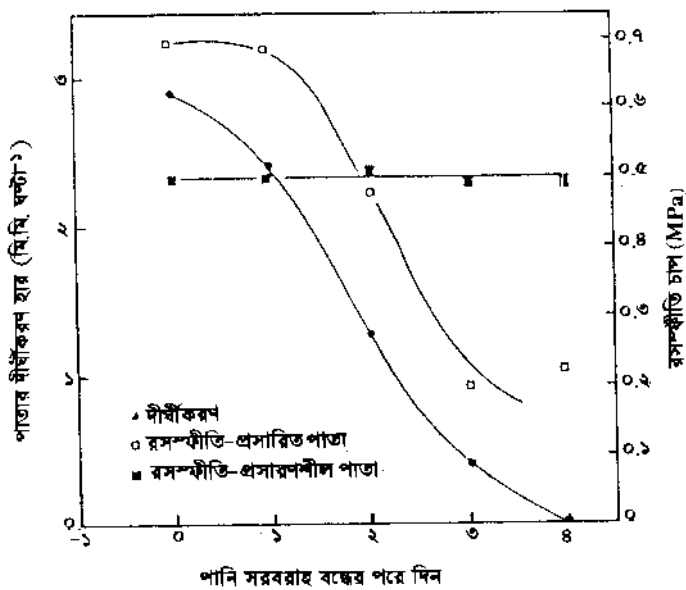

চিত্র ৬.১ : পানি প্রয়োগ বন্ধ করার পর ভুট্টার প্রসারণশীল ( ) এবং পূর্ণ প্রসারিত ( ) পাতার রসস্ফীতি চাপ ( ) এবং পাতার প্রসারণের হারের পরিবর্তন।

রসস্ফীতি চাপ ও কোষের প্রসারণের মধ্যে সম্পর্কহীনতার কারণ ব্যাখ্যা করতে কয়েকটি প্রস্তাব করা হয়েছে। পানি ঘাটতির সাথে থ্রেশহোল্ড রসস্ফীতি চাপ অথবা কোষ প্রাচীরের প্রসারণতার পরিবর্তনকে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে মনে করা হয় (Hsiao *et al.*, 1976)। Van volkenburgh এবং Boyer (1985) পানি ঘাটতির সাথে ভুট্টার পাতার পরিসংখ্যানগত তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন দেখাতে ব্যর্থ হন, কিন্তু Boyer এবং তাঁর সহকর্মীরা (1985) মন্তব্য করেন যে, আংশিক হলেও কোষ প্রাচীরের প্রসারণতা সয়াবিনের কাণ্ডের বৃদ্ধিকে সীমায়িত করেছিল। বিকল্পরূপে, বর্ধনশীল কলার রসস্ফীতি চাপের পরিমাপ সম্ভবত সঠিক নয়। Mayer এবং Boyer (1972) এবং

Michelena ও Boyer (1982) বর্ধনশীল পাতা ও হাইপোকটাইলের পানির পটেনশিয়াল এবং অসমোটিক পটেনশিয়াল পরিমাপ করেছিলেন থার্মোকাপল মাইক্রোমিটারে রক্ষিত কর্তিত কলা থেকে। কোষ প্রাচীরের শিথিলতার জন্য পানি সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় বর্ধনশীল কোষের রসস্ফীতি চাপ থ্রেশহোল্ড রসস্ফীতি চাপে নেমে আসে (Boyer *et al.*, 1985)। এজন্যই Michelena এবং Boyer (1985) এর পরীক্ষায় (চিত্র ৬.১) পানি ঘাটতির সাথে সাথে ভুট্টার প্রসারণশীল পাতার থ্রেশহোল্ড রসস্ফীতি চাপের পরিবর্তন হয়নি। এতদসত্ত্বেও, প্রেসার চেম্বারের সাহায্যে পাতার পানির পটেনশিয়াল পরিমাপ করেও রসস্ফীতি এবং পাতার বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। এটি নির্দেশ করে যে, অন্য কোনো প্রভাবক কাজ করে। একটি বিকল্প ব্যাখ্যা হলো যে, পাতার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে উদ্ভিদ হরমোন অংশগ্রহণ করতে পারে। হরমোনের প্রভাব সরাসরি হতে পারে অথবা কোষ ঝিল্লীর হাইড্রোলিক পরিবাহকতা এবং/ অথবা কোষ প্রাচীর শিথিল করে পরোক্ষভাবেও হরমোন কাজ করতে পারে।

Termaat এবং তাঁর সহকর্মীরা (1985) এবং Munns এবং Termaat (1986)-এর পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, পাতার বৃদ্ধি প্রভাবিত হয় মূলের অসমোটিক চাপ দ্বারা, পাতার রসস্ফীতি চাপ দ্বারা নয়।

পাতার প্রসারণ ছাড়াও, পানি ঘাটতির জন্য বৃদ্ধির সকল পর্যায়েই পাতার বার্ধক্যপ্রাপ্তি এবং মৃত্যু ত্বরান্বিত হতে পারে। পাতার পানির পটেনশিয়াল -১.৫ মেগাপ্যাসকেলের কম হলে মৃত পাতার শতকরা হার বেড়ে যায় এবং -১০.০ মেগাপ্যাসকেলে সকল পাতাই মরে যায়। সাধারণত ক্যানোপির নিচের অংশের পুরাতন পাতার প্রথমে মৃত্যু ঘটে এবং ধীরে ধীরে ক্যানোপির উপরের অংশ আক্রান্ত হয়। পানি ঘাটতির জন্য কুশির সংখ্যা কমে যায়, এবং মৃত্যুর হার বেড়ে যায় ফলে ক্যানোপির পাতার ক্ষেত্রফল হ্রাস পায়।

নিট সালোকসংশ্লেষণ : পানি ঘাটতির ফলে প্রতি একক পাতার ক্ষেত্রফলে সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়। ধারণা করা হতো যে, পানি ঘাটতির জন্য পত্ররন্ধ্র বন্ধ হওয়ার জন্য পাতায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রবেশে বিঘ্ন ঘটায় সালোকসংশ্লেষণ কমে যায়। বর্তমানে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায় পাতার পানির পটেনশিয়াল একটি সংকটকালীন অবস্থা বা থ্রেশহোল্ড না পৌছানো পর্যন্ত পাতার পানির পটেনশিয়াল কমার জন্য পত্ররন্ধ্রীয় রোধকের খুব সামান্য পরিবর্তন হয়। তবে থ্রেশহোল্ড পটেনশিয়ালের নিচে পত্ররন্ধ্রীয় রোধক ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। যে সংকটকালীন পটেনশিয়ালে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয় তা বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন এবং একই প্রজাতির বিভিন্ন জাতের মধ্যেও ভিন্নতা দেখা যায়। কোনো একটি প্রজাতি কিংবা ভ্যারাইটির পত্ররন্ধ্রের কোনো অনন্য সংকটকালীন মান নেই। পাতার যে পানির পটেনশিয়ালে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয় তা নির্ভর করে ক্যানোপিতে পাতার অবস্থান, পাতার বয়স, পরিবেশীয় অবস্থা এবং পীড়নের মাত্রার উপর।

কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রেডিয়েন্ট (বহিঃস্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড ঘনমাত্রা—অন্তঃস্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড ঘনমাত্রা) এবং পাতার কোষের কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণের ক্ষমতা-উভয়ের দ্বারাই কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণের হার নিয়ন্ত্রিত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপনের বাউন্ডারি স্তর রোধকের উপর পানি ঘাটতির প্রভাব নেই, কিন্তু পত্ররন্ধ্রীয় ও মেসোফিল রোধকের উপর কোনো প্রভাব আছে। পানি ঘাটতির জন্য সালোকসংশ্লেষণের উপর কোনো রোধকের অবদান কতটুকু তা এখনও স্পষ্ট নয়। পীড়নের সময় পত্ররন্ধ্রীয় এবং অপত্ররন্ধ্রীয় (non stomatal) বা মেসোফিল রোধকের পরিবর্তনের কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যাটার্ন পরিলক্ষিত হয় না, বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম প্যাটার্ন হয়। তবে অনেক উদ্ভিদে দেখা গেছে যে, পত্ররন্ধ্র বন্ধ করতে যে পানির

পটেনশিয়াল প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক কম না হলে অ-পত্ররন্ধ্রীয় রোধক প্রভাবিত হয় না। তবে কতকগুলো প্রজাতিতে, যেমন- সূর্যমুখী, পানি ঘাটতির জন্য পত্ররন্ধ্রীয় ও অ-পত্ররন্ধ্রীয় প্রভাব একই পানির পটেনশিয়ালে হয়।

পানি ঘাটতির জন্য সালোকসংশ্লেষণের আলোক বিক্রিয়া, চক্রীয় এবং অচক্রীয় উভয় ফসফোরাইলেশন বাধাগ্রস্ত হয়। পানি ঘাটতির জন্য সালোকসংশ্লেষণের অন্ধকার পর্যায়ও প্রভাবিত হয়। ক্লোরোপ্লাস্টে এনজাইমের মাত্রা কিংবা কার্যকারিতা কমে যাওয়ায় অন্ধকার বিক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।

পর্যাপ্ত পানি ঘাটতি যা পত্ররন্ধ্রকে বন্ধ এবং সালোকসংশ্লেষণকে হ্রাস করে তা অন্ধকার শ্বসনের হারকেও কমিয়ে দেয়। তবে একই পানির পটেনশিয়ালে অন্ধকার শ্বসনের তুলনায় সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সূর্যমুখীর পাতার পানির পটেনশিয়াল - ০.৪ থেকে — ১.৮ মেগাপ্যাসকেলে হ্রাস পাওয়ায় পাতার সালোকসংশ্লেষণের হার কমে শতকরা ৭০ ভাগ, কিন্তু অন্ধকার শ্বসনের হার কমে শতকরা ৩৩ ভাগ। সূর্যমুখী, সয়াবিন এবং ভুট্টার বিটপের অন্ধকার শ্বসন, সালোকসংশ্লেষণের মতো হ্রাস পায়, এটি নির্দেশ করে যে, পানি ঘাটতির জন্য পাতার কলার তুলনায় কান্ড ও ভাজক কলার অন্ধকার শ্বসনের হার বেশি।

বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, স্বল্পকালীন পানি ঘাটতির জন্য শস্য উদ্ভিদের আলোকশ্বসনের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু পরিশেষে আলোকশ্বসনের সাবস্ট্রেট কমে যাওয়ায় আলোকশ্বসনের হার কমে যায়। পানি ঘাটতি না থাকলে আলোর উপস্থিতিতে C_3 উদ্ভিদকে কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে বঞ্চিত করলে, আলোক-বাধকের (photo-inhibition) জন্য সালোকসংশ্লেষণ কমে যায়, অপরপক্ষে আলোকশ্বসনের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড রিসাইক্লিং হওয়াতে এই আলোক-বাধকের কার্যকারিতা কমে যায়। পাতার পানির পটেনশিয়াল খুব কমে গিয়ে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হলে আলোক-বাধকের কার্যকারিতা হ্রাসের একটি কৌশল হলো আলোকশ্বসনের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড রিসাইক্লিং হওয়া।

নাইট্রোজেন বিপাক : পানি ঘাটতির জন্য নাইট্রেট রিডাকটেজ এনজাইমের কার্যকারিতা কমে যায়। পানি ঘাটতিতে প্রোটিন সংশ্লেষণও সংবেদনশীল। পানি ঘাটতির জন্য সিম্বায়োটিক নাইট্রোজেন সংবন্ধন কম হয় (Huang *et.al.*, 1975)।

ক্ষুদ্র অণু সঞ্চয় (Accumulation of Small molecules) : পানি ঘাটতির জন্য উদ্ভিদ কোষে মেটাবোলাইটের পরিমাণ বেড়ে যায়, অবশ্য সব মেটাবোলাইটের যে অতিরিক্ত অভিযোজনীয় তাৎপর্য আছে, এমন নয়। যদি এই সঞ্চয় অভিযোজনীয় হয়, তাহলে পীড়নের সময় অথবা পীড়ন শেষে উদ্ভিদ এই দ্রব্য ব্যবহার করে। যেমন অসমোটিকাম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, এনজাইম/কোষ ঝিল্লীর রক্ষাকারী হিসেবে, ক্ষতিকারক নয় এমন নাইট্রোজেনের উৎস অথবা বিজারক হিসেবে কাজ করতে পারে।

পাতায় প্রোলিন সঞ্চয় (Proline accumulation in leaves) : মধ্যম অথবা প্রকট পানি ঘাটতির জন্য অনেক উদ্ভিদের পাতায় ১০ থেকে ১০০ গুণ মুক্ত প্রোলিন জমা হতে পারে। সাধারণত মুক্ত অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে প্রোলিন সবচেয়ে বেশি সঞ্চয় হয়; কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ এবং আলো বেশি হলে (আলোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যামূলক নয়) প্রোলিন সঞ্চয়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাধারণত পানি ঘাটতির জন্য প্রোলিনের মাত্রা প্রতি গ্রাম শুষ্ক পদার্থে ২০০ মাইক্রোমোলের বেশি হয় না। কচি গাছের পাতায় প্রোলিন সঞ্চয় হয়। পুরাতন উদ্ভিদের

পূর্ণাঙ্গ পাতায়, যা মাঠে অথবা বড় পটে অনেকদিন ধরে পানি ঘাটতি অবস্থায় জন্মে, প্রোলিন সঞ্চয় হয়। পানি ঘাটতি শেষ হলে নতুন বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেনের উৎস হিসেবে প্রোলিন কাজ করে।

পাতায় বিটেইন সঞ্চয় (Betaine accumulation in leaves)

কতকগুলো উদ্ভিদ প্রজাতির অঙ্গজ কলায় গৌণ (secondary) বিপাকীয় কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম যৌগ বিটেইন (গ্লাইসিন বিটেইন) প্রচুর পরিমাণে (প্রতি গ্রাম শুষ্ক পদার্থে ৫ মাইক্রোমোলের বেশি) জমা হয়। Chiropodiaceae গোত্রের প্রায় সকল উদ্ভিদে এবং Gramineae গোত্রের কোনো কোনো ট্রাইবে (যেমন– হরডি, Hordeae) বিটেইন থাকে। বিটেইন সংশ্লেষণ এবং সঞ্চয় লবণাক্ত পরিবেশে জমানো উদ্ভিদের একটি অভিযোজন, যদিও সকল বিটেইন সঞ্চয়কারী উদ্ভিদ লবণাক্ততা সহিষ্ণু (halophyte) উদ্ভিদ নয়।

বিটপ এবং মূল উভয়েতেই বিটেইন থাকে ; মূলের মাত্রা সাধারণত বিটপের তুলনায় কম অথবা সমান। গমের পরাগধানী এবং পুংরেণুতে প্রচুর পরিমাণে বিটেইনের এবং এর অগ্রবর্তী পদার্থ কোলাইন থাকে। গবেষণাগারে এবং মাঠে লবণাক্ততা বৃদ্ধি করলে বিইেনের পরিমাণ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। একইভাবে পানি ঘাটতির জন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ঘাস এবং চিনোপডের পাতার বিটেইন পাঁচ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়। মাঠ পর্যায়ে সেচবিহীন যবের উপরের পাতায় বিটেইন জমা হয়। দানাশস্য ও চিনোপডে বিটেইন সংশ্লেষণের জন্য আলোর প্রয়োজন নেই।

অসমোটিক সমন্বয় সাধন (Osmotic adjustment) : পানি ঘাটতির সময় কোষ থেকে পানি বের হয়ে গেলে, কোষের দ্রবের ঘনমাত্রা বেড়ে যায়, ফলে অসমোটিক পটেনশিয়াল কমে যায়। যদি কোষ সম্পূর্ণ অসমোমিটারের মতো আচরণ করে, তাহলে নিম্নলিখিতভাবে দ্রবের ঘনমাত্রার জন্য অসমোটিক পটেনশিয়ালের (ψ_π) পরিবর্তন হবে :

$$\psi_\pi = \frac{\psi^{\circ}_\pi V^{\circ}}{V} \quad \text{.................. (৬.১)}$$

এখানে V হলো কোষের অসমোটিক আয়তন এবং ψ_π° এবং V° হলো যথাক্রমে একটি রেফারেন্স মানের, যেমন পূর্ণ রসস্ফীতি অথবা শূন্য রসস্ফীতি, অসমোটিক পটেনশিয়াল এবং অসমোটিক আয়তন। ৬.১ নং সমীকরণকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে :

$$\psi_\pi = \frac{\psi^{\circ}_\pi RWC^0}{RWC} \quad \text{.............................. (৬.২)}$$

এখানে RWC এবং RWC^0 হলো আপেক্ষিক পানির পরিমাণ যথাক্রমে যে অবস্থায় কোষের ψ_π পরিমাপ করা হয় এবং রেফারেন্স রসস্ফীতি অবস্থায়।

এটি প্রতীয়মান হয় যে, পানির পটেনশিয়াল বেশি হলে, যে কোষের অসমোটিক পটেনশিয়াল কম তার রসস্ফীতি পটেনশিয়াল বেশি হবে এবং কোষের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন না হলে এবং আপেক্ষিক পানির পরিমাণ কম হলে, রসস্ফীতি পটেনশিয়াল শূন্য হবে। সুতরাং কোষে পানির পরিমাণ কম হলে, নিম্ন অসমোটিক পটেনশিয়ালের জন্য ধনাত্মক রসস্ফীতি বজায় থাকে এবং কতকগুলো প্রজাতিতে শুষ্কতা সহ্য করার (drought tolerance) এটিই ভিত্তি।

পানি সরবরাহ কম হলে কোনো কোনো উদ্ভিদ তাদের কোষের অসমোটিক পটেনশিয়াল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একে অসমোটিক সমন্বয় সাধন বা অসমো–নিয়ন্ত্রণ (osmo-regulation)

অথবা রসস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ (turgor regulation) বলে। যদিও খনিজ মৌলের পীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উদ্ভিদের অসমোটিক পটেনশিয়াল কমানোর ক্ষমতা সম্পর্কে অনেকদিন আগেই জানা গেছে, পানি ঘাটতির জন্য উদ্ভিদের অসমোটিক পটেনশিয়াল কমানোর ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য অপেক্ষাকৃত নতুন। সকল প্রজাতি কিংবা জাতের অসমোটিক সমন্বয় সাধন হয় না, এর মাত্রার ভিন্নতা হয় এবং এটি দ্রুত পরিবর্তনশীল, কিন্তু শুষ্কতা সহিষ্ণুতায় এর গুরুত্ব সুস্পষ্ট। পাতার পানির নিম্ন পটেনশিয়ালেও ধনাত্মক রসস্ফীতি বজায় রাখতে নিম্ন অসমোটিক পটেনশিয়াল সক্ষম। সুতরাং দ্রব জমা হওয়ার জন্য নিম্ন পানির পটেনশিয়ালেও ধনাত্মক রসস্ফীতি বজায় থাকে। প্রজাতি এবং পানি ঘাটতির মাত্রা অনুযায়ী অসমোটিক সমন্বয়ের জন্য আংশিক অথবা পূর্ণ রসস্ফীতি বজায় থাকে।

অনেকগুলো যৌগ অসমোটিক সমন্বয়সাধনে অংশগ্রহণ করে ; বিভিন্ন প্রজাতিতে এর বিভিন্নতা দেখা যায়। শস্য উদ্ভিদে এরকম প্রধান প্রধান যৌগ হলো দ্রবণীয় চিনি, কার্বোক্সিলিক এসিড, পটাশিয়াম, ক্লোরিন, অ্যামাইনো এসিড, বিশেষ করে প্রোলিন। গম উদ্ভিদের শীর্ষে এবং প্রসারণশীল পাতায় চিনি, পটাশিয়াম ও অ্যামাইনো এসিড শতকরা ৬০ থেকে ১০০ ভাগ অসমোটিক সমন্বয় সাধন ঘটায় ও সরগাম এবং সূর্যমুখীর পাতায় শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ অসমোটিক সমন্বয় সাধন ঘটায় চিনি, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, অ্যামাইনো এসিড, ক্লোরিন, নাইট্রেট এবং কার্বোক্সিলিক এসিড।

হরমোনের ভূমিকা (Role of Phytohormones)

উদ্ভিদে পানি ঘাটতি হলে কতকগুলো হরমোনের মাত্রার পরিবর্তন হয় (Hsiao, 1973 ; Davies *et al.*, 1986) ; তবে পানি ঘাটতি হলে অন্তঃস্থ অ্যাবসিসিক এসিডের (ABA) মাত্রা কয়েক গুণ বেড়ে যায় (Wright and Hiron, 1969) এবং অ্যাবসিসিক এসিড পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে এবং প্রস্বেদন হ্রাস করে (Raschke, 1975 ; Mans field, 1976)। এটি জানার পর পীড়ন হরমোন হিসেবে অ্যাবসিসিক এসিডের উপর অনেক গবেষণা হয়েছে। Zabadal (1974), Beardsell এবং Cohen (1975), Pierce এবং Raschke (1980) লেখিয়েছেন যে, পাতার পানির পটেনশিয়াল একটি থ্রেশহোল্ড মাত্রায় না পৌঁছানো পর্যন্ত পাতার অ্যাবসিসিক এসিডের পরিমাণ অপরিবর্তিত ছিল, বিভিন্ন প্রজাতিতে এই থ্রেসহোল্ড মাত্রা বিভিন্ন এবং এর পর পানির পটেনশিয়াল আর কমে গেলে অ্যাবসিসিক এসিডের পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। যে পানির পটেনশিয়ালে অ্যাবসিসিক এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তা হলো শূন্য রসস্ফীতি চাপ। অন্যান্য পরীক্ষায় ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, রসস্ফীতির হ্রাসের সাথে সাথে অ্যাবসিসিক এসিড সরলরৈখিকভাবে বৃদ্ধি পায় (Henson, 1983 ; 1985) । এসব ফলাফল নির্দেশ করে যে, অ্যাবসিসিক এসিডের পরিমাণের সাথে পত্ররন্ধ্রের পরিবাহকতার সম্পর্ক আছে। তবে Raschke (1983) উল্লেখ করেছেন যে, পত্ররন্ধ্র করতে প্রতি বর্গমিলিমিটার পাতার ক্ষেত্রফলে ১×১০^{-১৫} মোলের চেয়ে ও কম অ্যাবসিসিক এসিডের প্রয়োজন যা কোষের অন্তঃস্থ মাত্রার চেয়েও কম। এটি ধারণা করা হয় যে, পাতার মেসোফিল কলায় প্রধানত অ্যাবসিসিক এসিড সংশ্লেষণ হয় এবং ক্লোরোপ্লাস্টের অম্লকরণের জন্য অ্যাবসিসিক এসিড মুক্ত হয় এবং অ্যাপোপ্লাস্টের মাধ্যমে এপিডার্মিসে পৌঁছায়। Hartung *et al.* (1983) দেখিয়াছেন যে, রসস্ফীতি নয়, আয়তনের পরিবর্তনের জন্য অ্যাবসিসিক এসিড মুক্ত হওয়া প্ররোচিত হয়েছিল, কিন্তু Ackerson এবং Radin (1983) মত প্রকাশ করেন যে, কোষীয় সংকোচন এবং প্রসারণ অ্যাবসিসিক এসিডের সঞ্চয়কে উদ্দীপিত করে।

ইন্ডোল-৩-অ্যাসিটিক এসিড এবং সাইটোকাইনিনের মাত্রার জন্য পত্ররন্ধ্রের উপর অ্যাবসিসিকি এসিডের ক্রিয়ার পরিবর্তন হয় Snaith এবং Mansfield (1982) এবং Blackman

এবং Davies (1984) দেখিয়েছেন যে, অ্যাবসিসিক এসিড প্ররোচিত বন্ধ পত্ররন্ধ্র IAA এবং সাইটোকাইনিন (কাইনেটিন এবং জিয়াটিন) খুলে দেয়। উপরন্তু, অ্যাবসিসিক এসিড ও কাইনেটিনের পারস্পরিক ক্রিয়াকে পাতার নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের মাত্রা প্রভাবিত করে (Radin *et al.*, 1982 ; Rain, 1984)।

পানি ঘাটতির জন্য পাতার ঊর্ধ্বপৃষ্ঠ (adaxial) এবং নিম্নপৃষ্ঠের (abaxial) পত্ররন্ধ্রের প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য (Pemadasa, 1982 ; Turner and Singh, 1984), পত্ররন্ধ্রীয় পরিবাহকতা এবং পত্ররন্ধ্রের রন্ধ্র যে সবসময় সরলভাবে পাতার অ্যাবসিসিক এসিডের মাত্রার সাথে সম্পর্কিত নয় তা ব্যাখ্যা করতে বিভিন্ন উদ্ভিদ হরমোন এবং পাতার আয়নের মাত্রার মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া সাহায্য করে।

অ্যাবসিসিক এসিড পাতার বৃদ্ধি ও কোষের আকার হ্রাস করে (Quarrie and Jones, 1977 ; Hall and Mcwha, 1981 ; Van Volkenburgh and Davies, 1983), যদিও Hall এবং Mcwha (1981) লক্ষ্য করেন যে, গমের পাতার মোট ক্ষেত্রফলের উপর এর প্রভাব নেই, কারণ এর জন্য পাতার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ক্ষুদ্র পাতার বার্ধক্যপ্রাপ্তি বিলম্বিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, Morgan (1984) প্রস্তাব করেছেন যে, পূর্ণ প্রসারিত কলা থেকে, যা রসস্ফীতি হারায়, ভাজক অঞ্চলে অ্যাবসিসিক এসিড স্থানান্তরের জন্য রসস্ফীতি না হারানো সত্ত্বেও) বর্ধনশীল পাতার প্রসারণের হার এবং রসস্ফীতির মধ্যে সম্পর্কহীনতা ঘটতে পারে। পূর্ণ প্রসারিত কলার রসস্ফীতি এবং বর্ধনশীল কলার প্রসারণের হারের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক এর জন্য হতে পারে (চিত্র ৬.১)। নিম্নোক্ত পরীক্ষার ফলাফল থেকে এই প্রকল্পের সমর্থন পাওয়া যায়। পানি ঘাটতির জন্য রসস্ফীতি হারিয়ে পাতায় যে অ্যাবসিসিক এসিড তৈরি তা পুষ্পায়নের সময় গমের মঞ্জরীতে (head) জমা হয় এবং মঞ্জরী রসস্ফীতি না হারালেও এর জন্য পুংরেণু বন্ধ্যা এবং বীজ উৎপাদন কমে যায় (Morgan and king, 1984)। অ্যাবসিসিক এসিড সালোকসংশ্লেষণের হারকে কমিয়ে দেয় (Raschke and Hedrich, 1985), মূলে পানির ফ্লাক্স বৃদ্ধি করে এবং দানাশস্যের মঞ্জরীর উদ্ভব এবং পুষ্পায়নকে ত্বরান্বিত করে (Hall and Mcwha, 1981)।

পাতার মেসোফিল কলা ছাড়াও, মূলে অ্যাবসিসিক এসিড সংশ্লেষিত হয়। এটি যদি প্রস্বেদন প্রবাহের সাথে চলাচল করে, তাহলে মূল এবং বিটপের মধ্যে আদান-প্রদানকারী হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাপারে এখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। Davies এবং তাঁর সহকর্মীরা (1986) দেখিয়েছেন যে, ভুট্টার মূলতন্ত্রের কিছু অংশে পানি ঘাটতি হলে (একটি উদ্ভিদের মূলতন্ত্রকে দুভাগ করে দুটি পটে জন্মানো হয়, একটি পটে পানি দেয়া হয় এবং অপর পটে পানি দেয়া হয় না), পাতার রসস্ফীতি এবং অ্যাবসিসিক এসিডের মাত্রা না কমেও পত্ররন্ধ্রের প্রতিবন্ধকতা হ্রাস পায়। তবে, বাইরে থেকে সাইটোকাইনিন প্রয়োগ করলে পত্ররন্ধ্র খুলে যায়। এরা মন্তব্য করেন যে, অ্যাবসিসিক এসিডের ক্রিয়ার পত্ররন্ধ্র যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য মূলে সাইটোকাইনিন তৈরি এবং বিটপে এর স্থানান্তর প্রয়োজন এবং মৃত্তিকায় পানি ঘাটতির জন্য সাইটোকাইনিন তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। তখন পত্ররন্ধ্রীয় পরিবাহকতার উপর দুটি হরমোনের অসম প্রভাবের জন্য পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়। উপরন্তু Hubick এবং তাঁর সহকর্মীরা (1985) লক্ষ্য করেছেন যে, পানি ঘাটতি হলে সূর্যমুখীর মূল ও বিটপ উভয়েতেই অ্যাবসিসিক এসিড সঞ্চয় হয়। বিটপে সাইটোকাইনিনের মাত্রা কমে যায়, মূলে সাইটোকাইনিন তৈরি হ্রাস পাওয়ায় এটি ঘটে না, মূলে সংযুক্ত (bound) সাইটোকাইনিন বেড়ে যাওয়ায় এটি ঘটে। এই ফলাফল এটিই নির্দেশ করে যে, মৃত্তিকায় পানি ঘাটতি হলে মূল ও পাতার সাইটোকাইনিন এবং অ্যাবসিসিক এসিডের পারস্পরিক ক্রিয়া উদ্ভিদে গ্যাস বিনিময় এবং পত্ররন্ধ্রের আচরণকে প্রভাবিত করে।

আত্তীকারী দ্রব্য বিস্তার (Distribution of assimilates) : যে সমস্ত শস্যের অর্থনৈতিক ফলন হলো মোট ফলনের কিছু অংশ, তাদের ক্ষেত্রে আত্তীকারী দ্রব্য বিস্তারের উপর, অর্থাৎ ফলন–তৈরিকারী (yield Producing) অঙ্গে আত্তীকারী দ্রব্য স্থানান্তর, পানি ঘাটতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে। বর্তমানে এটি জানা গেছে যে, আত্তীকারী দ্রব্য স্থানান্তরের পথ, ফ্লোয়েম, পানি ঘাটতিতে খুব প্রতিরোধী। গম এবং *Lolium temelentum* এর আত্তীকারী দ্রব্য চলাচলের হার পানি ঘাটতি – ৩.০ মেগাপ্যাসকেল হলেও অপরিবর্তিত থাকে।

তা সত্ত্বেও, সাধারণভাবে আত্তীকারী দ্রব্য স্থানান্তর পানি ঘাটতির জন্য প্রভাবিত হয়, কারণ পানি ঘাটতির জন্য সালোকসংশ্লেষণের হার, সালোকসংশ্লেষণে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবহারের হার অথবা ফ্লোয়েমের বোঝাইকরণ এবং খালাসকরণ (loading and unloading) প্রভাবিত হয়। যেমন– গোল আলু এবং গমের দানা ভর্তির সময়, উৎস-পাতার সালোকসংশ্লেষণ হ্রাসের জন্য আত্তীকারী দ্রব্য পরিবহণ হ্রাস পায়।

শস্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে আত্তীকারী দ্রব্য প্রকৃত বিস্তারের উপর পানি ঘাটতির প্রভাব নির্ভর করে উদ্ভিদের বৃদ্ধির পর্যায়, পীড়নের মাত্রা। বিভিন্ন অঙ্গের পানি পীড়নে সংবেদনশীলতার মাত্রার উপর। যেমন– গমের দানা ভর্তির সময়, দানার বৃদ্ধির চেয়ে পাতার সালোকসংশ্লেষণ পানি ঘাটতিতে বেশি সংবেদনশীল এবং আত্তীকারী দ্রব্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্যানোপির নিচের পাতা, কান্ড, মূল ও ক্রাউন থেকে মঞ্জরীতে স্থানান্তরিত হয়।

অঙ্গজ অবস্থায় মূল পাতা ও কাণ্ডে সঞ্চিত আত্তীকারী দ্রব্য, পরবর্তী বৃদ্ধির জন্য আত্তীকারী দ্রব্য গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। পর্যাপ্ত পানি থাকলে, সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে নব্য তৈরি আত্তীকারী দ্রব্য জনন বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পানি ঘাটতির জন্য নব্য তৈরি আত্তীকারী দ্রব্য কম হওয়ায় সঞ্চিত আত্তীকারী দ্রব্য স্থানান্তর দানায় বেশি হয়। একটি পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, প্রকট পানি ঘাটতি অবস্থায় যব এবং গমের দানার কার্বোহাইড্রেটের দুই–তৃতীয়াংশ এসেছে দানা ভর্তির আগে তৈরি সঞ্চিত আত্তীকারী দ্রব্য থেকে।

পানি ব্যবহারে দক্ষতা (Water use efficiency)

পানি ব্যবহারে দক্ষতা(W) বলতে বোঝায়, যে দক্ষতায় পানি ব্যবহার করে শুষ্ক পদার্থ (D) তৈরি হয়,

অর্থাৎ $W = D/Tp$ .... (৬.৩) এক্ষেত্রে, Tp হলো প্রস্বেদনের হার।

শস্যের ক্যানোপির পাতায় সালোকসংশ্লেষণের জন্য বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রবেশের সময় প্রস্বেদনের মাধ্যমে শস্য পানিও হারায়, কারণ যে পথে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রবেশ করে সে পথেই জলীয় বাষ্প বের হয় (পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে)। কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্রহণ এবং পানি ত্যাগের প্রকৃত হার নির্ভর করে পাতার অভ্যন্তরে এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই–অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পের গ্রেডিয়েন্ট এবং ব্যাপন রোধকের উপর।

সুতরাং, $T_p = \frac{\Delta e}{r_a + r_s}$ ..... (৬.৪) এবং

সালোকসংশ্লেষণের হার (P_n) হলো,

$$P_n = \frac{\Delta c'}{r_a + r_s + r_m} \quad \text{..... (৬.৫)}$$

এক্ষেত্রে, Δeএবং Δc হলো বায়ুমণ্ডল এবং পাতার অভ্যন্তরে যথাক্রমে জলীয় বাষ্প এবং কার্বণ ডাই অক্সাইডের ঘনমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট, r_aএবং r_s হলো জলীয় বাষ্পের ব্যাপনের বাউন্ডারি স্তর এবং পত্ররন্ধ্রীয় রোধক এবং r'_a, r'_s হলো অনুরূপ কার্বন ডাই–অক্সাইড ব্যাপনের রোধক এবং r'_m হলো মেসোফিল রোধক, যাতে

আন্তঃকোষীয় বায়ুপ্রকোষ্ঠ এবং ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপনের সকল রোধক অন্তর্ভুক্ত আছে। $r_a' = ১.৬\ r_a$ এবং $r_s' = ১.৬r_s$, কার্বন ডাই–অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পের ব্যাপনের পার্থক্যের জন্য এটি হয়।

$$\text{তাই একক পাতার জন্য, } W = \frac{\Delta c(r_a+r_s)}{\Delta c\ (r_a'+r_s'+r_m)} \text{.............. (৬.৬)}$$

একক পাতার ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ উপযোগী, কারণ পানি ব্যবহারে দক্ষতার উপর পরিবেশ এবং উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য উভয়েরই গুরুত্ব বিবেচনা করা হয়।

শস্য পর্যায়ে পানি ব্যবহারে দক্ষতা হলো, প্রতি একক ব্যবহৃত পানির সাথে মোট শুষ্ক পদার্থ অথবা অর্থনৈতিক ফলনের অনুপাত। মাঠ পর্যায়ে মূল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বলে ভূ–পৃষ্ঠের উপরের শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতেই পানি ব্যবহার দক্ষতা নিরূপণ করা হয়। অপর একটি সমস্যা হলো মৃত্তিকা থেকে বাষ্পীভবনের জন্যও কিছু পানি নষ্ট এবং মাঠ পর্যায়ে মৃত্তিকার বাষ্পীভবন নির্ণয় খুব কঠিন। তাই প্রতি একক প্রস্বেদনে যে শুষ্ক পদার্থ তৈরি হয়, তাকে প্রস্বেদনীয় দক্ষতা (transpirational efficiency) এবং প্রতি একক বাষ্পীয় প্রস্বেদনের জন্য যে শুষ্ক পদার্থ তৈরি হয়, তাকে বলে পানি ব্যবহারে দক্ষতা।

পাতা পর্যায়ে কতকগুলো পরিবেশীয় এবং উদ্ভিদ প্রকরণ প্রস্বেদনীয় দক্ষতাকে প্রভাবিত করে। প্রধান পরিবেশীয় প্রকরণ হলো বায়ুর আর্দ্রতা। পাতার চারদিকের বায়ুর বাষ্প চাপের ঘাটতি বেশি হলে প্রস্বেদন বেশি হয়, কিন্তু সালোকসংশ্লেষণ বেশি হয় না, তাই প্রস্বেদনীয় দক্ষতা হ্রাস পায়। বাষ্প চাপের ঘাটতির উপর তাপমাত্রার প্রভাব থাকায় উচ্চ তাপমাত্রা প্রস্বেদনীয় দক্ষতা হ্রাস করে এবং সর্বোচ্চ প্রস্বেদনীয় দক্ষতার জন্য সর্বোত্তম সৌরবিকিরণ আছে। অন্তঃস্থ রোধক কম এবং বাউন্ডারি স্তররোধক বেশি এমন অবস্থা ব্যতীত পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকলে প্রস্বেদনীয় দক্ষতা বাড়বে। পত্ররন্ধ্র বন্ধকরণের মাধ্যমে পানি ঘাটতি প্রস্বেদনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু সেই সাথে কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্রহণে অন্তঃস্থ রোধক বেশি হওয়ায় এই দক্ষতা কমে যায়, তাই পানি ঘাটতি হলে প্রস্বেদনীয় দক্ষতা খুব সামান্যই বাড়ে।

এটি জানা গেছে যে, কার্বন ব্যবহারের অন্তঃস্থ কৌশলের উদ্ভিদের প্রস্বেদনীয় দক্ষতার উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে। CAM উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র রাতে খোলা থাকে, যখন বাষ্প চাপের ঘাটতি কম, এবং দিনে পত্ররন্ধ্র বন্ধ অবস্থায় কার্বন আত্তীকরণ হয়। এর জন্য এদের প্রস্বেদনীয় দক্ষতা খুব বেশি ; *Agave*-এ প্রতি গ্রাম পানির জন্য ০.০৫ গ্রাম কার্বন ডাই–অক্সাইড আত্তীকরণের মতো উচ্চমান পাওয়া গেছে। C_4 উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি, কারণ C_3 উদ্ভিদের তুলনায় এদের অন্তঃস্থ রোধক অর্ধেক বা এর চেয়েও কম এবং C_3 উদ্ভিদের তুলনায় এদের পত্ররন্ধ্রীয় রোধক বেশি। ফলে C_4 উদ্ভিদের দক্ষতা C_3 উদ্ভিদের প্রায় দ্বিগুণ (Rawson e tal., 1977)।

শস্য পর্যায়ে প্রস্বেদনীয় দক্ষতা কেবল পাতার প্রস্বেদনীয় দক্ষতার উপর নির্ভর করে না, সেই সাথে মৃত্তিকা থেকে বাষ্পীভবন এবং প্রতি একক ব্যবহৃত পানিতে যাতে ফলন সর্বোত্তম হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। সর্বোত্তম ফলন নির্ভর করে কতকগুলো কৃষিতাত্ত্বিক প্রকরণের উপর। যেমন, বপনের সময়, প্রাথমিক বৃদ্ধি সারের ব্যবহার এবং রোগবালাই, আগাছা এবং জলাবদ্ধতার জন্য ফলন হ্রাস পায়। সেই সাথে যদি বৃষ্টিপাতের দক্ষতা সর্বোত্তম করতে হয়, তাহলে গড়িয়ে যাওয়া (run off) এবং গভীর অনুস্রবণ (deep percolation) কমাতে হবে।

পানি ঘাটতির অভিযোজন (Adaptation to water Deficits)

পানি ঘাটতি এলাকায় কোনো শস্যের সন্তোষজনকভাবে জন্মানোর ক্ষমতাকে শুষ্কতা প্রতিরোধ (drought resistance) বলে। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে কোনো শস্যের ভালভাবে টিকে থাকা এবং জননের জন্য গঠনগত এবং কার্যাবলীর যেসব পরিবর্তন হয় তাকে বলে অভিযোজন (kramer, 1980)। Begg এবং Turner (1976) পানি ঘাটতির অভিযোজনের কৌশলকে অঙ্গসংস্থানিক এবং শারীরতাত্ত্বিক এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। পরবর্তীকালে Turner (1979) এই কৌশলকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন :

১. **শুষ্কতা এড়ানো** (Drought escape) : মৃত্তিকা এবং উদ্ভিদের পানি ঘাটতির পূর্বেই শস্য উদ্ভিদের জীবন চক্র সম্পূর্ণ করার ক্ষমতা।

২. **উদ্ভিদ কলায় নিম্ন পানির পটেনশিয়ালসহ শুষ্কতা সহিষ্ণুতা** (Drought tolerance with low tissue water potential) : উদ্ভিদ কলায় নিম্ন পানির পটেনশিয়াল বজায় রেখে তাৎপর্যপূর্ণ বৃষ্টিপাতহীন সময়ে টিকে থাকার ক্ষমতা (অর্থাৎ পানিবিয়োজন সহিষ্ণু)।

৩. **উদ্ভিদ কলায় উচ্চ পানির পটেনশিয়ালসহ শুষ্কতা সহিষ্ণুতা** (Drought tolerance with high tissne water potential) : উদ্ভিদের কলায় উচ্চ পানির পটেনশিয়াল বজায় রেখে তাৎপর্যপূর্ণ বৃষ্টিহীন সময়ে টিকে থাকার ক্ষমতা (অর্থাৎ পানি বিয়োজন স্থগিত রাখে)। প্রত্যেক প্রকারের কৌশল ৬.১ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ৬.১ : শুষ্কতা সহিষ্ণুতার কৌশল। Turner (1979) থেকে গৃহীত।

শুষ্কতা এড়ানো
(ক) দ্রুত ফিনোলজিক্যাল (phenological) বিকাশ
(খ) বিকাশশীল প্লাস্টিসিটি

নিম্ন পানির পটেনশিয়ালসহ শুষ্কতা সহিষ্ণুতা
(ক) রসস্ফীতি বজায় রাখা
  ১. অসমোটিক সমন্বয়সাধন
  ২. ইলাসটিসিটি বৃদ্ধি
  ৩. কোষের আকার হ্রাস
(খ) পানিবিয়োজন সহিষ্ণুতা
  ১. প্রোটোপ্লাজমীয় সহিষ্ণুতা
  ২. কোষ প্রাচীরের ধর্মাবলী

উচ্চ পানির পটেনশিয়ালসহ শুষ্কতা সহিষ্ণুতা
(ক) পানি হারানো কমানো
  ১. পত্ররন্ধ্রীয় এবং কিউটিকুলার রোধক বৃদ্ধি
  ২. সৌরবিকিরণের শোষণ হ্রাস
  ৩. পাতার ক্ষেত্রফল হ্রাস
(খ) পানি পরিশোষণ বজায় রাখা
  ১. মূলের ঘনত্ব এবং গভীরতা বৃদ্ধি
  ২. হাইড্রোলিক পরিবাহিতা বৃদ্ধি

শুষ্কতা এড়ানো (Drought escape) : শুষ্কতা এড়ানো এবং সন্তোষজনক ফলনের জন্য শস্য উদ্ভিদের যে দুটি বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ তা হলো দ্রুত ফিনোলজিক্যাল বিকাশ এবং বিকাশশীল প্লাস্টিসিটি। যেখানে শস্যের জীবনকালে শুষ্কতার সম্ভাবনা বেশি, সেক্ষেত্রে শস্যের জীবনকালের সময় কম হলে অধিকাংশ বছরেই ভাল ফলন হয়। তবে শস্যের জীবনকাল খুব কম হলেও ফলন কমে যায়। উপরন্তু, নিয়ত (determinate) শস্যে, ফলন এবং পরুতাপ্রাপ্তির সময়ের একটি সাধারণ সম্পর্ক আছে, তাই স্বল্প সময়ে যে শস্য পক্ব হয় তার ফলন সাধারণত কম। যে বছরে বৃষ্টিপাত ভাল হয়, সে বছরে সেসব শস্যের ফিনোলজিক্যাল বিকাশ খুব দ্রুত হয় তাদের ফলন কম হয়।

বিকাশশীল প্লাস্টিসিটি এই অসুবিধা দূর করতে সাহায্য করে। অনুকূল পরিবেশে অধিকাংশ শস্যের কিছু পরিমাণ বিকাশশীল প্লাস্টিসিটি থাকে। যেমন– পানি ঘাটতির তুলনায় পানি ঘাটতি না হলে গমের পুষ্পায়ন এবং শারীরবৃত্তীয় পরুতার (physiological naturity) সময় প্রলম্বিত হয়, মঞ্জরী বহনকারী কুশির সংখ্যা বেড়ে যায়। প্রতি মঞ্জরীতে স্পাইকলেট এবং ফ্লোরেটের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং সেই সাথে দানার আকার বাড়ে। উপরন্তু, বিকাশশীল প্লাস্টিসিটির আরেকটি দিক হলো যে, পানি ঘাটতি হলে কতকগুলো শস্য, যেমন গম ও যবের বর্তমান সালোকসংশ্লেষণ কমে যাওয়ায় সঞ্চিত আণ্ডীকারী দ্রব্য ক্ষতিপূরণ করে। যদিও বিকাশশীল প্লাস্টিসিটি নিয়ত শস্যে থাকতে পারে, তবে অনিয়ত শস্যেই এটি বেশি হয়, অর্থাৎ অন্য কোনো বাধা না থাকলে যতোক্ষণ পর্যন্ত পানি পায় ততক্ষণ পর্যন্ত এদের পুষ্পায়ন এবং বীজ তৈরি হয়। যান্ত্রিক উপায়ে শস্য সংগ্রহের সুবিধার্থে অনিয়ত শস্যের অধিকতর নিয়ত হওয়ার দিকে বাছাই করার জন্য বর্তমানে জোর দেয়া হচ্ছে। কিন্তু পানি ঘাটতি পরিবেশের জন্য অধিক নিয়ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, বরঞ্চ যান্ত্রিক উপায়ে শস্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, যেমন– বীজ ফেটে যাওয়া (shattering) প্রতিরোধিতা বাছাই করা অধিক যুক্তিসংগত।

শুষ্কতা এড়ানোর বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে আগামতা (earliness) প্রথমত, বর্তমানকাল পর্যন্ত শুষ্কতা প্রতিরোধীতা উদ্ভাবনে উদ্ভিদ প্রজননের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তথাপিও অধিক শুষ্ক অঞ্চলে অথবা এমনকি নাতিশীতোষ্ণ এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের শস্য শুষ্কতার কবলে পড়ে; তাই শস্যের শুষ্কতা সহিষ্ণু বৈশিষ্ট্য থাকা সুবিধাজনক।

নিম্ন পানির পটেনশিয়ালসহ শুষ্কতা সহিষ্ণুতা (Drought tolerance with Low Tissue water Potential)

(পানিবিয়োজন সহিষ্ণু) (Dehydration tolerance) : পানি বিয়োজন সহিষ্ণুতার দুটি প্রধান কৌশল হলো কোষের রসস্ফীতি বজায় রাখা এবং পানি বিয়োজন সহ্য করা (সারণি ৬.১)। শস্য উদ্ভিদের অনেক প্রাণরাসায়নিক, শারীরতাত্ত্বিক এবং অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য পাতার রসস্ফীতিতে সংবেদনশীল। তাই, পাতার পানির পটেনশিয়াল কমে গেলে, উদ্ভিদের শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া চালানোর জন্য কোষের রসস্ফীতি বজায় রাখা অত্যাবশ্যকীয়। রসস্ফীতি বজায় রাখার প্রধান কৌশল হলো অসমোটিক সমন্বয় সাধন, অর্থাৎ পানি ঘাটতি হলে দ্রব জমা করা, এতে অসমোটিক পটেনশিয়াল কমে যায়, তাই কোষের রসস্ফীতি চাপ বেড়ে যায়। অনেক শস্য উদ্ভিদের বিপক্ষে অসমোটিক সমন্বয় সাধন দেখা গেছে এবং এর জন্য পাতার নিম্ন পানির পটেনশিয়ালে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে ও সালোকসংশ্লেষণ সংঘটিত হয় এবং পাতার গুটানো (rolling) এবং মৃত্যু খুব কম পানির পটেনশিয়াল না হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। অসমোটিক সমন্বয় সাধনের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্ণ রসস্ফীতি দেখা গেছে, কিন্তু সবক্ষেত্রেই পূর্ণ রসস্ফীতি বজায় রাখার মাত্রার একটি

সীমা আছে। এটি এবং পাতার রসস্ফীতি বজায় থাকা সত্ত্বেও পত্ররন্ধ্রের পরিবাহকতা এবং সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যাওয়া নির্দেশ করে যে, মৃত্তিকার কম পানি বিটগের রসস্ফীতিকে বাতিল করে দেয়। মৃত্তিকার পানির ক্রমহ্রাসমান অবস্থায় যদি মূলেও অসমোটিক সমন্বয় সাধন হয়, কেবল তখনই বিটপের বৃদ্ধি বজায় রাখতে অসমোটিক সমন্বয়সাধন কার্যকর।

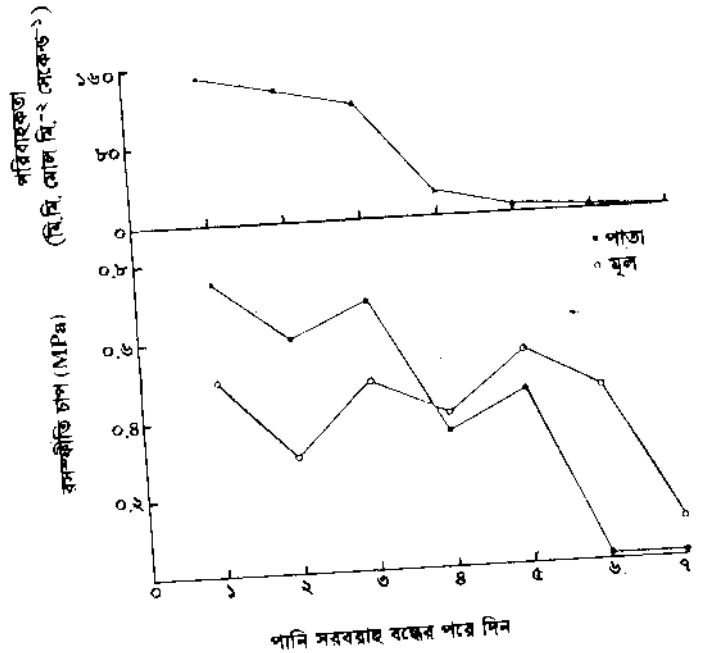

চিত্র ৬.২ : পানি সরবরাহ বন্ধের পর ভুট্টার পাতার পরিবাহকতা (▲) এবং পাতা (●) ও মূলের (○) রসস্ফীতি চাপের পরিবর্তন।

মটরের মূলে অসমোটিক সমন্বয় সাধন হয় (Greacen and Oh, 1972) এবং পানি ঘাটতির জন্য ভুট্টার পাতার তুলনায় মূলে কম পানির পটেনশিয়াল পাওয়া গেছে (Sharp and Davies, 1979)। যেহেতু পূর্ণ রসস্ফীতি অবস্থায় ভুট্টার অবস্থায় ভুট্টার অসমোটিক পটেনশিয়াল পরিমাপ করা হয়নি, পাতা ও মূলের অসমোটিক পটেনশিয়ালের পার্থক্য হতে পারে দু'প্রকার কোষের স্থিতি স্থাপকতার (elasticity) পার্থক্যের কারণে। তবে ৬.২নং চিত্রে দেখা যায় যে, শুকানো চক্রে (drying cycle) পাতার রসস্ফীতি চাপের তুলনায় মূলের রসস্ফীতি চাপ বেশি সময় বজায় থাকে। লিউপিন (lupin) নিয়ে বর্তমানের গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, পূর্ণ রসস্ফীতিতে অসমোটিক পটেনশিয়াল মূলের তুলনায় বেশি। *Lupinus angustifolius* ব্যতীত, পাতার তুলনায়, মূলের অসমোটিক সমন্বয় সাধন নগণ্য (সারণি ৬.২)। সম্পূর্ণ মূলের তুলনায়, মূলের বর্ধনশীল অগ্রভাগের অসমোটিক সমন্বয় সাধন বেশি, কারণ মূলের বৃদ্ধির (ভৌত বাঁধা অতিক্রম

করার জন্য, যা মৃত্তিকার পানির পরিমাণ হ্রাসের সাথে বৃদ্ধি পায়, মূলের অগ্রভাগকে চাপ প্রয়োগ করতে হয় (Greacen and oh, 1972)। পত্ররন্ধ্রীয় পরিবাহকতা এবং সালোকসংশ্লেষণ ও প্রস্বেদনের হারের উপর কোনো প্রভাব ছাড়াই, মৃত্তিকার দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত লভ্য পানিশোষণ করা যেতে পারে (Burch *et al.*, 1974)এবং মৃত্তিকার উপরের স্তর থেকে প্রথমে পানি পরিশোষিত হয়, এই দুটি পর্যবেক্ষণ জোরালোভাবে নির্দেশ করে যে, মৃত্তিকার প্রোফাইলের নিম্নাংশের মূলের বর্ধনশীল অগ্রভাগ প্রথমে মৃত্তিকার পানি ঘাটতি অনুভব করে (sensors)। সুতরাং বিটপের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের সমতা বজায় রাখতে ফুলের অগ্রভাগের অসমোটিক সমন্বয় সাধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পানিবিয়োজন সহিষ্ণুতা : পানি বিয়োজন সহিষ্ণুতা আণবিক পর্যায়ে ঘটে এবং ঝিল্লীর (membrane) গঠন ও এনজাইমের ক্রিয়ার উপর এক নির্ভর করে। Gaff (1980) এর মতে, এটি নির্ভর করে ভৌত ক্ষতি থেকে কোষের প্রতিরোধের ক্ষমতা, ঝিল্লীর ক্ষতি প্রতিরোধের ক্ষমতা এবং ঝিল্লী ও সাইটোপ্লাজমের প্রোটিন নষ্ট হওয়া প্রতিরোধের ক্ষমতার উপর। অসমোটিরক সমন্বয় সাধন উদ্ভিদের পানিবিয়োজন সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করে (Blum and Ebercon, 1981)। সারণি ৬.২-এ চারটি লিউপিন *(Lupinus)* প্রজাতির পাতা ও মূলের পূর্ণ রসস্ফীতি অবস্থায় অসমোটিক পটেনশিয়াল, যা পর্যাপ্ত পানিতে এবং প্রভাত-পূর্ব (predawn) পাতার পটেনশিয়াল -১.৫ মেগাপ্যাসকেলে থাকে এমন পানিতে রাখা হয়েছিল।

প্রজাতি	পূর্ণ রসস্ফীতিতে অসমোটিক পটেনশিয়াল (মেগাপ্যাসকেল)	অসমোটিক সমন্বয় সাধন (মেগাপ্যাসকেল)		পূর্ণ রসস্ফীতিতে অসমোটিক পটেনশিয়াল (মেগাপ্যাসকেল)	অসমাটিক সমন্বয় সাধন (মোগপ্যাসকেল)	
	পানি ঘাটতি পাতা	পানিযুক্ত পাতা-		পানি ঘাটতি মূল	পানিযুক্ত মূল	
L. atlanticus	- ১.০৬	- ০.৬৪	০.৪২	- ০.৩৬	০.৩৫	০.০১
L. pilosus	- ১.২২	- ০.৭৪	০.৪৮	- ০.৪০	- ০.৪২	- ০.০২
L. luteus	-০.৯৩	- ০.৭৮	০.১৫	- ০.৩৬	- ০.৩২	০.০৪
L. angustifolius	- ১.০৮	- ০.৯৪	০.১৪	- ০.৫৪	- ০.৩৮	০.১৬

H'siao এবং তাঁর সহকর্মীরা (1984) এটি খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন ; তাঁরা দেখিয়েছেন যে, পাতার সকল পানির পটেনশিয়ালেই ধানের পাতার মৃত্যুর শতকরা হার হ্রাসের সাথে প্রায় ০.৫ মেগাপ্যাসকেল অসমোটিক সমন্বয়সাধন সম্পর্কযুক্ত। শুষ্ক বায়ুমণ্ডলে থাকার জন্য মূলের তুলনায় বিটপ প্রকট পানিবিয়োজন পরিবেশে থাকে, ঝিল্লীর অখন্ডতা রক্ষা করতে এবং শুষ্ক পরিবেশে টিকে থাকার জন্য বিটপ এবং পাতার অসমোটিক সমন্বয় সাধনের কিছু তাৎপর্য আছে।

Turner (1979) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, শস্য উদ্ভিদে পানিবিয়োজন স্থগিতকরণের তুলনায় পানিবিয়োজন সহিষ্ণুতার উপর কম গুরুত্ব দেয়া উচিৎ, কারণ শস্য উৎপাদনে টিকে থাকার তুলনায় শস্যের ফলনের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে যেখানে অনির্ধারিত পানি ঘাটতি হয়,

সেখানে ফলনের জন্য সালোকসংশ্লেষী কলা অথবা বর্ধিষ্ণু অগ্রভাগ টিকে থাকা প্রয়োজন এবং এগুলো সুস্পষ্টভাবে পানি বিয়োজন সহিষ্ণুতার কৌশলের গবেষণা।

উচ্চ পানির পটেনশিয়ালসহ শুষ্কতা সহিষ্ণুতা (Drought Tolerance with high Tissue Water potential) : পানি পরিশোষণ বৃদ্ধি করে অথবা পানি হারানো হ্রাস করে শস্য উদ্ভিদে পানিবিয়োজন স্থগিত করা যায় (সারণি ৬.১)।

পানি পরিশোষণ বৃদ্ধি (Increase of water absorption) : মূলের গভীরতা এবং ঘনত্ব বেশি হলে পানি পরিশোষণ বেশি হয়। যেহেতু নিম্ন পানির পটেনশিয়ালে অসমোটিক সমন্বয় সাধনের জন্য মূলের বৃদ্ধি বেশি হয়, তাই বেশি আয়তনের মৃত্তিকা থেকে পানি সংগৃহীত হয়। অবশ্য Jordan এবং তাঁর সহকর্মীরা (1983) মন্তব্য করেছেন যে, অসমোটিক সমন্বয় সাধনের জন্য কেবল অতিরিক্ত কয়েকদিন প্রস্বেদন এবং শারীরতাত্ত্বিক কার্যাদি চলে, তাই ফলনের উপর এর প্রভাব সামান্যই। McGowan এবং সহকর্মীরা (1984) মন্তব্য করেছেন যে, পাতার অসমোটিক সমন্বয়ের জন্য মাঠে জন্মানো গমের পানি পরিশোষণের উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে। যে বছর পাতার অসমোটিক সমন্বয় হয়েছিল তার তুলনায় যে বছর পাতার অসমোটিক সমন্বয় হয়নি সেই বছরে মূলের দৈর্ঘ্য বেশি এবং মৃত্তিকার অধিক গভীরতা থেকে পানি পরিশোষণ করলেনও, যে বছর পাতার অসমোটিক সমন্বয় হয়েছিল সে বছর মৃত্তিকা থেকে ২৫ মিলিমিটার অতিরিক্ত পানি পরিশোষিত হয়েছিল এবং অধিক সময় পাতার রসস্ফীতি বজায় ছিল।

মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদের পানি পরিশোষণের দ্বিতীয় নিয়ামক হলো পানি প্রবাহের হাইড্রোলিক রোধক। মৃত্তিকা এবং বিটপের মধ্যে নিম্ন হাইড্রোলিক রোধকের তুলনায়, উচ্চ হাইড্রোলিক রোধকের জন্য মূলের চেয়ে পাতায় অপেক্ষাকৃত কম পানির পটেনশিয়াল হয়। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে হাইড্রোলিক রোধকের পার্থক্য আছে এবং জাইলেমের ব্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে এর পরিবর্তন হয় (Richards and Passioura, 1981)। নিম্ন হাইড্রোলিক রোধক উদ্ভিদের তুলনায় উচ্চ হাইড্রোলিক রোধক উদ্ভিদ বায়বীয় পীড়নে অধিক এবং মৃত্তিকার পানি ঘাটতিতে কম সংবেদনশীল।

পানি হারানো হ্রাস (Reduction of water loss) : যে সমস্ত নিয়ামক, যেমন পত্ররন্ধ্রীয় পরিবাহকতা হ্রাস, পাতা গুটানো (rolling) এবং পাতার ক্ষেত্রফল কমানো, পানি হারানো হ্রাস করে পানিবিয়োজন স্থগিত রাখে তা আবার শস্যের ফলনকে হ্রাস করে (Turner, 1979)। দিনের সংকটকালীন সময়ে যখন বাষ্প চাপের ঘাটতি প্রকট থাকে, সে সময় পানি হারানো হ্রাস পায়, কিন্তু সকালে এবং বিকেলে যখন বাষ্প চাপের ঘাটতি কম, তখন সালোসংশ্লেষণ চলতে থাকে, তাই বাষ্প চাপের ঘাটতি পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি করে। দুপুর পত্ররন্ধ্র বন্ধ হওয়া, এবং পাতা মিইয়ে পড়া অথবা গুটিয়ে যাওয়ার জন্যও এরকম হয়। একইভাবে শস্য উদ্ভিদের জীবনকালের প্রথমের দিকে সালোকসংশ্লেষণ এবং পানি ব্যবহার কম হলে, পুষ্পায়নের পরবর্তী সময়ের জন্য পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ফলন বেশি হয়।

পানি হারানো হ্রাসের জন্য পত্ররন্ধ্র বন্ধ হওয়া একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা ; পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এটি অ্যাবসিসিক এসিড এবং সাইটোকাইনিন উভয়েরই নিয়ন্ত্রণে বলে মনে হয়। উপরন্তু, পাতার পানির পটেনশিয়ালের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে, বায়ুর বাষ্প চাপের ঘাটতি পত্ররন্ধ্রের পরিবাহকতার উপর প্রভাব আছে।

সংকটকালীন সময়ে দুপুরের দিকে পাতা গুটানোর জন্য পানি হারানো হ্রাস পায়। পাতার বুলিফরম (bulliform) কোষের রসস্ফীতির উপর পাতার গুটানোর মাত্রা নির্ভর করে।

সংকটকালীন সময়ে পানি হারানো হ্রাস হওয়ায় পাতার কলার পানিবিয়োজন স্থগিত হয় এবং মৃত্তিকার পানি ঘাটতিও কম হয়।

সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় পাতার চলন, অথবা পত্রপৃষ্ঠের রোম (pubescence) বৃদ্ধি অথবা পত্রপৃষ্ঠে মোমের বৃদ্ধিজনিত (waxiness) কারণে পাতা কর্তৃক সৌরবিকিরণ শোষণ হ্রাস হতে পারে। পানি ঘাটতির জন্য কতকগুলো শস্য উদ্ভিদের আপতিত সৌরবিকিরণের সমান্তরালে পাতার সক্রিয় চলন দেখা যায়। নিষ্ক্রিয় মিইয়ে পড়া অথবা পাতা গুটানোর জন্যও শস্য কর্তৃক সৌরবিকিরণ শোষণ কম হয়, এবং আনুভূমিক (horizontal) ও গুটায় না– এমন পাতার তুলনায় কম পানি হারায় ও পানি ব্যবহারে দক্ষতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। পানি ঘাটতির জন্য কোনো কোনো শস্য উদ্ভিদে পাতার রোমের এবং/অথবা মোমের আস্তরণ বেড়ে যায় এবং উভয় অভিযোজনের জন্যই পাতা থেকে সৌরবিকিরণের বেশি প্রতিফলন হয় ও পানি হারানো কম হয়।

পানি ঘাটতির একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব হলো শস্য উদ্ভিদের পাতার ক্ষেত্রফল হ্রাস পাওয়া এটি হয় পাতার প্রসারণ হ্রাস পাওয়ায় অথবা পাতার বার্ধক্যপ্রাপ্তি এবং মৃত্যু ত্বরান্বিত হওয়ার জন্য। পত্র ক্ষেত্রফল সূচক (Leaf Area Index বা LAI) ও এর কম হলে, এর হ্রাসের সাথে সাথে শস্যের প্রস্বেদনও হ্রাস পায়। সুতরাং শস্যের LAI কম হলে শস্যের প্রস্বেদন কমায়, মৃত্তিকার পানির ঘাটতি কমায় এবং পাতার পানির পটেনশিয়াল ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

অতিরিক্ত পানিজনিত পীড়ন বা জলাবদ্ধতা (Water logging)

শস্য উদ্ভিদ এবং পরিবেশের সাথে গ্যাসীয় বিনিময় এবং বৃদ্ধি ও বাষ্পীয় প্রস্বেদনের জন্য পর্যাপ্ত পানি প্রয়োজন। খুব বেশি অথবা খুব কম পানির জন্য উপরোক্ত প্রক্রিয়া বাহত হলে পীড়নের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে শস্যের ফলন হ্রাস পায়, এমন কি উদ্ভিদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অতিরিক্ত পানিজনিত পীড়ন (বন্যা অথবা জলাবদ্ধতা) বৃদ্ধি পায় এবং যখন শারীরতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয় গ্যাস মৃত্তিকায় জমা এবং জলাবদ্ধ মৃত্তিকা রাসায়নিকভাবে অতিরিক্ত বিজারিত হয়, এ অবস্থায় উদ্ভিদ ক্রমাগত শারীরতাত্ত্বিকভাবে খাপখাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। শুষ্ক পদার্থের বিনিময়ে উদ্ভিদে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটে (যেমন পত্ররন্ধ্র বন্ধ এবং পাতার অকালবার্ধক্য) যা পরবর্তী সময়ে শস্য উদ্ভিদের টিকে থাকা এবং ভাল ফলনের জন্য সহায়ক হয়। এগুলোকে বলে অ্যাকলিমেটিক (acclimatic) বা নতুন পরিবেশে অভ্যস্তকরণ প্রতিক্রিয়া।

দক্ষিণমেরু ব্যতীত পৃথিবীর সবঐই বন্যার কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত পানি সেচন, সেচনালা থেকে পানি চোয়ানো, ভূ-নিম্নস্থ অ্যাকুইফারে পানির চলাচল এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণকারী বাঁধের জন্যও সাময়িক জলাবদ্ধতায় সৃষ্টি হয়।

মৃত্তিকার উপর জলাবদ্ধতার প্রভাব (Effect of water logging on Soil)

(ক) ভৌত প্রভাব (Physical effects)

সাধারণত মৃত্তিকার আয়তনের শতকরা ১০ থেকে ৬০ ভাগ গ্যাস। ভাল গঠনের এবং সুনিষ্কাশিত মৃত্তিকার পানি ও কঠিন পদার্থের তুলনায় গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি। অক্সিজেন গ্রহণ, কার্বন ডাই–অক্সাইড তৈরি এবং মৃত্তিকার অণুজীব কর্তৃক ডাইনাইট্রোজেন (N_2) সংবন্ধন সত্ত্বেও সুনিষ্কাশিত মৃত্তিকার গ্যাসের গঠন মোটামুটি অপরিবর্তনশীল ; কারণ মৃত্তিকা এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দ্রুত গ্যাস বিনিময় হয়। কিন্তু মৃত্তিকার যদি গ্যাসীয় রন্ধ্রের মাত্রা শতকরা প্রায় ১০ ভাগে নেমে

আসে, তাহলে গ্যাসীয় ব্যাপন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বন্যা বা জলাবদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকার গ্যাসপূর্ণ রন্ধ্র কমিয়ে দেয়, এবং মৃত্তিকার উপরের বায়ুমণ্ডলের সাথে গ্যাস বিনিময়ের পরিবর্তে মৃত্তিকার পানিতে আণবিক ব্যাপন হয়। বায়ুর তুলনায় এই মৃত্তিকার পানিতে আণবিক ব্যাপন হয়। বায়ুর তুলনায় এই প্রক্রিয়া প্রায় $১০^{৪}$ গুণ মন্থর। তাই মৃত্তিকার অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং মৃত্তিকায় বিপাকের ফলে সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থ জমতে থাকে।

জলাবদ্ধতার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মূল এবং মৃত্তিকার অণুজীব পানির অথবা মৃত্তিকার অবশিষ্ট অক্সিজেন দ্রুত নিঃশেষ করে ফেলে, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই- অক্সাইড, মিথেন এবং হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে যায়। গ্যাসীয় পদার্থগুলো বুদবুদের আকারে নির্গত হয়। জলমগ্ন ধানক্ষেত থেকে একটি মৌসুমের বিভিন্ন সময়ে এই বুদবুদ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এগুলোর মাত্রার পরিবর্তন নিম্নলিখিতভাবে হয় : নাইট্রোজেন (১০ থেকে ৯৫%), মিথেন (১% থেকে ৭৫%), কার্বন ডাই–অক্সাইড (১ থেকে ২০%) এবং হাইড্রোজেন (০ থেকে ১০%)। জলাবদ্ধতার জন্য মৃত্তিকা কর্তৃক সৌরবিকিরণ শোষণ, মৃত্তিকার তাপধারণ ক্ষমতা ও তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় এবং মৃত্তিকার গঠনের ক্ষতি হয়।

(খ) তড়িৎরাসায়নিক পরিবর্তন (Electrochemical changes)

জলাবদ্ধ মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তড়িৎরাসায়নিক পরিবর্তন হয়। একটি প্রত্যক্ষ এবং অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তন হলো মৃত্তিকার দ্রবণ লঘু হওয়া। এর জন্য pH বেড়ে যায় এবং বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা (electrical conductivity বা EC) এবং রেডক্স (redox) পটেনশিয়াল হ্রাসপায়। অম্ল মৃত্তিকা জলাবদ্ধ হলে pH বেড়ে এবং ক্ষারীয় মৃত্তিকার বিপরীত অবস্থা হয়। আয়ন বিনিময় হলো মৃত্তিকার কলয়েডে ইলেকট্রোস্টাটিক আকর্ষণে লেগে থাকা ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের মৃত্তিকায় দ্রবণের আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপন; জলাবদ্ধতার প্রভাবে মৃত্তিকার বিজারণ হওয়ার জন্য আয়ন বিনিময় বিক্রিয়া প্রভাবিত হয়; মৃত্তিকার কলয়েডে বৈদ্যুতিক আধানের পরিবর্তন এবং অম্ল মৃত্তিকায় লৌহ (Fe^{2+}) এবং ম্যাঙ্গানিজ (Mn^{2+}), ক্ষারীয় মৃত্তিকায় ক্যালসিয়াম (Ca^{2+}) এবং উভয় প্রকার মৃত্তিকায় HCO_3^- বৃদ্ধির জন্য এটি ঘটে।

(গ) রাসায়নিক রূপান্তর (Chemical transformation)

জলাবদ্ধতার জন্য প্রধান প্রধান রাসায়নিক পরিবর্তন হলো অক্সিজেন নিঃশেষ হওয়া, কার্বন ডাই অক্সাইড জমা হওয়া, জৈব পদার্থের অবাত ভাঙন, ডাইনাইট্রোজেনের রূপান্তর এবং লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ এবং সালফেটের বিজারণ। জলাবদ্ধ মৃত্তিকার কর্ষণযোগ্য স্তরের প্রতি হেক্টরে তিন টন পর্যন্ত কার্বন ডাই- অক্সাইড জমতে পারে। কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড পানিতে দ্রবণীয় এবং রাসায়নিকভাবে সক্রিয়, এটি কার্বনিক এসিড এবং বাইকার্বোনেট তৈরি করে এবং দ্বি যোজী ক্যাটায়নের সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় কার্বোনেট তৈরি হয়। সুনিষ্কাশিত মৃত্তিকার তুলনায় জলাবদ্ধ মৃত্তিকায় খুব ধীরে জৈব পদার্থের ভাঙন হয় এবং এক্ষেত্রে কেবল অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া অংশগ্রহণ করে। যদিও অবায়ুজীবী মৃত্তিকায় প্রাকৃতিক জৈব পদার্থের ভাঙন খুব ধীরে হয়, কিন্তু বিজারণ অবস্থায় কীটনাশক, আগাছানাশক এবং ছত্রাকবারকের ভাঙন খুব দ্রুত ঘটে।

সুনিষ্কাশিত মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ ভাঙনের স্থায়ী বস্তু হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং হিউমিক পদার্থ। কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়, অপরপক্ষে, কদম এবং

যায়। অ্যামোনিয়া আকারে যে নাইট্রোজেন মুক্ত হয় তা নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং সালফার যৌগ সালফেটে জারিত হয়। মৃত্তিকার জৈব পদার্থের অবাত ভাঙ্গনের প্রধান প্রধান স্থায়ী যৌগ হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন এবং হিউমিক পদার্থ। অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেনের এবং সালফেট সালফারের স্থায়ী অবস্থা। কিন্তু অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়ার বিপাকে অনেক প্রকার বস্তু তৈরি হয় : এদের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষণস্থায়ী যা সুনিষ্কাশিত মৃত্তিকায় হয় না। যেমন– অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাই–অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই–অক্সাইড, নাইট্রোজেন পারঅক্সাইড, মিথেন, ইথানল, মিথানল ইত্যাদি : জলাবদ্ধ মৃত্তিকায় জৈব নাইট্রোজেন থেকে অজৈব নাইট্রোজেনে রূপান্তর অ্যামোনিয়াম পর্যায়ে এসে থেমে যায়, কারণ অক্সিজেনের অভাবে এটি থেকে নাইট্রেট তৈরি হয় না। মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, ইউরিয়া অথবা অ্যামোনিয়াম সালফেট যা জলাবদ্ধ ধানের ক্ষেতে ছড়িয়ে (broadcast) দেয়া হয়, তার শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস আকারে নষ্ট হয়। পানিতে অ্যামোনিয়ামের উচ্চ ঘনমাত্রা, মৃত্তিকার উচ্চ pH, শৈবাল এবং নিমজ্জিত উদ্ভিদের উচ্চ সালোকসংশ্লেষণ এবং উচ্চ তাপমাত্রা অ্যামোনিয়া উদ্বায়ীকরণে (volatization) সাহায্য করে। জৈবিক নাইট্রোজেন সংধঙ্গনে জলাবদ্ধতা সহায়তা করে। যখন জলাবদ্ধ মৃত্তিকার অক্সিজেন এবং নাইট্রেট শেষ হয়ে যায় তখন অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া শ্বসনের সময় ইলেকট্রন গ্রহীতা হিসেবে মৃত্তিকার জারিত উপাদান, যেমন– ম্যাঙ্গানিজ (M_n^{4+}) ও লৌহের (Fe^{3+}) হাইড্রাস অক্সাইড ও সালফেট (SO_4^{2-}) ব্যবহার করে এবং এদেরকে বিজারিত করে যেমন $Mn^2 + Fe^2 +$ এবং S^2।

শস্য-উদ্ভিদের উপর জলাবদ্ধতার প্রভাব (Effects of Waterlogging on Crop Plants)

(ক) মূলের বৃদ্ধি ও বিপাক (Root Growth and Metabolism) উদ্ভিদ কলার অক্সিজেন সম্পূর্ণ নিঃশেষ হওয়ার (anoxia, অ্যানোক্সিয়া) আগেই, মূলের চারদিকে অতিরিক্ত পানির জন্য মূলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। উদ্ভিদ হরমোন ইথিলিনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অন্তঃস্থ অক্সিজেনের মাঝারি ধরনের ঘাটতির (hypoxia, হাইপোক্সিয়া) জন্য এটি ঘটে। জলাবদ্ধ অবস্থায় ধানের বৃদ্ধি ভাল হয়। এর মূলের অন্তঃস্থ ইথিলিন তৈরির হার মন্থর, তাই জলাবদ্ধ অবস্থায় মাঝারি পরিমাণ ইথিলিন তৈরি হয়। অপরপক্ষে, যেসব শস্য উদ্ভিদের, যেমন– সাদা সরিষা, ইথিলিন সংশ্লেষণের হার বেশি, তাদের খুব বেশি পরিমাণে ইথিলিন তৈরি হয় যা বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকারক। হাইপোক্সিয়া অবস্থায়ও মূলের বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে, কারণ-মূলের অক্সিজেনের ব্যবহার এবং মূলে অক্সিজেনের ব্যাপন রোধক খুব বেশি হওয়ায় মূলে অ্যানোক্সিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতার জন্য মূলের বৃদ্ধির দিক পরিবর্তন হয় এবং মূলে গ্যাসপূর্ণ অ্যারেনকাইমা কোষ তৈরি হয়। মূল এবং বায়বীয় বিটপের মধ্যে অন্তঃস্থ গ্যাসীয় চলাচল এর জন্য সুবিধাজনক বলে অ্যানোক্সিক পীড়ন পরিহারের এটি একটি কৌশল।

মৃত্তিকায় অক্সিজেনের অনুপস্থিতে কতকগুলো বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই বিক্রিয়ায় সৃষ্ট কতকগুলো বিজারিত যৌগ (NO_2^-, M_n^{2+}, S^-) এবং অণুজীবের মেটাবোলাইট এমন মাত্রায় জমা হতে পারে যা মূলের বিপাকের জন্য ক্ষতিকারক। অক্সিজেন ঘাটতি মূলে অবাত বিপাকে সৃষ্ট কতকগুলো যৌগ খুব বেশি পরিমাণে জমা হলে মূলের ক্ষতি করে। চোয়ানো এবং ডিনাইট্রিফিকেশনের জন্য মৃত্তিকার নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে।

লেগ্যুমজাতীয় শস্য উদ্ভিদের অর্বুদ কম হয় এবং নাইট্রোজিনেজ এনজাইমের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে কতকগুলো শস্য উদ্ভিদে ভেসিকুলার-আরবাসকুলার মাইকোরাইজা

(vesicular-arbuscular mycorrhiza) দেখা যায়। এরা ফসফেট এবং আরও কতকগুলো মৃত্তিকায় অচল মৌল উপাদানের মূল কর্তৃক পরিশোষণে সহায়তা করে। মূলে মাইকোরাইজা-তৈরিতে জলাবদ্ধতা ব্যাহত করে।

জলাবদ্ধতার জন্য বিটপে নাইট্রোজেন ফসফরাস এবং পটাশিয়ামের মাত্রা হ্রাস পায় ; আয়ন পরিশোষণে বিঘ্ন ঘটায় এটি হয় অসন্তুষ্ট অক্সিজেন ভালভাবে ধরে রাখার সুবিধার্থে জলাবদ্ধ উদ্ভিদের মূলের হাইপোডার্মিসে প্রচুর পরিমাণে লিগনিন এবং সুবেরিন জমা হয়, কিন্তু এর জন্য মূলে আয়ন চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। দানাশস্যের বিটপে অন্যান্য মৌলের তুলনায় সোডিয়ামের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। লবণ-সংবেদনশীল প্রজাতির এরকম সোডিয়াম বৃদ্ধির জন্য বৃদ্ধি ও ফলন হ্রাস পায়।

অ্যানোক্সিয়া অবস্থায়, সাইটোক্রোম অক্সিডেজ থেকে ইলেকট্রন অক্সিজেনে স্থানান্তর হতে পারে না, তাই ইলেকট্রন প্রবাহ তন্ত্রের মাধ্যমে ATP উৎপন্ন হয় না। উপরন্তু, ক্রেবস চক্রে যে $NADH_2$, $NADPH_2$ এবং $FADH_2$ তৈরি হয়, তা ইলেকট্রন প্রবাহ তন্ত্রে জারিত হয় না বলে চক্রটি বন্ধ হয়ে যায়। কোষে পর্যাপ্ত শক্তির অভাবে কোষ বিভাজন তথা মূলের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

বিভিন্ন প্রকার পীড়নের জন্য উদ্ভিদ কোষে সুনির্দিষ্ট পলিপেপটাইড প্রচুর পরিমাণে সংশ্লেষিত হয়, যা জেল ইলেকট্রোফোরেসিসের সাহায্যে পৃথক করা সম্ভব। স্বাভাবিক মাত্রার অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ভুট্টার প্রাথমিক মূলে ১০০ এর বেশি পলিপেপটাইড সনাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অক্সিজেনের ঘাটতি অবস্থায় প্রোটিন সংশ্লেষণ খুব কম হয়, কিন্তু RNA নিউর এক নতুন শ্রেণির পলিপেপটাইড সংশ্লেষিত হয়। একে অবায়বীয় পলিপেপটাইড বলে। যা বায়বীয় মূলে অনুপস্থিত। প্রোটিন সংশ্লেষণের প্যাটার্নের পরিবর্তন সত্ত্বেও, ভুট্টার মূল প্রায় ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। তাই অবায়বীয় প্রোটিনের তাৎপর্য বোঝা কঠিন ; তবে এটি মনে রাখা দরকার যে, অ্যানোক্সিয়া অবস্থায় যেসব প্রাণরাসায়নিক বৈশিষ্ট্য স্বল্প সময়ের জন্য হলেও কোষকে বাঁচিয়ে রাখে তা উদ্ভিদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(খ) বিটপের বৃদ্ধি ও বিপাক (Shoot growth and metabolism)

জলাবদ্ধতার জন্য বিটপের বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের মাত্রা অনেক নির্ভর করে অনেকগুলো পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত প্রকরণের উপর, যেমন- প্রজাতি অথবা জাত, এর বয়স অথবা বিকাশের পর্যায়, জলাবদ্ধতার স্থায়িত্বকাল, গভীরতা এবং সময়, মৃত্তিকার প্রকার এবং জলাবদ্ধতার সময়ে, এমন কি পূর্বে তাপমাত্রা এবং আলো।

জলাবদ্ধতা এবং অ্যানোক্সিয়াতে পাতার বৃদ্ধি খুব সংবেদনশীল। একটি পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, অ্যানোক্সিয়া হওয়ার ২১ দিন পর গমের পাতার ক্লোরোফিল শতকরা ৮৬ ভাগ এবং ৭৬ ভাগ, হ্রাস পায় যথাক্রমে ২১ এবং ৯ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ; উভয়ক্ষেত্রেই পাতার প্রসারণ এবং কুশি তৈরি বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এই হ্রাসের জন্য ইথিলিন দায়ী হতে পারে, কারণ Gramineae গোত্রের উদ্ভিদের পাতার বর্ধনশীল গোড়া মৃত্তিকা থেকে অথবা গোড়ায় জমে থাকা পানি থেকে অতি সহজেই ইথিলিন গ্রহণ করে। একই কারণে কাণ্ডের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। অ্যানোক্সিয়ার জন্য শুষ্ক পদার্থ তৈরি বন্ধ হয়ে যায় ; তবে এর আগে শুষ্ক পদার্থ তৈরি বেশি হয়। এর কারণ সম্ভবত অন্ধকার শ্বসন বাধাগ্রস্থ হয়, এবং ক্ষতিগ্রস্থ টিস্যুতে এর কারণে শুষ্ক পদার্থের চাহিদা না থাকার কারণে মূলে শুষ্ক পদার্থের স্থানান্তর কম হয়। যদিও জলাবদ্ধতা সাধারণভাবে বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করে, তবে কোনো কোনো শস্য উদ্ভিদের (যেমন ধান) কাণ্ড অথবা পত্রবৃন্তের

দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায়। কোনো কোনো শস্য উদ্ভিদের কান্ডের গোড়া অথবা হাইপোকটাইল স্ফীত [illegible] যায়, একে হাইপারট্রফি (hypertrophy) বলে। কর্টেক্সের কোষ বড় হওয়া এবং কতগুলো [illegible] ভেঙে গ্যাসপূর্ণ অবকাশ (space) তৈরির জন্য এরকম ঘটে।

অনেক একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী শস্য উদ্ভিদের কান্ডের অথবা হাইপোকটাইলের নির্দিষ্ট অংশ থেকে দ্রুত গতিতে অস্থানিক মূল নির্গত হয়। অকার্যকর আদি মূলের কার্যাদি এই নতুন মূল সম্পাদন করে এবং উদ্ভিদটিকে টিকে থাকতে এবং আংশিকভাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে সাহায্য করে। অন্যান্য মূল মরে গেলেও এই মূল বেঁচে থাকে, কারণ এই মূল পানিপৃষ্ঠের কাণ্ড থেকে উৎপন্ন হয় এবং এখানে পানি ও অক্সিজেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং অবায়বীয়ভাবে সৃষ্ট বিষাক্ত পদার্থ অনুপস্থিত। অনেকসময় অ্যারেনকাইমা কোষযুক্ত কাণ্ডের সাথে এদের সরাসরি সংযুক্তির জন্য এদের অক্সিজেনের ঘাটতি হয় না। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা পানিতে ভেসে থাকে এবং আনুভূমিকভাবে বৃদ্ধি পায় (ডায়াজিওট্রপিজম)। এ দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য বায়ু–পানির পৃষ্ঠ বরাবর মূল অবস্থান করে এবং এখানে বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকে।

জলাবদ্ধতার জন্য পত্রবৃন্তের ইপিনাসটিক (epinastic) বক্রতা দেখা যায়। জলাবদ্ধতার কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিনের মধ্যেই, মূল দিয়ে বিটপে পানি প্রবাহের রোধক সাময়িক বৃদ্ধি পাওয়ায় পাতায় পানি ঘাটতি হয়। ইপিনাসটির অ্যাকলিমেটিক তাৎপর্য হলো যে সৌরতাপ হ্রাসের মাধ্যমে এই সংকটকালীন সময়ে প্রস্বেদন হ্রাস করা।

জলাবদ্ধতার কারণে পাতার বার্ধক্যপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত হয় এবং অ্যাবসিসন দ্রুত হয়। একটি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে, জলাবদ্ধতার ৪ থেকে ৫ দিনের মধ্যেই যবের পুরাতন পাতার ক্লোরোফিলের পরিমাণ হ্রাস পায়। পাতার অগ্রভাগ থেকে হলুদ হওয়া শুরু হয়। জাইলেম প্রবাহে সাইটোকাইনিন এবং জিব্বারেলিনের মাত্রা জলাবদ্ধতার প্রথম তিন দিনের মধ্যেই কমে যায়। মূলের অগ্রভাগ নষ্ট হয়ে যাওয়া অথবা খুব সীমিত বিপাকীয় কার্য হওয়ার ফলে এখানে হরমোন সংশ্লেষিত হয় না। জলাবদ্ধতার কারণে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়।

যদিও জলাবদ্ধতার কারণে উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানা বাকি আছে, তথাপিও এ পর্যন্ত জলাবদ্ধ পরিবেশ এবং তা কিভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলনকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এগুলোর উপর ভিত্তি করেই প্রজননবিদরা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবনে হয়তো সক্ষম হবেন।

তাপজনিত পীড়ন (Temperature Stress)

শস্য উদ্ভিদের তাপশক্তির সমতা (Heat Energs Balance crop plant) : তাপশক্তির বিনিময়ের সমতার দিক থেকে উদ্ভিদকে প্রায় কৃষ্ণ বস্তু (black body) বলে গণ্য করা হয়। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, উদ্ভিদে এবং উদ্ভিদ থেকে তাপশক্তির বিনিময়ের সমতা শূন্য। নিট বিকিরণ, শক্তি আত্তীকরণ এবং তাপের বিনিময় হলো প্রধান নিয়ামক যা উদ্ভিদের তাপশক্তির সমতাকে প্রভাবিত করে। এই সম্পর্ক নিম্নলিখিত শক্তির বাজেট সমীকরণের সাহায্যে দেখানো যায় :

$$Q_I+Q_M+Q_P+Q_H+Q_E = 0 \quad \text{.....................} \quad (৬.৭)$$

Q_I হলো নিট সৌরবিকিরণ ; পরিপার্শ্ব থেকে শোষণের তুলনায় পাতা বেশি তাপশক্তি বিকিরণ করলে এর মান ঋণাত্মক এবং পাতা বেশি সৌরবিকিরণ শোষণ করলে এর মান ধনাত্মক। বিকিরণের মাধ্যমে সূর্য থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠে তাপশক্তি আসে যা উদ্ভিদ, মৃত্তিকা, এবং পানি শোষণ করে। আবার তাপীয় বিকিরণের (thermal radiation) মাধমে পৃথিবী পৃষ্ঠ তাপশক্তি হারায়।

তাপীয় বিকিরণ, পৃথিবী পৃষ্ঠের অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমাত্রার জন্য হয়, দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিসরে (৩ থেকে ১০০ মাইক্রোমিটার), এবং বায়ুমণ্ডলের দ্বি-মেরু অণু, বিশেষ করে জলীয় বাষ্প কর্তৃক প্রবলভাবে শোষিত হয়।

এর ফলে পৃথিবীর চারপাশের বায়ু উত্তপ্ত হয় এবং এই ধৃত শক্তির অধিকাংশ অংশ দীর্ঘ-তরঙ্গদৈর্ঘ্য পুনঃবিকিরণের মাধ্যমে পৃথিবী পৃষ্ঠে ফিরে আসে। কোনো স্থানের কোনো সময়ের নিট বিকিরণ (Q_1) পাওয়া যাবে স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্য (০.৩–৩ মাইক্রোমিটার) (I_s) এবং দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য তাপীয় বিকিরণের (I_e) সমতা থেকে। অর্থাৎ $Q_1=I_s+I_e$; আবার $I_s= I_d+I_i-I_r$ এবং $I_t = I_a-I_g$। এক্ষেত্রে I_d = সরাসরি (direct) সৌরবিকিরণ, I_i = পরিব্যাপ্ত (diffuse) স্কাইলাইট এবং ক্লাউডলাইট, I_r = প্রতিফলিত স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিকিরণ, I_a = বায়ুমণ্ডল হতে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পুনঃবিকিরণ এবং I_g= ভূ-পৃষ্ঠ এবং উদ্ভিদ হতে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তাপীয় বিকিরণ। পৃথিবী কর্তৃক স্বল্প তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ গ্রহণকে তাপশক্তির সঞ্চয় এবং তাপীয় বিকিরণকে তাপশক্তির ক্ষতি বলে গণ্য করা হয়। এজন্য যতোক্ষণ স্বল্প তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণের প্রাধান্য থাকে, ততোক্ষণ বিকিরণের সমতা ধনাত্মক। সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্তের কিছু পূর্ব পর্যন্ত এটি ঘটে। যখন তাপীয় বিকিরণের তুলনায় সৌরবিকিরণ কম হয়, তখন এই সমতা ঋণাত্মক। উদ্ভিদ কর্তৃক সালোকসংশ্লেষণের জন্য, ফাইটোমাস, মৃত্তিকা ও বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত করতে এবং বাষ্পীভবন ঘটাতে অতিরিক্ত তাপশক্তি জীবনমণ্ডলে (biosphere) ব্যবহৃত হয়।

Q_M হলো বিপাকীয় শক্তি ; সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শক্তি গৃহীত হয়, অপরপক্ষে অন্ধকার এবং ক্লোরোফিলবিহীন কলায় শ্বসনের মাধ্যমে শক্তি নির্গত হয়। এ দুটি বিপাক প্রক্রিয়ার অত্যন্তগুরুত্ব সত্ত্বেও তাপশক্তির সমতায় Q_M এর অবদান অত্যন্ত কম, শতকরা ১ থেকে ২ ভাগ।

Q_P হলো ফাইটোমাসে কর্তৃক জমাকৃত তাপশক্তি। যখন পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে ত্যাগের তুলনায় বেশি তাপশক্তি গ্রহণ করে তখন ধৃত তাপশক্তি সাময়িকভাবে উদ্ভিদে জমা থাকে। এর ফলে ফাইটোমাসের তাপধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে উদ্ভিদে তাপমাত্রা বাড়ে।

Q_H হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (sensible) তাপশক্তির (পরিবহণ এবং পরিচলন) স্থানান্তর এবং Q_E হলো লীন তাপের বিনিময় (latent heat exchange)।

তাপশক্তির সমতার ক্ষেত্রে পরিবহণ এবং পরিচলন (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাপ বিনিময়) এবং বাষ্পীভবন ও ঘনীভবনের (লীন তাপ বিনিময়) গুরুত্ব খুব বেশি। তবে শস্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পরিবহণের গুরুত্ব কম। বিকিরণের সমতা ধনাত্মক হলে, সাধারণত পরিচলনের মাধ্যমে উদ্ভিদ থেকে তাপশক্তি নির্গত হয় (অর্থাৎ Q_H ঋণাত্মক)। অপরপক্ষে, বায়ুর তুলনায় যদি উদ্ভিদ শীতল হয়, তখন পরিবেশ থেকে তাপশক্তি উদ্ভিদে স্থানান্তরিত হয় (Q_H ধনাত্মক)। বায়ুপ্রবাহের বেগ বেশি হলে এবং পাতা ক্ষুদ্রাকার হলে পরিচলন বৃদ্ধি পায়।

উদ্ভিদের তাপীয় সমতা কেবল পরিবেশের ভৌত প্রকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, কারণ প্রস্বেদনের সময় পত্ররন্ধ্রের নিয়ন্ত্রণ শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া দ্বারাও প্রভাবিত হয়। যখন উদ্ভিদে প্রস্বেদন হয়, তখন Q_E ঋণাত্মক এবং যখন পাতার উপর শিশিরবিন্দু ঘনীভূত (condensation) হয়, তখন এটি ধনাত্মক।

তাপীয় সমতা সমীকরণ অথবা প্রস্বেদনের হার থেকে প্রস্বেদনের শীতলীকরণ প্রভাব নির্ণয় করা যায়। পানিকে বাষ্পে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ শক্তি উদ্ভিদ প্রস্বেদনের সময় হারায়। তাই কখনো কখনো Q_E এর পরিবর্তে λE ব্যবহার করা হয়।

এক্ষেত্রে E হলো যে পরিমাণ পানির বাষ্পীভবন হয়েছে এবং λ হলো পানির বাষ্পীভবনের লীন তাপ (heat of vapourization)। Q_E হলো বাষ্পীভবনের হার এবং পানির বাষ্পীভবনের লীন তাপের গুণফল। প্রস্বেদনের হার প্রতি ঘণ্টায় প্রতি বর্গ ডেসিমিটারে ১ গ্রাম পানি (অর্থাৎ ০.১ মিলিমিটার প্রতি ঘণ্টায়) হলে উদ্ভিদ থেকে ০.১ ক্যালোরি প্রতি বর্গসেন্টিমিটার প্রতি মিনিট শক্তি হারায়। উদ্ভিদ পর্যাপ্ত পানি পেলে, বায়ুর তাপমাত্রা বেশি হলে জলীয় বাষ্প কম থাকলে প্রস্বেদনের মাধ্যমে শীতলীকরণ বিশেষভাবে কার্যকর। যদি বায়ুপ্রবাহের জন্য প্রস্বেদন ত্বরান্বিত হয়, তাহলে উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি হারায় এবং পারিপার্শ্বিক বায়ুর তুলনায় পাতার তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি হ্রাস পায়।

সৌরবিকিরণ খুব বেশি হলে প্রায়ই পরিচলন এবং প্রস্বেদনের মাধ্যমে উদ্ভিদ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ তাপশক্তি স্থানান্তরিত হয় না। তাই পরিবেশের তুলনায় উদ্ভিদের তাপমাত্রা ১০° সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যায়। ব্যতিক্রমমূলক ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ২০° সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়ে; আবার উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রকম উত্তপ্ত হয়। শুধু যে বিভিন্ন পাতায় তাপমাত্রার পার্থক্য হয়, তাই নয়, একটি পাতার বিভিন্ন অংশেও তাপমাত্রার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই ঘটনা ঘটে রাতে শীতলীকরণের সময়। বায়ুপ্রবাহ না থাকলে, পাতার কিনারে এবং অগ্রভাগের তাপমাত্রা অন্যান্য অংশের চেয়ে কম। শিশির প্রথমে শীতল অংশে জমা হয় এবং অন্যান্য অংশের তুলনায় এই অংশে দ্রুত বরফ তৈরি হয়।

শস্য উদ্ভিদের উপর নিম্নতাপের প্রভাব (Influence of Low Temperature on Crop plant) : সর্বোত্তম তামাত্রার চেয়ে কম তাপমাত্রায়, শস্য উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার ও বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপ হ্রাস পায়। ফলে শস্যের জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে বেশি সময় লাগে; প্রত্যেক শস্যের একটি গড় সংকটকালীন তাপমাত্রা আছে যার কমে এদের যৌন জনন সাথর্কভাবে হয় না।

অব–গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় শস্য উদ্ভিদকে ০ থেকে ১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার পরিসরে রাখলে এদের বিপাক ক্রিয়া, বিশেষ করে শ্বসন অতি দ্রুত হ্রাস পায় এবং এর জন্য ব্যাপক ক্ষতি হয় ও কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের মধ্যে উদ্ভিদ মারা যেতে পারে। নিম্ন তাপে এসকল প্রজাতির ঝিল্লীর (যেমন– কোষ ঝিল্লী) লিপিডের দশার পরিবর্তন হয় (যেমন– তরল থেকে কঠিন) এর জন্য ঝিল্লী সংযুক্ত এনজাইমগুলো নিষ্ক্রিয় হয়, যেমন– মাইটোকনড্রিয়নের ঝিল্লীতে লেগে থাকা শ্বসনিক এনজাইম, এবং মূলের পানি ও খনিজ যৌগ পরিশোষণ বিঘ্নিত হয়। নাতিশীতোষ্ণ উদ্ভিদের ঝিল্লীর লিপিডে অপেক্ষাকৃত বেশি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকায়, এদের ঝিল্লী অধিকতর স্থায়ী এবং নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

সাধারণভাবে, নাতিশীতোষ্ণ উদ্ভিদ ০° সেলসিয়াসের উপরের ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় সংবেদনশীল নয় এবং কেবল এদের কলায় বরফ তৈরি হলে ব্যাপক ক্ষতি হয়। যেমন– অনেক বৃক্ষ প্রজাতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, আন্তঃকোষীয় (extra cellular) বরফ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত (সাধারণত –৩ থেকে –৫° সেলসিয়াস) সালোকসংশ্লেষণ –সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় না, তা সত্ত্বেও পুরোপুরি ভৌত কারণে (বরফ কর্তৃক কার্বন ডাই–অক্সাইড ব্যাপন বাধাগ্রস্থ হওয়ায় এই প্রক্রিয়া প্রথম অবস্থায় বন্ধ হতে পারে। শীতলীকরণ নিম্ন হারে হলে <১° সেলসিয়াস প্রতি ঘণ্টায়), উদ্ভিদ কলার অ্যাপোপ্লাস্টে (অর্থাৎ আন্তঃকোষীয়, অন্তঃকোষীয় নয়) প্রথম বরফ তৈরি হতে থাকে, কারণ সাইটোপ্লাজম ও কোষগহবরে অধিক পরিমাণে দ্রব থাকে। যতোক্ষণ পর্যন্ত এই বরফ তৈরিকরণের সময় দীর্ঘায়িত না হয় এবং বরফ গলন (thaw) খুব দ্রুত না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত আন্তঃকোষীয় বরফ হারডেন্ড (hardened) উদ্ভিদের কলার তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষতি করতে পারে না।

BANSDOC Library Dhaka

তবে আন্তঃকোষীয় বরফ স্থায়ী হলে অ্যাপোপ্লাস্ট এবং কোষের বাষ্প চাপের পার্থক্যের জন্য কোষ থেকে পানি অ্যাপোপ্লাস্টে বের হয়ে আসে, এই পানি বরফে পরিণত হয়, ফলে কোষ কলায় বরফের পরিমাণ বেড়ে যায়। যান্ত্রিক ক্ষতি ছাড়াও এই প্রক্রিয়ার জন্য কোষ ক্রমাগত পানি হারায় এবং কোষরসের ঘনমাত্রা বেড়ে যায় (পানি ঘাটতির মতো)। ফলে কোষের বিপাকীয় বিক্রিয়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হয় ; এনজাইমসহ সকল প্রোটিনের গঠনের ক্ষতি হয় (denatured)। আবদ্ধ (compartmented) বস্তু, যেমন– হাইড্রোলাইটিক এনজাইম সাইটোপ্লাজমে মুক্ত হয়, বাফার সিস্টেম কোষের pH নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয় না এবং পানিবিয়োজনের জন্য পারস্পরিক ক্রিয়ায় ম্যাক্রোঅণুগুলো ঘনীভূত হওয়ার প্রবণতা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ প্রভাবের জন্য কোষের মৃত্যু ঘটে। কোষের বিপাক এবং পানি সম্পর্ক আরও বিঘ্নিত হওয়ায়, বরফ গলন দ্রুত হলে উদ্ভিদের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে।

প্রতিরোধী প্রকৃতির সাইটোপ্লাজমের জন্য, অনেক প্রজাতির হারডেন্ড (hardened) উদ্ভিদ খুব নিম্ন তাপে এবং উচ্চ মাত্রার পানিবিয়োজন অবস্থায় অনেক দিন ধরে টিকে থাকে। তবে খুব প্রতিরোধী উদ্ভিদও খুব দ্রুত শীতলীকরণের জন্য সৃষ্ট অন্তঃকোষীয় (intracellular) বরফ সহ্য করতে পারে না।

হিমাঙ্ক তাপমাত্রা প্রতিরোধী উদ্ভিদকে, যা প্রধানত অন্তঃকোষীয় বরফ তৈরি প্রতিরোধ করে (যদিও কোষের পানিবিয়োজন সহিষ্ণুতা এবং আন্তঃকোষীয় বরফের জন্য ভৌত ক্ষতি প্রতিরোধও খুব গুরুত্বপূর্ণ), প্রতিরোধীতার কয়েকটি পর্যায়ক্রমিক লাইন হিসেবে দেখা যেতে পারে। সাধারণভাবে, শীত যখন প্রকট হয়, তখন টিকে থাকার জন্য একাধিক লাইনের প্রয়োজন হয়। প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন হলো কোষগহ্বর এবং সাইটোপ্লাজমের পানির হিমাঙ্ক অবনমন (depression of freezing point), দ্রবণীয় দ্রবের জন্য এটি ঘটে। এভাবে হার্ডেনিং এর পূর্বেই বরফ তৈরি না হয়েও নাতিশীতোষ্ণ অনেক উদ্ভিদকে হিমাঙ্কের কয়েক ডিগ্রি নিচে (সাধারণত – ৩ থেকে – ৫° সেলসিয়াস) পর্যন্ত শীতল করা যায়।

শরৎকালে কোষরসে নিম্ন আণবিক ওজনের কতকগুলো জৈব দ্রব (চিনি, জৈব এসিড অ্যামাইনো এসিড এবং বৃহদাকার প্রোটিন অণু) জমা হওয়ার কারণে হিমাঙ্ক অবনমন আরও বেশি হওয়ায় উদ্ভিদকে আরও তুষারপাত প্রতিরোধী করে। নিম্ন তাপমাত্রায় আস্তিকারী দ্রব্য চাহিদা কম হওয়ায়, অতিরিক্ত পানিবিয়োজনের হাত থেকে সাইটোপ্লাজমীয় ম্যাক্রো অণু এবং ঝিল্লীর রক্ষার মাধ্যমে দ্রব জমাকরণ আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইন, যা কাষ্ঠল উদ্ভিদের গুরুত্বপূর্ণ কলাকে (সুপ্ত কুঁড়ি এবং জাইলেম রশ্মি (ray) প্যারেনকাইমা) খুব নিম্ন তাপমাত্রা প্রায় –৪০° সেলসিয়াস থেকে রক্ষা করে, কার্যকর হতে পারে কেবল বৃদ্ধি বন্ধ হওয়ার পর, সুপ্তাবস্থা স্থাপনের পর এবং কয়েকদিন যাবৎ ০° সেলসিয়াসের নিচের তাপমাত্রায় কলা হার্ডেন্ড হওয়ার পর। সুতরাং শীত শুরুর আগের পরিপার্শ্বিকতার জন্য এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর হয়। এভাবে শর্তবদ্ধ (conditioned) কলা এমন আচরণ করে, যাতে মনে হয় এদের অতি–বিশুদ্ধ (ultra-pure) পানি আছে, যার নিউক্লিয়েটিং স্থান না থাকায় বরফ তৈরি হতে পারে না। তাই বরফ তৈরির আগে এদেরকে অনেক বেশি শীতল করা যেতে পারে, প্রায় - ৩৮° সেলসিয়াস পর্যন্ত (পানির স্বতঃস্ফূর্ত নিউক্লিয়েটিং তাপমাত্রা)।

যে সমস্ত শস্য উদ্ভিদ খুব নিম্ন তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে তাদের কোষ প্রাচীর এবং কোষ ঝিল্লীর ক্ষতি না হয়েও অ্যাপোপ্লাস্টে প্রচুর পরিমাণে বরফ জমা থাকে। এরা সাইটোপ্লাজমে প্রবল পানিবিয়োজন অবস্থা সহ্য করতে পারে এবং পানিবিয়োজন এবং পানিযোজন চক্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ভৌত এবং প্রাণরাসায়নিক পীড়ন সহ্য করতে সক্ষম। হার্ডেনিং এর সাথে এসকল পীড়ন সহ্য করার ক্ষমতার উন্নতি হয়, তবে এর সঠিক কৌশল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ; এর প্রধান কারণ হলো নিম্ন তাপমাত্রায় কোষের উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যাদি পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন।

শস্য উদ্ভিদের উপর উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাব (Influence of High Temperature on Crop Plant)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উদ্ভিদ কলা থেকে প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে (দীর্ঘ তরঙ্গবেগ বিকিরণ, পরিচলন এবং প্রস্বেদন) তাপশক্তির স্থানান্তর হয় ; এদের মধ্যে প্রস্বেদনের ভূমিকাই বেশি। মাঠ পর্যায়ে সাধারণত উচ্চ তাপমাত্রা এবং পানি ঘাটতি একই সাথে ঘটে। তাই পানি ঘাটতির জন্য পত্ররন্ধ্র বন্ধ হওয়ায় উচ্চ তাপমাত্রায় (>৪০° সেলসিয়াস) উদ্ভিদে প্রস্বেদনজনিত শীতলীকরণ হয় না। এজন্য গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং অব–গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের শুষ্ক এলাকার শস্য উদ্ভিদ সাধারণত পানি ঘাটতিজনিত এবং তাপজনিত উভয় প্রকার পীড়নের পড়ে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মরুজ নিবাসেও (যেমন– বালিয়াড়ী, অগভীর মৃত্তিকা) এরকম ঘটে।

পানি ঘাটতি এবং উচ্চ তাপমাত্রার মধ্যে এরকম নিকট সম্পর্কে থাকায়, মাঠ পর্যায়ে এ'দুটির প্রভাব পৃথক করা বেশ কঠিন। এজন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এ'দুটির প্রভাব আলাদাভাবে পরীক্ষা করা দরকার। যেমন– উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাব নির্ণয়ের জন্য উদ্ভিদকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সরবরাহ করতে হবে। এরকম পরীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে, স্বল্প পরিসরের তাপমাত্রায় (৪৫ থেকে ৫৫° সেলসিয়াস) উদ্ভিদকে অল্প সময়ের জন্য (প্রায় ৩০ মিনিট) রাখলেও পাতার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। অপর পক্ষে, নিম্ন তাপমাত্রার পরিসর বেশ বিস্তৃত (+৫ থেকে –৪০° সেলসিয়াস অথবা আরও কম)।

উচ্চ তাপজনিত ক্ষতির প্রকৃতি বেশ জটিল। এই পরিসরের তাপমাত্রায় (৪৫ থেকে ৫৫° সেলসিয়াস) ক্লোরোপ্লাস্টের লিপিডের দশার পরিবর্তন হয় ; হঠাৎ করে সান্দ্রতা (viscosity) কমে যায় এবং এ থেকে ধারণা করা হয় যে, উচ্চ তাপজনিত ক্ষতির স্থান হলো ঝিল্লী। অন্যান্য প্রক্রিয়ার (শ্বসন, আয়ন পরিশোষণ) তুলনায় সালোকসংশ্লেষণ খুব বেশি তাপে সংবেদনশীল। অব–কোষীয় (sub-cellular) পর্যায়ে, পাতার সালোকসংশ্লেষণের তুলনায় ঝিল্লীর কাজ এবং এনজাইমের কার্যকারিতা, রঞ্জকতন্ত্র-২ ব্যতীত, তাপমাত্রায় কম সংবেদনশীল। এ থেকে মন্তব্য করা যায় যে, ক্ষতিকারক উচ্চ তাপমাত্রার প্রধান প্রভাব হলো ক্লোরোপ্লাস্টের ঝিল্লীর দশার (phase) পরিবর্তন ঘটিয়ে রঞ্জক তন্ত্র ২–এর ইলেকট্রন প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন করে।

মরুজ উদ্ভিদের যে বিপুল পরিসরের অঙ্গসংস্থান এবং ফিনোলজি (যেমন– ক্ষুদ্রাকার স্বল্পকালস্থায়ী উদ্ভিদ থেকে বিশালাকার ক্যাকটাস পর্যন্ত) পরিলক্ষিত হয়, তা নির্দেশ করে যে, উষ্ণ এবং শুষ্ক পরিবেশে নানা প্রকার অভিযোজনের মাধ্যমে উদ্ভিদ টিকে থাকে। উষ্ণ এলাকার অনেক প্রজাতির জীবনচক্র এমনভাবে সুবিন্যস্ত যে, এরা বছরের উষ্ণতম সময় এড়িয়ে চলে। এটি ঘটতে পারে পত্র পতনের মাধ্যমে কেবল শক্ত, তাপপ্রতিরোধী মুকুল থাকে অথবা বর্ষজীবী উদ্ভিদ তাদের জনন বৃদ্ধি সম্পন্ন করে বছরের অপেক্ষাকৃত শীতল সময়ে। শেষোক্ত প্রজাতির কতকগুলোতে

হারের আপাত অনুপোযুক্ত অভিযোজন দেখা যায়। যেমন- ডায়াহেলিওট্রোপিক সূর্য অনুসরণ (সূর্যের সাথে পাতা সমকোণে অবস্থান করে সর্বোচ্চ সূর্যালোক শোষণ করে) এবং উচ্চ সালোকসংশ্লেষণের হার যা স্বল্পস্থায়ী অনুকূল পরিবেশে এদের দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিকল্পভাবে, একক পাতা অথবা সম্পূর্ণ ক্যানোপির এমন বৈশিষ্ট্য থাকে যা সৌরবিকিরণ শোষণ হ্রাস করে অথবা পাতা শীতলীকরণে সহায়তা করে, এর মাধ্যমে ক্ষতিকারক উচ্চ তাপমাত্রার হাত থেকে উদ্ভিদ রক্ষা পায় এবং সারা বছর ধরেই এদের বৃদ্ধি চলতে থাকে। যেমন– পাতার কোণ (angle) এবং পাতা ঘুরানোর ক্ষমতা এসকল প্রজাতির খুব বেশি, এদের পাতা সূর্যের সমান্তরালে থাকে (প্যারাহেলিওট্রোপিক সূর্য অনুসরণ করে) বলে সৌরবিকিরণ কম শোষিত হয়। তবে, ডায়া এবং প্যারাহেলিও ট্রোপিক উভয় প্রকাশ চলনই সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে এমন এলাকায় যেখানে মেঘমুক্ত আকাশ এবং পরিষ্কার বায়ু বিরাজ করে, এখানে পরিব্যাপ্ত (diffuse) বিকিরণের অবদান কম এবং যেখানে বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ক্যানোপি প্রভাবিত না হয়।

পানি ঘাটতি পরিবেশে পাতা যদি অতিরিক্ত সৌরবিকিরণ শোষণ করে, তাহলে উদ্ভিদকে টিকে থাকার জন্য পত্র পৃষ্ঠ থেকে অতিরিক্ত তাপ পরিচলনের মাধ্যমে ত্যাগ করতে হবে অথবা শোষিত হওয়ার আগেই আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত হতে হবে। পাতার অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যের (যেমন- ক্ষুদ্রাকার পাতা) জন্য পাতার বাউন্ডারি স্তর রোধক হ্রাস পায় বলে প্রথম প্রক্রিয়া দ্রুত হয়।

কতকগুলো উদ্ভিদ প্রজাতি আছে যারা উচ্চ তাপমাত্রা না এড়িয়ে সহ্য করে। অনেক রসালো উদ্ভিদ যাদের বৃহৎ আকার (পরিচলনের হার খুব কম) এবং CAM উদ্ভিদের (দিনে প্রস্বেদনের মাধ্যমে শীতলীকরণ হয় না) পাতার শীতলীকরণের সুযোগ কম, যদিও পানির আপেক্ষিক তাপ বেশি হওয়ায় এবং এসব উদ্ভিদে পানি সঞ্চয় বেশি থাকায় তাপমাত্রা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বাফারের মতো কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, উদ্ভিদে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৬৫ সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে এক *Opuntia* প্রজাতিতে, এবং সাধারণভাবে দীর্ঘ সময় ধরে কলার তাপমাত্রা ৬০ সেলসিয়াসের অধিক হলেও ক্যাকটাস তা সহ্য করতে পারে।

বীজের অঙ্কুরোদগম এবং চারাগাছের প্রতিষ্ঠা শস্য উদ্ভিদের জীবন চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই পর্যায়ে তাপমাত্রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতি উচ্চ তাপে চারা গজালেও তাদের প্রতিষ্ঠা ঠিকমতো না হওয়ার জন্য প্রতি একক জমিতে উদ্ভিদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় ফলন হ্রাস পায়। জনন বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়েও উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাব আছে। পুষ্পায়ন, পরাগরেণুর জীবনীশক্তি (viability), নিষেক, দানা ভর্তির হার ও সময়কাল ইত্যাদি উচ্চ তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফলনকে হ্রাস করে।

খনিজ মৌলজনিত পীড়ন (Mineral stress)

পানি এবং তাপমাত্রাজনিত পীড়ন ছাড়াও, মৃত্তিকায় খনিজ মৌলের স্বল্পতা কিংবা বৃদ্ধির কারণে পীড়নের উদ্ভব হয়। এরকম সমস্যাসঙ্কুল মৃত্তিকা হলো লোনা (saline) মৃত্তিকা, অম্লীয় (acid) মৃত্তিকা, চুনময় (Calcareous) মৃত্তিকা, সোডিক (sodic) মৃত্তিকা এবং ধাতু কলুষিত (metal contaminated) মৃত্তিকা প্রধান। এসব মৃত্তিকায় জন্মানো শস্য উদ্ভিদের উপর সাধারণভাবে কতকগুলো প্রভাব দেখা যায় সারণি (৬.৩)।

লোনা মৃত্তিকা (Saline Soil)

যে মৃত্তিকায় উচ্চ মাত্রায় দ্রবণীয় লবণ থাকে, সে মৃত্তিকায় শস্য উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না ; নিম্নলিখিত মাত্রার চেয়ে কম লবণ থাকলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলন ব্যাহত হয়। মৃত্তিকার পানির খনিজ মৌলজনিত পীড়নের প্রভাবের একটি সরল শ্রেণীবিভাগ।

সারণি ৬.৩ : সম্পদ (resource) অর্জনের ক্ষমতার উপর প্রভাব

(১) পানি অর্জন :	(ক) দ্রব্যের অত্যধিক ঘনমাত্রার জন্য অসমোটিক প্রভাব (খ) কোষ বিভাজনে বাঁধা, মূলের বৃদ্ধি ব্যাহত
(২) খনিজ মৌল অর্জন :	(ক) আয়নের মধ্যে প্রতিযোগীতা (খ) ঝিল্লীর ক্ষতিসাধন (গ) সিম্প্লায়োটের উপর প্রভাব (ঘ) কোষ বিভাজনে বাঁধা
(৩) সৌরবিকিরণ এবং কার্বন ডাই–অক্সাইড অর্জন :	(ক) ক্লোরোফিল ব্লিচিং (খ) পত্ররন্ধ্রের উপর প্রভাব
সম্পদ ব্যবহারের ক্ষমতার উপর প্রভাব	(ক) এনজাইমের ক্রিয়ার বাঁধা (খ) কোষ বিভাজনে বাঁধা (গ) শ্বসনিক বস্তুর ঘাটতি এবং অক্সিজেন স্বল্পতা

পরিমাণের উপর নির্ভর করে এই অবস্থা অস্থায়ী অথবা স্থায়ী হতে পারে। পানি নিষ্কাশন ভাল না হলে মৃত্তিকা লবণাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। পৃথিবীতে লবণাক্ত এলাকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর একটি প্রধান কারণ হলো অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রার দ্রবণীয় লবণযুক্ত পানি শস্যক্ষেতে সেচের জন্য ব্যবহার। এ অবস্থায় লবণ পরিশোষণের তুলনায় পানি পরিশোষণ বেশি হয়। যে এলাকায় ভূমি অসমান, সেখানে উচ্চভূমি থেকে লবণ নিম্নভূমিতে জমা হতে পারে। পৃথিবীর সেচ নির্ভর ২৩০×১০⁶ হেক্টর জমির মধ্যে প্রায় এক–তৃতীয়াংশ লবণাক্ততায় আক্রান্ত (Epstein *et al.*, 1980)।

বিশুদ্ধ পানির তুলনায় দ্রবণীয় লবণের দ্রবণের ভেতর দিয়ে সহজে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা (electrical conductance, EC) লবণের ঘনমাত্রার সাথে সরলরৈখিকভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং এর সাহায্যে দ্রবণে লবণের ঘনমাত্রা পরিমাপ করা যায়। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক পরিবাহিতাকে ডেসিসিমেন (deci siemens বা ds) প্রতি মিটার অর্থাৎ ds^{m-1} হিসেবে প্রকাশ করা হয়। পুরাতন পদ্ধতিতে এই এককে মোস (mhos) বলা হতো ($1ds^{m-1} = 1mmhos\ cm^{-1}$)।

যদি মৃত্তিকার দ্রবণের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা ৪ ডেসিসিমেন প্রতি মিটার এর বেশি হয়, তাহলে সেই মৃত্তিকাকে লোনা মৃত্তিকা বলা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্রব পানির পটেনশিয়ালকে হ্রাস করে। মৃত্তিকার দ্রবণের অসমোটিক পটেনশিয়ালের (ψ_π) সাথে EC নিম্নলিখিতভাবে সম্পর্কযুক্ত :

$$\Psi_\pi = EC\ (-০.০৩৬\ \text{মেগাপ্যাসকেল}) \quad (৬.৮)$$

উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পানি সম্পর্কের উপর লবণাক্ততার প্রভাব

লবণাক্ততা সহিষ্ণুতার উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

১. লবণ উদ্ভিদ (Halophytes) : যা লবণাক্ত পরিবেশের মূল (native) উদ্ভিদ এবং এরা সবচেয়ে বেশি লবণ সহিষ্ণু।

২. গ্লাইকোফাইট (Glycophytes) : অপেক্ষাকৃত কম লবণ সহিষ্ণু, তবে বিভিন্ন প্রজাতি এবং একই প্রজাতির বিভিন্ন জাতের মধ্যে এই সহিষ্ণুতার পার্থক্য আছে। অধিকাংশ শস্য উদ্ভিদ এই গ্রুপের অন্তর্গত। লবণের ক্ষতিকারক প্রভাব নির্ভর করে লবণের পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর।

লবণাক্ততার জন্য শস্য উদ্ভিদের পাতার প্রসারণ হার কমে যায়। লবণের জন্য পাতার পানির পটেনশিয়াল কমে যায় এবং রসস্ফীতি চাপ কমে যাওয়ায় পাতার প্রসারণ ব্যাহত হয়। লবণাক্ততার জন্য বিটপের তুলনায় মূলের বৃদ্ধি বেশি প্রভাবিত হয়। যব, সরগাম এবং বারমুডা ঘাসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, নিম্ন থেকে মধ্যম লবণাক্ততা এদের মূলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে (Munns and Termaat, 1986)। যদি মৃত্তিকায় ক্যালসিয়ামের তুলনায় সোডিয়াম বেশি থাকে, তাহলে মূলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় মৃত্তিকার ভৌত প্রকরণের জন্য। কর্দম মৃত্তিকার বিনিময়যোগ্য সোডিয়াম আয়ন মৃত্তিকার গঠনকে (structure) দূর্বল করে এবং মৃত্তিকার ঘনত্ব বৃদ্ধি করে (Emerson, 1984)। লবণাক্ত পরিবেশে জন্মানো উদ্ভিদের পাতা সাধারণত পুরু এবং রসালো হয়। খুব বেশি লোনা মৃত্তিকার মূলে অ্যাবসিসিক এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সালোকসংশ্লেষণের উপর লবণাক্ততার ক্ষতিকারক প্রভাবের সাথে ক্লোরোফিলের পরিমাণ কমে যাওয়ার সম্পর্ক আছে।

লোনা মৃত্তিকায় সাধারণত Na^+, Cl^- এবং SO_4^{2-} আয়ন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে এবং মৃত্তিকার দ্রবণের অসমোটিক ধর্মাবলীর জন্য এদের অবদান তাই বেশি। পানির পটেনশিয়াল এবং মৃত্তিকার দ্রবণের উপর এদের প্রভাব ছাড়াও, এদের বিশেষ করে Na^+ এবং Cl^- কোষের গঠনগত অখণ্ডতা এবং বিপাকের উপর সুনির্দিষ্ট প্রভাব আছে। মূল রোমের কোষ ঝিল্লীতে অবস্থিত Ca^{2+} কে Na^+ সরিয়ে দিতে পারে লবণাক্ততার জন্য NO_3^- পরিশোষণ এবং পাতার নাইট্রেট রিডাকটেজ এনজাইমের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়।

লোনা মৃত্তিকার লবণের পরিমাণ কমিয়ে আনলে শস্য উদ্ভিদের বৃদ্ধি অপেক্ষা স্বাভাবিক হয়। কিছু লবণ সরিয়ে দিয়ে অথবা অলোনা অবস্থায় যে পানির প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি পানি বজায় রেখে লবণের পরিমাণ কমানো সম্ভব। তবে মৃত্তিকার, বিশেষ করে ভারী মৃত্তিকায় সিক্ত অবস্থা বজায় রাখলে বায়ু চলাচলের বিঘ্ন ঘটে। নিম্ন মাত্রার অক্সিজেন সোডিয়াম বর্জন কৌশলের ক্ষতি করে, এর জন্য উদ্ভিদ লবণাক্ততা সহিষ্ণু হয়। অক্সিজেনের মাত্রা কম হলে মূল থেকে বিটপে সোডিয়াম স্থানান্তর বৃদ্ধি পায়।

অলোনা মৃত্তিকায় যেভাবে অজৈব সার ব্যবহার করা হয়, লোনা মৃত্তিকায় তার পরিবর্তন দরকার। উচ্চ মাত্রায় NO_3^- প্রয়োগ করলে Cl^- ক্ষতিকারক প্রভাব কমে যায়, কিন্তু এই সার দ্রুত দ্রবীভূত হয়ে মৃত্তিকার লবণাক্ততা বৃদ্ধি করতে পারে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন Cl পরিশোষণ বৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু সোডিক (sodic) লবণাক্ত মৃত্তিকার pH কমিয়ে দেয়। ফসফেট প্রয়োগ করলে, যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্যালসিয়াম অপ্রাপ্য হয় তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে লবণাক্ততার ক্ষতিকারক প্রভাব আরও বৃদ্ধি করে। তবে লোনা মৃত্তিকায় জন্মানোর জন্য লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত বাছাই করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। ধান, গম ইত্যাদি শস্যসহ অনেক শস্য নিয়ে এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে।

অম্লীয় মৃত্তিকা (Acid Soil)

খনিজ মৌল পরিশোষণের সময় উদ্ভিদ কর্তৃক ক্যাটায়ন গ্রহণ এবং প্রোটন (H^+) ত্যাগের ফলে মৃত্তিকা অম্ল হয়। অ্যামোনিক্যাল নাইট্রোজেন, জৈবিক কার্বনের বিয়োজন হলে অথবা অ্যামোনিয়াম লবণ হিসেবে মৃত্তিকায় প্রয়োগ করলে, এর জারণেও অম্লকরণ (acidification) হয়। এছাড়াও গ্রানাইট অথবা যেসব মাতৃ পদার্থে ক্ষারীয় খনিজ কম আছে তা থেকে উৎপন্ন মৃত্তিকা অম্লীয় হয়। যে সমস্ত অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং তাপমাত্রাও বেশি, সেসব অঞ্চলে ক্ষারীয় লবণ দ্রবীভূত হয় এবং চুইয়ে দূরে সরে যায় এবং কার্বন ডাই–অক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার জন্য সৃষ্ট প্রোটন ক্যাটায়নকে অপসারণ করে।

pH হ্রাসের সাথে সাথে দ্রবীভূত অ্যালুমিনিয়াম এবং লোহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এই আয়নযুক্ত যৌগের আর্দ্রবিশ্লেষণ হয়। আর্দ্রবিশ্লেষণে উৎপন্ন পদার্থ, বিশেষ করে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন এবং লোহার আয়ন, কার্যকরভাবে বিনিময়যোগ্য ক্যাটায়নকে অপসারিত করে। কোনো কোনো এলাকার মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে সালফাইড থাকে। জারণের মাধ্যমে সালফাইড সালফেটে পরিণত হলে মৃত্তিকা খুব অম্লীয় হয়।

অধিক অম্লীয় মৃত্তিকায় সব উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। এগুলিকে সাধারণভাবে অম্ল অসহিষ্ণু উদ্ভিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। অনেক এলাকায় এই উদ্ভিদকে জন্মানোর জন্য চুনাপাথর (lime stone) ব্যবহার করা হয়।

অধিক অম্লীয় মৃত্তিকায় খনিজ লবণ পরিশোষণের সময় হাইড্রোজেন আয়ন অন্যান্য ক্যাটায়নের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং মূলের ক্ষতিসাধন করে। অম্লীয় মৃত্তিকায় কোনো কোনো মৌল অল্প পরিমাণে, কোনো কোনো মৌল অধিক পরিমাণে এবং কতকগুলো আবার উদ্ভিদের ক্ষতিকারক (toxic) মাত্রায় থাকে। বিভিন্ন রাসায়নিক অবস্থায় দ্রবণীয় অ্যালুমিনিয়াম ক্ষতিকারক মাত্রায় থাকে। অজৈব মনোমেরিক অবস্থার চারটির সবগুলোই [AL^{3+}, $AL(OH)^{2+}$, $AL(OH)_2^+$ এবং $AL(OH)^-_4$] এবং জৈবভাবে সংযুক্ত অ্যালুমিনিয়ামের কমপক্ষে কয়েকটির ক্ষতিকারক প্রভাব আছে। অম্লীয় মৃত্তিকায় অ্যালুমিনিয়াম ছাড়াও অতিরিক্ত ম্যাঙ্গানিজ (M_n^{2+}) এবং লৌহ (Fe^{3+}) উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। বহু ওর পুষ্টি উপাদানের মধ্যে পটাশিয়াম বিনিময় স্থান থেকে অপসারিত হয় এবং চোয়ানোর মাধ্যমে দূরে সরে যায়; ফসফরাসের প্রাপ্যতাও কমে যায়।

অতি ক্ষারীয় মৃত্তিকায় উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যে মৌলগুলো অপর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, তা হলো নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম এবং মলিবডেনাম। অধিকাংশ মৃত্তিকায় ও খুব নিম্ন pH–এ এই চারটির একটি বা একাধিক মৌলের অভাব অস্পষ্ট থাকে অ্যালুমিনিয়াম অথবা সম্ভবত ম্যাঙ্গানিজের ক্ষতিকারক প্রভাবের জন্য। নাইট্রোজেন যোগান, গ্রহণ ব্যবহারের উপর অম্লীয় অবস্থার প্রভাব আছে। যে pH এ জৈব নাইট্রোজেন খনিজীকরণ এবং নাইট্রিফিকেশন হ্রাস পায় তা হলো যথাক্রমে ৬.০ থেকে ৬.৫ এবং ৬.৬ থেকে ৮.০ এবং pH এর মান ৪.৫ এর কম হলে শেষোক্ত প্রক্রিয়া বস্তুত বন্ধ হয়ে যায়। অম্লীয় অবস্থায় অধিকাংশ উদ্ভিদ অ্যামোনিয়ামের তুলনায় নাইট্রেট অধিক দ্রুত গ্রহণ করে। নাইট্রেট রিডাকটেজের ক্রিয়াকে দ্রবণীয় অ্যালুমিনিয়াম প্রভাবিত করে বলে, অম্লীয় অবস্থায় খনিজ নাইট্রোজেনের ব্যবহার দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় অ্যালুমিনিয়াম থাকার জন্য মূলের বৃদ্ধি, কোষ বিভাজন এবং কোষ দীর্ঘকরণ দারুনভাবে ব্যাহত হয়। সাধারণত মূলের তুলনায় বিটপে অ্যালুমিনিয়াম কম থাকে

এবং এই মাত্রা বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন রকম। পোষক উদ্ভিদের উপর প্রভাব ছাড়াও পোষক মূলে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ এবং সুচারুরূপে কার্য সম্পাদনের উপর অ্যালুমিনিয়ামের প্রভাব আছে।

অতিরিক্ত অম্লীয় মৃত্তিকার pH বৃদ্ধির জন্য গুড়া করা চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। এর জন্য দ্রবণীয় এবং বিনিময়যোগ্য হাইড্রোজেন, অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ আয়নের পরিমাণ কমে যায়, দ্রবণীয় এবং বিনিময়যোগ্য ক্যালসিয়াম আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, মলিবডেনামের দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং যদি ডলোমিটিক চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়, তাহলে দ্রবণীয় এবং বিনিময়যোগ্য ম্যাগনেশিয়াম বৃদ্ধি পায়।

সাধারণত দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বৃদ্ধির তুলনায় দ্রবণীয় হাইড্রোজেন, অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ বৃদ্ধির উপকারিতা বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুষ্টি উপাদান যোগ করে অম্লীয় মৃত্তিকার ক্ষতিকারক প্রভাব সফলভাবে দূর করা যায়। উচ্চ অ্যালুমিনিয়াম পরিবেশে দ্রবণীয় ফসফরাস প্রয়োগ করলে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়তা হয়। উদ্ভিদের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে অ্যালুমিনিয়ামের অচলতায় ফসফরাস সহায়তা করে। খুব বেশি অদ্রবণীয় অ্যালুমিনোফসফেট যৌগ তৈরি হলেও যে সমস্ত উদ্ভিদের ফসফরাস পরিশোষণের কার্যকর কৌশল আছে, তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে ফসফরাস পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খরচের কথা বিবেচনা করলে অম্লীয় মৃত্তিকায় ফসফরাস প্রয়োগের তুলনায় চুনাপাথর প্রয়োগ অধিকতর সুবিধাজনক। যেহেতু উদ্ভিদের মধ্যে অম্লীয় মৃত্তিকা সহিষ্ণুতার আন্তঃপ্রজাতি এবং অন্তঃপ্রজাতি পার্থক্য আছে, সেহেতু উদ্ভিদের বৃদ্ধির উন্নতির জন্য বংশগতীয় পদ্ধতিও কার্যকর।

চুনাময় মৃত্তিকা (Calcareous Soil)

খুব বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটযুক্ত (চুনাপাথর, চক এবং অন্যান্য খনিজ ও জৈবজাত তলানি) মাতৃ-পদার্থ থেকে উৎপন্ন মৃত্তিকার pH ৭ অথবা এর চেয়ে বেশি থাকে, এই মৃত্তিকাকে চুনাময় মৃত্তিকা বলে। মৃত্তিকার দ্রবণের প্রকৃতিতে কার্বোনেট বেশ প্রভাবিত করে এবং এর সাথে খনিজ যৌল লেগে থাকে। কোনো কোনো চুনাময় মৃত্তিকায় সোডিয়াম কার্বোনেট জমা হয়। অতিরিক্ত সোডিক পরিবেশে, অধিকাংশ উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়।

বিভিন্ন পরিবেশের জন্য চুনাময় মৃত্তিকায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন হয়। কম বৃষ্টিপাত এলাকায় পানি স্বল্পতা বৃদ্ধির প্রধান প্রতিবন্ধক। অধিক বৃষ্টিপাত এলাকায়, অপর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান, বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস বৃদ্ধি সীমাবদ্ধকরণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। চুনাময় মৃত্তিকায় উদ্ভিদের টিকে থাকা এবং বৃদ্ধির ক্ষমতার আন্তঃপ্রজাতি ও অন্তঃপ্রজাতি পার্থক্য আছে। এই মৃত্তিকায় যে সমস্ত উদ্ভিদ ভালভাবে বৃদ্ধি পায়, তাদেরকে ক্যালসিকোল (calcicole) এবং যারা ভালভাবে বৃদ্ধি পায় না, তাদেরকে ক্যালসিফিউজ (calcifuge) বলে।

চাষাবাদ করার জন্য চুনা মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়, বিশেষ করে যখন উদ্ভিদের ভাল বৃদ্ধির জন্য পানিসেচ করা হয়। ক্ষয়ীভবন এবং জৈবিক ক্রিয়াকলাপ ত্বরান্বিত হয়, খনিজ লবণ মূল অঞ্চল থেকে দূরে সরে যেতে পারে, বায়ু চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়, মৃত্তিকার দ্রবণের আয়োনিক মাত্রা হ্রাস পেতে পারে, কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে এবং দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম, pH ও রেডক্স (Redox) অবস্থায় পরিবর্তন হতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে মৃত্তিকার উপর এই প্রভাবগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক আছে।

চুনাময় মৃত্তিকায় নাইট্রোজেনের অভাব প্রকটভাবে দেখা যায়। কোনো কোনো চুনাময় মৃত্তিকা এলাকার শুষ্ক আবহাওয়া জৈব পদার্থ জমাকরণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নয়, তাই মোট নাইট্রোজেন পরিমাণ কম; পানি স্বল্পতার জন্য জৈবিক ক্রিয়া সীমিত হয়।

চুনাময় মৃত্তিকায় লোহার ঘাটতি থাকায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। উদ্ভিদে লোহার স্বাভাবিক জন্য সাধারণত নতুন পাতা হলুদ হয়ে যায়। একে চুন প্ররোচিত ক্লোরোসিস বলে। চুনাময় মৃত্তিকায় চাষাবাদ এবং পানিসেচের জন্য দস্তার (Zn) ঘাটতি হয়। pH বৃদ্ধি পেলে, বিশেষ করে ৮ এর বেশি হলে, অধিক পরিমাণে আয়োনিক দস্তা $Zn(OH)^+$ এবং $Zn(OH)_3^-$ এ পরিণত হয় যা Zn^{2+} এর তুলনায় উদ্ভিদ কম পরিশোষণ করতে পারে। ফসফরাস ঘাটতি সার প্রয়োগের ফলে চুনাময় মৃত্তিকায় জন্মানো উদ্ভিদের দস্তার ঘাটতির লক্ষণ দেখা যায়। মূল থেকে বিটপে দস্তা স্থানান্তরে ফসফরাস বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

চুনাময় মৃত্তিকায় শস্য উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় (১) মৃত্তিকার pH কমানো, (২) এমন পুষ্টি উপাদান প্রয়োগ করা যা অধিক pH-এ অপেক্ষাকৃত বেশি অদ্রবণীয়, (৩) HCO_3^- যাতে কম তৈরি হয়, সেজন্য সুবিবেচনার সাথে পানিসেচ করতে হবে, (৪) খনিজ মৌলের অত্যধিক প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে (যেমন– ফসফরাস, যা অন্যান্য মৌলের ঘাটতিকে প্ররোচিত করে, যেমন– দস্তা), (৫) মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং (৬) মূল অঞ্চলে অবস্থিত উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকারক পদার্থ দূর করতে হবে।

যদি কোনো মৃত্তিকা চুনাময় এবং সোডিক হয়, তাহলে pH কমানো এবং এই মৃত্তিকা উদ্ভিদ জন্মানোর মতো উপযুক্ত করা বেশ জটিল। কেবল দ্রবণীয় সোডিয়াম নয়, বিনিময় স্থানে অবস্থিত সোডিয়ামকেও দূর করতে হবে। কারণ মৃত্তিকার ভৌত গঠনের উপর সোডিয়ামের প্রভাবের জন্য এ মৃত্তিকায় চোয়ানো দ্রুত হয় না।

সোডিক চুনাময় মৃত্তিকায় ক্যালসিয়ামের দ্রবণীয়তা এবং সোডিয়াম দূর করার জন্য সালফিউরিক এসিড প্রয়োগ খুব কার্যকর পন্থা। অনেক শিল্পজাত উপজাত দ্রব্য যাতে সালফিউরিক এসিড থাকে, সোডিক মৃত্তিকা পুনরুদ্ধারের জন্য এসব দ্রব্য কার্যকরী। তবে এগুলো ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার এই জন্য যে, কোনো কোনো দ্রব্যে এমন কিছু থাকতে পারে যা পরিবেশ, মানুষ ও উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর। সোডিক মৃত্তিকায় মৌল সালফার প্রয়োগেও সালফিউরিক এসিডের মতো সোডিয়াম চোয়ানোযোগ্য হয়; কিন্তু পুনরুদ্ধারের হার সাধারণত মন্থর হয়, কারণ সালফার জারণের জন্য জৈবিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন।

অম্লকরণ প্রভাবের জন্য, চুনাময় মৃত্তিকার নাইট্রোজেন ঘাটতি পূরণের জন্য নাইট্রেটের তুলনায় অ্যামোনিক্যাল নাইট্রোজেন অধিক কার্যকর। উদ্বায়ীজনিত অ্যামোনিয়া হারানোর, বিশেষ করে শুষ্ক মৃত্তিকায়, সম্ভাবনাও বিবেচনা করে দেখা উচিৎ। চুনাময় মৃত্তিকায় উচ্চ pH থাকায় নাইট্রিফিকেশনের সুবিধা হয়; তাই পানি ও তাপমাত্রা যদি অনুকূল হয়, তাহলে অ্যামোনিক্যাল নাইট্রোজেন দ্রুত নাইট্রেটে পরিণত হয়। একারণে উদ্বায়ীজনিত ঘাটতি কম হয়। অ্যামোনিক্যাল খনিজ লবণ ও ইউরিয়ার উদ্বায়ীজনিত ক্ষতি কমানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম মৃত্তিকায় থাকা দরকার।

চুনাময় মৃত্তিকায় ফসফরাসের ঘাটতি পূরণের জন্য এমন ফসফরাসজাতীয় সার ব্যবহার করা উচিৎ যা মৃত্তিকায় অতিরিক্ত ক্ষার তৈরি না করে। তাই অ্যামোনিয়াম ফসফেটের সম্পৃক্ত দ্রবণ ক্ষারীয় এবং মনোক্যালসিয়াম ফসফেট মনোঅ্যামোনিয়াম ফসফেটের দ্রবণ অম্লীয়। যখন দ্রবণীয় অর্থোফসফেট সার চুনাময় মৃত্তিকায় প্রয়োগ করা হয়, তখন ডাইক্যালসিয়াম ফসফেট ডাইহাইড্রেট এবং অকটাক্যালসিয়াম সালফেটের মতো অধিকতর অদ্রবণীয় যৌগ তৈরি হতে পারে। উচ্চ মাত্রার ফসফরাস সার ব্যবহার করে দস্তার ঘাটতি পূরণের বিষয়টি বিবেচনা করার দরকার আছে। চুনাময় মৃত্তিকায় উদ্ভিদের জন্য ফসফরাসের উৎস হিসেবে কাঁচা পাথুরে ফসফেট কার্যকরী নয়।

ধাতু-কলুষিত মৃত্তিকা (Metal Contaminated Soil)

কতিপয় মৌল সাধারণত ক্ষতিকারক মাত্রায় মৃত্তিকায় [illegible] কতগুলো [illegible] সেলেনিয়াম এবং আর্সেনিক প্রাকৃতিক ভাবে ক্ষতিকারক মাত্রায় পৌঁছাতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর মধ্যে আছে তামা, দস্তা, সীসা (Pb), [illegible] এবং ক্যাডমিয়াম (Cd), ক্রোমিয়াম (Cr), কোবাল্ট (Co) এবং নিকেল (Ni)। এসকল ধাতুর খনিজ প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া যায়। যদিও প্রাকৃতিক অবস্থায় ধাতু-কলুষিত মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তবে বিজ্ঞানীদের বেশি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে কৃত্রিমভাবে কলুষিত মৃত্তিকার প্রতি। এটি সাধারণত যেখানে খনি অথবা ধাতু-গলানো কারখানার বর্জ্য পদার্থ স্তূপীকৃত করা হয়। একইভাবে, বায়ুমণ্ডল থেকে পতিত ধাতুর জন্যও মৃত্তিকা কলুষিত হতে পারে। নিম্ন pH-এ ধাতুর আয়নের মুক্তকরণ সুবিধাজনক। যেমন কপার সালফাইড অথবা কার্বোনেট খনিজ থাকে। ফেরিক সালফেটের সাথে কপার সালফাইড বিক্রিয়া করে দ্রবণীয় তামা এবং সালফেট আয়ন মুক্ত হয়। ফেরিক সালফাইডের উপর জারণকারী-ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ার ফলে খনিজ থেকে পরোক্ষভাবে তামা, নিকেল, দস্তা, আর্সেনিক এবং এমন কি মলিবডেনাম মুক্ত হয়।

খনিজ মৌলজনিত পীড়ন প্রতিরোধ (Resistance to Mineral Stress)

কতকগুলো উদ্ভিদ এমন মাত্রার খনিজ মৌল সমৃদ্ধ মৃত্তিকায় জন্মাতে পারে যা অন্য উদ্ভিদের জন্য খুবই ক্ষতিকারক। চারটি প্রধান কৌশলের মাধ্যমে এটি ঘটে। এগুলো হলো :

(ক) এড়ানো (Escape) : যেখানে পীড়ন ঋতুগত, সেখানে সবচেয়ে অনুকূল সময়ে জীবনচক্রের সক্রিয় পর্যায় সম্পন্ন করে।

(খ) বর্জন (Exclusion) : মৃত্তিকায় ক্ষতিকারক আয়ন চিনতে উদ্ভিদ সক্ষম এবং এর পরিশোষণে বাধা দেয়, ফলে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

(গ) উন্নতি (Amelioration) : উদ্ভিদ ক্ষতিকারক আয়ন পরিশোষণ করতে পারে, কিন্তু এর উপর এমন ক্রিয়া করে যাতে করে এর ক্ষতিকারক প্রভাব অনেক কমে যায়। এটি ঘটে চিলেশন (chelation), লঘুকরণ (dilution), কোনো বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধকরণ (localization) অথবা এমন কি নিঃসরণের (excretion) মাধ্যমে।

(ঘ) সহিষ্ণুতা (Tolerance) : উদ্ভিদে এমন বিপাকীয় পদ্ধতি থাকে যার জন্য ক্ষতিকারক মাত্রার মৌলের উপস্থিতিতেও শারীরতাত্ত্বিক ক্রিয়া চলতে পারে।

সবচেয়ে প্রতিরোধী প্রজাতি উপরোক্ত একাধিক কৌশল ব্যবহার করে।

মৃত্তিকার খনিজ মৌলের ঘাটতি পূরণে অথবা এর ক্ষতিকারক প্রভাব দূর করতে যে সার ব্যবহার করা হয়, তার মূল্য বর্তমানে অনেক বেড়েছে। তাই, ব্যাপকভাবে মৃত্তিকার পরিবর্তন না করে, এমন জাতটি উদ্ভবনের দিকে বিজ্ঞানীরা বেশি নজর দিয়েছেন, যা এই পীড়ন সহ্য করে ভালভাবে টিকে থাকতে পারে। কোনো মৌলের ঘাটতি হলে এরকম মৃত্তিকা থেকে তা পরিশোষণ এবং কোনো মৌল অতিরিক্ত হলে তা উদ্ভিদ থেকে বের করে দেবার বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা শস্য উদ্ভিদে আছে। যেমন- ব্রাজিলের বিজ্ঞানীরা গম ও সরগমের এমন জাতটি উদ্ভাবন করেছেন যা অ্যালুমিনিয়াম সহিষ্ণু এবং নিম্ন pH টিকে থাকতে পারে, এমন অবস্থায় অনেক জাতের ফসফরাস ঘাটতি হয়। সংবেদনশীল জাতের তুলনায় প্রতিরোধী জাতের সেমিনাল এবং অস্থানিক (nodal) মূল উভয়েই প্রায় দ্বিগুণ। অম্লীয় মৃত্তিকায় উপযুক্ত মাত্রায় চুন প্রয়োগ করে এবং ফসফরাস যোগ করে ক্ষতিকারক প্রভাব অনেকাংশে দূর করা যায় ; তবে এটিও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাজনক হবে না।

খনিজ যৌগের কার্যকরীভাবে পরিশোষণ ও [illegible] বংশপরম্পরায় বাহিত হয়। তাই উদ্ভিদ প্রজননের বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগ করে [illegible] পীড়ন সহিষ্ণু শস্য উদ্ভিদের জাতটি হয়তো ভবিষ্যতে উদ্ভাবিত [illegible]

বায়ু দূষণজনিত পীড়ন (Air pollution stess)

বর্তমানে শস্য উৎপাদনে একটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে বায়ু দূষণজনিত কারণে। [illegible] এবং ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে জানা না গেলেও, এই ক্ষতির পরিমাণ যে যথেষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অধিক সালফারযুক্ত জীবাশ্ম জ্বালানির দহনে এবং মোটর ইঞ্জিনে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের অসম্পূর্ণ দহনে সৃষ্ট জারক (oxidant) থেকে বায়ু দূষিত হয়। বায়ু দূষণের একক উৎস হিসেবে শেষোক্তটি সবচেয়ে কার্যকর। একটি পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ১৯৭০ সনে কেবল পেট্রোলিয়ামজাত দূষণের জন্য উদ্ভিদের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোটরযান থেকে নির্গত হয়েছে ১১০ মিলিয়ন টন এবং শিল্প কারখানা থেকে নির্গত হয়েছে ২১ মিলিয়ন টন এবং শিল্প–কারখানা থেকে নির্গত হয়েছে ২১ মিলিয়ন টন দূষক পদার্থ। বর্তমানে যে এই পরিমাণ অনেক বেড়েছে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

মোটরযানের ইঞ্জিনে জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহনে হাইড্রোকার্বনের অংশ তৈরি হয় যা জারিত যৌগ এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড, যেমন NO_2 তৈরির অনুঘটক হিসেবে কাজ করে আলোর প্রভাবে NO_2 ভেঙে NO এবং O হয়। এরপর আণবিক অক্সিজেনের (O_2) সাথে O যুক্ত হয়ে ওজোন (O_3) তৈরি হয় যা উদ্ভিদের জন্য খুবই ক্ষতিকারক (এমন কি ০.৫ পিপিএম মাত্রার নিচেও)। নাইট্রোজেন অক্সাইড হাইড্রোকার্বনের অংশ এবং ওজোনের সঙ্গে ক্রিয়া করে পার-অক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট (PAN) তৈরি করতে পারে, এটি উদ্ভিদের জন্য খুবই ক্ষতিকারক যৌগ।

ওজোন সম্পাতের (expousure) আগে যে সমস্ত উদ্ভিদ নিম্ন তাপমাত্রায় (১০ থেকে ১৩ সেলসিয়াস) থাকে, তাদের তুলনায় যে সমস্ত উদ্ভিদ উচ্চ তাপমাত্রায় (২১ থেকে ৩২ সেলসিয়াস) থাকে, তারা ওজোনে বেশি সংবেদনশীল। তবে সম্পাতের সময় নিম্ন তাপমাত্রায় অধিক ক্ষতি হয়। নিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতায় জন্মানো উদ্ভিদের তুলনায় উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় জন্মানো উদ্ভিদ ওজোনে বেশি সংবেদনশীল। উচ্চ আলোতে জন্মানো উদ্ভিদের তুলনায় নিম্ন আলোতে (পূর্ণ সৌরবিকিরণের শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ) জন্মানো উদ্ভিদ বেশি সংবেদনশীল। জীবাশ্ম জ্বালানি এবং খনিজ-শোধন শিল্পের জৈব পদার্থ থেকে এবং সালফিউরিক এসিড উৎপাদনের সময় প্রধানত সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। সালফার ডাই-অক্সাইড পত্ররন্ধ্র দিয়ে পাতায় প্রবেশ করে এবং জারিত হয়ে খুবই বিষাক্ত সালফাইটে (SO_3) পরিণত হয় এবং পরবর্তীকালে [illegible] সালফেটে (SO_4) রূপান্তরিত হয়।

খুব ক্ষতিকারক পারঅক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট (PAN) এর উদ্ভিদের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব আলোর উপর নির্ভরশীল। অত্যাধিক PAN সংবেদনশীল উদ্ভিদের মধ্যে বিন, লেটুস এবং যই প্রধান। মাঝারি প্রতিরোধী উদ্ভিদের মধ্যে গম এবং তামাক।

প্রতিরোধী উদ্ভিদের মধ্যে তুলা এবং ভুট্টা। সালফহাইড্রাল গ্রুপের (SH) সাথে PAN বিক্রিয়া করে যখন অধিক পরিমাণে SH লভ্য হয়, তখন উদ্ভিদ বেশি সংবেদনশীল হয়। বায়ু দূষণজনিত। বায়ু দূষণজনিত কারণে পাতা বেশি আক্রান্ত হয়, তবে মূলের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। আর বায়ু দূষক এককভাবে ক্রিয়া না করে যৌথভাবেও ক্রিয়া করতে পারে।

মৃত্তিকায় পানি ঘাটতি হলে উদ্ভিদ বায়ুদূষণে সাধারণত অধিক সহিষ্ণু হয় এবং প্রয়োজনীয় খনিজ যৌগের ঘাটতি কিংবা অতিরিক্ত থাকার তুলনায় সর্বোত্তম পরিমাণ খনিজ যৌগ থাকলে উদ্ভিদ অধিক সংবেদনশীল হয়।

সপ্তম অধ্যায়

সালোকসংশ্লেষণ, অন্ধকার শ্বসন ও আলোকশ্বসন

সালোকসংশ্লেষণ

শস্য উদ্ভিদের শুষ্ক পদার্থের শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ কার্বনঘটিত পদার্থ যা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি হয়। সালোকসংশ্লেষণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে তিনটি আংশিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত করা যায়। এই তিনটি আবার পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ পারিবেশিক প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল।

এই আংশিক প্রক্রিয়াগুলোর প্রথমটি হলো ক্লোরোপ্লাস্টে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপন যা নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় :

$$F = -D\delta [CO_2]/\delta \times = g'\Delta [CO_2] \text{ .... } (৭.১)$$

এক্ষেত্রে $\Delta [CO_2]$ হলো কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রার পার্থক্য এবং $\times$ হলো বহিঃস্থ বায়ু ও ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে পথের দৈর্ঘ্য এবং $g'(=DCO_2/\times)$ হলো কার্বন ডাই অক্সাইডের ব্যাপনের পরিবাহকতা। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপনের পথ বেশ জটিল এবং তা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি আলোক-রাসায়নিক, এতে ক্লোরোপ্লাস্টের রঞ্জক পদার্থগুলো আলোক শোষণ করে। আলোকশক্তি ও অজৈব ফসফেট (Pi) এতে অংশগ্রহণ করে এবং পানিকে ভেঙে আণবিক অক্সিজেন তৈরি হয়। সেই সাথে বিজারিত নিকোটিনামাইড অ্যাডিনিন ডাই-নিউক্লিওটাইড ফসফেট ($NADPH_2$) ও ATP তৈরি হয়। সমগ্র বিক্রিয়াটি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$4H_2O + 2ADP + 2NADP^+ + 2Pi \rightarrow O_2 + 2H_2O + 2ATP$$
$$+ 2\,NADPH + 2H^+ \text{ .... } (৭.২)$$

এই প্রক্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট কর্তৃক সৌরবিকিরণ শোষণের পরিমাণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এর উপর কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা অথবা তাপমাত্রার তেমন কোনো প্রভাব নেই।

তৃতীয় প্রক্রিয়ায়, ধরা যাক C_3 গতিপথ কার্যকর, কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বিজারিত করে কার্বোহাইড্রেট এবং অন্যান্য যৌগ তৈরিতে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণকারী রাইবুলোজ বিস-ফসফেট পুনঃসংশ্লেষণে আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপাদিত $NADPH+H^+$ এবং ATP ব্যবহৃত হয়।

$$3CO_2 + 9ATP + 6NADPH + 6H^+ \rightarrow Triose - P + 6NADP^+$$
$$+ 9ADP + 8Pi + 3H_2O \text{ .... } (৭.৩)$$

এই বিজারণ অন্ধকারে চলতে পারে এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

সম্পূর্ণ সালোকসংশ্লেষণ বিক্রিয়াকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়,

$CO_2 + 2H_2O \rightarrow (CH_2O) + H_2O + O_2$ .... (৭.৪)

উপরোক্ত তিনটি প্রক্রিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক ৭.১ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। নিম্ন মাত্রার বিকিরণে আলোকরাসায়নিক প্রক্রিয়া সীমায়িত এবং সালোকসংশ্লেষণের হার বিকিরণের উপর নির্ভরশীল। বিকিরণ বৃদ্ধির সাথে সাথে কার্বন ডাই-অক্সাইড সরবরাহ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং পরিশেষে এটিও সীমায়িত হয়। বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক কার্বন ডাই-অক্সাইড ঘনমাত্রায় (০.০৩৫%), সালোকসংশ্লেষণ হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব খুব কম। উচ্চ মাত্রার বিকিরণে এবং উচ্চ ঘনমাত্রার কার্বন ডাই-অক্সাইডে (০.১৩%), তাপমাত্রা তথা প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো সীমায়িত হয় এবং তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস থেকে ৩০° সেলসিয়াসে বৃদ্ধির জন্য সালোকসংশ্লেষণের হার শতকরা ৫০ ভাগ বেড়ে যায়। ৭.১ এর চিত্র প্রতিক্রিয়া কার্ভকে নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় :

$P= aQv/(b+Qv)$...................... (৭.৫)

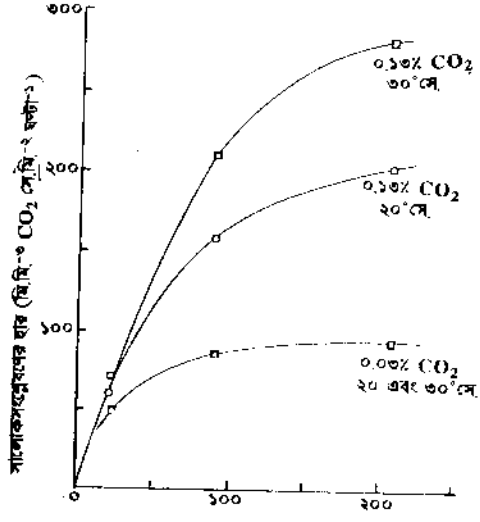

চিত্র ৭.১ : ৩০°সেলসিয়াস (বর্গক্ষেত্র) এবং ২০°সেলসিয়াস (বৃত্ত) তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হারের উপর বিকিরণ, তাপমাত্রা এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রার প্রভাব।

এখানে a হলো বিকিরণের, Qv, সাথে সালোকসংশ্লেষণের (P) হারের অ্যাসিম্পোটোট (asymptote অর্থাৎ সর্বোচ্চ সম্ভাব্য সালোকসংশ্লেষণের হার) এবং a/b হলো কার্ভের প্রাথমিক স্লোপ (slope) (অর্থাৎ আলোকরাসায়নিক বিক্রিয়ার দক্ষতা)। এখানে a আনুমানিক মান ছিল ৩০০, ৯২৬ এবং ১৫৬৩ ঘনমিলিমিটার কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রতি মিটারে প্রতি সেকেন্ডে এবং b

এর মান ছিল ২৮.৫, ১০০ ও ১৬৫ ওয়াট প্রতি বর্গমিটারে (Wm^{-2}) যথাক্রমে ০.০৩% কার্বন ডাই-অক্সাইড, ০.১৩% কার্বন ডাই অক্সাইড ২০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ০.১৩% কার্বন ডাই-অক্সাইড ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার জন্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তিনটি কার্ভের জন্যই a/b ছিল প্রায় একই রকম। তবে এরকম সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন, বিশেষ করে যখন কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা বৃদ্ধির জন্য পত্ররন্ধ্রীয় পরিবাহকতা হ্রাস পায়। যদি পত্ররন্ধ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিহার করা হয় এবং তাপমাত্রা সর্বোত্তম হয়, তাহলে অন্তঃস্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড ঘনমাত্রার প্রায় ০.০৩% থেকে ০.১% পরিসরে একই প্রকারের সীমায়িত কার্ভ দেখা যায়। এটি নির্দেশ করে যে, কার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়া সম্পৃক্ত হয়েছে।

সালোকসংশ্লেষণের আলোক-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক (Photochemical Aspects of Photosynthesis)

সৌরবিকিরণ (Solar radiation)

যে পরিমাণ সৌরবিকিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পৌঁছায় (সৌর ধ্রুবক) তা হলো ১৩৫৮ ওয়াট প্রতি বর্গমিটারের (Wm^{-2})। বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করার সময় শোষণ এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার জন্য (scattering) সৌরবিকিরণ শক্তি হারায় এবং এজন্য মাত্র ৯১০ ওয়াট প্রতি বর্গমিটারে (বিশ্ব গড়) ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায়। এর মধ্যে ৪২০ ওয়াট প্রতি বর্গমিটারে সলোকসংশ্লেষণীয় সক্রিয় বিকিরণ (PAR) (৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের) এবং আবার এই বিকিরণের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ উদ্ভিদ শোষণ করে। শোষিত শক্তির শতকরা ৯৫ ভাগের মতো তাপশক্তি হিসেবে নষ্ট হয় এবং শতকরা ৫ ভাগেরও কম শক্তি সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

বায়ুমণ্ডলে সৌরবিকিরণ প্রবেশ করলে শক্তি বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে যা মেঘের আচ্ছাদন। বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণার পরিমাণ এবং এজাতীয় অন্যান্য দিন-রাত এবং ঋতুগত ভৌত প্রভাবকের উপর নির্ভরশীল (চিত্র ৭.২)।

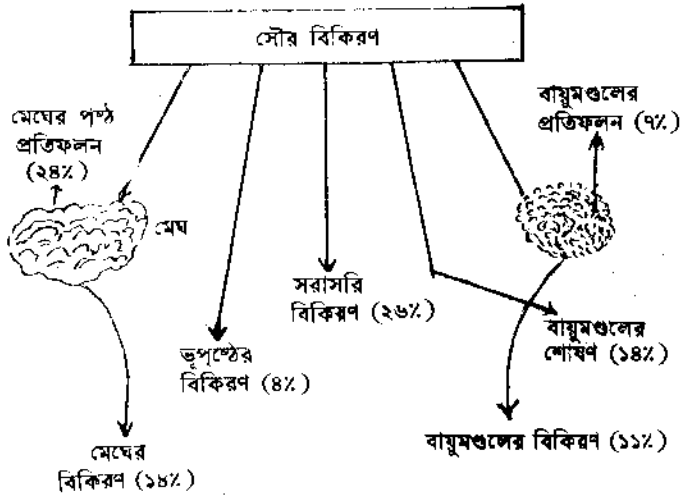

চিত্র ৭.২ : আপাতত সৌর বিকিরণের পরিণতির একটি সাধারণীকৃত নকশা।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সারা বছরে গড় হিসেবে সৌর বিকিরণের প্রায় শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ শক্তি মেঘ এবং বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন প্রকার গ্যাস দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। মেঘ, ধূলিকণা এবং গ্যাসীয় পদার্থ সৌরশক্তির আরো শতকরা ২৫ ভাগ শোষণ করে যা বিক্ষিপ্ত (diffuse) অবস্থায় এবং একই পরিমাণ সৌরশক্তি সরাসরি (direct) ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায়। ভূ-পৃষ্ঠে পতিত সৌরশক্তির খুব সামান্য অংশ প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায় এবং এটি নির্ভর করে পৃষ্ঠে প্রতিফলিতা (reflectivity) বা অ্যালবেডোর (albedo) উপর।

সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠে আপতিত সৌরশক্তিকে দুটি উপাদানে ভাগ করা যায় সূর্য থেকে সরাসরি আপতিত শক্তি এবং বায়ুমণ্ডল এবং মেঘ থেকে ছড়িয়ে পড়া অথবা প্রতিফলিত শক্তি। সরাসরি সৌরবিকিরণের তুলনায়, বিক্ষিপ্ত বিকিরণের বর্ণালীগত (Spectral) গঠনের পার্থক্য আছে, কারণ দীর্ঘ–তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তুলনায় হ্রস্ব তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি বায়ুর অণু কর্তৃক বেশি ছড়িয়ে পড়ে, এর জন্য আকাশ নীল দেখায়। অবশ্য অধিকতর বড় কণা, যেমন ধূলিকণা এবং জলবিন্দু সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণকে একইভাবে ছড়িয়ে দেয় এজন্য মেঘাচ্ছন্ন আকাশ সাদা দেখায়। একটি পাতা কিংবা শস্যের ক্যানোপির উপর আপতিত সৌরবিকিরণ শোষিত (absorbed), প্রেরিত (transmit) অথবা প্রতিফলিত (reflect) হতে পারে। সৌর বর্ণালীর সালোকসংশ্লেষণীয় সক্রিয় বিকিরণের (PAR) শতকরা ৯০ ভাগ পাতা শোষণ করে এবং ৫০০ থেকে ৬০০ ন্যানোমিটারের মধ্যে সবচেয়ে কম শোষিত হয় (চিত্র ৭.৩)।

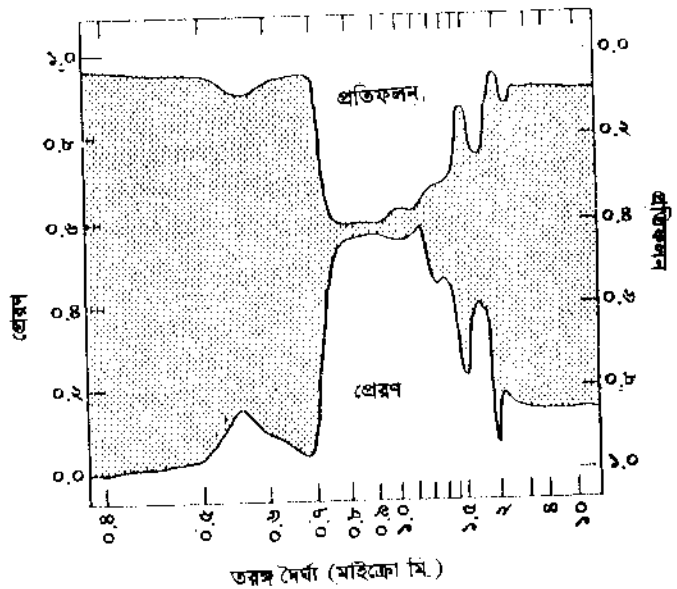

চিত্র ৭.৩ : একটি আদর্শ পাতা কর্তৃক সৌরবিকিরণ প্রেরণ, প্রতিফলন এবং শোষণ। বিন্দুর দ্বারা নকশাকাটা অংশে শোষিত অংশ।

অবলোহিত (infrared) অংশে (৭০০ থেকে ১২০০ ন্যানোমিটার) পাতা কর্তৃক সৌরবিকিরণ শোষণ হঠাৎ করে খুব হ্রাস পায় এবং সেই সাথে প্রতিফলন এবং প্রেরণত্ব বৃদ্ধি পায়। আপতিত

সৌরবিকিরণের প্রায় অর্ধাংশ এই [illegible] দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অংশ তরল পানি অধিক পরিমাণে শোষণ করে [illegible] থেকে প্রায় কিছুই প্রতিফলন এবং প্রেরণ হয় না। পাতায় যে পরিমাণ সৌরবিকিরণ শোষিত হয় তা ক্লোরোপ্লাস্টের রঞ্জকের মাত্রা এবং এদের সজ্জার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

যদিও এ পর্যন্ত সৌরবিকিরণকে শক্তি [illegible] হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, তবে সালোকসংশ্লেষণে বিকিরণের শোষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোয়ান্টা (quanta) হিসেবে বিবেচনা করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। একটি কোয়ান্টামে শক্তির পরিমাণ বিকিরণের ফ্রিকোয়েন্সির, v (নিউ), উপর নির্ভরশীল [illegible] এদের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় :

$$E=hv \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (৮.২)$$

এখানে E হলো কোয়ান্টামে শক্তির পরিমাণ [illegible] জুল (J) কোয়ান্টাম $^{-1}$] এবং h হলো প্লাঙ্কের ধ্রুবক ([illegible] জুল সেকেন্ড)।

সারণি ৮.১ : বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের বৈশিষ্ট্য

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ন্যানোমিটার)	[illegible]	[illegible]	৬০০	৭০০
তরঙ্গ সংখ্যা (প্রতি সেন্টিমিটারে)	[illegible]	[illegible] $\times১০^{৩}$	১৬.৭$\times১০^{৩}$	১৪.৩$\times১০^{৩}$
ফ্রিকোয়েন্সি (প্রতি সেকেন্ডে)	[illegible]	[illegible] $\times১০^{১৪}$	৫$\times১০^{১৪}$	৪.৫$\times১০^{১৪}$
প্রতি কোয়ান্টামে শক্তির পরিমাণ (জুল)	[illegible]	[illegible] $\times১০^{-১৯}$	৩.৩$\times১০^{-১৯}$	২.৮$\times১০^{-১৯}$

সালোকসংশ্লেষণে শক্তির [illegible] কোয়ান্টাম দক্ষতা, P/Ia, হিসেবে অধিকতর নিখুঁতভাবে [illegible] করা যায়। এক্ষেত্রে P হলো সালোকসংশ্লেষণের হার এবং Ia হলো শোষিত কোয়ান্টাম সংখ্যা। যেহেতু বিভিন্ন রঞ্জক [illegible] বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ বিভিন্ন মাত্রায় শোষণ করে এবং এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কোয়ান্টামের শক্তির পরিমাণ ভিন্নতর, সেহেতু কোয়ান্টাম ফলন (quantum yield) হলো বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি জটিল ফাংশন (function)।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে [illegible] যে সালোকসংশ্লেষণের আলোকবিক্রিয়ায় $NADPH+H^{+}$ এবং ATP তৈরি হয় যা অন্ধকার বিক্রিয়ায় কার্বন বিজারণে অংশগ্রহণ করে। প্রতি অণু অক্সিজেন নির্গমনের জন্য (অথবা প্রতি অণু কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারণ) আট কোয়ান্টা শক্তির দরকার [illegible] আলোর প্রখরতা প্রায় শূন্য অবস্থায় একটি পাতার সর্বনিম্ন ১২ থেকে ১৪ কোয়ান্টাম প্রয়োজন, এবং প্রতি আইনস্টাইন (einstein, E) শক্তির জন্য ০.০৭ থেকে ০.০৮ মোল কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারিত হয়। সূর্যালোকের দৃশ্যমান অংশের (PAR) প্রতি একক শক্তিতে [illegible] সংখ্যা প্রায় নির্দিষ্ট এবং যার পরিমাণ ৪.৬ মাইক্রো আইনস্টাইন প্রতি জুল (μE J^{-1})।

শস্য কর্তৃক সৌরবিকিরণ শোষণ (Interception of Solar Radiation by Crop)

যদি কোনো শস্যের [illegible] মৃত্তিকায় শস্য জন্মায় তার ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করা হয়, তাহলে পত্র [illegible] (Leaf area Index or LAI, অর্থাৎ মৃত্তিকার প্রতি একক ক্ষেত্রফলে পাতার ক্ষেত্রফল) [illegible] (LV, অর্থাৎ প্রতি একক আয়তনে পাতার

ক্ষেত্রফল) পাওয়া যায়। মৃত্তিকার ক্ষেত্রফলকে শস্যের উচ্চতা (h) দ্বারা গুণন করলে ক্যানোপির আয়তন পাওয়া যায় এবং LAI কে ক্যানোপির আয়তন দ্বারা ভাগ করলে পত্র ক্ষেত্রফল) পাওয়া যায়। শস্যের বিভিন্ন উচ্চতায় Lv ভিন্নতর হয়। নবীন শস্যে সর্বোচ্চ ঘনত্ব, LV, max, ২য় প্রায়ই ০.৫h উচ্চতায় এবং শস্যের বৃদ্ধি হলে এটি হয় ০.৭h উচ্চতায়। শস্যের বৃদ্ধির সাথে সাথে সাধারনত Lv. max বেড়ে যায় ; কারণ কাণ্ডের দীর্ঘীকরণের তুলনায় নতুন পাতা তৈরি ও প্রসারণের হার অপেক্ষাকৃত বেশি। বিভিন্ন প্রজাতিতে এবং বিভিন্ন পরিবেশে এটি পরিবর্তিত হয়। ঘন ক্লোভার শস্যে এটি প্রতি মিটারে ১০০ ($100m^{-1}$) পর্যন্ত হতে পারে, তবে সাধারণত এই মান এর এক–দশমাংশ অর্থাৎ প্রতি মিটারে ১০ হয়। যখন মৃত্তিকার উদ্ভিদ মোটামুটি সমানভাবে বণ্টন থাকে, যেমন কোনো কোনো শস্যের শীর্ষ (ear) নির্গমনের সময়, পাতাগুলো কম–বেশি আনুভূমিক তলে ছড়িয়ে থাকে। আনুভূমির সাথে প্রতিটি পত্রফলক অথবা পত্রফলকের কিছু অংশ যে কোণ (angle)তৈরি করে তা বিভিন্ন প্রজাতিতে এবং বৃদ্ধির বিভিন্ন দশায় ভিন্ন হয় ; ক্লোভার, কেল এবং বিনের মতো শস্যের ক্ষুদ্র কোণের প্রাধান্য থাকে, অপরপক্ষে ঘাসের নবীন পাতা অধিকতর খাড়া (erect) এবং পাতার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ইহা শায়িত (flatter)হয়। সুতরাং নবীন অবস্থায় অথবা ঘাসের স্ট্যান্ডের (stand) উপরের অংশে বৃহৎ কোণের পরিমাণ বেশি ; ঘাসের বয়স বৃদ্ধির সাথে অথবা ঘন ক্যানোপির নিচের স্তরে বিস্তার অধিকতর একরূপ হয়। ক্যানোপির গঠনের এই বিষয়গুলো শস্য কর্তৃক সৌরবিকিরণ শোষণকে প্রভাবিত করে।

সরাসরি (direct) এবং বিক্ষিপ্ত (diffuse) বিকিরণের ফ্লাক্স ঘনত্বের দুটি উপাদান যা ক্যানোপির বাইরে পৌঁছায় তা প্রাসঙ্গিক, এদুটোকে একসাথে বিবেচনা করাই সুবিধাজনক। একটি হলো দৃশ্যমান বিকিরণের অন্তর্গামী (incoming) ফ্লাক্স যা সালোকসংশ্লেষণে তাৎপর্যপূর্ণ। অপরটি হলো মোট আপতিত হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিকিরণের ফ্লাক্স যা দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের নিট বহির্গামী (outging) ফ্লাক্সের সাথে একত্রে বাষ্পীয়ভবনের জন্য নিট শক্তি সরবরাহ করে।

কোনো শস্যের শীর্ষে আপতিত একটি নির্দিষ্ট বর্ণালীর বিকিরণের ফ্লাক্সের (Qo) কথা বিবেচনা করা যাক। এর কিছু অংশ পাতা ফাঁক দিয়ে নিচে চলে যায় এবং কিছু অংশ পাতায় পতিত হয় ; শেষোক্ত বিকিরণের কিছু অংশ প্রতিফলিত (α) এবং কিছু অংশ প্রেরিত (y) হয়। ক্যানোপি অতিক্রমের সময় সৌরবিকিরণের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং একটি তল বরাবর লম্বা আনুভূমিক টিউব সোলারিমিটারের সাহায্যে বিকিরণের গড় মান পাওয়া যায়। কোনো তলের ফ্লাক্স সাধারণত নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয় :

$Q=Q_0 \exp(-KL)$, এক্ষেত্রে L হলো পাতার ক্ষেত্রফল। এক্সপোনেন্ট K দুটি প্যারামিটার প্রকাশ করে ; প্রেরণ গুণাঙ্ক y কেবল আলোক বর্ণালীর গঠনের উপর নির্ভরশীল এবং একটি ক্ষেত্রতত্ত্ব বিষয়ক উপাদান, K, যা শস্যের অভ্যন্তরে পাতার কোণের বিস্তারের সাথে এবং সূর্যের উচ্চতার সাথে পরিবর্তিত হয়। এগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত ; **$K=k/(1-y)$**। অধিকাংশ শস্যে $y=\alpha=$০.০৭ দৃশ্যমান বিকিরণের (৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার) জন্য, ০.৪১ অবলোহিত বিকিরণের (৭০০ থেকে ৩০০০ ন্যানোমিটার) জন্য এবং ০.২৫ মোট হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিকিরণের জন্য। তাই মোট অন্তর্গামী হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিকিরণ পরিমাপ করে যদি K নির্ণয় করা হয়, তাহলে $K=1.33k$; যদি দৃশ্যমান বিকিরণ থেকে নির্ণয় করা হয়, তাহলে $K=1.07k$।

পাতার কোণ এবং পাতার বিস্তার K এর মানকে প্রকটভাবে প্রভাবিত করে ; খাড়া পাতা এবং/অথবা ঝোপের মতো (Clumped) বিস্তারযুক্ত ক্যানোপির নিম্ন মান (দৃশ্যমান বিকিরণের জন্য ০.৩ থেকে ০.৫) এবং আনুভূমিক (horizontal) পাতার ক্যানোপির উচ্চমান (... থেকে ১.০) হয়। এছাড়াও, পাতা থেকে বিকিরণ প্রতিফলিত হওয়ার জন্য একটি উর্ধ্বমুখী ফ্লাক্স সৃষ্টি হয়

এবং পাতার ক্ষেত্রফলের (L) নিচে মোট ফ্লাক্স নির্ণয়ের জন্য এটি অবশ্যই নিম্নমুখী ফ্লাক্সের সাথে যোগ করতে হবে। একটি কাছাকাছি গ্রহণযোগ্য মানের জন্য নিম্নলিখিত সমীকরণ ব্যবহার করা যায় :

$$Q=Qo\ \exp\{-K(1-y-\infty)\ L\}\ ....\ (৭.৭)$$

এরপর প্রত্যেক স্তরে প্রতি একক পাতার ক্ষেত্রফল কর্তৃক শোষিত ফ্লাক্স সরাসরি নির্ণয় করা যায়।

সমীকরণে ৭.৭-এ দৃশ্যমান (৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার) এবং মোট হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (৩০০ থেকে ৩০০০ ন্যানোমিটার) বিকিরণ উল্লেখ করা হয়েছে। ক্যানোপির কোনো স্তরে মোট লভ্য শক্তির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের বিনিময় অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। ক্যানোপির বাইরে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের ঊর্ধ্বমুখী ফ্লাক্স সবসময়ই আকাশ থেকে নিম্নমুখী ফ্লাক্স থেকে বেশি উষ্ণ এবং মেঘমুক্ত দিনে প্রাস্বেদনরত উদ্ভিজ্জে প্রায় ১.২ গুণ বেশি। ক্যানোপিতে নিট দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের ফ্লাক্স, যা উপর থেকে নিচে পরিমাপ করা হয়েছে, কাছাকাছিভাবে নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে বর্ণনা করা যায় :

$$QL=-(1-\beta)\delta T^4\ \exp(-KdL)\ ....\ (৭.৮)$$

এক্ষেত্রে β হলো ইমিসিভিটি (emissivity), যার মান শুষ্ক আবহাওয়ায় এবং পরিষ্কার আকাশের জন্য ০.৭ এবং আর্দ্র ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জন্য ১ এর কাছাকাছি হয়, δ হলো Stefan - Boltzmann ধ্রুবক, T হলো পরম তাপমাত্রা এবং Kd হলো প্রেরণ গুণাঙ্ক যার মান ক্যানোপির অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্ত বিকিরণের সমান।

আলোক বর্ণালীর বিভিন্ন অংশের উপর নিট বিকিরণের ফ্লাক্স (Q_N) নির্ভরশীল। আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে এবং হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ফ্লাক্সের মান উচ্চ হলে, দৃশ্যমান বিকিরণ এবং মোট নিট বিকিরণের প্রোফাইল প্রায় একই রকম হয়। এর প্রধান কারণ হলো ৭০০ থেকে ১২০০ ন্যানোমিটার ব্যান্ডে শোষণ কম হয় এবং ১২০০ থেকে ৫৫০০ ব্যান্ডের শোষণ অনেকাংশে পূরণ হয় দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণের নিট হারানো (loss) দ্বারা। ক্যানোপির প্রত্যেক স্তর কর্তৃক শোষিত সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নিট বিকিরণের উপর প্রস্বেদন নির্ভরশীল, কিন্তু কেবল দৃশ্যমান বিকিরণের উপর সালোকসংশ্লেষণ নির্ভরশীল।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিজারণ (Reduction of CO_2)

উদ্ভিদ কোষে কার্বনের গতিপথ রেখাচিত্রের সাহায্যে ৭.৪ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। দুটি প্রধান কার্বোক্সিলেশন অনুক্রম (sequence) – কেলভিন চক্র এবং হ্যাচ এবং স্ল্যাক গতিপথ এবং দুটি ডিকার্বোক্সিলেশন অনুক্রম – অন্ধকারশ্বসন (গ্লাইকোলাইসিস এবং ক্রেবস্ চক্রের মাধ্যমে) এবং আলোকশ্বসন আছে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড গতিপথের উপর ভিত্তি করে শস্য উদ্ভিদকে তিনভাগে ভাগ করা যায়- C_3, C_4 এবং CAM উদ্ভিদ।

(ক) C_3 উদ্ভিদ–(কার্বন আত্তীকরণের প্রথম স্থায়ী বস্তু তিন–কার্বন যৌগ) ; এক্ষেত্রে কেলভিন চক্রের মাধ্যমে কার্বন ডাই–অক্সাইড বিজারণ হয়। প্রাথমিক কার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী এনজাইম, রাইবুলোজ – ১,৫–বিসফসফেট কার্বোক্সিলেজ, আবার অক্সিজিনেজ হিসেবেও কাজ করে। অক্সিজেনের ঘনমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে আত্তীকৃত কার্বন ডাই-অক্সাইড অধিক মাত্রায় গ্লাইকোলিক এসিড গতিপথে চলে যায় আলোকশ্বসনের সাবস্ট্রেট হিসেবে কাজ করে।

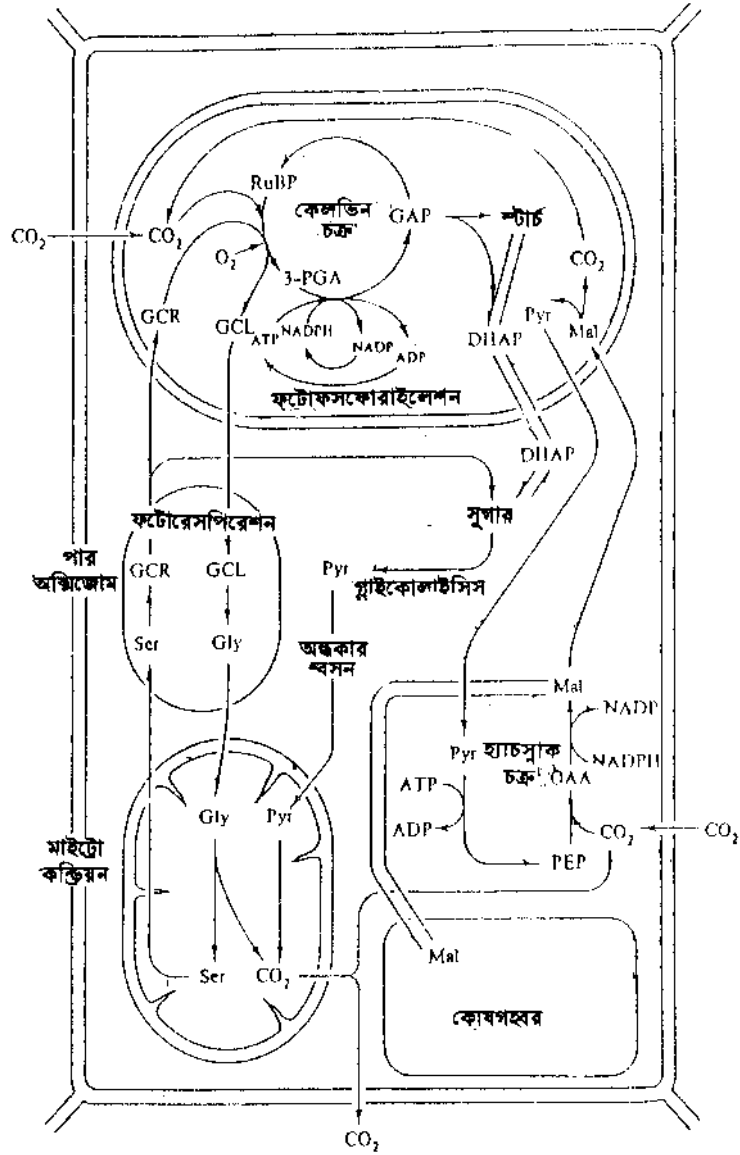

চিত্র ৭.৪ : উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসনের গতিপথের খসড়া চিত্র। DHAP= ডাই হাইড্রোক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট, GAP = গ্লিসারালডিহাইড ফসফেট ; GCL= গ্লাইকোলেট ; GCR= গ্লিসারেট ; Gly = গ্লাইসিন ; Mal = ম্যালেট ; OAA = অক্সালো অ্যাসিটেট ; PEP=ফসফোএনল পাইরুভেট ; 3-PGA=৩ ফসফো-গ্লিসারালডিহাইড ; Pyr=পাইরুভেট, RUBP=রাইবুলোজ -১,৫ বিসফসফেট।

(খ) C_4 উদ্ভিদে বহিঃস্থ মেসোফিল কলায় হ্যাচ এবং স্ল্যাক গতিপথ কার্যকর এবং অন্তঃস্থ বান্ডিল শিথে কেলভিন চক্র সংঘটিত হয়। কার্বন আত্তীকরণের প্রাথমিক বস্তু একটি চার-কার্বন যৌগ, এসকল উদ্ভিদের বহিঃস্থ কোষে কার্বন আত্তীকরণ হয়ে ম্যালিক এসিডে (অথবা অ্যাসপারটিক এসিড) পরিণত হয় এবং এটি অন্তঃস্থ কোষে চলে যায় এবং এখানে ডিকার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়া ঘটে।

এই উৎপাদিত কার্বন ডাই-অক্সাইড পুনরায় কেলভিন চক্রের মাধ্যমে আত্তীকরণ হয় এবং পাইরুভিক এসিড (অথবা অ্যালানিন) আবার বহিঃস্থ কোষে চলে আসে পুনরায় ফসফোএনল পাইরুভিক এসিড তৈরি হওয়ার জন্য। সম্ভবত বহিঃস্থ কোষে দক্ষতার সাথে কার্বন ডাই-অক্সাইড ধৃত হওয়ায় এবং অন্তঃস্থ কোষে উচ্চ ঘনমাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকায়, আলোকশ্বসনের মাধ্যমে C_4 উদ্ভিদে খুব সামান্য কিংবা একেবারেই কার্বন নষ্ট হয় না।

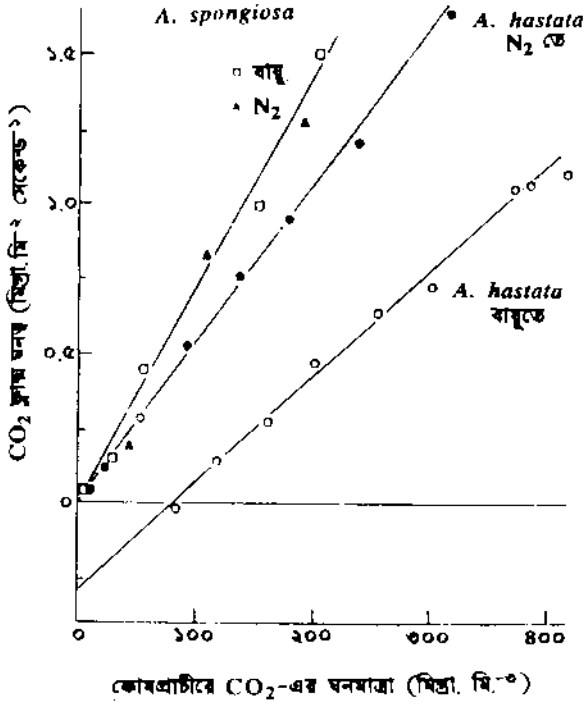

চিত্র ৭.৫ : অপরিবর্তনীয় তাপমাত্রা, প্রখর আলো এবং স্বাভাবিক ও অক্সিজেন মুক্ত বায়ুতে এবং পর্যাপ্ত পানিতে জন্মানো *Atriplex spongiosa* ও *A. hastata*-এর কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময়ের হারের উপর মেসোফিল কলার কোষ প্রাচীরে কার্বন ডাই-অক্সাইড ঘনমাত্রার প্রভাব।

(গ) ক্র্যাসুলেসিয়ান এসিড বিপাক বা CAM উদ্ভিদের কেলভিন চক্র এবং হ্যাচ ও স্লাক গতিপথ একই কোষে সংঘটিত হয়, তবে এদের কার্যকারিতা সময় দ্বারা পৃথক। এই প্রকার উদ্ভিদে রাতে পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণ হয় ও ম্যালিক এসিড হিসেবে কোষ গহবরে জমা থাকে। দিনের অধিকাংশ সময় পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকে এবং ম্যালিক এসিডের ডি-কার্বোক্সিলেশন হওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত হয় এবং আবার কেলভিন চক্রের মাধ্যমে এর পুনঃআত্তীকরণ হয়।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অনেক শস্য উদ্ভিদ যেমন- গম, যব, সুগারবিট, গোল আলু, তুলা, সকল লেগুম এবং কাষ্ঠল প্রজাতি C_3 উদ্ভিদের অন্তর্গত। অধিকাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দানাশস্য এবং ঘাস, যেমন- ভুট্টা, সরগম, এবং আখ C_4 উদ্ভিদের অন্তর্গত। এ পর্যন্ত জানা মতে আনারস হচ্ছে একমাত্র CAM উদ্ভিদ যা শস্য হিসেবে জন্মানো হয়।

C_4 উদ্ভিদে আলোকশ্বসনের অনুপস্থিতি এবং শ্বসন সৃষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড পুনরায় ব্যবহারের কার্যকর কৌশল থাকায়, C_3 এবং C_4 উদ্ভিদের পাতায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ফ্লাক্স-ঘনত্বের তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। প্রথমত, উচ্চ বিকিরণে রাখা C_4 উদ্ভিদের পাতা থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডমুক্ত বায়ুতে নির্ণয়যোগ্য কার্বন ডাই-অক্সাইডের ফ্লাক্স থাকে না ; অপরপক্ষে C_3 উদ্ভিদে আত্তীকৃত কার্বনের শতকরা ২০ থেকে ৫০ ভাগের সঙ্গে সঙ্গেই শ্বসন হয় (চিত্র ৭.৫)। দ্বিতীয়ত, C_3 উদ্ভিদের তুলনায় C_4 উদ্ভিদের নিট ফ্লাক্স অনেক বেশি। যখন আলোকশ্বসন হ্রাস করা হয় (অক্সিজেনের ঘনমাত্রা ০ থেকে ২% কমিয়ে), তখন দু'প্রকার উদ্ভিদের মধ্যে অধিকাংশ পার্থক্য আর থাকে না। তৃতীয়ত, কেলভিন চক্রের মাধ্যমে এক মোল কার্বন ডাই অক্সাইড আত্তীকরণের জন্য সর্বনিম্ন ৫৬৭ কিলোজুল (KJ) শক্তির দরকার, অপরপক্ষে, সম্পূর্ণ C_4 পথের জন্য প্রয়োজন ৪০ থেকে ৮০ কিলোজুল বা এর চেয়ে বেশি শক্তি।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপনের পথ (Diffusion Pathways of CO_2)

ঘনভাবে জন্মানো কোনো শস্যের উপরের বায়ু থেকে ব্যাপনের মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘাটতি পূরণের তুলনায় যদি শস্য বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে, তাহলে সালোকসংশ্লেষণের জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড সীমায়িত হয়। শস্যের ক্যানোপির অভ্যন্তরের বায়ুর সাথে শস্যের উপরের বায়ুর মিশ্রণকে বায়ুপ্রবাহ ত্বরান্বিত করে, এভাবে ক্যানোপির কার্বন ডাই-অক্সাইড ঘাটতি পূরণ হয়। সালোকসংশ্লেষণে আলো অথবা কার্বন ডাই-অক্সাইড সীমায়িত হবে তা নির্ভর করে আলোর প্রখরতা, উদ্ভিদের ঘনত্ব এবং বায়ুপ্রবাহের উপর। গ্রীনহাউজের মতো বদ্ধ প্রকোষ্ঠে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি করা সম্ভব (সাধারণত গ্যাস অথবা তেল পুড়িয়ে এটি করা হয়), কিন্তু মুক্ত মাঠে এটি অসম্ভব।

সালোকসংশ্লেষণে অংশগ্রহণকারী কার্বন ডাই-অক্সাইড পত্ররন্ধ্র এবং পরস্পর সংযোগকারী আন্তঃকোষীয় বায়ু প্রকোষ্ঠের শাখান্বিত সিস্টেমের মাধ্যমে পাতা অথবা কাণ্ডের সবুজ কোষে পৌঁছায়। বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড পত্ররন্ধ্র অতিক্রমের পর, এটি অধ-পত্ররন্ধ্রীয় বায়ু প্রকোষ্ঠ এবং সংযোগকারী বায়ু চলাচলের পথে প্রবেশ করে। এখান থেকে পাতার মেসোফিল কলায় পরিব্যাপ্ত হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড যখন ভেজা কোষের পৃষ্ঠে পৌঁছায়, এটি পানিতে দ্রবীভূত হয়, পানিযোজিত হয়ে কার্বোনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) হয়, এটি আবার কোষের ক্যাটায়ন দ্বারা আংশিকভাবে নিরপেক্ষ হয়ে বাই-কার্বোনেট আয়নে (HCO_3) পরিণত হয়। এই বাইকার্বোনেট হলো কোষে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভাণ্ডার যা সালোকসংশ্লেষণের ব্যবহৃত হয়। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে দ্রবণীয় অবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপনের পথ খুব কম। কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড কিউটিকলের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে পারে।

সালোকসংশ্লেষণের স্থান এবং বায়ুমণ্ডলে একটি ব্যাপন গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হওয়ার জন্য কার্বন ডাই–অক্সাইড পাতায় প্রবেশ করে। সুতরাং কার্বন ডাই–অক্সাইড আত্তীকরণের নিট হার, এই ব্যাপন গ্রেডিয়েন্ট বরাবর কার্বন ডাই–অক্সাইডের ফ্লাক্সের হারের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। ফ্লাক্স F, গ্রেডিয়েন্টের আকার নির্ধারণ করে। যেহেতু বিভিন্ন ঘনমাত্রা অংশে গ্যাসের ফ্লাক্স বৈদ্যুতিক কন্ডাকটরের ভেতরে বিদ্যুৎ প্রবাহের অনুরূপ, তাই ওহমের সূত্র অনুসারে ফ্লাক্সকে (F) নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$F = \Delta C/\Sigma r \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (৭.৯)$$

এক্ষেত্রে পাতায় কার্বন ডাই–অক্সাইডের ফ্লাক্স (F), ঘনমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট (ΔC) এবং পাতায় কার্বন ডাই–অক্সাইড ব্যাপনে মোট রোধক (Σr) হলো যথাক্রমে বিদ্যুৎ প্রবাহ (current), বিভবের পার্থক্য (potential difference) এবং বৈদ্যুতিক রোধকের অ্যানালগাস।

কার্বন ডাই–অক্সাইড আত্তীকরণ প্রক্রিয়াটি বর্ণনার জন্য রোধক অ্যানালগ ব্যবহারের ধারণাটি প্রথম প্রকাশ করেন Gaastra ১৯৫৯ সালে। তাঁর মতে বায়ুমণ্ডল এবং কার্বোক্সিলেশনের স্থানের মধ্যে কার্বন ডাই–অক্সাইড ব্যাপনের পথটি পর্যায়ক্রমিক তিনটি রোধকে গঠিত যথা, বাউন্ডারি স্তর রোধক (r_a), পত্ররন্ধ্রীয় রোধক (r_s) এবং মেসোফিল রোধক (r_m) (চিত্র ৭.৬)।

এজন্য $F = (Ca-r)/(r_a+r_s+r_m) \ldots\ldots\ldots\ldots (৭.১০)$

এক্ষেত্রে C_a হলো বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই–অক্সাইডের ঘনমাত্রা এবং কার্বোক্সিলেশনের স্থানে কার্বন ডাই–অক্সাইডের ঘনমাত্রা অজ্ঞাত, Gaastra-এর মডেল অনুযায়ী এটি শূন্যের কাছাকাছি, অর্থাৎ ΔC-Ca। পরবর্তী মডেলগুলোতে অবশ্য পাতার অভ্যন্তরে কার্বন ডাই–অক্সাইডের ঘনমাত্রা হিসেবে সালোকসংশ্লেষণের কার্বন ডাই–অক্সাইডের ক্ষতিপূরণ বিন্দুকে (r) বিবেচনা করা হয়েছে।

বাউন্ডারি স্তর রোধক

যখন কোনো গ্যাসীয় পদার্থ কোনো সমতল পৃষ্ঠ, যেমন পাতার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন সমতল পৃষ্ঠে বায়ুর অণুর একটি স্থির স্তরের সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় বাউণ্ডারি স্তর। এই স্তরের পুরুত্ব নির্ভর করে পৃষ্ঠের আকার ও আকৃতি এবং গ্যাসীয় পদার্থের প্রবাহের বেগের উপর। যদি এই স্তর পুরু হয় যেমন– বৃহদাকার পত্রপৃষ্ঠের উপর অথবা বায়ুপ্রবাহ স্থির থাকলে, তাহলে গ্যাসীয় পদার্থের ব্যাপনের রোধক বেশি হয় পাতাতে কিংবা পাতা থেকে জলীয় বাষ্প কিংবা কার্বন ডাই–অক্সাইড ব্যাপন মন্থর হয়, এবং বাউন্ডারি স্তর রোধক (r_a) বেশি হয়। সুতরাং বায়ুপ্রবাহ বেশি হলে এবং পাতা ছোট হলে r_a এর মান সাধারণত বেশ কম।

পত্ররন্ধ্রীয় রোধক

পাতায় পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা ও রন্ধ্রের আকারের উপর প্রধানত এই রোধক নির্ভর করে। এটি হলো সালোকসংশ্লেষণের কার্বন ডাই–অক্সাইড আত্তীকরণ পথের অ-বিপাকীয় রোধক। কতকগুলো প্রভাবক, যেমন– আলোর ফ্লাক্স ঘনত্ব, পাতার তাপমাত্রা, কার্বন ডাই–অক্সাইড ঘনমাত্রা, পাতার পানির পটেনশিয়াল এবং পাতা ও বায়ুমণ্ডলের বাষ্প চাপের ঘাটতি পত্ররন্ধ্রীয় রোধককে প্রভাবিত করে।

মেসোফিল রোধক

এটি প্রকৃতপক্ষে কতকগুলো রোধকের সমষ্টি ; এতে আছে পাতার বায়ু প্রকোষ্ঠে কার্বন ডাই-অক্সাইডের চলাচলের রোধক, মেসোফিল কোষের প্রাচীর থেকে কোষের অভ্যন্তরে কার্বোক্সিলেশনের স্থানে প্রবেশে রোধক এবং প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সীমাবদ্ধতাজনিত রোধক। সুতরাং এর মান নির্ভর করে কার্বন ডাই-অক্সাইডের কোষীয় স্থানান্তরের দক্ষতা এবং ক্লোরোপ্লাস্টে আলোক ও অন্ধকার বিক্রিয়ার দক্ষতার উপর।

সর্বোত্তম পরিবেশে মেসোউদ্ভিদের পাতার CO_2-এর ব্যাপনের রোধকের পরিসর নিম্নরূপ-

r_a= ১০ থেকে ৩০ সেকেন্ড প্রতি মিটারে (sm^{-1}) ;

r_a= ২৫০ থেকে ১০০০ সেকেন্ড প্রতি মিটারে ;

r_a= ২৫০ থেকে ৪০০০ সেকেন্ড প্রতি মিটারে।

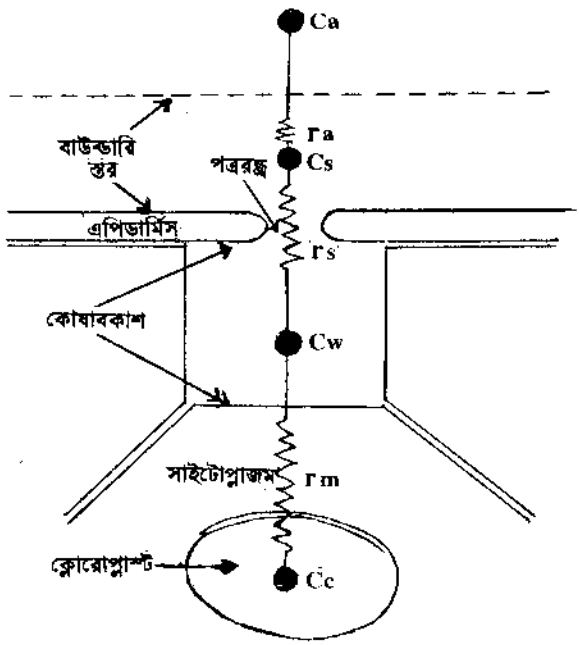

চিত্র ৭.৬ : পাতায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপনের বিভিন্ন প্রকার রোধক। C= কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা (Ca=বায়ুমণ্ডলে, C_S= পত্ররন্ধ্রে প্রবেশ পথে, C_W = পাতার অভ্যন্তরে বায়ু প্রকোষ্ঠে, C_C = কার্বোক্সিলেশনের স্থানে); r= কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপনের রোধক (r_a বাউন্ডারি স্তর, r_S = পত্ররন্ধ্রীয়, r_m= মেসোফিল)। বিভিন্ন রোধকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ফ্লাক্সে $F=(Ca-Cs)/r_a=(Cs-Cw)/r_s=(Cw-Cc)/r_m=(Ca-Cc)/(r_a+r_s+r_m)$।

সালোকসংশ্লেষনের উপর পরিবেশীয় প্রভাবক আলো, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও তাপমাত্রা

C_3 এবং C_4 উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের হারের সাথে আলো এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের সম্পর্ক ৭.৭ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। C_3 অথবা C_4 উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে (অথবা জাতের মধ্যে, এমন কি বিভিন্ন পাতার মধ্যে) সালোকসংশ্লেষণের হারের পার্থক্যের জন্য আলোকের যে মাত্রায় এবং অন্যান্য পরিবেশে পাতার বৃদ্ধি ঘটে তা সহ আরো কতকগুলো প্রভাবক দায়ী। এগুলো পাতার পুরুত্বকে (thickness) এবং এভাবে সালোকসংশ্লেষীয় সিস্টেমের আকারকে প্রভাবিত করে ; মেসোফিল কোষের গড় আকার, সুনির্দিষ্ট পাতার ওজন (specific leaf weight অথবা SLW) এবং প্রতি একক ক্ষেত্রফলে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা (কিন্তু ক্লোরোফিলের পরিমাণ নয়) পাতার পুরুত্ব বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়।

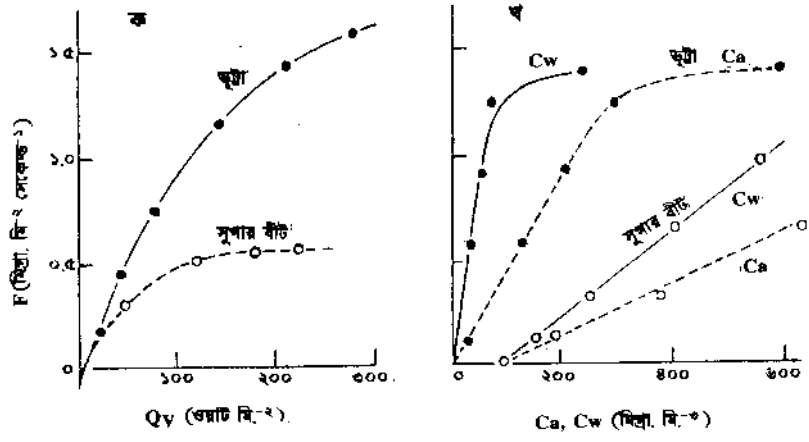

চিত্র ৭.৭ : ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দৃশ্যমান আলোর ফ্লাক্স ঘনত্ব Qv, বায়ুমণ্ডল, Ca, ও অন্তঃস্থ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রার Cw সাথে ভুট্টা (C_4 উদ্ভিদ) এবং সুগারবিটের (C_3 উদ্ভিদ) পাতায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিট ফ্লাক্সের, F, সম্পর্ক।

স্বাভাবিক সম্পৃক্ত আলোতে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্বাভাবিক ঘনমাত্রায়, C_3 উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের হারের উপর তাপমাত্রার খুব বেশি প্রভাব নেই (চিত্র ৭.৮)। সালোকসংশ্লেষনের হারের প্রশস্ত প্লেটু (plateau) এবং উচ্চ তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষণের হার কিছু কমে যায়, এরকম তথ্য অনেক গবেষকই প্রকাশ করেছেন। তবে অপেক্ষাকৃত বেশি তাপমাত্রায় C_4 উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের হার সর্বোচ্চ হয়।

C_3 উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের উপর তাপমাত্রার প্রতিক্রিয়া আলো এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয় (চিত্র ৭.৯)।

নিম্ন মাত্রার আলো এবং স্বাভাবিক ঘনমাত্রার কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রতিক্রিয়া, পূর্বে উল্লেখিত প্রতিক্রিয়ার মতোই। কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্বাভাবিক ঘনমাত্রায়, তাপমাত্রার অধিকাংশ পরিসরে আলোর মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিট ফ্লাক্স ঘনত্ব (F) বাড়ে এবং সর্বোত্তম তাপমাত্রাও বেশি। কার্বন ডাই-অক্সাইডের উচ্চ ঘনমাত্রায় এবং অধিক আলোতে নিট ফ্লাক্স ঘনত্ব (F) খুব বেশি হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রায় সরলরৈখিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং সর্বোত্তম তাপমাত্রাও অনেক বেশি। এখানে আলোকশ্বসন প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ হয়ে যায়।

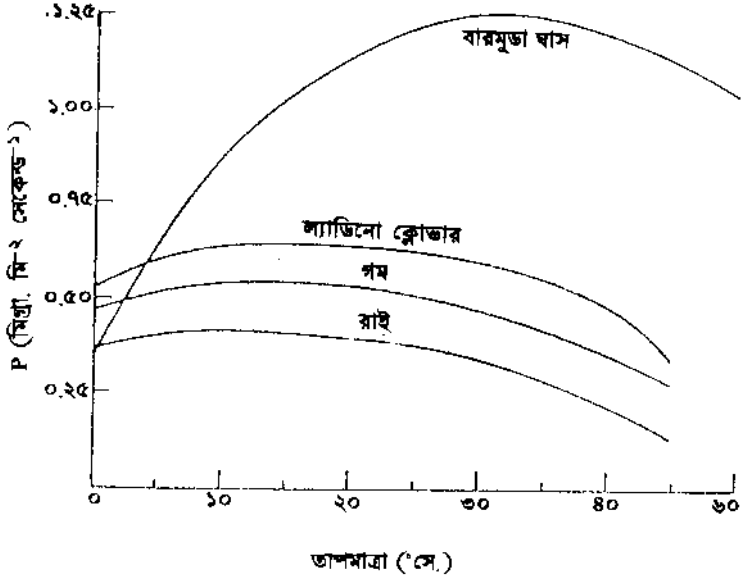

চিত্র ৭.৮ : কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্বাভাবিক ঘনমাত্রায় এবং ৪০ কিলোলাক্স (প্রায় ১৭৫ ওয়াট প্রতি বর্গমিটারে, ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার) আলোতে তিনটি C_3 প্রজাতি এবং একটি C_4 প্রজাতির (বারমুডা ঘাস) মোট সালোকসংশ্লেষণের ($P=F+R_D$) তাপমাত্রার উপর প্রতিক্রিয়া।

এ পর্যন্ত যে সকল উদাহরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে জন্মানো পাতাকে বিভিন্ন পরিবেশে রেখে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সালোকসংশ্লেষণের হার পরিমাপ করা হয়েছে।

তাৎক্ষণিক প্রভাব ছাড়াও, দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবও আছে। এদের কতকগুলো পূর্ববর্তী দিন বা রাতের পরিবেশের উপর (চিত্র ৭.১০) এবং অন্যগুলো পাতা যে পরিবেশে বৃদ্ধি পায় তার উপর বেশি নির্ভরশীল। এ সকল ফলাফল নির্দেশ করে যে, তাপমাত্রার পরিবর্তনের জন্য সমন্বয় সাধন ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু আলোর জন্য এই সময়সীমা আরো বেশি। তবে, সাধারণভাবে আলো, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং তাপমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে এ সকল অ্যাকলিমেটিজেশন (acclimatization) এর মাত্রা এবং তাৎপর্য এখনও সুস্পষ্ট নয়।

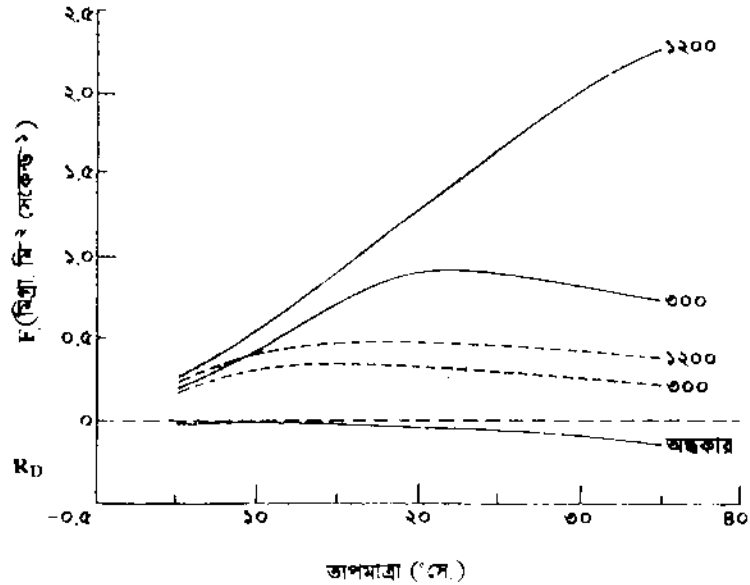

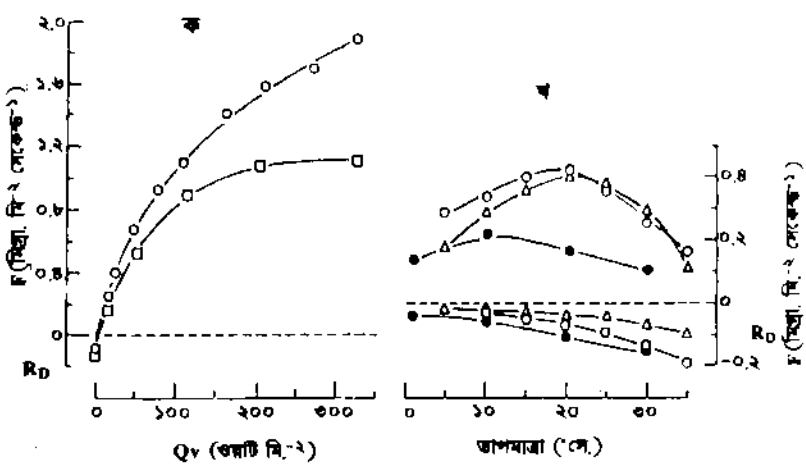

চিত্র ৭.৯ : তাপমাত্রা [illegible] আলোর ৪০ (বিচ্ছিন্ন লাইন) এবং ৪০০ (অবিচ্ছিন্ন লাইন) ওয়াট/ব.মি. ফ্লাক্স ঘনত্ব ৩০০ ও ১২০০ পিপিএম (আয়তন) ঘনমাত্রার CO_2 এর সঙ্গে, ২০°সে. তাপমাত্রায় ও ৮০ ওয়াট ব.মি. আলোতে জন্মানো টমেটো পাতার CO_2 এর নিট ফ্লাক্স ঘনত্ব, F, ও অন্ধকার শ্বসনের, R_D, প্রতিক্রিয়া

চিত্র ৭.১০(ক): ১৫ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জন্মানো এবং ৩০° সেলসিয়াসে সারা রাত অ্যাক্লিমেটাইজেশনের পূর্বে (বর্গক্ষেত্র) এবং পরে (বৃত্ত) *Panicum coloratum* এ কাচের [illegible] মধ্যাহ্নের নিট ফ্লাক্স ঘনত্বের উপর আলোর প্রভাব। (খ) [illegible] থেকে [illegible] সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মাঠে জন্মানো (বদ্ধবৃত্ত), ২৫°/২০° সেলসিয়াস দিন/রাত তাপমাত্রায় গ্রোথ চেম্বারে স্থানান্তরিত (মুক্ত বৃত্ত) ঘাসের পাতায় CO_2 এর বিনিময়ের হার। পরিমাপ করা হয়েছে ৯০ কিলোলাক্স (প্রায় ৩৬০ ওয়াট/বর্গমিটার) আলোতে।

পানি

মৃত্তিকার পানি ঘাটতি বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্বসনের হারের তুলনায় সালোকসংশ্লেষণের হার অপেক্ষাকৃত বেশি হ্রাস পায় এবং এর জন্য নিট সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায় (চিত্র ৭.১১)। পাতার পরিবাহকতা (g'_c) পানি ঘাটতির জন্য হ্রাস পাওয়ায় সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস হয় বলে ধারণা করা হয়। যেমন– মূলের তাপমাত্রার কমিয়ে পাতার আপেক্ষিক পানির পরিমানের (RLWC) পরিবর্তন করা যায়। মূলের প্রবেশ্যতা কমে যাওয়ায় পানি পরিশোষণ কম হওয়ার জন্য সম্ভবত এটি ঘটে।

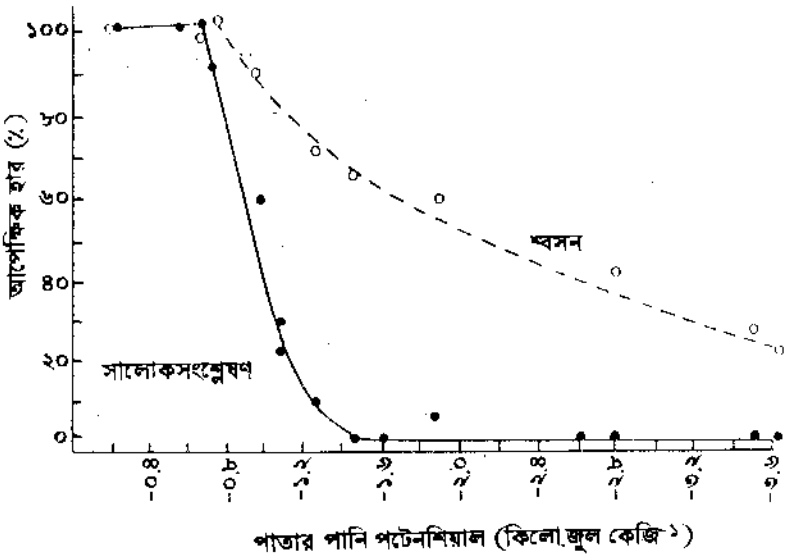

চিত্র ৭.১১ : পাতার পানির পটেনশিয়ালের সাথে সালোকসংশ্লেষণ (বদ্ধ বৃত্ত) এবং শ্বসনের (মুক্ত বৃত্ত) আপেক্ষিক হারের সম্পর্ক।

এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে তুলা গাছে, এক্ষেত্রে CO_2–এর ফ্লাক্স ঘনত্ব g'_l এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত (চিত্র ৭.১২ক), দেখা গেছে যে, যখন পাতার আপেক্ষিক পানির পরিমাণ প্রায় ৮৫% এর কম হয়, তখন g'_c কমতে শুরু করে, কিন্তু পাতার আপেক্ষিক পানির পরিমাণ প্রায় ৭৫% এর কম না হওয়া পর্যন্ত g'_c (অন্তঃস্থ পরিবাহকতা) এর সামান্য পরিবর্তন হয় (চিত্র ৭.১২.খ)। এই সংকটকালীন মাত্রার পর পাতার আপেক্ষিক পানির পরিমাণ হ্রাসের সাথে সাথে উভয় প্রকার পরিবাহকতাই হ্রাস পায়।

এটি সাধারণত দেখা যায় যে, পত্ররন্ধ্রীয় পরিবাহকতার পরিবর্তনের জন্য সালোকসংশ্লেষণের হারের তুলনায় প্রস্বেদনের হার বেশি প্রভাবিত হয়। বিভিন্ন মাত্রার আলো ও তাপমাত্রায় গম ও সরগমের সালোকসংশ্লেষণ এবং প্রস্বেদনের হারের তুলনা করা হয়েছে। উচ্চ মাত্রার আলো ব্যতীত, গমের তুলনায় সরগমের পত্ররন্ধ্রীয় পরিবাহকতা কম, সুতরাং এর প্রস্বেদনের হার কম। তবে গমের তুলনায় সরগমের আলোকশ্বসন কম এবং সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি এবং

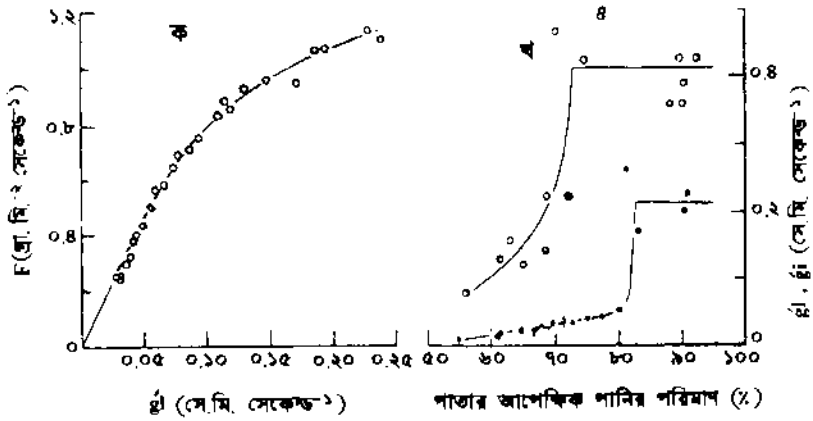

চিত্র ৭.১২ ক) : তুলার পাতার কার্বন ডাই-অক্সাইডের ফ্লাক্স ঘনত্ব, F, এবং পাতার পরিবাহকতার, g'_c (প্রতি একক পাতার পৃষ্ঠ) সাথে সম্পর্ক। (খ) পাতার আপেক্ষিক পানির পরিমাণের সাথে g'_c (বৃদ্ধ বৃত্ত) এবং অন্তঃস্থ পরিবাহকতার, g'_i (প্রতি একক পাতার ক্ষেত্রফল) (মুক্ত বৃত্ত) সম্পর্ক

এ কারণেই P/E (প্রস্বেদন) অনুপাত সরগমে বেশি (চিত্র ৭.১৩)। অধিকতর দক্ষতার সাথে পানি ব্যবহারের সুবিধা C_4 উদ্ভিদে আছে।

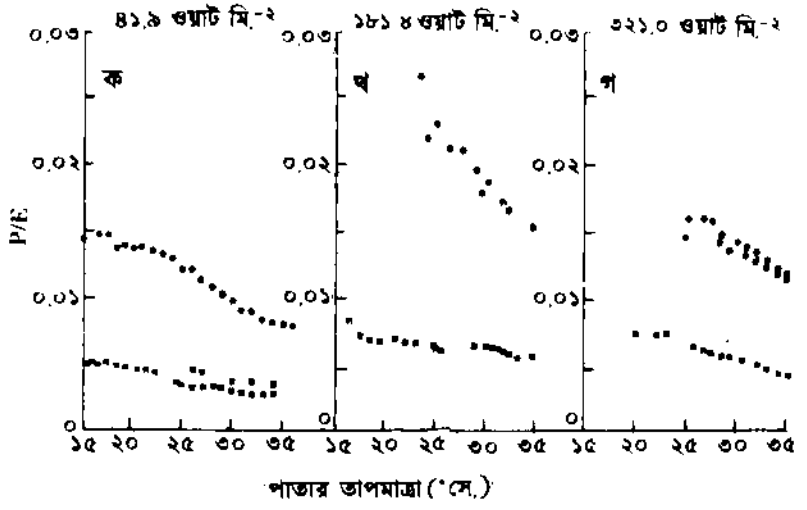

চিত্র ৭.১৩ : বিভিন্ন পরিসরে পাতার তাপমাত্রা এবং আলোতে গম (বর্গক্ষেত্র) এবং সরগমের (বৃত্ত) আলোকসংশ্লেষণ (P) এবং প্রস্বেদনের (E) অনুপাত।

পানি ঘাটতির জন্য সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাসের কারণ বহুবিধ। তীব্র পানি ঘাটতি হলেও, ক্লোরোপ্লাস্টের ঝিল্লীর অখণ্ডতা বজায় থাকে। তবে পানি ঘাটতির জন্য C_4 উদ্ভিদের বান্ডিল শিথের ক্লোরোপ্লাস্টের তুলনায় মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট অধিকতর দ্রুত নষ্ট হয়।

পানি ঘাটতি হলে সালোকসংশ্লেষণের প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়।

বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায় যে, পানি ঘাটতির জন্য পত্ররন্ধ্র বন্ধ হওয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টের কার্যকারিতা কমে যাওয়ায় সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায়।

একই প্রজাতির বিভিন্ন ভ্যারাইটি কিংবা বিভিন্ন প্রজাতিতে পানি ঘাটতির জন্য r_s এবং r_m হ্রাসের সময় এবং এদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন হয়।

খনিজ মৌল

খনিজ মৌলের সাথে সালোকসংশ্লষণের হারের ধনাত্মক সম্পর্ক আছে ; অন্তঃস্থ এবং পত্ররন্ধ্রীয় পরিবাহকতার উপর খনিজ মৌলের প্রভাবের মাধ্যমে এটি ঘটে (চিত্র ৭.১৪)। আলোকশ্বসনের উপরও খনিজ মৌলের প্রভাব আছে।

চিত্র ৭.১৪–এ চিত্র g'_e এর মান বেশি, তাই আলোকশ্বসন (R_l) এবং অন্তঃস্থ পরিবাহকতা g'_i তুলনায় সালোকসংশ্লেষণের উপর g'_e এর কম প্রভাব আছে।

সালোকসংশ্লেষণের উপর লৌহ এবং অন্যান্য মৌলের প্রভাব প্রধানত কার্যকর হয় ক্লোরোফিল, কার্বোক্সিলেজ এবং অন্যান্য এনজাইমের পরিমাণের পরিবর্তনের মাধ্যমে।

লবণাক্ততা

মাটির লবণাক্ততার জন্য সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়। মৃত্তিকায় লবণের জন্য মৃত্তিকার দ্রবণের অসমোটিক পটেনশিয়াল কমে যায়, তাই মৃত্তিকায় পানির পটেনশিয়াল কমে যাওয়ায় মৃত্তিকা থেকে পানি পরিশোষণ কম হয়, ফলে উদ্ভিদে পানি ঘাটতি হয়। একে বলা হয় শারীরতাত্ত্বিকভাবে শুষ্ক মৃত্তিকা।

লবণাক্ততার জন্য মৃত্তিকায় খনিজ মৌলের ঘাটতি হয়। যেমন, K^+, NH_4^+, NO_3^-, Mg^{2+} এবং $Fe^{3+/2+}$পরিশোষণে সোডিয়াম ক্লোরাইড বাঁধা প্রদান করে।

বিশেষ করে লবণাক্ততা প্ররোচিত K^+ এবং Mg^{2+} ঘাটতির জন্য সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়, কারণ যথাক্রমে পত্ররন্ধ্র খুলতে এবং থাইলাকয়েড – স্ট্রোমা আয়ন গ্রেডিয়েন্টে এদের ভূমিকা আছে।

লবণাক্ততার জন্য কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্রহণ কম হয়, কারণ লবণাক্ততা বৃদ্ধির জন্য পত্ররন্ধ্র আংশিক বন্ধ হয়।

৭.১৪ : সূর্যমুখীর মূলে ফসফরাস (ক থেকে গ) এবং পটাশিয়াম [illegible] আলোকসংশ্লেষণ [illegible] বিনিময়, F [illegible], আলোকশ্বসন, R_L [illegible] R_L [illegible] [illegible] মোট শুষ্ক পদার্থের মোলের সংখ্যা।

অন্তঃস্থ প্রভাবকসমূহ

অধিকাংশ উদ্ভিদ প্রজাতির বৃদ্ধির অঙ্গজ পর্যায়ে একটি প্রধান প্রবণতা দেখা যায় যে, পাতার বয়স বাড়ার সাথে সাথে সালোকসংশ্লেষণের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। সালোকসংশ্লেষণের সর্বোচ্চ হার সাধারণত হয় পাতার সর্বোচ্চ প্রসারণের সময়ে এবং খনিজ যৌলের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলে এই সর্বোচ্চ হার অনেক দিন বজায় থাকে। বয়সের সাথে পাতার শ্বসনের হারও কমে যায়, কিন্তু সালোকসংশ্লেষণের তুলনায় এই হ্রাস অধিকতর মন্থর (চিত্র ৭.১৫)।

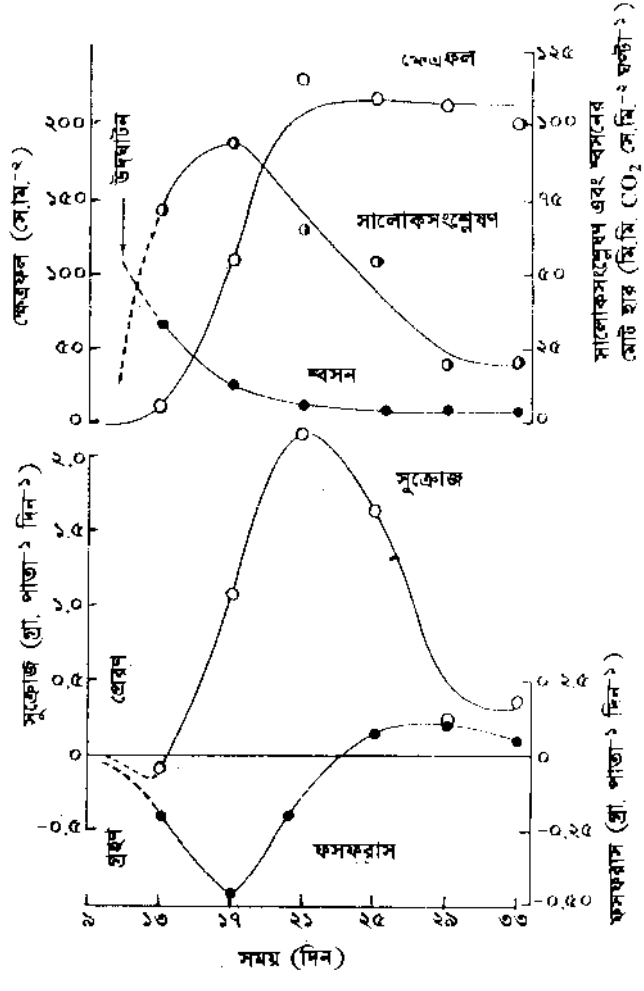

চিত্র ৭.১৫ : কিউকামবারের দ্বিতীয় পাতার বর্ধনের সময়ে পাতার ক্ষেত্রফল (L), সালোকসংশ্লেষণের হার (P), শ্বসনের হার (R) এবং সুক্রোজের গ্রহণ ও প্রেরণের পরিবর্তন।

যেহেতু এই পরিবর্তনগুলো ঘটার সময় পাতারও বর্ধন হয়, অ্যাসিমিলেটের চাহিদারও পরিবর্তন হয় এবং এর জন্য প্রাথমিক অবস্থায় পুরাতন পাতা থেকে নবীন পাতা অ্যাসিমিলেট গ্রহণ করে।
যে সময় পাতার ক্ষেত্রফল সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফলের এক-তৃতীয়াংশে পৌছায় তখন এটি অ্যাসিমিলেট গ্রহণের সাথে সাথে প্রেরণ করাও শুরু করে। সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফলের অর্ধেক ক্ষেত্রফল হলে পাতা নিট প্রেরণকারী হয়। নাইট্রোজেন খনিজ যৌগের গ্রহণ এবং প্রেরণ একই প্যাটার্নে হয়, তবে সময়ের পার্থক্য হয়, ও পাতা থেকে ফসফেটের নিট প্রেরণ প্রায় পাতার সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল হয় ও এই সময়ে অ্যাসিমিলেট প্রেরণ সর্বোচ্চ হয়।

চিত্র ৭.১৫-এ পাতা থেকে ফসফরাস স্থানান্তর এবং সম্ভবত উপরের নবীন পাতা কর্তৃক ছায়া প্রদানের জন্য সালোকসংশ্লেষণের হার কমেছে। তবে যদি পুষ্টি দ্রবণে উদ্ভিদ জন্মানো যায় এবং আলোর উচ্চ ফ্লাক্স ঘনত্ব বজায় রাখা যায়, তাহলেও একই রকম প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় (চিত্র ৭.১৬)।

এক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় F এর বৃদ্ধি g_c এবং g_i বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত; সম্ভবত পাতার পুরুত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি হয়। উভয় পরিবাহকতা কমে যাওয়ায় পরবর্তীতে F হ্রাস পায়।

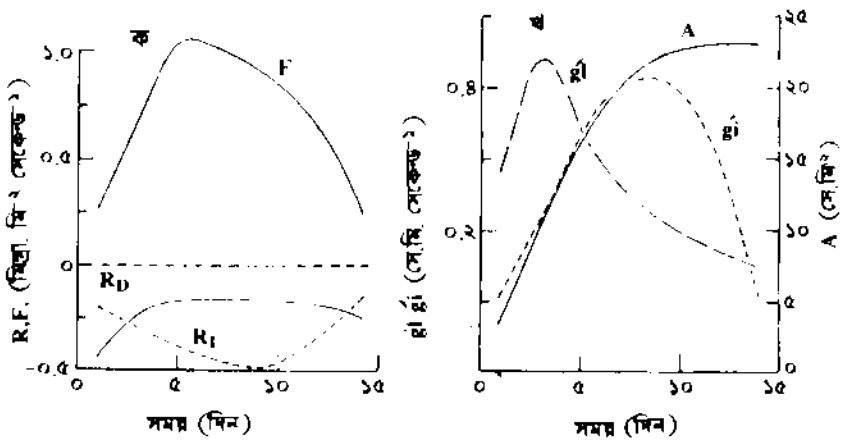

চিত্র ৭.১৫ : *Phaseolus vulgaris* এর প্রাথমিক পাতা মেলার (unfolding) থেকে সময়ের সাথে নিট কার্বন ডাই-অক্সাইড বিনিময় (F), আলোকশ্বসন (R_L) ও অন্ধকার শ্বসন (R_D) এবং পত্ররন্ধ্রের পরিবাহকতা (g_l), অভ্যন্তরীণ পরিবাহকতা (g_i) এবং পাতার ক্ষেত্রফলের (A) পরিবর্তন।

প্রকৃত পর্যায়ে তুলনায় উদ্ভিদের ফলোৎপাদনের সময় কোন নির্দিষ্ট পাতায় উচ্চ হারে এবং বেশি দিন ধরে সালোকসংশ্লেষণ বজায় থাকে। যখন ফুল অথবা বর্ধনশীল ফল কেটে ফেলা হয়, তখন অঙ্গজ উদ্ভিদের মতো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় (চিত্র ৭.১৭)।

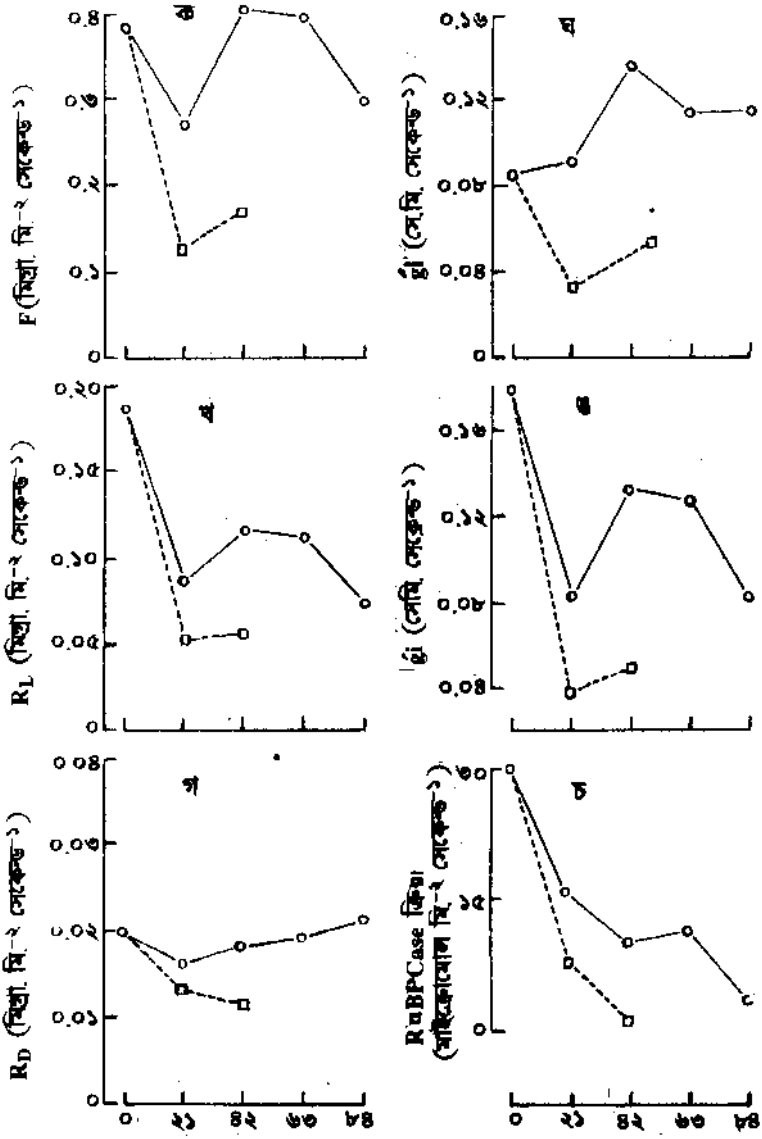

চিত্র ৭.১৭ : ফলসহ (বৃত্ত) এবং পুষ্পায়নের সময় ফুল কর্তিত (বর্গক্ষেত্র) *Capsicum annuum*-এর ফুলের উপরের প্রথম পাতার সালোকসংশ্লেষণের বৈশিষ্ট্যের পুষ্পায়নের সময়ের সাথে পরিবর্তন। (ক) সম্পৃক্ত আলোতে নিট কার্বন ডাই অক্সাইড বিনিময়, F ; (খ) প্রাক্কলন (estimated) আলোকশ্বসন, R_L ; (গ) অন্ধকার শ্বসন, R_D ; (ঘ) পাতার পরিবাহকতা, g'_e; (ঙ) অন্তঃস্থ পরিবাহকতা, g'_i ; (চ) রাইবুলোজ -১, ৫-বাইফসফেট কার্বোক্সিলেজের ক্রিয়া।

ফসল ফটোসিনথেটের প্রধান সিন্ক (sinK) হলে অধিক সময় স্থায়ী উচ্চ হারের সালোকসংশ্লেষণ আরো প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয় ; বৃহৎ সিঙ্কে, যেমন– গমের মঞ্জরী অথবা গোল আলুর কন্দে এরকম প্রভাব হয়।

বৃহৎ সিঙ্ক (sink) যেমন–*Capsicum* এর ফল (বর্তমান ফটোসিনথেটের শতকার ৮০ ভাগ পর্যন্ত এটি গ্রহণ করে) অপসারণের জন্যেও তাৎক্ষণিকভাবে পাতায় কার্বন ডাই–অক্সাইড ফ্লাক্স ঘনত্ব হ্রাস পায়।

এতে পত্রবন্ধ্রীয় এবং অন্তঃস্থ পরিবাহকতা উভয়েরই ভূমিকা আছে বলে প্রতীয়মান হয়, তবে এদের আপেক্ষিক মাত্রার উপর it নির্ভরশীল।

Capsicum–এ (চিত্র ৭.১৭) যদিও দ্রবণীয় প্রোটিনের পরিমাণের (এবং ফ্র্যাকশন ১ প্রোটিন) ও রাইবোলুজ বিস ফসফেটের ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু এদের সাথে g'₁ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত নয় এবং সুনির্দিষ্ট পাতার ক্ষেত্রফল (Specific Leaf Area বা SLA) তথা মোট সিস্টেমের আকারের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদের মধ্যে রেসিপ্রোকাল জোড়কলমেও এরকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন– সুগারবিট, এর বৃহৎ সঞ্চয়ী মূল আছে, এবং স্পিনাক বিটের, সঞ্চয়ী মূলবিহীন, মধ্যে রেসিপ্রোকাল জোড়কলমের নিট আত্তীকরণ হার (Net Assimilation Rate বা NAR) সর্বোচ্চ হয় যখন সুগারবিটকে আদি জোড় (stock) হিসেবে ব্যবহার করা হয়, উপজোড়ের (scion) ভূমিকা এখানে নগণ্য।

একইভাবে দুটি গোল আলুর জাতের মধ্যে জোড়কলমের ক্ষেত্রে কন্দের ফলন এবং এদের শর্করার পরিমাণের উপর উপজোড়ের কোন ভূমিকা নেই। টমেটো এবং গোল আলুর মধ্যে রেসিপ্রোকাল জোড়কলম করে এজাতীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষা করা হয়েছে।

যখন অতিরিক্ত অ্যাসিমিলেট ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত বিকল্প সিন্ক থাকে না, তখন সিঙ্ক থেকে উৎস এই ফিডব্যাক কৌশল পরিদৃষ্ট হয়। যেমন– গোল আলু পর্যাপ্ত পার্শ্বে পার্শ্বীয় বিটপ তৈরি করে কন্দ অপসারণের ক্ষতি পূরণ করতে পারে না, কিন্তু *Chrysanthemum morifolium* -এ প্রধান সিঙ্ক, পুষ্পমঞ্জরী, অপসারণে অ্যাসিমিলেট মূলে স্থানান্তরিত হয় এবং এর জন্য নিট আত্তীকরণ হারের তেমন পরিবর্তন হয় না।

একইভাবে যদি জেরুজালেম আরটিককের (Jerusalem artichoke) কন্দের ইনিশিয়ালস (initials) অপসারণ করা হয়, তাহলে অ্যাসিমিলেট মূলে স্থানান্তরিত হয়। গমের অবস্থান এই দুই গ্রুপের মাঝামাঝি ; এক্ষেত্রে প্রধান সিঙ্ক, মঞ্জরী অপরসারণের জন্য ফ্ল্যাগ পাতার সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়।

একই সাথে অধিক পরিমাণে অ্যাসিমিলেট মূল এবং নবীন কুঁশিতে পরিবাহিত হয়। যখন পুরাতন পাতায় সালোকসংশ্লেষণে, এসকল অঙ্গ অ্যাসিমিলেট সরবরাহকারী, বাঁধা প্রদান করা হয়, তাহলে ফ্ল্যাগ পাতা থেকে অধিক অ্যাসিমিলেট প্রেরিত হয় (চিত্র ৭.১৮)।

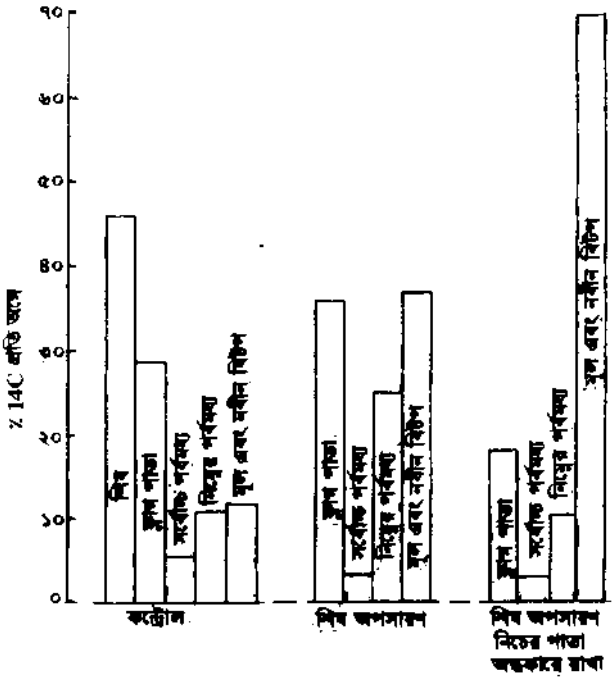

চিত্র ৭.১৮ : গমের ফ্ল্যাগ পাতায় $^{14}CO_2$ সম্পাতের ২৪ ঘন্টা পর ^{14}C এর বন্টন প্যাটার্ন ; কন্ট্রোল উদ্ভিদ ; $^{14}CO_2$ সম্পাতের ২৪ ঘন্টা পূর্বে মঞ্জরী অপসারণ এবং $^{14}CO_2$ সম্পাতের তিন দিন পূর্বে এবং মঞ্জরী অপসারণের ২৪ ঘন্টা পরে নিচের পাতাগুলোকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল।

শস্য সালোকসংশ্লেষণ (Crop Photosynthesis)

দিন–রাতের বিভিন্ন সময়ের প্রবণতা (Diurnal Trends)

নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে একটি পাতা কিংবা একটি উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণের হার পরিমাপের জন্য কতকগুলো পদ্ধতি আছে। তবে মাঠে জন্মানো অবস্থায় একটি উদ্ভিদ কিংবা শস্যের সালোকসংশ্লেষণের হার পরিমাপ করা খুবই কঠিন, কারণ পূর্বে আলোচিত সবগুলো পারিবেশিক এবং অন্তঃস্থ প্রকরণগুলো একই সাথে কাজ করে। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রভাব সম্ভবত ক্যানোপির নিচের পাতাগুলো ছায়াতে থাকে এবং এজন্য ক্যানোপির উপরের পাতার তুলনায় এদের সালোকসংশ্লেষণের হার কম। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়, যখন নিচের পাতা বয়স বৃদ্ধির জন্য খনিজ যৌগ অন্য পাতায় প্রেরণ করে ; এর জন্য অন্তঃস্থ পরিবাহকতা [illegible] কমে যায় এবং পাতার বার্ধক্যপ্রাপ্তি শুরু হয়।

একটি স্বচ্ছ তাবু দিয়ে শস্যের কিছু অংশ ঢেকে দিয়ে এবং তাবুর ভেতরের বায়ুর কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনমাত্রার পরিবর্তন অনুসরণ করে শস্যের গড় সালোকসংশ্লেষণের হার নিরূপণ করা যায়। এই পদ্ধতির অসুবিধা হলো যে, বায়ুমণ্ডল এবং শস্যের মধ্যে স্থানান্তর প্রক্রিয়াগুলো তাবুর ভেতরে এবং বাইরে এক রকম নয়।

বিকল্প পদ্ধতি হলো মাইক্রো-মিটিওরোলোজিক্যাল (micro-meteorological) কৌশল ব্যবহার করে শস্যের ক্যানোপির ভেতরে এবং বাইরে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রার পরিবর্তন নিরূপণ করা। এরপর ৩.১৪ থেকে ৩.১৭ সমীকরণের (তৃতীয় অধ্যায়) সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ফ্লাক্স পরিমাপ করা সম্ভব। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ব্যাপন গুণাঙ্ককে, K_P, K_H, K_W অথবা K_M যে কোনো একটির সমান হিসেবে ধরে নেয়া হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাপের সাথে সাথে তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা অথবা বায়ুপ্রবাহের গ্রেডিয়েন্ট ও পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ফলাফল ৭.১৯ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

গমের তুলনায় পাইন বনের উপাত্ত অধিকতর পরিবর্তনশীল, এর সম্ভাব্য কারণ হলো পাইন শাখের পৃষ্ঠ অমসৃণ ও ঢালুতে ছিল। দুপুরে গম শস্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ফ্লাক্স কমে যায় এবং পানি পরিশোষণের তুলনায় প্রস্বেদনের হার বেশি হওয়ায় এসময় পত্ররন্ধ্র সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কার্বন ডাই অক্সাইডের ফ্লাক্সের প্রাক্কলিত ভ্রান্তি (estimate error) ছিল গমের জন্য শতকরা ১০ ভাগ এবং পাইনের জন্য শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ এবং মৃত্তিকা থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড চলাচলের (তথাকথিত মৃত্তিকা শ্বসন) অনিশ্চয়তার কারণে ভ্রান্তি (error) বেশি হয়েছে। শেষোক্ত প্রভাব ৭.২০ নং চিত্রে দেখা যেতে পারে ; এখানে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মোট ফ্লাক্সে মৃত্তিকা এবং গমের ক্যানোপির তিনটি স্তরের অবদান দেখানো হয়েছে।

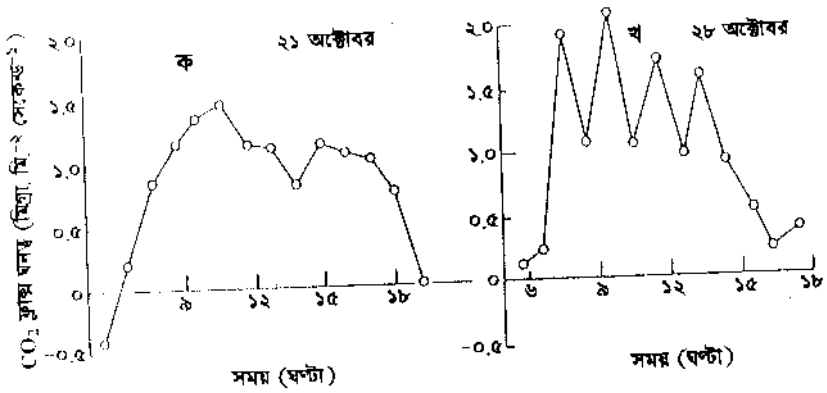

চিত্র ৭.১৯ : (ক) গম শস্য এবং (খ) পাইন বনের উপরে প্রতি ঘণ্টায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিম্নমুখী ফ্লাক্সের গড়। দুটি স্থানই অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরার নিকটে। ঋণাত্মক মান নিট ঊর্ধ্বমুখী ফ্লাক্স নির্দেশ করে।

গম শস্যের ক্যানোপির সর্বোপরে অবস্থিত পাতাগুলোতে সুস্পষ্টভাবে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় সালোকসংশ্লেষণ হয় (চিত্র ৭.২০)। তবে পাতার ক্ষেত্রফল ঘনত্বও গুরুত্বপূর্ণ ; ক্যানোপির যে স্তরে সবচেয়ে বেশি পাতার ক্ষেত্রফল ঘনত্ব আছে, সেই অংশে প্রায়ই সালোকসংশ্লেষণের হার সর্বোচ্চ হয় (চিত্র ৭.২১)।

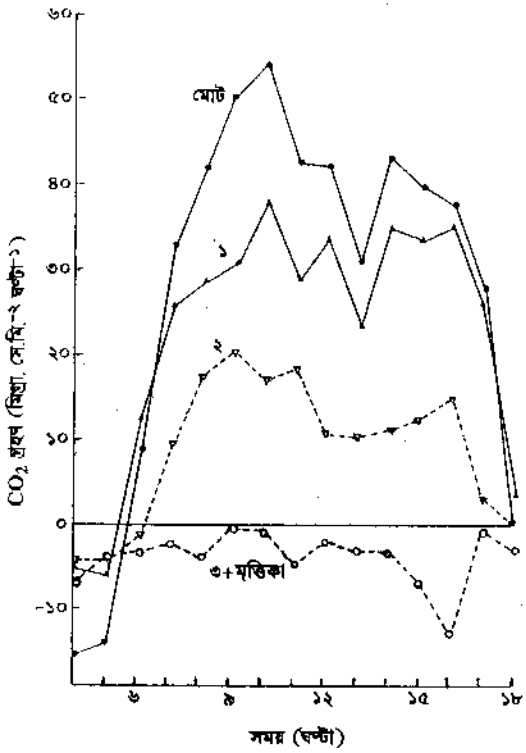

চিত্র ৭.২৩ : অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরার নিকটে জন্মানো গম শস্য কর্তৃক মোট কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণে বিভিন্ন পাতার স্তর এবং মৃত্তিকার অবদান। ২১ অক্টোবর এই পরিমাপগুলো করা হয়েছে (চিত্র ৭.১৯)। শস্যের মোট পত্র ক্ষেত্রফলসূচক ছিল ১.৬৭ এবং ১.২ এবং ৩ নম্বর স্তরে ছিল যথাক্রমে ০.৫৭, ০.৫৮ এবং ০.৫২। ১ নম্বর স্তর হলো সর্বোপরের স্তর।

ক্যানোপিতে পাতার বিন্যাসের উপর এই প্রকার প্রোফাইল বিশ্লেষণ নির্ভর করে, কারণ এর সাথে আলোর প্রোফাইল এবং তাই সালোকসংশ্লেষণের জন্য শক্তির লভ্যতা সম্পর্কযুক্ত। উপরন্তু, আলো শোষণকারী সকল অঙ্গের ক্ষেত্রফল বিবেচনা করা দরকার, কারণ এদের অধিকাংশই সালোকসংশ্লেষণে সক্ষম এবং আপতিত আলোকের অনেকখানি শোষণ করে। যেমন- গম এবং ভুট্টার মোট সালোকসংশ্লেষী ক্ষেত্রফলের যথাক্রমে শতকরা ৫০ এবং ১৩ ভাগ পর্যন্ত অংশ হলো পাতার শিথ (sheath) এবং কাণ্ড। এছাড়াও, ভুট্টার টাসেল (tassel) শতকরা ৯ ভাগ পর্যন্ত আলো শোষণ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম স্পষ্ট সালোকসংশ্লেষি অঙ্গের সালোকসংশেষণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়; যেমন কতকগুলো কাষ্ঠল বিটপের মতো, আঙুর, বিন এবং মটরের পর্ভপত্রে (carpel) সালোকসংশ্লেষণ হয়। যবের দানার শুষ্ক ওজনের প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ আসে মঞ্জরীর সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে। শুভবিহীন (awnless) গমের মঞ্জরীর সালোকসংশ্লেষণের অবদান যবের তুলনায় অনেক কম, কিন্তু শুভযুক্ত গমের অবস্থা অনেকটা যবের মতোই।

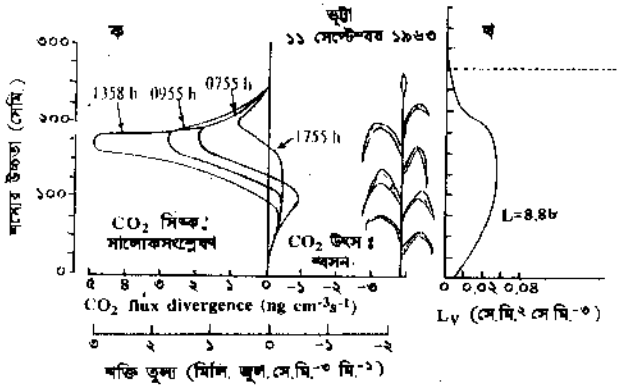

চিত্র ৭.২১ : (ক) একটি ভুট্টা শস্যে কার্বন ডাই–অক্সাইড এবং আলোকরাসায়নিক শক্তির উৎস এবং সিঙ্ক ; ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক মান যথাক্রমে নিট সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসন নির্দেশ করে। (খ) একই শস্যের পাতার ক্ষেত্রফল ঘনত্বের খাড়া বিস্তার।

শস্যের কার্বন সমতা (Carbon Balance of Crop)

দিনে বায়ুমণ্ডল থেকে মাঠশস্যে কার্বন ডাই–অক্সাইডের ফ্লাক্স নিম্নমুখী হয়। একে F_a দ্বারা চিহ্নিত করা যাক। ক্যানোপির কলার শ্বসন, R_C এবং মূল, R_r ও মৃত্তিকার জীব, R_S, থেকে কার্বন ডাই–অক্সাইডের ঊর্ধ্বমুখী ফ্লাক্সও আছে। R_r এবং R_C হলো এমন কার্বন ডাই–অক্সাইড যা মূল+নিম্ন ক্যানোপি এবং উপরের পাতার মধ্যে পুনঃআবর্তন (recycle) হয়। সুতরাং N ঘণ্টা দিনের আলোতে ক্যানোপি কর্তৃক নিট কার্বন ডাই–অক্সাইড গ্রহণকে $\sum_{0}^{N}(F_a+R_S)$ হিসেবে প্রকাশ করা যায়। রাতে শস্য–মৃত্তিকা সিস্টেম $R_a(=R_S+R_r+R_C)$ হারে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে, অর্থাৎ শস্য থেকে নিট ত্যাগ হলো

$$R_D^* = \sum_{N}^{24} (R_a - R_S) \quad \text{.........................} \quad (৭.১১)$$

২৪ ঘণ্টায় নিট গ্রহণ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় –

$$F_D^* = \sum(F_a - R_a) + \sum R_S \quad \text{....................} \quad (৭.১২)$$

এখানে F_a এবং R_a হলো দিনে নিম্নমুখী এবং রাতে পরিমিত (measured) ঊর্ধ্বমুখী ফ্লাক্সে এবং R_S স্বতন্ত্রভাবে নিরূপণ করা হয়। যদি $F+R_D$কে মোট (gross) সালোকসংশ্লেষণ, P, হিসেবে ধরা হয়, তাহলে প্রাত্যহিক ভিত্তিতে এখানে R_D (adj) হলো রাতের শ্বসনের হার যাকে তাপমাত্রা পার্থক্যের জন্য পরিশুদ্ধ (corrected) করা হয়েছে।

$$P^* = \sum_{0}^{N}(F_a+R_S) + R_D\,(adj) \quad \text{......................} \quad (৭.১৩)$$

অ্যাসিমিলেটে পরিবহণ (Translocation of assimilates)

কার্বন আত্তীকরণের স্থান থেকে অধিকাংশ অ্যাসিমিলেট অন্য অঙ্গে পরিবাহিত হয়, এখানে এটি রক্ষণ (maintenance) অথবা বৃদ্ধির (growth) জন্য ব্যবহৃত হয়। ফ্লোয়েমে সিভনলের ভেতর দিয়ে এই পরিবহণ হয়, তবে এই কৌশল এখনও ভালভাবে জানা যায়নি। তা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া সম্ভব যা বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য পর্যাপ্ত।

সাধারণত সুক্রোজ হিসেবে কার্বন পরিবাহিত হয়, কিন্তু কতিপয় প্রজাতিতে র‍্যাফাইনোজ (raffinose) অথবা স্ট্যাকিওজ (stachyose) হলো অধিকতর সচল অবস্থা। মনোস্যাকারাইডের তুলনায় ডাই- এবং ট্রাই-স্যাকারাইডের পরিবহণের সময় অতিরিক্ত শ্বসনজনিত ক্ষতি হ্রাস পায়। পরিবহণের হার, সিভনলের ভেতর দিয়ে ফ্লাক্স ঘনত্ব যে হারে কার্বন ফ্লোয়েমে প্রবেশ করে তার সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু এর সাথে সালোকসংশ্লেষণের হারের সবসময় সরল সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, পরিবহণের হারের তুলনায় সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি এবং এজন্য পাতায় কার্বন জমা হয়, সাধারণত শর্করা হিসেবে। রাতে কিংবা পরিবহণের হারের তুলনায় সালোকসংশ্লেষণের হার কম হলে এই সঞ্চিত কার্বন পরিবহণ সিস্টেমে কার্বনের সরবরাহ বজায় রাখে (চিত্র ৭.২২)। এটি অস্থায়ী হতে পারে এবং পরিবহণের হারের দিন-রাতে তারতম্য আছে (চিত্র ৭.২৩)।

পাতায় অস্থায়ীভাবে সঞ্চিত কার্বন পরিবহণের পথ বরাবর পুনরায় সঞ্চিত হয় ; সীভনল এবং পার্শ্ববর্তী কলায় অবিরত কার্বনের বিনিময় হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সঞ্চয় কেবল কয়েক ঘণ্টার জন্য, এবং অন্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বার্ধক্যজনিত কারণে পাতার ফটোসিনথেটের পরিমাণ কমে যায়, তখন সঞ্চয়ী অঙ্গে স্থানান্তরিত হয়।

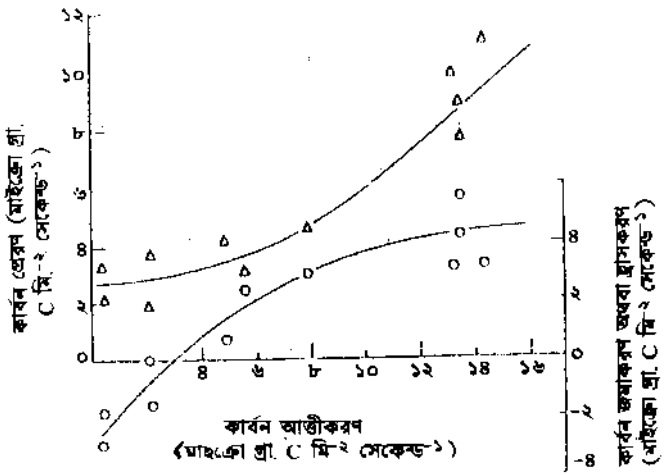

চিত্র ৭.২২ : *Lycopericon esculentum*-এর পাতা থেকে কার্বন প্রেরণ (ত্রিভুজ) অথবা সঞ্চয়ের (মুক্ত বৃত্ত) এবং কার্বন আত্তীকরণের মধ্যে সম্পর্ক।

অ্যাসিমিলেটের দীর্ঘকালীন প্রধান সিঙ্ক হলো মূল ও বিটপের শীর্ষ, অঙ্গজ উদ্ভিদের ক্যাম্বিয়াম এবং সঞ্চয়ী অঙ্গ যেমন- কন্দ, দানা ও ফল। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে অ্যাসিমিলেটের পরিবহণ বিপরীতমুখী হতে পারে, যদি কোনো কারণে বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়, যেমন গোল আলুর দৌরাতে তৈরি কন্দ অথবা দানাশস্যের অনুর্বর কুশি থেকে উর্বর (fertile) কুশিতে পুনঃস্থানান্তর হয়। তাই পাতার বৃদ্ধি এবং কার্বনের নিট গ্রহণকারী থেকে নিট প্রেরণকারীতে পরিবর্তনের ও অন্যান্য সিঙ্কের উৎপত্তির জন্য উদ্ভিদে অ্যাসিমিলেটের বণ্টন প্যাটার্নের সবসময়ই পরিবর্তন হয়।

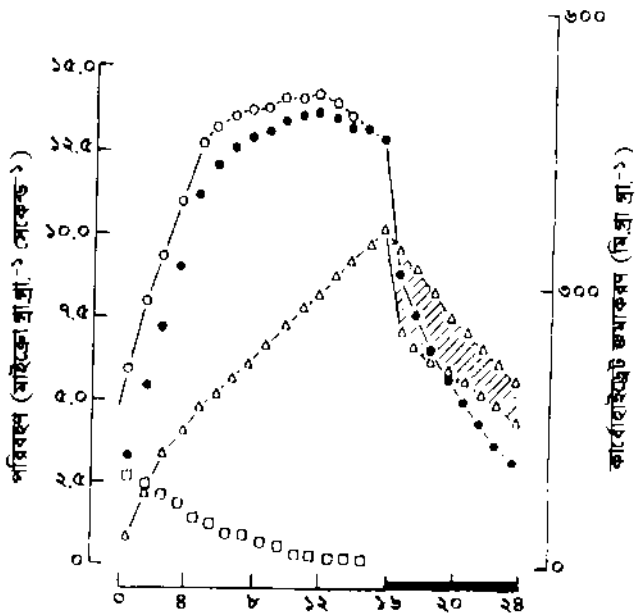

চিত্র ৭.২৩ : ১৬ ঘন্টা আলোতে এবং ৮ ঘন্টা অন্ধকারে *Vicia faba*–এর কার্বোহাইড্রেট সঞ্চয় এবং পরিবহণ। যেদিনে কার্বন ডাই-অক্সাইড আত্তীকরণ হয়েছে, সেদিনে পরিবহণ (বদ্ধ বৃত্ত), পরবর্তী দিনে পরিবহণ (অর্থাৎ পূর্ববর্তী আলোককালে তৈরি কার্বোহাইড্রেটের পুনঃস্থির (মুক্ত বর্গক্ষেত্র), মোট পরিবহণ (মুক্ত বৃত্ত) এবং কার্বোহাইড্রেটের ক্যালকুলেটেড সঞ্চয় (মুক্ত বৃত্ত) এবং কার্বোহাইড্রেটের ক্যালকুলেটেড সঞ্চয় (মুক্ত ত্রিভুজ)। অন্ধকার শ্বসনের জন্য যে পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট নষ্ট হয় তা ফাঁক ফাঁক লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে।

কিভাবে অ্যাসিমিলেটের পরিবহণের দিক নির্দেশিত হয় তা জানা সম্ভব হয়নি। উৎস এবং সিঙ্কের মধ্যে সুক্রোজের চলাচলকে Fick সূত্র দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব, অর্থাৎ এ দুটির সুক্রোজের ঘনমাত্রার পার্থক্যের সাথে ফ্লাক্স সমানুপাতিক। প্রকৃতপক্ষে, সরল ব্যাপনের মাধ্যমে এই চলাচল হয় না, পানিতে সুক্রোজের ব্যাপন গুণাঙ্কের তুলনায় এই সমানুপাতিক হার ধ্রুবক ১০[illegible] গুণ

বেশি। এরকম সম্পর্ক পাওয়া সম্ভব হয়েছে ঐসব প্রজাতিতে যারা সুক্রোজ সঞ্চয় করে না। যেমন– আখের মতো প্রজাতিতে কাণ্ডে সুক্রোজ জমা হয় বলে সিভনলে সুক্রোজের ঘনমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হতে পারে না।

চিত্র ৭.১৫–এ প্রতীয়মান হয় যে, পাতায় ফসফরাসের নিট চলাচল হয়েছিল, এর কিছু অংশ অবশ্যই ফ্লোয়েমের মাধ্যমে হয়েছে যখন ফ্লোয়েম দিয়ে সুক্রোজের নিট প্রেরণ হয়েছিল। এটি কিভাবে সম্ভব হয় তা এখনও ভালভাবে জানা যায়নি, তবে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিভনলে অথবা পরিবহণ কলাগুচ্ছে বিপরীতদিকে চলাচল হয়; তবে একটি সাধারণ উৎস থেকে একটি সাধারণ সিঙ্কে দ্রবণের কোনো সরল প্রবাহ এটি নয়। একটি সঙ্গ একইসাথে ফসফরাসের সিঙ্ক এবং সুক্রোজের উৎস হতে পারে এবং এর জন্য পরিবহণ তন্ত্র যথেষ্ট নমনীয় (flexible)।

উদ্ভিদের যে অংশে বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ সেই অংশ অ্যাসিমিলেটর প্রধান সিঙ্ক, তবে প্রকট (dominant) সিঙ্ক, যেমন– কাণ্ডের শীর্ষের বৃদ্ধির হার প্রায়ই কম, এ অবস্থায় তারা কিভাবে তাদের প্রাধান্য বজায় রাখে তা জানা যায় নি। কোনো কোনো বৃদ্ধিকর রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ার কথা এ প্রসঙ্গে বলা হয়, কিন্তু পরীক্ষামূলকভাবে যখন উদ্ভিদে প্রয়োগ করা হয়, এটি সরাসরি পরিবহণ তন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে না, কেবল বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে।

সালোকসংশ্লেষণের হার এবং উৎপাদনশীলতা (Rates of Photosynthesis and Productivity)

শস্যের বৃদ্ধির আরও কতিপয় বিষয় বিবেচনা না করে সালোকসংশ্লেষণের হারের সাথে উৎপাদনশীলতার সম্পর্ক ভালভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। যেহেতু শস্যের ৮৫% থেকে ৯৫% শুষ্ক ওজনের বৃদ্ধি সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে হয়, তাই ধারণা করা হয় যে, প্রতি একক ক্ষেত্রফলে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধির জন্য বৃদ্ধির হারও দ্রুত হয়। তাই শস্যের অধিক ফলনের উদ্দেশ্যে উচ্চ আলোকে সর্বোচ্চ নিট সালোকসংশ্লেষণের হার) F_{max}, আছে এমন জাত বাছাই-এর জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

প্রথমে C_3 এবং C_4 উদ্ভিদের মধ্যে তুলনা করা যাক। C_4 উদ্ভিদের শুষ্ক পদার্থের উৎপাদন কেবল পাওয়া যায় উষ্ণ অঞ্চলে, শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এর কোনো সুবিধা নেই।

দ্বিতীয়ত, উভয় গ্রুপের (C_3 এবং C_4) উদ্ভিদের একই প্রজাতির বিভিন্ন জাতের মধ্যে F_{max} এর বিস্তর পার্থক্য আছে (সারণি ৭.২), তাই বাছাই–এর জন্য যথেষ্ট বংশগতীয় ভেরিয়েবিলিটি পাওয়া যায়। তবে এটি সাধারণত সালোকসংশ্লেষী সিস্টেমের আকারের (যেমন– পাতার পুরুত্ব) সাথে অধিক সম্পর্কযুক্ত, সিস্টেমের অন্তঃস্থ কার্যকারিতার জন্য নয়। যেমন C_3 উদ্ভিদে আলোকশ্বসন এবং মোট (gross) সালোকসংশ্লেষণের অনুপাতের ভেরিয়েশন খুব কম। তবে প্রতি একক আয়তনের কার্বোক্সিলেজ ক্রিয়া এবং পত্ররন্ধ্রীয় পরিবাহকতার পার্থক্য আছে। এ পর্যন্ত জানা মতে F_{max} এবং বৃদ্ধি হারের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক পাওয়া যায়নি এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বিপরীত সম্পর্ক পাওয়া গেছে। গম, টমেটো এবং তুলার বন্য প্রজাতিতে সর্বোচ্চ সালোকসংশ্লেষণের হার দেখা যায়; পাতার আকার, পাতার বৃদ্ধির হার, দানার আকার এবং অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্তির সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, F_{max} হ্রাস পেয়েছে এবং আপেক্ষিক বৃদ্ধি হার কম-বেশি অপরিবর্তিত আছে।

তৃতীয়ত, কিছুটা উপরোক্ত বিষয়ের বিপরীত হলেও, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই–অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সাধারণত আলোর সকল মাত্রায় প্রতি একক পাতার ক্ষেত্রফলে

সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি পায়। নিচের পাতা অধিকতর ছায়াযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধির হার এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। অধিকতর ছায়াযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধির হার এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। এতদসত্ত্বেও, কার্বন ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধির জন্য তুলার সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যায়, সম্ভবত পাতা থেকে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেনের পুনঃস্থানান্তরের (remobilization) সাথে এটি সম্পর্কিত।

অন্ধকার শ্বসন এবং আলোকশ্বসন (Dark Respiration and Photorespiration)

জীবন্ত কোষে জারণের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড, পানি এবং শক্তি তৈরি হওয়ার পদ্ধতিকে সাধারণভাবে শ্বসন বলে। সালোকসংশ্লেষী উদ্ভিদে দু'প্রকারের শ্বসন হয়। প্রথমটিকে বলা হয় অন্ধকার শ্বসন (R_D) এবং এতে সাবস্ট্রেটের জারণের বিভিন্ন পথ আছে, যেমন- গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস চক্র এবং জারিত পেন্টোজ ফসফেট পথ (চিত্র ৭.৪)। এতে কার্বোহাইড্রেটের মুক্ত শক্তির কিছু অংশ ATP-এর উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বন্ধনীতে এবং বিজারিত পাইরিডিন নিউক্লিওটাইডে ($NADH+H^+$) সংরক্ষিত থাকে। মাইটোকনড্রিয়ার ঝিল্লীতে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনের পথ ধরাবর $NADH+H^+$ জারণের সময় ইলেকট্রন পরিশেষে অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়, তাও শ্বসনের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি $NADH+H^+$ জারণে তিনটি ATP তৈরি হয়। দ্বিতীয় প্রকার শ্বসনকে বলা হয় আলোকশ্বসন (R_L)। এটি হলো ফটোরেসপিরেটরি কার্বন অক্সিডেশন (PCO) চক্রের মাধ্যমে (একে গ্লাইকোলেট পথও বলে- চিত্র ৭.৪) কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হওয়া। সালোকসংশ্লেষী কার্বন বিজারণ চক্রের (কেলভিন চক্র) প্রথম ধাপে যে এনজাইম রাইবুলোজ বিস ফসফেট কার্বোক্সিলেশনে অংশগ্রহণ করে, সেই এনজাইমই PCO চক্রের প্রথম ধাপে অক্সিজিনেশনের মাধ্যমে ফসফোগ্লাইকোলিক এসিড তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।

আলোক শ্বসন এবং অন্ধকার শ্বসনের মধ্যে শারীরতাত্ত্বিকভাবে কতকগুলো পার্থক্য আছে: (১) রাইবুলোজ বিস ফসফেটের জন্য প্রকৃত আলোকশ্বসনের সাথে সালোকসংশ্লেষী কার্বন বিজারণ চক্র সম্পর্কিত, সুতরাং আলোকশ্বসন কেবল আলোর উপস্থিতিতে সবুজ কোষে হয়। অপরপক্ষে, অন্ধকারশ্বসন অন্ধকার কিংবা আলোতে সকল জীবন্ত কোষেই হয় এবং সম্ভবত আলোতে সালোকসংশ্লেষী কোষেও হয় (নিট সালোকসংশ্লেষণের হারের শতকরা ৫ থেকে ১৫ ভাগ)। (২) অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উভয়ের ঘনমাত্রা দ্বারা আলোকশ্বসন প্রভাবিত হয়। রাইবুলোজ বিস ফসফেটের অক্সিজেনেশন এবং কার্বোক্সিলেশনের প্রতিযোগিতামূলক প্রকৃতির জন্য এটি হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা বৃদ্ধির জন্য রাইবুলোজ বিসফসফেটের কার্বোক্সিলেশন বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ নিট সালোকসংশ্লেষণ বৃদ্ধি পায়), কিন্তু অক্সিজেনের ঘনমাত্রা বৃদ্ধির জন্য অক্সিজিনেজ ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ আলোকশ্বসন বৃদ্ধি পায়)। অপরপক্ষে, শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগের বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড অথবা অক্সিজেনের ঘনমাত্রা দ্বারা অন্ধকার শ্বসন প্রভাবিত নয়। (৩) অন্ধকার শ্বসনে গ্লুকোজের জারণ হতে লভ্য শক্তির প্রায় শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ ATP তে সংরক্ষিত থাকে। কিন্তু ফটোরেসপিরেটরি কার্বন অক্সিডেশন চক্র সচল রাখার জন্য প্রকৃতপক্ষে শক্তির প্রয়োজন হয়। (প্রতিটি কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্য ২৮টি ATP সমতুল্য শক্তি দরকার)।

C_4 উদ্ভিদে আলোকশ্বসন

C_4 উদ্ভিদের অনেকগুলো শারীরতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে যে, এসব উদ্ভিদের বাহ্যিকভাবে মনে হয় আলোকশ্বসন অনুপস্থিত। এগুলো কার্বন ডাই-অক্সাইডের ক্ষতিপূরণ মাত্রা প্রায় শূন্য

(খুব সামান্য কিংবা শ্বসনের জন্য কোনো কার্বন ডাই–অক্সাইড মুক্ত হয় না) মেসোফিলরোধক কম, অক্সিজেনর ঘনমাত্রার সাথে সালোকসংশ্লেষণের প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের অভাব, সালোকসংশ্লেষণের উচ্চ হার এবং উচ্চ তাপমাত্রা সর্বোত্তম তাপমাত্রা (অক্সিজিনেজ এবং কার্বোক্সিলেজ অনুপাত তাপমাত্রার সাথে বৃদ্ধি পায়)। C_4 উদ্ভিদে শ্বসনে তৈরি কার্বন ডাই–অক্সাইডের দক্ষতার সাথে পুনঃআত্তীকরণ হয়, কিন্তু বিকিরণ ব্যবহারের দক্ষতার (কোয়ান্টাম দক্ষতা) উপর অক্সিজিনের কোনো প্রভাব কেন থাকে না, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ আশা করা যায় যে, আলোকশ্বসনের সাথে এটি পরিবর্তিত হয়, কিন্তু এরকম প্রভাব এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও অনেক তথ্য নির্দেশ করে যে, আলোকশ্বসনের প্রয়োজনীয় এনজাইম বান্ডিল শিদে থাকে (খুব কম মাত্রায়), তাই আলোকশ্বসন অনুপস্থিত থাকার সম্ভাব্য কারণ হলো অন্তঃস্থ কার্বন ডাই–অক্সাইডের ঘনমাত্রা বেশি হওয়ায় প্রায় সম্পূর্ণরূপেই রাইবুলোজ বিস ফসফেটের কার্বোক্সিলেশন হয়।

কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশে একটি আলোকিত পাতার P, R_L এবং R_D পৃথকভাবে পরিমাপের সন্তোষজনক পদ্ধতির এখনও অভাব আছে, কারণ P এবং R_L এর সমতার উপর অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনের হারের উপর ফটোফসফোরাইলেশনের প্রভাব সম্পর্কে এখনও অনিশ্চয়তা আছে। এগুলোর মধ্যে যেমন– আলোতে অন্ধকার শ্বসন আদৌ হয় কি-না অথবা কতিপয় গবেষক পরিমাপ করেছেন যে এই হার হ্রাস পেয়ে প্রায় এক–তৃতীয়াংশ হয় কি–না অথবা অন্ধকারে নিরূপিত কার্বন ডাই–অক্সাইডের বহিঃস্থ ফ্লাক্সের সাথে এর প্রকৃত সম্পর্ক কিরূপ।

২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং অন্ধকারে পূর্ণ প্রসারিত পাতার কার্বন ডাই–অক্সাইডের বহিঃস্থ ফ্লাক্সের, R_D, পরিমাণ হয় প্রায় ০.০২ থেকে ০.০৭ মিলিগ্রাম প্রতি বর্গমিটার প্রতি সেকেন্ড এর মধ্যে। তবে প্রসারণশীল পাতায় এই হার অনেক বেশি (চিত্র ৭.১৬) এবং অন্যান্য অঙ্গেও একই রকম ফলাফল পাওয়া গেছে। পূর্ববর্তী আলোককালে সালোকসংশ্লেষণের হারের সাথেও বৃদ্ধির জন্য অন্ধকার শ্বসনের সম্পর্ক আছে (চিত্র ৭.২৪) এবং মূলে অন্ধকারের তুলনায় আলোতে অন্ধকার শ্বসনের হার বেশি। এই তারতম্য সত্ত্বেও পাতার এবং মূলের প্রতি একক শুষ্ক ওজনে কার্বন ডাই–অক্সাইড তৈরির হার সাধারণত একই রকম, কিন্তু সক্রিয় দীর্ঘীকরণের সময়ে কাণ্ডের তুলনায় কম। এটি সাধারণত ধরে নেয়া হয় প্রায় শূন্য থেকে ২৫ থেকে ৩৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রার পরিসরে R_D (সকল অঙ্গের) এর Q_{10} হলো প্রায় ২ (চিত্র ৭.২৪)।

সাধারণত বৃদ্ধি এবং সালোকসংশ্লেষণের হারের সাথে শ্বসনের হার ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত; তবে কোনো কোনো সময় এরকম সম্পর্ক দেখা যায় না। যেমন, যদি গোল আলুর কন্দকে ৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে রাখা হয়, তাহলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শর্করা সুগারে পরিণত হয় এবং এর জন্য এসকল কন্দের শ্বসনের হার ২০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রাখা কন্দের মতো হয়। অনেক ফলের যেমন– আপেল, কলা, টমেটো, পরিপক্বতার সময় শ্বসনের হার বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধিকে বলা হয় ক্লাইম্যাকটেরিক (Climacteric) এবং শ্বসনিক অনুপাতের (respiratory quotient) বৃদ্ধি এবং রঙ ও গঠনের পরিবর্তনের সাথে এটি সম্পর্কযুক্ত ; এর শুরু ইথিলিন তৈরির উপর নির্ভরশীল।

কোষের সকল প্রকার জীবজ কাজে ব্যবহৃত শক্তি (ATP) এবং কার্বন কাঠামো অন্ধকার শ্বসন সরবরাহ করে।

সাইটোপ্লাজমে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত $NADPH+H^+$ -এর উৎস হলো অক্সিডেটিভ পেন্টোজ ফসফেট পথ।

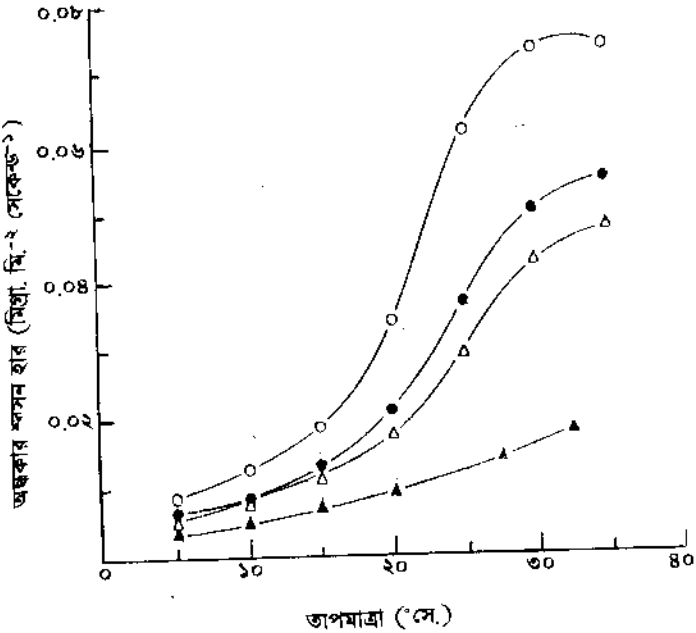

চিত্র ৭.২৪ : তুলা উদ্ভিদের বিভিন্ন পাতার শ্বসনের হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব : দশম পাতা, অর্ধ-প্রসারিত (মুক্ত বৃত্ত) ; ষষ্ঠ পাতা (বদ্ধ বৃত্ত) ; উচ্চ আলোতে রাখার এক দিন পর চতুর্থ পাতা (মুক্ত ত্রিভুজ); অন্ধকারে রাখার এক দিন পর চুতর্থ পাতা (বদ্ধ ত্রিভুজ)।

অন্ধকার শ্বসনকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়–বৃদ্ধি (growth, R_G) এবং রক্ষণ (maintenance, R_m) শ্বসন। বৃদ্ধি এবং কোষের নতুন উপাদান সংশ্লেষণের জন্য বৃদ্ধি শ্বসন এবং কোষের গঠন রক্ষণের জন্য রক্ষণ শ্বসন শক্তি সরবরাহ করে। এ দু'প্রকার শ্বসনের মধ্যে কোনো প্রাণরাসায়নিক পার্থক্য নেই ; ধারণা করা হয় যে, R_M শুষ্ক ওজনের সমানুপাতিক এবং তাপমাত্রায় খুব সংবেদনশীল, অন্যপক্ষে R_G সরাসরি সালোকসংশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল এবং তাপমাত্রায় সংবেদনশীল নয়।

দৈনিক (অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা) ভিত্তিতে পাতার শ্বসনকে নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে বর্ণনা করা যায় :

$$R^* = R_G + R_M = aP^* + bW \text{ (কেজি প্রতি কেজি প্রতি দিন)} \quad \ldots\ldots\ldots (৭.১৪)$$

এক্ষেত্রে P^* হলো আলোতে মোট সালোকসংশ্লেষণ এবং W হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড তুল্যাঙ্কে [অর্থাৎ (৪৪/১২)C, এই C হলো প্রতি একক ওজনে কার্বনের পরিমাণ] পাতার ওজন। এই সম্পর্ক সম্ভবত ক্লোরোফিলবিহীন অঙ্গের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে

P* হবে মোট পরিবাহিত কার্বনের পরিমাণ। একক পাতা কিংবা অন্য কোনো অঙ্গে এই সম্পর্ক খুব কম ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সমগ্র উদ্ভিদের (whole plant) ক্ষেত্রে এটি সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে (চিত্র ৭.২৫)। সীমিত বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, কার্বনের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ (W–১.৪ কার্বন ডাই-অক্সাইড তুল্যাঙ্কে)। তবে শুষ্ক পদার্থের গঠনের উপর ভিত্তি করে কার্বনের পরিমাণ শতকরা ৩০ থেকে ৪৫ ভাগের মধ্যে হতে পারে। বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বৃদ্ধি গুণাঙ্ক, a হলো প্রায় ০.৩০, এবং এটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয়, এবং রক্ষণ গুণাঙ্ক, b হবে ০.০১৪ $(২)^{0.১}(T-2)$ D^{-1}, তবে অধিকতর আস্থার সাথে একে সাধারণীকরণের জন্য আরও তথ্যের প্রয়োজন। যেমন - যেহেতু গঠনগত এবং সঞ্চিত উপাদান হলো ওজনের ভিত্তি, তাই এটি আশা করা যায় যে, অঙ্গের আকার এবং বয়সের সাথে সাথে b কমে যায়। উপরন্তু, বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে a হ্রাস পায় এবং উপরে যে a এর মান দেখানো হয়েছে তা স্বাভাবিক কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রায় (প্রায় ০.০৩৫%)।

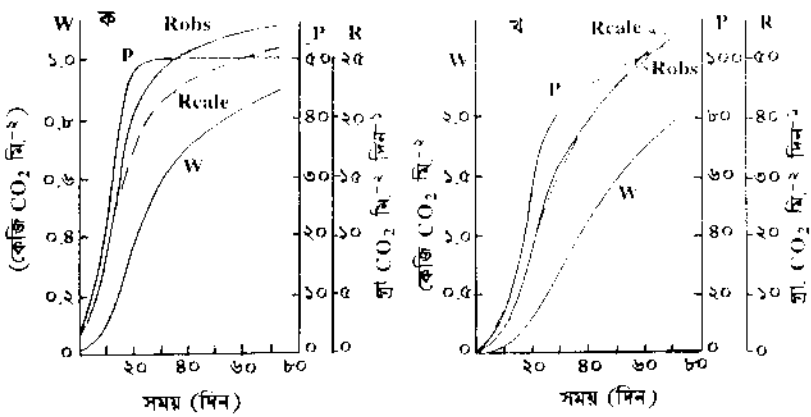

চিত্র ৭.২৫ : দুটি ভিন্ন মাত্রার আলোতে (ক এবং খ) ১০০ ওয়াট প্রতি বর্গমিটার বিকিরণের জন্মানো *Trifolium repens*-এর ২৪ ঘন্টার মোট সালোকসংশ্লেষণ, P, শুষ্ক ওজন, W,এবং পর্যবেক্ষণকৃত (observed) এবং নির্ণীত (calculated) শ্বসন, R_{obs}, R_{calc}।

শস্যের ফলনের উপর আলোকশ্বসনের প্রভাব (Photorespiration in Relation to Crop Yield)

আলোকশ্বসনের জন্য কোনো শক্তি উৎপত্তি হয় না, প্রকৃতপক্ষে এর জন্য শক্তির অপচয় হয়, এবং এজন্য শস্য উদ্ভিদের ফলন অনেকাংশে কমে যায়। এ কারণে আলোকশ্বসনের হার কমিয়ে আনতে পারলে উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বাড়ানো সম্ভব। এটি করা হয়েছে ফসফোগ্লাইলিক এসিড সংশ্লেষণ বন্ধের মাধ্যমে। কোনো বিষাক্ত পদার্থ তৈরি না হয়ে ফসফোগ্লাইকোলিক এসিডের মাত্রা হ্রাসের একমাত্র কার্যকর পদ্ধতি হলো শস্যের চারদিকে বায়ুর

অক্সিজেন/কার্বন ডাই-অক্সাইডের অনুপাত হ্রাস করা। এটি করা যায় বায়ুর অক্সিজেনের ঘনমাত্রা হ্রাস করে কিংবা কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করে।

অক্সিজেনের নিম্ন ঘনমাত্রায় ফলন বৃদ্ধি

এটি সুনিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, অক্সিজেনের নিম্ন ঘনমাত্রায় আলোকশ্বসন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অনেক শস্যের ফলন বৃদ্ধি পায়। অক্সিজেনের স্বাভাবিক ঘনমাত্রা ২১% থেকে ২% এ কমিয়ে আনলে বিভিন্ন উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণের হার শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সালোকসংশ্লেষণের হারের বৃদ্ধির জন্য বৃদ্ধির হার এবং শুষ্ক পদার্থ তৈরির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ শস্য উদ্ভিদ, যেমন গম, সুগারবিট এবং সূর্যমুখীতে এটি পাওয়া গেছে।

এরকম সুস্পষ্ট ফলাফল সত্ত্বেও এর খরচ এবং মাঠে প্রাকৃতিক পরিবেশে অক্সিজেনের ঘনমাত্রা হ্রাস করার বাস্তব অসুবিধার কারণে এই পদ্ধতি কার্যকর নয়। এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন হলো উদ্ভিদকে বায়ুরোধী বৃহৎ প্রকোষ্ঠে জন্মাতে হবে এবং পাঁচ ভাগের চার ভাগ বায়ুর পরিবর্তে নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করতে হবে। যেহেতু এই প্রকোষ্ঠটি বায়ুরোধী, সেহেতু সালোকসংশ্লেষণের জন্য কৃত্রিমভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড যোগ করতে হবে। এজন্য মাঠে শস্যের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের উচ্চ ঘনমাত্রায় ফলন বৃদ্ধি

যেহেতু অক্সিজেনের ঘনমাত্রা কমিয়ে অক্সিজেন/কার্বন ডাই-অক্সাইডের অনুপাত হ্রাস করা কঠিন এবং ব্যয়বহুল, সেহেতু কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা বৃদ্ধির কাজ অপেক্ষাকৃত কম খরচে এবং সহজে এটি করা যায়। এটি করতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা এমন বৃদ্ধি করতে হবে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। এর জন্য অবশ্য আবশ্যিক বায়ুরোধী প্রকোষ্ঠের প্রয়োজন কিন্তু বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রকোষ্ঠের প্রয়োজন, কিন্তু বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনমাত্রা এতো কম (০.০৩%) যে, এই অনুপাত বেশি পরিবর্তন করে আলোকশ্বসন হ্রাস করতে খুব সামান্য পরিমাণ অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজন।

গ্রীন হাউজে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বাড়িয়ে শস্যের ফলন বৃদ্ধির পদ্ধতি বহুদিন থেকেই চলে আসছে এবং আলোকশ্বসনবিশিষ্ট উদ্ভিদে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে যে পরিমাণ ফলন বৃদ্ধি হয়, এর জন্যেও একই পরিমাণ হয়, সাধারণত শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পায়। তবে নিম্ন অক্সিজেন পদ্ধতির মতো এর একটি অসুবিধা হলো উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য বায়ুরোধী প্রকোষ্ঠের প্রয়োজন, তাই খোলা মাঠে বৃহৎ আকারে শস্য উৎপাদনের জন্য এটি অনুপযোগী।

রাসায়নিকরোধক ব্যবহারের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি

যদি এমন কোনো রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যেতো যা মাঠে জন্মানো শস্যে ছিটিয়ে দিলে ফসফোগ্লাইকোলিক এসিড সংশ্লেষণ বন্ধ করে আলোকশ্বসন হ্রাস করতে পারতো। এটি যদি সস্তা এবং বিষাক্ত না হতো তা হলে মাঠে জন্মানো শস্যের জন্য সহজেই ব্যবহার করা যেতো। দুর্ভাগ্যবশত এখন পর্যন্ত এরকম কোনো রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ, যেমন আলফা হাইড্রোক্সিসালফোনেট গ্লাইকোলিক এসিডের সংশ্লেষণ বন্ধ করে,

কিন্তু এগুলো আবার সালোকসংশ্লেষণকেও বাঁধাগ্রস্থ করে। তবে যেহেতু একই এনজাইম উভয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, সেহেতু সালোকসংশ্লেষণকে বাধাগ্রস্থ না করে গ্লাইকোলিক এসিড সংশ্লেষণ বন্ধ করতে এমন রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া হয়তো সম্ভব না-ও হতে পারে।

উদ্ভিদ প্রজননের মাধ্যমে আলোকশ্বসন হ্রাস

নিম্ন আলোকশ্বসনসম্পন্ন মিউট্যান্ট তৈরির মাধ্যমে আলোকশ্বসনের হার কমানো যেতে পারে। বীজে γ-রশ্মি অথবা কোনো রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে পরিব্যক্তি (mutation) ঘটানো যায়। এভাবে যদি খুব কম মাত্রার আলোকশ্বসন সম্পন্ন উদ্ভিদ পাওয়া যায় এবং এদের বীজ উৎপাদন সম্ভব হয়, তাহলে উদ্ভিদ প্রজননের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে আলোকশ্বসনবিহীন উদ্ভিদ তৈরি হয়তো সম্ভব হবে।

তথ্যপঞ্জি

Abbott, I.R. and N.K. Matheson. 1972. *Phytochemistry 11* : 1261-1272.

Abdul-Baki, A. and J.E. Baker. 1970. *Plant Physiol. 45* : 698-702.

Abrahamsen, M. and T.W. Sudia. 1966. *Amer. J. Bot. 53* : 108-114.

Abrahamsen, M. and A.M. Mayer. 1967. *Physiol. Planta.* 20 : 1-5.

Abrol, Y.P., D.C. Uprety, V.P. Ahuta and M. S. Naik. 1971. Aust. *J. Agric.* Res. *22* : 195-200.

Ackerson, R.C. and J.W. Radin. 1983. *Plant Physiol. 71* : 432-433.

Adams, M.W. 1967. *Crop Sci. 7* : 505-510.

Addicott, F.T. and J.L. Lyon. 1969. *Ann. Rev. Plant Physiol. 20* : 139-164.

Aimi, R.,H. Sawamura and S. Konno. 1959. *Proc. Crop Sci. Soc. Japan 27* : 405-407.

Ahrens, J.F. and W.E. Loomis. 1963. *Crop Sci. 3* : 463-466.

Aldrich, S.R. and E.R. Leng. 1966. *Modern Corn Production.* The Farm Quaterly, Cincinnati, Ohio.

Allan, R.E., O.A. Vogel and J. C. Craddock. 1959. *Agron. J. 51* : 737-740.

Allan, R.E., O.A. Voget and C.J. Peterson. 1962. *Agron. J. 54* : 347-350.

Allen, E.J. and R.K. Scott. 1980. *J. Agric. Sci., Camb. 94* : 583-606.

Allison, J.C.S. 1964. *J. Agric. Sci., Camb. 63* : 1-4.

Almond, J.A., C.J. Done and T. C .K. Dawkins. 1983. *Arable Farm. 12* : 6-10.

Anderson, D.B. and T. Kerr. 1938. *Ind. Eng. Chem. 30* : 48-54.

Anderson, D.B. and T. Kerr. 1943. *Plant Physiol.* 18 : 261-269.

Anderson, E. and W. L. Brown. 1948. Missouri Bot. Gard. Ann. 35 : 323-336.

Angus, J.F., R. Jones and J.H. Wilson. 1972. *Aust. J. Agric. Res. 23* : 945-957.

Anisimov, A.A. 1962. Doklady Akad. Nauk. *SSSP 139* : 742-743.

Anonymous. 1966. *Soybean Dig. 26* : 10-11.

Arashi, K. 1960. Growth of rice Plant and diagnosis of its aletumn decline. Yokendo, Tokyo.

Asana, R.D. and V.S. Mani. 1950. *Physiol. Planta. 3* : 22-39.

Asana, R.D. 1961. *Arid Zone Res. 16* : 183-190.

Asana, R.D. and A.D. Saini. 1962. *Indian J. Plant Physiol. 5* : 128-171.

Asana, R.D. and R.N. Basu. 1963. *Indian J. Plant Physiol. 6* : 1-13.

Asana, R.D. and C.M. Joseph. 1964. *Indian J. Plant Physiol. 7* : 86-101.

Asana, R.D. and R.F. Williams. 1965. *Aust. J. Agric. Res. 16* : 1-13.

Asana, R.D. and R.K. Sahay. 1965. *Indian J. Plant Physiol. 8* : 86-102.

Asana, R.D.P.K. Ramiah and M.V.K. Rao. 1966. *Indian J. Plant Physiol. 9* : 95-107.

Asana, R.D. and A.K. bagga. 1966. *Indian J. Plant Physiol. 9* : 1-21.

Asana, R.D. and D.N. Singh. 1967. *Indian J. Plant Physiol. 10* : 154-169.

Asana, R.D., S.R. Parvatikar and N.P. Saxena. 1969. *Physiol. Planta. 22* : 915-924.

Ashley, D.A. 1972. *Crop Sci. 12* : 69-74.

Athwal, D.S. 1971. *Quart. Rev. Biol. 46* : 1-34.

Austin, R.B. 1980. Physiological limitations to cereal yields and ways of reducing them by breeding. *In* : Opportunities for Increasing Crop Yields. eds. R.G. Hurd. P.V. Biscoe and C. Dennis. pp. 3-20. Pitman, London.

Baba, I., I. Iwata and Y. Takahashi. 1957. *Proc. Crop Sci. Soc. Japan 25* : 222-224.

Baba, I. 1961. *IRC Newsletter. 10* : 9-16.

Bairn, J.M. and F.V. Mercer. 1966a. *Aust. J. Biol. Sci.* 19 : 49-67.

Bain, J.M. and F.V. Mercer. 1966b. *Aust. J. Biol. Sci.* 19 : 69-84.

Baker, D.A. and J. Moorby. 1969. *Ann. Bot. 33* : 729-741.

Baker, D.N., J.D. Hesketh and W.G. Duncan. 1972. *Crop Sci. 12* : 431-435.

Balls, W.L. and F.S. Halton. 1915a. *Phil. Trans. Roy. Soc. Ser. B. 206* : 103-180.

Balls, W.L. 1917. *Phil Trans. Roy. Soc. Ser. B. 208* : 157-233.

Balls, W.L. and F.S. Halton. 1915b. *Phil. Trans. Roy. Soc. Ser. B, 206* : 403-480.

Banerjee, H.T., M. Das and T.K. Bhattacharjee. 1967. *Indian J. Agron. 12* : 323-324.

Bange, G.G.J. 1953. *Acta Bot. Neelandica 2* : 255-296.

Barber, H.N. 1959. *Heredity 13* : 33-60.

Barer, G.A. and W.Z. Hassid. 1965. *Nature, Lond. 207* : 295-296.

Barley, K.P. 1970. *Adv. Agron. 22* : 159-201.

Barnard, C. 1974. *In* : Cereals in Australia. eds. A. Lazenby and E.M. Matheson. Angus and Robertson. Sydney.

Barnes, A.C. 1974. *The Sugarcane.* Leonard Hill Books. P. 572.

Barrs, H. 1968. *Physiol. Plant. 21* : 918-929.

Bassett, D.M., J.R. Stockton and W.L. Dickens. 1970. *Agron. J. 62* : 200-203.

Bassett, D.M., W.D. Anderson and C.H. E. Werkhoven.1970. *Agron. J. 62* : 299-303.

Beardsell, M.F. and D. Cohen. 1974. *Bull. R. Soc. N.Z. 12* : 411-415.

Beevers, L. and W.E. Splittstoesser. 1968. *J. Exp. Bot. 19* : 698-711.

Beevers, L. and R. Poulson. 1972. *Plant Physiol. 49* : 476-481.

Begg, J.E. and N.C. Turner. 1976. *Adv. Agron. 28* : 161-217.

Begum, F.A. and N.K. Paul. 1993. *J. Agron. & Crop Sci. 170* : 136-141.

Begum, A. and W.G. Eden. 1965. *J. Econ. Entomol. 58* : 591-592.

Belikov, I.F. 1955. Dokl. Akad. Nauk. *SSSR 102* : 379-381.

Belikov, I.F. and L. I. Pirskii. 1965. *Soviet Plant Physiol. 13* : 361-364.

Berdahl, J.D., D.C. Rasmusson and D.N. Moss. 1972. *Crop Sci. 12* : 177-180.

Bergersen, F.J. 1970. *Aust. J. Biol. Sci. 23* : 1015-1025.

Bergesen, F.J. 1971. *Ann. Rev. Plant Physiol. 22* : 121-140.

Bergersen, F.J. and D.J. Good child. 1973. *Aust. J. Biol. Sci. 26* : 741-756.

Berkley, E.E. 1931. *Ann. Mo. Bot. Gard. 18* : 573-601.

Berry, J.A. and J.K. Raison, 1981. *Encyclopaedia of Plant Physiology. 12A* : 278-338.

Berger, J. 1962. Maize production and the manuring of maize. Centre d'etude de L'azote. Geneva.

Bernal, J.D. 1965. *Symp. Soc. Exp. Biol. 19* : 17-32.

Beuerlein, J.E. and J.W. Pendleton. 1971. *Crop Sci 11* : 217-219.

Beardsell, M.F. and D. Cohen, 1975. *Plant Physiol. 56* : 207-212.

Bhan, S, M. Balaraju and Vidya Ram. 1980. *Indian J. Agric.Sci. 50* : 760-763.

Bieberdorf, F.W. 1938. *J. Amer. Soc. Agron. 30* : 375-389.

Bilinski, E. and W.G. McConnell. 1958. *Cerel Chem, 34* : 1.

Bils, R.F. and R.W. Howell. 1963. *Crop Sci. 3* : 304-308.

Bingham, J. 1966. *Ann. Appl. Biol. 47* : 365-377.

Bingham, J. 1967. *J. Agric. Sci., Camb. 68* : 411-422.

Bingham, J. 1969. *Agric Prog. 44* : 30-42.

Birecka, H. 1967. *In* : Isotopes in Plant Nutrition and Physiology. Int. Atomic Energy Agency, Vienna.

Birecka, H., V. Wojcieska and S. Glazewski. 1968. *Bull. Acad. Polon. Sci.Cl. V16* : 191-196.

Birecka, H. 1968. *Bull. Acad. Polon. Sci. Cl. V16* : 455-460.

Biswas, S.c., K.M. Roy and N.K. Paul. 1990a. *Bangladesh J. Bot. 19* : 231-234.

Biswas, S.c., R.K. Mondal and N.K. Paul. 1990b. *J. Asiatic Soc., Bang. 16* : 27-31.

Biscoe, P.V. and J.N. Gallagher. 1977. *In* : Environmental Effects on Crop Physiology. eds. J. J. Landsberg and C. V. Cutting. Academic Press. London. pp. 75-100.

Biscoe, P.V. and J.N. Gallagher. 1978. *Agric. Prog.* 53 : 34-50.

Blackman, V.H. 1919. *Ann. Bot.33* : 353-360.

Blackman, P.G. and W.J. Davies. 1984. *J. Exp. Bot. 35* : 174-179.

Bland, B.F. 1971. Crop production : cereals and legumes. Academic Press, London.

Blad, B. L. and D.G. Baker. 1972. *Agron. J. 64* : 26-29.

Bleasdale, J.K.A. 1965. *J. Agirc. Sci., Camb. 64* : 361-366.

Blixt, S. 1970. Pisum. *In* : Genetic Resources in Plants. eds. O.H. Frankel and E. Bennett. IBP hand book No. 11. Blackwell, Oxford, pp. 321-326.

Blomquist, R.V. and C.A. Kust. 1971. *Crop Sci. 11* : 390-393.

Blum, A. and A. Ebercon. 1981. *Crop Sci. 21* : 43-47.

Boatwright, G.O. and H. Ferguson. 1967. *Agron. J. 59* : 299-302.

Bodlaender, K.B.A. 1963. Proc. 10th Ester Sch. Agric. Sci. Univ. Nottingham. 199-210.

Bohning, R.H. and C. A. Burnside. 1956. *Amer. J. Bot. 43* : 557-561.

Bond, G. 1950. *Ann. Bot. 15* : 95-108.

Bonnett, O.T. 1940. J. *Agro. Res. 60* : 25-37.

Bonnett, O.T. 1967. *Bull. Univ. Ill. Agric. Exp. St.* 721 ; 105.

Booth, A. 1963. Proc. 10th Ester Sch. Agric. Sci. Univ. Nottingham, 99-113.

Borah, M.N. and F.L. Milthorpe. 1962. *Indian J. Plant Physiol. 5* : 53-72.

Borden, R.J. 1946. Hawaiian Planters' Record 50 : 3-4.

Borger, H., W. Huhnke, D. Kohler, F. Schwanitz and R. Von Sengbusch. 1956. Der. Zuchter. 26 : 363-370.

Borthwick, H.A. and M.W. Parker. 1939. *Bot. Gaz. 101.* : 341-365.

Boyer, J.S. 1971. *Crops Sci. 11* : 403-407.

Boyer, J.S, A. J. Cavalieri and E.D. Schulze. 1985. *Planta 163* : 527-543.

Boysen-Jensen, P. 1932. Die Stoffproduktion der pflanzen. Fisher, Jena. p. 108.

Bradford, K.J. and T.C. Hsiao. 1982. Encyl. *Plant Physiol. New Ser. 12B* : 263-324.

Brady, N.C. 1974. *The Nature and Properties of Soils.* MacMillan. New York.

Brandes, E.W. 1958. In Sugarcane. USDA Handbook No. 122, Washington. p. 307.

Brar, G. and W. Thies, 1977. *Z. Pflanzen Physiol. 82* : 1-13.

Bremner, P.M. and H. M. Rawson. 1972. *Aust. J. Biol. Sci.* 25 : 921-930.

Bremner, P.M. and M.A. Taha. 1966. *J. Agric. Sci., Camb. 66* : 241-252.

Bremner, P.M. 1972. *Aust. J. Biol. Sci. 25* : 657-681.

Brenchley, W.E. 1920-21. *Ann. Appl. Biol. 6* : 211-216.

Breyhan, T., O. Fischnich and F. Heilinger. 1962. Landbauforsch. Volkenrode 12 : 78-80.

Briggs, G.E., F. Kidd and C. West. 1920-21a. *Ann. Appl. Biol. 7* : 103-123.

Briggs, G.E., F. Kidd and C. West. 1920-21b. *Ann. Appl. Biol. 7* : 202-223.

Briggs, G.E., F. Kidd and C. West. 1920-21c. *Ann. Appl. Biol. 7* : 403-406.

Brouwer, R. 1966. *In* : The Growth of Cereals and Grasses. eds. F. L. Milthorpe and J.D. Ivins. Butterworths. London.

Brouwer, R., A. Kleinendorst and Th. J. Locher. 1970. *In* : Plant Response to Climatic Factors. UNESCO, Paris, pp. 169-174.

Brown, H.B. and J.O. Ware. 1958. Cotton. McGraw-Hill.

Brown, D.M. 1960. *Agron. J. 52* : 493-495.

Brown, A.H.D., J. Daniels and B.D.H. Latter. 1969. *Theor. and Appl. Genet. 39* : 1-10.

Brun, W.A. 1972. *Agron. Abstr.* p. 31.

Bull, T.A. and K. T. Glasziou. 1963. *Aust. J. Biol. Sci. 16* : 737-742.

Bull, T.A. 1964. Aust. J. *Agric. Res. 15* : 77-84.

Bull, T.A. 1969 *Crop Sci.* 9 : 726-729.

Bull, T.A. 1971. *In* : Photosynthesis and photorespiration. eds. M.D. Hatch, C.B. Osmond and R.O. Slatyer. John Willey. pp. 68-75.

Bull, T.A. and K.R. Gayler and K.T. Glasziou. 1972. *Plant Physiol. 49* : 1007-1011.

Burch, G.J.R.C.G. Smith and W.K. Mason. 1978. *Aust. J. Plant Physiol. 5* : 169-177.

Burke, M.J., L.V. Gusta, H.A. Quamme, C.J. Weiser and P.H. Li. 1976. *Ann. Rev. Plant Physiol. 27* : 507-528.

Burris, J.S., A.H. Wahab and O.T. Edge. 1971. *Crop Sci. 11* : 492-496.

Burris, J.S., O.T. Edge and A.H. Wahab. 1973. *Crop. Sci. 13* : 207-210.

Burton, W.G. 1966. The Potato. Veenman and Zonen, Wageningen.

Burton, W.G. and D.F. Meigh. 1971. *Potato Res. 14* : 96-101.

Buttery, B.R. and R.I. Buzzell. 1972. *Can. J. Plant Sci. 52* : 13-20.

Buttery, B.R. 1969. Can *J. Plant Sci. 49* : 675-684.

Buttery, B.R. 1970. *Crop Sci. 10* : 9-13.

Buttrose, M.S. 1962a. *Aust. J. Biol. Sci. 15* : 611-618.

Buttrose, M.S. 1962b. *J. Cell Biol. 14* : 159-167.

Buttrose, M.S. 1963. *Aust. J. Biol. Sci. 16* : 305-317.

Buttrose, M.S. and L.H. May. 1965. Ann. Bot. 29 : 79-81.

Colder, N. 1967. The Environment Game. Secker and Warburg. London. p. 240.

Cameron, D.S. and E.A. Cossins. 1967. *Biochem. J. 105* : 323-331.

Campbell, C.A. and D.W.L. Read. 1968. *Can. J. Plant Sci. 48* : 299-311.

Campbell, C.A., W.L. Pelton and K.F. Neilson. 1969. *Can J. Plant Sci. 49* : 685-699.

Campbell, D.K. and D.J. Hame. 1970. *Crop Sci. 10* : 625-626.

Cannell, R.Q., W.A. Brun and D.N. Moss. 1969. *Crop Sci. 9* : 840-842.

Canning, R.E. and P.J. Kramer. 1958. *Amer. J. Bot. 45* : 378-382.

Canny, M.J. 1971. Ann. Rev. *Plant Physiol. 22* : 237-260.

Carns, H.R. 1966. Ann. Rev. *Plant Physiol. 17* : 295-314.

Carpenter, R.W., H.J. Hass and E.F. Miles. 1952. *Agron. J. 44* : 420-423.

Carpenter, P.N. 1957. *Bull. Me. Agric Exp. Sta.* 562 : 1-22.

Carr, D.J. and K.G.M. Skene. 1961. *Aust. J. Biol. Sci. 14* : 1-12.

Carr, D.J. and I.F. Wardlaw. 1965. *Aust. J. Biol. Sci.* 18 : 711-719.

Carr, D.J. and J.S. Pate. 1967. *Symp. Soc. Exp. Biol. 21* : 559-600.

Cartwright, D.J. and D. Snow. 1962. *Ann. Bot. 26* : 257-259.

Catchpole, A.H. and J. Hillman. 1969. *Nature Lond. 223* : 1387.

Chandler, W.V. 1960. *Tech. Bull. North Carolina Agr. Expt. Sta. 143.*

Chang, Jen Hu. 1961. Hawaiian Planters' Record. 56 : 195-223.

Chase, D.L. 1971. M.Sc. Thesis. Univ. of Sydney.

Chin, L.T.Y., R. Poulson and J. Beevers. 1972. *Plant Physiol. 49* : 482-489.

Chinoy, J.J. and K.K. Nanda. 1951. *Physiol. Pant 4* : 427-436.

Chonan, N. 1965. Proc. *Crop Sci Soc. Japan 33* : 388-393.

Chonan, N. 1971. Proc. *Crop Sci. Soc. Japan 40* : 425-430.

Christiansen, M.N. 1968. *Plant Physiol. 43* : 743-746.

Christiansen, M.N. and R.P. Moore. 1959. *Agron. J. 51* : 582-584.

Christiansen, M.N., H.R. Carns, and D.J. Slyter. 1970. *Plant Physiol. 46* : 53-56.

Chujo, H. 1966a. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 35 : 177-186.

Chujo, H. 1966b. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 35 : 187-194.

Chujo, H. 1967. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 36 : 224-231.

Clarke, J.M. and G.M. Simpson. 1978. *Can. J. Plant Sci. 58* : 731-737.

Claver, F.K. 1964. *Rev. Fac. Agron. La Plata 40* : 171-183.

Cleland, R.E. 186. *Aust. J. Plant Physiol. 13* : 93-103.

Coates, J.H. and D.H. Simmonds. 1961. *Cereal Chem. 38* : 256-272.

Cock, J.H. and S. Yoshida. 1972. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 41 : 226-234.

Cole, S. 1961. Neolithic Revolution. 2nd Edition, London.

Cooper, D.C. 1938. *Bot. Gaz. 100* : 123-132.

Cooper, J.P. 1960. *Ann. Bot. 24* : 232-246.

Cossins, E.A. 1964. *Nature, Lond. 203* : 989-990.

Curtis, C.E., W.L. Ogren and R.H. Hageman. 1969. *Crop Sci. 9* : 323-327.

Daniels, J., K.T. Glasziou and T.A. Bull. 1965. *Proc. Intr. Soc. Sugarcane Technol. 12* : 1027-1032.

Daniels, R.W. and D.H. Scarisbrick. 1981. *In* : Yield of oilseed Rape. Nat. Agric. Cent. Course Papers. pp. 29-46.

Das Gupta, D.K. 1972. *J. Exp. Bot. 23* : 103-113.

Dastur, R.H. 1959. Physiological studies on the cotton crop and their practical applications. The Indian Central Cotton Committee, Bomby.

Davidson, J.L. and J.R. Philip. 1958. *Arid Zone Res. 11* : 181-187.

Davidson, J.L. 1965. *Aust. J. Agric. Res. 16* : 721-731.

Davis, K.S. and J.A. Day. 1961. Water. Heinemann, London.

Davis, D. B. and E.C. A. Runge. 1964. *Agron. J. 61* : 518-521.

Davies, W.J., J. Metchalfe, T.A. Lodge and A.R. da Costa. 1986. *Aust. J. Plant Physio 113* : 105-125.

Daynard, T.B. and W.G. Duncan. 1969. *Crop Sci. 9* : 473-476.

Daynard, T.B., J.W. Tanner and D.J. Hume. 1969. *Crop Sci. 9* : 831-834.

Daynard, T.B., J.W. Tanner and W.G. Duncan. 1971. *Crop Sci. 11* : 45-48.

Degemhardt, D.F. and Z.P. Kondra. 1981. *Can. J. Plant Sci. 61* : 175-183.

Denmead, O.T. and R.H. Shaw. 1962. *Agron. J. 45* : 385-390.

Denmead, O.T. 1970. *In* : Prediction and Measurement of Photosynthetic Procuctivity. Pudoc. Wageningen. pp. 149-164.

Diener, T. 1950. *Phytopath. Z.* 16 : 129-170.

Dixon, R.O.D. 1964. Arch. Mikrobiol. 48 : 166-178.

Donald, C.M. 1968. *Euphytica. 17* : 385-403.

Dornhoff, G.M. 1969. M.Sc. Thesis. Iowa state Univ.

Dornhoff, G.M. and R.M. Shibles. 1970. *Crop Sci. 10* : 42-45.

Drennan, D.S.H. and C. Norton. 1972. *Plant and Siol 36* : 53-57.

Duffield, R.D., L.I. Croy and E.L. Smith. 1972. *Agron. J. 64* : 249-251.

Duncan, W.G., R.S. Loomis, W.A. Williams and R. Hanau. 1967. Hilgardia 38 : 181-205.

Duncan, W.G. and J.D. Hesketh. 1968. *Crop Sci. 8* : 670-674.

Duncan, W.G. 1971. *Crop Sci. 11* : 482-485.

Duncan, W.G. 1973. Proc. 27th Ann. Corn and sorghum Res. Conf. ASTA, 159-167.

Duncan, W.G., D.R. Davis and W.A. Chapman. 1973. *Florida Soil and Crop Sci. Soc. 32* : 59-62.

Dungan, G.H. 1931. *Agron. J. 23* : 662-669.

Dunstone, R.L. and L.T. Evans. 1973. *Aust. J. Plant Physiol. 1* : 157-165.

Dunstone, R.L., R.M. Gifford and L.T. Evans. 1973. *Aust. J. Biol. Sci. 26* : 295-307.

Earley, E.B. and J.L. Cartter. 1945. *J. Amer. Soc. Agron. 37* : 727-735.

Eaton, F.M. and D.R. Ergle. 1948. *Plant Physiol. 23* : 169-187.

Edelman, J. and S.P. Singh. 1966. *J. Exp. Bot. 17* : 696-702.

Edelman, J., T.G. Jefford and S.P. Singh. 1969. *Planta 84* : 48-56.

Edge, O.T. and J.S. Burris. 1970a. Ass. Offic. *Seed Anal. Proc. 60* : 149-157.

Edge, O.T. and J.S. Burris. 1970b. Ass. Offic. Seed Anal Proc. 60 : 158-166.

Edwards, C.J. Jr. and E.E. Hartwig. 1972. *Agron. J. 63* : 429-430.

Eliasson, L. 1955. *Physiol. Plant 8* : 374-388.

Elmore, C.D., J.D. Hesketh and H. Muramoto.1967. *J. Ariz. Acad. Sci. 4* : 215-219.

El Sharkawy, M. and J.D. Hesketh. 1964. *Crop Sci. 4* : 514-518.

El Sharkawy, M., J.D. Hesketh and H. Muramoto. 1965. *Crop Sci. 5* : 173-175.

Emerson, W.W. 1984. *In* : Soil Salinity Under Irrigation : processes and Management. eds. I. Shainberg and J. Shalhevet. Ecol. Studies 51 : 65-76. Springer-verlag. Berlin.

Emilsson, B. and H. Lindblom. 1963. Proc. 10th Easter Sch. Agric. Sci. Univ. Nottingham 45-62.

Engledow, F.L. and S.M. Wadham. 1923. *J. Agric. Sci. 13* : 390-439.

Epstein, E., J.D. Norlyn, D.W. Rush, R.W. Kingsbury, D.B. Kelley, G.A. Cunningham and A.F. Wrona. 1980. Science 210 : 399-404.

Evans, L.T. and R.L. Dunstone. 1970. *Aust. J. Biol.Sci. 23* : 725-741.

Evans, L.T., R.L. Dunstone, H.M. Rawson and R.F. Williams. 1970. *Aust. J. Biol. Sci. 23* : 743-752.

Evans, L.T. 1971. *In* : Photosynthesis and Photorespiration. eds. M.D. Hatch, C.B. Osmond and R.O. Slatyer. Wiley-Interscience. New York. pp. 130-136.

Evans, L.T., J. Bingham and M.A. Roskams. 1972. *Aust. J. Biol.Sci. 25* : 1-8.

Evans, L.T., J. Bingham, P. Jackson and J. Sutherland. 1972. *Ann. Appl. Biol. 70* : 67-[illegible]

Evers, A.D. 1970. *Ann. Bot. 34* : 547-555.

Fisher, R.A. 1920-21. *Ann. Appl. Biol. 7* : 367-372.

Fischer, R.A. and C.M. Kohn. 1966. *Aust. J. Agric. Res. 17* : 281-295.

Fischer, R.A. 1973. *In* : Plant Response to Climatic Factors. UNESCO, Paris. pp. 233-241.

Flinn, A.M. and J.S. Pate. 1968. *Ann. Bot. 32* : 479-495.

Flinn, A.M. 1969. Ph.D. Thesis, queen's Univ., Belfast.

Flinn, A.M. and J.S. Pate. 1970. *J. Exp. Bot. 21* : 71-82.

Ford, M.A. and G.N. Thorne. 1967. *Ann. Bot. 31* : 629-644.

Fox, J.E. 1969. *In* : Physiology of plant growth and development. ed. M.B. Wilkins. McGraw Hill, New York. pp. 83-123.

Francis, C.A., V.D. Sarria, D.D. Harpstead and D.C. Cassalett. 1970. *Crop. Sci. 10* : 465-468.

Frazier, J.C. and B. Appalanaidu. 1965. *Amer. J. Bot. 52* : 193-198.

Friend, D.J.C. 1965a. *Can. J. Bot. 43* : 345-353.

Friend, D.J.C. 1965b. *Can. J. Bot. 43* : 1063-1076.

Friend, D..C. 1966. *In* : The Growth of Cereals and Grasses. eds. F.L. Milthorpe and J.D. Ivins. Butterworth, London. pp. 181-199.

Friend, D.J.C., V.A. Helson and J.E. Fisher. 1962. *Can. J. Bot. 40* : 299-311.

Fry, K.E.1970. *Plant Physiol.45* : 465-469.

Fryxell, P.A. 1963. *Bot. Gaz. 124* : 196-199.

Fujii, Y. 1961. *Bull. Fac. Agr. Suga Univ.* 12 : 1-117.

Fulcher, R.G., T.P. O'Brien and D.H. Simmonds. 1972. *Aust. J. Biol. Sci. 25* : 487-497.Funnah, S.M. 1971. Ph.D. Thesis. Univ. of Florida.

Funnah, S.M. 1971. ph.D. Thesis. Univ. of Florida.

Gaastra, P. 1962. Netherlands *J. Agric. Sci. 10* : 311-324.

Gaff, D.F. 1980. *In* : Adaptation of Plants to water and High Temperature stress. eds. N.C. Turner and P.J. Kramer. Wiley, New York. pp. 207-230.

Gardner, W.R. 1960. *Soil Sci. 89* : 63-73.

Gates, J.W. and G.M. Simpson. 1968. *Can. J. Bot. 46* : 1459-1462.

Gates, D.M. 1976. *In* : Water and Plant life, eds. O.L. Lange, L. kappen and E.. -D. Schulze. Ecological studies 19 : 137-147. Springer Verlage, Berlin.

Gavin. W. 1951. *J. Min. Agric. 58:* 105-111.

Gericke, F. 1908. Zeitachrift fur Naturw. 80 : 321-363.

Ghorashy, S.R., J.W. Pendelton, R.L. Bernard and M.E. Bauer. 1971. *Crop Sci. II* : 426-427.

Gieger, D.R., M.A. Saunders and D.A. Cataldo. 1969. *Plant Physiol. 44* : 1657-1665.

Gifford, R.M. and J. Moorby. 1967. *Eur. Potato J. 10* : 235-238.

Gifford, R.M., P.M. Bremner and D.B. Jones 1973. *Aust. J. Agric. Res. 24* : 297-307.

Gifford, R.M. 1974. *Aust. J. Plant Physiol. 1* : 107-117.

Gilman, D.F., W.R. Fehr, and J.S. Burris. 1973. *Crop Sci. 13* : 246-249.

Glasziou, K.T., T.A. Bull, M.D. Hatch and P.C. Whiteman. 1965. *Aust. J. Biol. Sci.* 18 : 53-66.

Glasziou, K.T. and T.A. Bull. 1971. *In* : Photo-Synthesis and Photo respiration. eds. M.D. Hatch, C.B. Osmond and R.O. Slatyer. John Wiley Inc. pp. 82-88.

Goodwin, P.B. 1966. *Eur. Potato J. 9* : 53-63.

Goodwin, P.B. 1967. *J. Exp. Bot. 18* : 87-99.

Goodwin, P.B., A. Brown, J.H. Lennard and
F.L. Milthorpe. 1969a. *J. Agric.Sci., Camb. 73* : 161-166.

Goodwin, P.B., A. Brown, J.H. Lennard and F.L. Milthorpe. 1969b. J. agric. Sci, Camb. 73 : 167-16.

Gosnel, J.M. 1968. *Proc. Intr. Soc. Sugar cane Technol. 13* : 499-513.

Goss, J.A. 1968. *Bot. Rev. 34* : 333-358.

Gott, M.B. 1961. *Aust. J. Agric. Res.* 12 : 547-565.

Grabe, D.F. and R.B. Metzer. 1969. *Crop Sci. 9* : 331-333.

Grace, J. 1977. Plant Response to Wind. Academic Press, London.

Graham, J.S.D., R.K.Morton and J.K. Raison 1963. *Aust. J. Biol.Sci. 16* : 375-394.

Graham, D., M.D. Hatch, C.R. Slack and R.M. Smillie. 1970. *Phytochem.* 9 : 521-532.

Grahl, A. 1965. Landbou forsch. 15 : 97-106.

Grant, U. J., W.H. Hatheway, D.H. Timothy, D. C, Cassalottand L.M.Roberts. 1963 Publ. Nat. Res. Council Nat. Acad. Sci. Washington, No. 1136.

Grasmanis, V.O. and K.P. Barley. 1969. *Aust. J. Biol. Sci. 22* : 1313-1320.

Greacen, E.L. and J.S. Oh. 1972. *Nature New Biol. 235* : 24-35.

Green, D.E., E.L. Pinnell, L.E. Cavanah and L.F. Williams. 1965. *Agron. J. 57* : 165-168.

Green, H.A.L. and I.C. Anderson. 1965. *Crop Sci. 5* : 229-232.

Gregory, F.G. 1917. Third Ann. Rep. Exptl. and Res. Sta. Cheshunt. pp. 19-28.

Gregory, F.G. 1928. *Ann. Bot. 42* : 369-507.

Gregory, L.E. *Encyl. Pl. Physiol. 15* : 1328-1354.

Grobman, A.W., W. Salhuano, R. Sevilla and P.C. Managels dorf. 1962. Publ. Nat. Res. Concil. Nat, Acad. Sci. Washington No. 915.

Guardiola, J.L. and J.F. Sutcliffe. 1971a. *Ann. Bot. 35* : 791-807.

Guardiola, J.L. and J.F. Sutcliffe. 1971b. *Ann. Bot. 35* : 809-823.

Guardiola, J.L. and J.F. Sutcliffe. 1972. *J. Ex p. Bot. 23* : 322-337.

Guinn, G. and R.E. Hunter. 1968. *Crop Sci. 8* : 67-70.

Hackett, C. 1973. *Aust. J. Biol. Sci. 26* : 1057-1071.

Hall, V.L., J.M. Sims and T.H. Johnston. 1968. *Agron, J. 60* : 450-453.

Hall, H.K. and J.A. McWha. 1981. *Ann. Bot. 38* : 419-429.

Hallauer, A.R. and W.A. Russell. 1962. *Crop Sci. 2* : 289-294.

Halse, N.J. and R.N. Weir. 1970. *Aust. J. Agric Res. 21* : 383-393.

Ham, G.J. 1970. Report of Water Research Foundation of Australia. No. 32.

Hanif, M. and R.H.M. Langer. 1972. *Ann. Bot. 36* : 721-727.

Hansen, W.R. 1972. Ph.D. Thesis. Iowa state Univ.

Hanson, W.D., R.C. Leffel and R. Howell. 1961. *Crop Sci. 1* : 121-126.

Hanson, W.D. 1971. *Crop Sci. 11* : 334-339.

Hanway J.J. and C.R. Weber. 1971. *Agron. J. 63* : 227-230.

Hanway, J.J. and C.R. Weber. 1971a. *Agron. J. 63* : 227-230.

Hanway, J.J. and C.R. Weber. 1971b. *Agron. J. 63* : 263-266.

Hanway, J.J. and C.R. Weber. 1971c. *Agron. J. 63* : 286-290.

Hanway, J.J. and C.R. Weber.1971d. *Agron. J. 63* : 406-408.

Hardman, L.L. and W.A. Brun. 1971. *Crop Sci. 11* : 886-888.

Hardy, P.J. and G. Norton. 1968. *New Phytol. 67* : 139-143.

Hardy, R.W.F., R.C. Burns and R.D. Holsten. 1973. Soil. Biol. Biochem. 5 : 47-81.

Hardland, S.C. 1961. Biograph. Mem. Fellows Roy. Soc. 7 : 1-16.

Harper, J.E., J.C. Nicholas and R.H. Hageman. 1972. *Crop Sci. 12* : 382-386.

Hartt, C.E. 1972. *Plant Physiol. 49* : 569-571.

Hashimoto, K. and R. Yamamoto. 1970. *Proc. Crop. Sci. Soc. Japan 39* : 164-170.

Hashimoto. K. 1971. Hokkaido Nat. Agr. Exp. Sta. Res. Bull. 99 : 17-29.

Hartting. W., W.M. Kaiser and C. Burseckka. 1983.Z. pflanzenphysiol. 112 : 131-138.

Hatch. M.D. and C.R. Slack. 1970. *Ann. Rev. Pl. Physiol. 21* : 141-162.

Harvey, D.M. 1971. *Ann. Report. John Innes Institute, England 62* : 35.

Haupt, W. 1969. *In* : The Induction of Flowering. ed. L.T. Evans, MacMillan pp. 393-408.

Hawkev, J.S. 1965. *Aust. J. Biol. Sci. 18* : 959-969.

Hayashi, K. and H. Ito. 1962. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 30 : 329-334.

Hayashi, K. 1966. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 35 : 205-211.

Hayashi, K. 1972, *Bull. Nat. Inst. Agr. Sci. Japan Ser. D. 23* : 1-67.

Head ford, D.W. R. 1962. *Eur. Potato J. 5* : 14-22.

Heath, O.V.S. and F.G. Gregory, 1938. *Ann. Bot. 2* : 811-818.

Heilmann. B., W. Hartung and H. Gimmler. 1980. Z. Pflanzenphysiol. 97 : 67-78.

Helback, H. 1950. Tollund mandens sidste maaltid Araboger for Nordisk Olkdkyndighed og Historie.

Hellmuth, E.O. 1971. *Photosynthetica 5* : 190-194.

Henson, I.E. 1983. *Ann. Bot. 52* : 247-255.

Henson, I.E. 1985. *J. Exp. Bot. 36* : 1232-1239.

Herner, R.C. 1969. Diss. Abstr. 29 : 2316B.

Hesketh. J.D. and D.N. Moss. 1963. *Crop Sci. 3* : 107-110.

Hesketh. J.D and A. Low. 1968. Cott. Gr. Rev. 45 : 243-257.

Hesketh, J.D. 1968. *Aust. J. Biol. Sci. 21* : 235-241.

Hesketh. J.D., D.N. Baker and W.G. Duncan. 1971. *Crop Sci. 11* : 394-398.

Hesketh J.D. and D.N. Baker. 1969. *J. Ariz. Acad. Sci. 5* : 216-221.

Hesketh, J.D., D.N. Baker and W.G. Duncan. 1972. *Crap Sci. 12* : 436-439.

Hesketh, J.D., S S. Chase and D.K. Nanda. 1969. *Crop Sci. 9* : 460-463.

Hicks, D.R and J.W. Pendleton. 1969. *Crop Sci. 9* : 435-437.

Hidaka, N. 1968. Bull. *Nat. Inst. Agr. Sci. Japan Ser. A. 15* : 1-175.

Hofstra, G. and C.D. Nelson. 1969. *Planta, Berl. 88* : 103-112.

Hoffman, G.J., S.L. Rawlins, M.J. Garber and E.M. Cullen. 1971. *Agron. J. 63* : 822-826.

Holmgren, P., P.G. Jarvis and M.S. Jarvis. 1965. *Pysiol. Planta. 18* : 557-573.

Honoya, K 1961. Tohku Agr. Expt. Sta. Bull. 21 : 1-143.

Hornberger, R. 1885. Landw. *Versuch. 31* : 415.

Hoshikawa. K. 1959. *Proc. Crop Sci. Soc. Japan 28* : 291-295.

Hoshikawa, K. 1961a. *Proc. Crop Sci. Soc. Japan 30* : 228-231.

Hough, H.N. 1978. ADAS Quarterly Review 31 : 217-221.

Howell, R.W. and J.L. Cartter. 1958. *Agron. J. 50* : 664-667.

Hozumi, K., H. Koyami and T. Kira. 1955. J. Inst. Polytechnics Osaka city Univ. Ser. D6 : 121-130.

Hozyo, Y., S. Kato and H. Kobayashi. 1972. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 41 : 420-425.

Hsia, C., S. Waon and F. Wong. 1963. *Acta Bot. Sin. 11* : 338-349.

Hsio, T.C. 1973.*Ann. Rev. Plant Physiol. 24* : 519-570.

Hsio, T.C. and E. Acevedo. 1974. *Agric. Meteorol. 14* : 59-84.

Hsio, T.C., E. Acevedo, E. Fereres and D.W. Henderson. 1976. Phil. Trans. R. Soc. London B273 : 479-500.

Hsio, T.C., J.C. O'Toole, E.B. Yambao and N.C. Turner. 1984. *Plant Physiol. 75* : 338-341.

Hubbell, D.H. and G.H. Elkan. 1967. *Can. J. Microbiol. 13* : 235-241.

Hubick, K.T., J.S. Taylor and D.M. Reid. 1986. *Plant Growth Regul. 4* : 139-152.

Hughes, A.P. and P.R. Freeman. 1967. *J. Appl. Ecl. 4* : 553-560.

Humbert, R.P. 1968. The Growing of Sugarcane. American Elsevier Pub. Co. Inc. New York. p. 779.

Hume, D.J. and D.K. Campbell. 1972. *Can. J. Plant Sci. 52*: 363-368.

Humphries, E.C. and P.W. Dyson. 1967. *Eur. Potato J. 10* : 116-126.

Hunt, R. and I.T. Parsons. 1974. *J. Appl. Ecol. 11* : 297-307.

Hunter, R.B., T.B. Daynard, J.W. Tanner, J.D. Curtis and L.W. kannenberg. 1969. *Crop Sci. 9* : 405-406.

Hurd, E.A. 1968. *Agron. J. 60* : 201-205.

Hussain, S.M. and L. Linck. 1966. *Physiol. Plant. 19* : 992-1010.

Hussain, S.M. 1967. Diss. Abstr. 27 : 4258B.

Hymowitz, T. 1970. *Econ. Bot. 24* : 408-421.

Inada, K. 1967. *Bull. Nat.Inst. Agr. Sci. Japan Ser.* D16 : 19-156.

Ishibara, A. 1956. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 24 : 211.

Islam, M.M. and N.K. Paul. 1985. *J. Bangladesh Acad. Sci.* 9 : 201-206.

Islam, M.R., P.B. Kundu and N.K. paul. 1988. *Crop Res. 1* : 194-204.

Ishihara, A. 1961. *Proc. Crop Sci. Soc. Japan 30* : 88-92.

Ishizuka, Y. and A. Tanaka. 1963. Studies on the nutrio-physiology of the rice plant. Yokendo, Tokyo.

IRRI. 197. *In* : Annual report of Inter. Rice Res. Inst. for 1969, The Philippines. pp. 118-119.

Irvine, J.E. 1967. *Crop sci. 7* : 297-304.

Jain, T.C. and K.C. Jain. 1979. *Indian J. Agric. Sci. 49* : 470-472.

Jarvis, P.G. and T.A. Mansfield. 1981. Stomatal Physiology. Cambridge Univ. Press.

Jean, F.C. 1928. *Bot. Gaz. 86* : 319-329.

Jenner, C.F. 1968. *Aust. J. Biol. Sci. 21* : 597-608.

Jenner, C.F. and A.J. Rathjen. 1972. *Ann. Bot. 36* : 743-74.

Jennings, A. C. and R.K. Morton. 1963a. *Aust.J. Biol. Sci. 16* : 318-331.

Jennings, A. C. and R. K. Marton. 1963b. *Aust. J. Biol. Sci. 16* : 332-341.

Jennings, P.R. 1967. *Crop Sci. 4* : 13-15.

Jensen, N.F. 1964. *Science 157* : 1405-1409.

Jewiss, O.R. 1972. *J. Brit. Grassl. Soc. 27* : 65-82.

Joarder, O.I., N.K. Paul and S.K. Ghose. 1979. *Expl. Agric. 15* : 299-302.

Johnson, H.W., H.A. Borthwick and R.C. Leffel. 1960. *Bot. Gaz. 122* : 77-95.

Johnson, B. L. and O.Hall. 1965. *Amer. J. Bot. 52* : 506-573.

Johnson, V.A., P.J. Mattern and J.W. Schmidt. 1967. *Crop Sci. 7* : 664-667.

Johnson, D.R. and J .W. Tanner. 1972. *Crop Sci. 12* : 482-485.

Johnston, T.J., J.W. Pendelton, D.B. Peters and D.R. Hicks. 1969. *Crop Sci. 9* : 577-581.

Jolliffe, P.A. and E.F. Tregunna. 1968. *Plant Physiol. 43* : 902-906.

Jones, V.M. and D. Boulter. 1968. *New Phytol. 67* : 925-934.

Jordan, W.R. 1970. *Agron. J. 62* : 699-701.

Jordan, W.R. and J.T. Ritchie. 1971. *Plant Physiol. 48* : 783-788.

Jordan, W.R., W.A. Dugas and P.J. Shouse. 1983. *In* : Plant production and Management Under Drought Conditions. eds. J.F. Stone and W.O. Wills. Elsevier, Amsterdam. pp. 281-299.

Juliano, B.O. and J.E. Varner. 1969. *Plant Physiol. 44* : 886-892.

Junges. W. 1959. *Z. fur pflazenz. 41* : 103-122.

Kapoor, B.M. 1966. *Genetica. 37* : 557-568.

Kato, I. and S. Sakaguchi. 1954. *Tokai-kinki Nat. Agr. Exp. Sta. Bull. 1* : 115-132.

Kato, I., S. Sakaguchi and Y. Naito. 1954. *Tokai-Kinki Nat. Agr. Exp. Sta. Bull. 1* : 96-114.

Kato, I., S. Sakaguchi and Y. Naito. 1955. *Tokai-Kinki Nat. Agr. Exp. Sta. Bull. 2* : 59-168.

Kato, I. 1967. *Tokai-Kinki Nat. Agr. Exp. Sta.* p. 14.

Kellogg, C.E. and A.C. Orvedal. 1968. *War on Hunger. 2* : 14-17.

Khan, M.A. and M. Tsunoda. 1970. *Jap. J. Breed. 20* : 305-314.

Khan, M.A. and S. Tsunoda. 1970. *Jap J. Breed. 20* : 133-140.

Kiesselbach, M. 1949. Res. Bull. Univ. Nebr. Agr. Expt. Sta. 161.

Kiltz, H. 1909. Bot. Zbl. 110 : 455-456.

King, R.W. and L.T. Evans. *Aust. J. Biol. Sci. 20* : 623-635.

King, R.W., I.F. Wardlaw and L.T. Evans. 1967. Planta, Berl. 77. 261-276.

King, E.E. and H.C. Lane. 1969. *Plant Physiol. 44* : 903-906.

Kishida, K. 1970. Proc General Meet. Soc. Agr. Meteor. Japan. pp. 25-26.

Knott, D.R. and B. Talukdar. 1971. *Crop Sci. 11* : 280-283.

Kollotfel, C. and J.V. Sluys. 1970. *Acta Bot. Neerl. 19* : 503-508.

Kortschak, H.P., C.E. Hartta nd G.O. Burr. 1965. *Plant Physiol. 40* : 209-213.

Koyama, T., A. Miyasaka and K. Eguchi. 1962. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 30 : 143-145.

Kozloski, T.T. (ed.) 1972. Water Deficits and Plant Growth. Vol. III. Academic Press, New York.

Kramer, P.J. and T.T. Kozloski. 1979. *Physiology of Woody Plants.* Academic Press, New York.

Kramer, P.J. 1980. *In* : Adaptation of Plants to Water and High Temperature Stress. eds. N.C. Turner and P.J. Kramer. Wiley, New York. pp. 7-20.

Krautsova, B.Y. 1957. Dokl. Akad.Nauk. *SSSR 115* : 822-825.

Krekule, J. 1964. *Biol. Planta. 6* : 299-305.

Kreusler, U., A. Prehn and G. Becker. 1877. Landw. Jahrb. 6 : 759-786.

Kriedeman, P. 1966. *Ann. Bot. 30* : 349-363.

Kumura, A. 1956. Proc. Crop. Sci. Soc. Japan 24 : 177-180.

Kumura, A. 1960. *In* : Experimental methods in crop science. vol. ii. eds. Y. Togari, T. Matsuo, M. Hatamura, N. Yamada, T. Harada and N. Suzuki. Nogyo-gijutsu-kyokai, Japan. pp. 195-274.

Kumura, A. and T. Takeda. 1962. *Proc.* Crop Sci. Soc. Japan 30 : 261-265.

Kumura, A. and I. Naniwa. 1965. *Proc.* Crop Sci. Soc. Japan 33 : 467-472.

Kundu, P.B., K.M. Roy and N.K. Paul. 1989. *Crop Res. 2* : 131-136.

Kundu, P.B., R.K. Mondal, S.C. Biswas and N.K. Paul. 1991. *Rajshahi Univ. studies 19* : 37-45.

Laetsch, W.M. and H.P. Kortschak. 1971.*Plant Physiol. 49* : 1021-1023.

Laing, D.R. 1966. Ph.D. Thesis. Iowa state Univ.

Landsberg., J.J. and G.B. James. 1971. *J. Appl. Ecol. 8* : 729-742.

Lang, A. 1952. *Ann. Rev.Plant Physiol. 3* : 265-306.

Langer, R.H.M. and F.K.Y. Liew. 1973. *Aust. J. Agric. Res. 24* : 647-656.

Langer, R.H.M. and M. Hanif. 1973. *Ann. Bot. 37* : 743-751.

Lapwood, D.H., G.A. Hide and J.M. Hirst. 1967. *Pl. Path. 16* : 61-63.

Larson, L.A. 1968. *Plant Physiol. 43* : 255-259.

Larson, L.A. and L. Kyagaba. 1969. *Can. J. Bot. 47* : 707-709.

Larsarides, D.L. 1967. *Eur. Potato J. 10* : 100-107.

Lawlor, D.W. 1969. *J. Exp. Bot. 20* : 895-911.

Leblova, S., I. Zimakova,D. Sofrova and J. Barhtova. 1969. *Biol. Plant. 11* : 417-423.

Lee, J.H. and Y. Ota. 1971. *Proc.* Crop Sci. Soc. Japan 40 : 217-222.

Leffel, R.C. 1961. Marylant Agr. Exp. Sta. Bull. A-117 : 69.

Leopold. A.C. and F.S. Guernsey. 1954. Amer. J. Bot. 41 : 181-185.

Levitt, J. 1972. Responses of Plants to Environmental Stress. Academic Press, New York.

Lewis, O.A.M. and J.S. Pate. 1973. *J. Exp. Bot. 24* : 596-606.

Lie, T.A. 1969. *Plant and Soil 31* : 391-406.

Lie, T.A. 1971. *Plant and Soil 34* : 751-752.

Linck, A.J. 1961. *Phytomorphology II* : 79-84.

Linke, R.D. and N.G. Marinos. 1970. *Aust. J. Biol.Sci. 23* : 1125-1131.

Lipsett, J. 1963. *Aust. J. Agric. Res. 14* : 303-314.

Liu, M.C. and H.H. Hadley. 1971. *Crop Sci. 11* : 467-471.

Locke, L.F. and J.A. Clark. 1924. *J. Amer. Soc. Agron. 16* : 261-268.

Loomis, R. S. W. A. Williams, 1963. *Crop Sci 5*: 67-72.

Loomis, R.S. and W.A. Williams, W.G. Duncan, A. Dourat and A.F. Nuner. 1968. *Crop Sci. 8* : 352-356.

Lpatecki, L.E., E.L. Longair and R. Kasting. 1962. *Can. J. Bot. 40* : 1223-1228.

Lovell, P.H. and A. Booth. 1967. *New Phytol. 66* : 525-537.

Lovell, P.H. 1969. *Physiol. Plant 22* : 506-515.

Lovell, P.H. and A. Booth. 1969. *New Phytol. 68* : 1175-1185.

Low, A., J.D. Hesketh and H. Muramoto. 1969. Cott. Gr. Rev. 46 : 181-188.

Lowe, L.B. and S.K. Ries. 1972. *Can. J. Plant Sci. 52* : 157-164.

Lowe, L.B., G.S. Ayers and S.K. Ries. 1972. *Agron. J. 64* : 608-611.

Ludlow, M.M. 1980. *In* : Adaptive significance of stomatal responses to water stress. eds. N.C. Turner and P.J. kramer. pp. 123-138.

Lugt, C., K.B.A. Bodlaender and G. Goodijk. 1964. Eur. Potato J. 7 : 219-227.

Lupton, F.G.H. 1966. *Ann. Appl. Biol. 57* : 335-364.

Lupton, F.G.H. and M.J. Pinthus. 1972. *Nature, Lond. 221* : 483-484.

Madec, P. 1963. Proc. 10th Ester Sch. Agric. Sci. Univ. Nottingham 121-130.

Madec, P. 1964. Proc. 2nd. Trienn. Conf. EAPR, 1963. pp. 36-39.

Madec, P. and P. Perennec. 1969. *Eur. Potato. J.* 12 : 96-115.

Maeda, K. 1960. Proc. Crop. Sci. *Soc. Japan. 29* : 158-160.

Mague, T.H. and R.H. Burris. 1972. *New Phytol. 71* : 275-286.

Majernik, O. and T.A. mansfield. 1972. *Environ. Pollut. 3* : 1-7.

Mann, J.D. and E.G. Jawoski. 1970. *Crop Sci. 10* : 620-624.

Mansfield, T.A. 1976. *In* : Commentaries in Plant Science. ed. H. Smith. Pergamon Press. Oxford. pp. 13-22.

Mansfield, T.A. (ed.). 1976. Effects of air Pollution on Plants. Cambridge Univ. Press.

Mansfield, T.A. 1983. *Sci. Prog. Oxf. 68* : 519-542.

Maretzki, A. and A. De la Crus. 1967. *Plant and Cell Physiol. 8* : 605-611.

Mason, T.S. and E.J. Maskell. 1928. *Ann. Bot. 42* : 189-253.

Mathur, O.P. and P.S. Tomar. 1972. *Indian J. Agron. 17* : 306-308.

Matin, M.A., M.A. Hossain and M.A.S. Miah. 1988. *Bangladesh J. Sugarcane. 10* : 108-110.

Matsuo, T. 1959. Min. Agr. For. Japan p. 128.

Matsushima, S. 1957. *Bull. Nat. Inst. Agr. Sci. Japan Ser. A. 5* : 1-271.

Matsushima, S. and T. Manaka . 1959. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 27 : 432-434.

Matsushima, S. and T. Manaka. 1961. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 29 : 202-206.

Matsushima, S. and T. Manaka. 1963. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 29 : 202-206.

Matsushima, S. and T. Manaka. 1963. Proc. crop Sci. Soc. Japan 32 : 44-47.

Milburn, J.A. 1979. *Water Flows in Plants*. Longmans, London.

Millerd, A. and J.R. McWilliam. 1968. *Plant Physiol. 43* : 1967-1972.

Miller, A.A. and W.R.Gardner. 1972. *Agron. J. 64* : 559-562.

Milthorpe, F.L. 1963. Proc. 10th Easter Sch. Agric. Sci. Univ. Nottingham 3-16.

Milthorpe, F.L. and J. Moorby. 1969. *Ann. Rev. Plant Physiol. 20* : 117-138.

Milthorpe,F.L. and J. Moorby. 1974. *An Introduction to Crop Physiology*. Cambridge Univ. Press.

Minchin, F.R. and J.S. Pate. 1973. *J. Exp. Bot. 24* : 259-271.

Minotti, P.L. and W.A. Jackson. 1970. *Planta 94* : 36-44.

Misra, S.R., R.S. Ram and K. Singh. 1987. *Indian J. Agric. Sci. 57* : 267-270.

Mitchell, D.J. and R.G.S. Bidwell. 1970. *Can. J. Bot. 48* : 2001-2007.

Mitchell, R.L. and W.J. Russell. 1971. *Agron. J. 63* : 313-316.

Mittelheuser, C.J. and R.F.M. Steveninck. 1971. *Planta 97* : 83-86.

Mohapatra, N., E.W. Smith, R.C. Fifes and G.R. Noggle. 1970. Biochem. Biophy. Res. comm. 40 : 1253-1258.

Moll, A. 1968. *Flora, Jena 159* : 277-292.

Moll, A. 1970. Biochem. Physiol.Pflanzen 161 : 74-80.

Mondal, R.K. and N.K. Paul. 1994. *Bangladesh J. Bot. 23* : 123-126.

Mongelard, J.C. and L. Mimura. 1971. *Crop Sci. 11* : 795-800.

Mongelard, J.C. and L. Mimura. 1972. *Crop Sci. 12* : 52-58.

Monsi, M. and T. Saeki. 1953. *Jap. J. Bot. 14* : 22-52.

Monteith, J.L. 1977. *In* : In Agricultureal Efficiency. The Royal Society, London.

Moomaw, J.C., P. Baldazo andL. Lucas. 1967. IRC Newsletter Special Issue. pp. 18-25.

Moorby, J. and S. McGrow. 1966. *Ann. Appl. Biol. 54* : 159-170.

Moorby, J. 1967. *Eur. Potato J. 10* : 189-205.

Moorby, J. 1968. *Ann. Bot. 32* : 57-68.

Moorby, J. 1970. *Ann. Bot. 34* : 297-308.

Moore, T.C. and E.K. Bonde. 1962. *Plant Physiol. 37* : 149-153.

Moore, T.C. 1964. *Plant Physiol. 39* : 924-927.

Moore, T.C. 1965. *Nature, Lond. 206* : 1065-1066.

Morgan, J.M. 1984. *Ann. Rev. Plant Physiol. 35* : 299-319.

Morgan, J.M. and R.W. King. 1984. *Aust. J. Plant Physiol. 11* : 143-150.

Moraghan, B.J. 1970. Ph.D. Thesis. Iowa state Univ.

Morris, D.A. 1966. *Eur. Potato J. 9* : 69-85.

Morrison, J.W. 1955. *Can. J. Bot. 33* : 168-176.

Morris, D.A. 1967. *Eur. Potato J. 10* : 296-311.

Mortimore, C.G. and G.M. Ward. 1964. *Can. J. Plant Sci. 44* : 451-457.

Moss, D.N., E.G. Krezer and W.A. Brun. 1969. *Science 164* : 187-188.

Mulchi, C.L., R.J. Volk and W.A. Jackson. 1971. *In* : Photosynthesis and Photorespiration. eds. M.D. Hatch, C.B. Osmond and R.O. Slatyer. Wiley Interscience, New York. pp. 35-50.

Mulder, E.G. 1948. *Plant and Soil 1* : 179-212.

Mukherjee, N. 1979. Proc. Ann. Con. Sug.Techin. Asso. India. 43 : 37-43.

Munns, R. and A. TerMaat. 1986. *Aust. J. Plant Physiol. 13* : 143-160

Muramoto, H., J.D. Hesketh and C.D. Elmore. 1967. Proc, Cotton Physiology Defoliation Conf. pp. 161-165.

Muramoto, H., J.D. Hesketh and D.N. Baker. 1971. *Crop Sci. 11* : 189-591.

Murata, Y. and A. Osada. 1958. Proc. *Crop Sci Soc. Japan 27* : 12-14.

Murata, Y. 1961. *Bull. Nat. Inst. Agr. Sci. Japan Ser. D. 9* : 1-169.

Murata, Y. 1964a. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 33 : 59-63.

Murata, Y. 1964b. *In* : Mineral nutrition in rice plants. IRRI. Johns Hopkins Press. pp. 385-400.

Murata, Y., J. Iyama, M. Himeda, S. Izumi, A. Kawabe and Y. Kanzaki. 1966. *Bull. Nat. Inst. Agr. Sci. Japan Ser.* D. 15 : 1-53.

Murata, Y. 1969. *In* : Physiological aspects of Crop yield, eds. J.D. Eastin, F.A. Haskins, C.Y. Sullivan and C.H.M. Van Bavel, ASA and CSSA, Madison, Wisconsin.

Murata, Y. and Y. Togari. 1972. Proc. *Crop Sci. Soc. Japan 41* : 372-387.

Murayama, N. 1971. Nogyo-oyobi-engei 46 : 145-149.

Murtaza, M.G. and N.K. Paul. 1989. *Bangladesh J. Agri. 14* : 163-168.

Nagato, K. and F.M. Chaudhury. 1969. Proc. Crop Sci Soc. Japan 38 : 425-433.

Naidu, K.M. and K.V. Bhagyalaksmi. 1967. Current Sci. 36 : 555-556.

Nakaina, M. and T. Asahi. 1972. *Plant Cell Physiol. 13* : 101-110.

Nakayama, H. 1969. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 38 : 338-341.

Namken, L.N. 1964. Siol. Sci. Soc. Amer. Proc. 28 : 12-15.

Namken, L.N. 1965. *Agron. J. 57* : 38-41.

Natr, L. 1963. Rostl. Vyroba. 13 : 797-818.

Nawa, Y. and T. Asahi. 1971. *Plant Physiol. 48* : 671-674.

Neales, T.F., M.J. Anderson and I.F. Wardlaw. 1963. *Aust. J. Agric. Res. 14* : 725-736.

Neales, T.F. and J.A. Davies. 1966. *Aust. J. Biol. Sci. 19* : 471-480.

Nelson, C.D. 1963. *In* : Environmental control of plant growth. ed. L.T. Evans. Academic Press. New York. pp. 149-172.

Neuffer, M.G., L. Jones and M.S. Zuber. 1968. The Mutants of Maize. Crop Sci. Soc. Amer. Madison.

Norton, G. and J.F. Harris. 1975. *Planta 123* : 163-174.

Nutman, P.S. 1956. *Biol. Rev. 31* : 109-151.

Oghoghorie, C.G.O. 1971. ph.D. Thesis. Univ. Belfast.

Oghoghorie, C.G.O. and J.S. Pate. 1971. Plant and Siol. Special vol. 185-202.

Ogren, W.L. and G. Bowes. 1971. *Nature New Biol. 230* : 159-160.

Ohad, I., I. Friedburg, Z. Neéman and M. Schramm. 1971. *Plant Physiol.* 47 : 465-477.

Ohlrogge, A.J. 1958. *Plant Food Rev. 4* : 4-6.

Ojima, M., J. Fukui and I. Watanabe. 1965. *Proc. Crop. Sci. Soc. Japan 33* : 437-442.

Ojima, M. and J. Fukui. 1966. Proc. Crop. Sci Soc. Japan 34 : 448-152.

Ojima, M. and R. Kawashima. 1968. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 37 : 667-675.

Okajima, H. 1960. *Tohku Univ. Inst. Agr. Res. Bull. 12* : 1-146.

O'Kelly, J.C. 1953. *Plant Physiol. 28* : 281-286.

Osada, A. and Y. Murata. 1965. Proc. Crop. Sci. Soc. Japan 33 : 460-466.

Osada, A., M. Nara, S. Dhammanuvong, H. Chakurabanthu, M. Rahony and M. Gesprosert. 1972. Proc. Crop Sci.Soc. Japan 41 : 87-88.

Osada, A. 1966. *Bull. Nat. Inst. Agr. Sci. Japan Ser. D. 14* : 117-188.

Pahlich, E. and K.W. Joy. 1971. *Can J. Biochem. 49* : 127-138.

Pandey, R.K. 1972. Ph.D. Thesis Univ. Illonois.

Parker, M.W. and H.A. Borthwick. 1943. Bot. Gaz. 104 : 612-619.

Passioura, J.B. 1972. *Aust. J. Agric. Res. 23* : 745-752.

Passioura, J.B. 1977. *J. Aust. Inst. Agric. Sci. 43* : 559-565.

Passioura, J.B. 1984. *Aust. J. Plant Physiol. 11* : 333-339.

Pate, J.S. 1958. *Aust. J. Biol.Sci. 11* : 366-381.

Pate, J.S. 1962. *Plant and Soil 17* : 333-356.

Pate, J.S., B.E.S. Gunning and L.G. Briarty. 1969. *Planta 85* : 11-34.

Patil, B.B. and R.De. 1978. *J. Agric. Sci., Camb. 91* : 257-264.

Paul, N.K. and A.M. Sarker. 1989. *Bangladesh J. Sci. Res. 7* : 145-154.

Paul, N.K. 1990a. Acta Agronomica Hungarica 39 : 31-36.

Paul, N.K. 1990b. Acta Agronomica Hungarica 39 : 37-42.

Paul, N.K. 1991. *Bangladesh J. Bot. 20* : 143-148.

Paul, N.K. and P.B. Kundu. 1991. Proc. Inte. Conf. Pl. Physiol. Benaras Hindu University pp. 35-42.

Paul, N.K. and D.K. Saha. 1992. *Crop Res. 5* : 249-255.

Pablov, A.N. 1969. Sel'khoz. *Biologia 4* : 230-235.

Pearce, R.B., G.E. Carlson, D.K. Barnes, R.H. Hart and C.H. Hanson. 1969. *Crop Sci. 9* : 423-426.

Peaslee, D.E., J.L. Rangland and W.G. Duncan. 1971. *Agron. J. 63* : 561-563.

Premdasa, M.A. 1982. *New Phytol. 90* : 209-219.

Pendleton, J.W., G.E. Smith, S.R. Winter and J.J. Johnston. 1968. *Agron. J. 60* : 422-424.

Penning de Vries, F.W.T. 1972. *In* : Crop Processes in Controlled environments. eds. A.R. Rees, K.E. Cockshull, D.W. Hand and R.G. Hurd. Academic Press. New York. pp. 327-346.

Perry, D.A. and J.G. harrison. 1970. *J. Exp. Bot. 21* : 504-512.

Peters, D.B. and L.C. Johnson. 1960. *Agron. J. 52* : 687-689.

Peters, D.B., J.W. Pendleton, R.H. Hageman and C.M. Brown. 1971. *Agron. J. 63* : 809-815.

Phillips, I.D.J. 1969. *In* : Physiology of plant growth and development ed. M.B. Wilkins. McGrow-Hill, New York. pp. 163-202.

Phillips, D.A. 1971. *Planta 100* : 181-190.

Phillips, D.A. and J.G. Torrey. 1972. *Plant Physiol. 49* : 11-15
Phillis, E. and T.G. Maskell. 1936. *Ann. Bot. 50* : 161-174.
Plaisted, P.H. 1957. *Plant Physiol. 32* : 445-453.
Pierce, M. and K. Raschke. 1980. *Planta 148* : 174-182.
Pinthus, M.J. and Y. Eshel. 1962. *Isreal J. Agric. Res. 12* : 13-20
Pinthus, M.J. 1963. *Crop Sci. 3* : 301-304.
Pinthus, M.J. and R. Osher. 1966. *Isreal J. agric. Res. 16* : 53-58
Pinthus, M.J. 1967. *Euphytica 16* : 231-251.
Powell, R.D. and P.W. Morgan. 1970. *Plant Physiol. 54* : 548-552
Pressey, R. and R. Shaw- 1966. *Plant Physiol. 41* : 1657-1661
Pressey, R. 1969. *Plant Physiol. 44* : 759-764.
Pressey, R. 1970. *Amer. Potato J. 47* : 245-251.
Puckridge, D.W. 1968. *Aust. J. Agric. Res. 19* : 191-201.
Puckridge, D.W. 1971. *Aust. J. Agric. Res. 22* : 1-9.
Puckridge, D.W. and D.A. Ratkowsky. 1971. *Aust. J. Agric. Res.* 22 : 11-20
Quarrie, S.A. and H.G. Jones. 1977. *J. Exp. Bot. 28* : 182-203
Radin,, J.W., L.L. Parker and G.Guinn. 1982. *Plant Physiol. 70* : 1066-1070
Radin, J.W. 1984. *Plant Physiol. 6* : 392-394.
Redley, R.W. 1963. *In* : The growth of the potato eds. J.D. Ivins and F.L. Milthorpe. Butterworth, London. pp. 211-220.
Radley, M. 1970. *Planta, Berl. 92* : 292-320.
Raja, V. and K.C. Bishnoi. 1990. *Exp. Agric 26* : 227-233
Raper, C.D. Jr. and S.A. barber. 1970. *Agron. J. 62* : 581-584.
Rappaport, L. and N. Wolf. 1969. Symp. Soc. Exp. Biol. 23 : 219-240
Raschke, K. 1975. Annu. Rev. *Plant Physiol. 26* : 309-340
Raschke, K. and R. Hedrich. 1985. *Planta, Berl. 163* : 105-118.
Rawson, H.M. and C.M. Donald. 1969. Aust. J. agric Res. 20 : 799-808
Rawson, H.M. 1970. *Aust. J. Biol. Sci. 23* : 1-16.
Rawson, H.M. 1971. *Aust. J. Biol. Sci. 24* : 829-841.
Rawson, H.M. and L.T. Evans. 1971. *Aust. J. Agric. Res.* 22 : 851-863
Rawson, H.M., J.E. Begg and R.G. Woodward. 1977. *Planta Berl. 134* : 5-10.
Reddy, B.N., M.N. Sinha and M.R. Hedge. 1988. *J. Oilseeds Res.* 5 : 36-44
Reitz, L.P. and S.C. Salmon. 1968. *Crop Sci. 8* : 686-689.
Rejowski, A. 1964. *Bull. Acad. Polon. Sci. Cl. V. 12* : 233-236
Revelle, R. 1966. Proc. Natl. Acad. Sci. 56 : 328-351.
Reynolds, J.D. 1960. *Agriculture 66* : 509-513.
Richards, F.J. 1959. *J. Exp. Bot. 10* : 290-300.
Richards, R.A. and J.B. Passioura. 1981. *Crop Sci. 21* : 249-252
Riddel, J.A. and G.A. Gries. 1958. *Agron. J. 50* : 739-742.
Rijven, A.H.G.C. and R. Cohen. 1961. *Aust. J. Biol. Sci. 14* : 552-566.

Rijven, A.H.G.C. 1972. *Acta Bot. Neerl. 21* : 381-386

Roach, B.T. 1968. Proc. Intern. Seo. Sugar Cane. Technol. 13 : [illegible]-654

Rowan, K.S. and D.H. Turner, 1957. *Aust. J. Biol. Sci. 10* : 414-4[illegible]

Roy, K.M. and N.K. Paul. 1991. Acta Agronmica Hungarica 4[illegible] : [illegible]

Russel, E.W. 1973. Siol Conditions and Plant Growth. Longman. London

Sabalvoro, E.G. 1965. M.Sc. Thesis. Univ. Nottingham.

Sabbe, W.E. and G.w. Cathey. 1969. *Agron. J. 61* : 436-43[illegible]

Sachs, T. 1966. *Ann. Bot. 30* : 447-456.

Sachs, T. 1968a. *Ann. Bot. 32* : 391-399.

Sachs, T. 1968b. *Ann. Bot. 32* : 781-790.

Sadler, E. 1961. Ph.D. Thesis. Univ. Nottingham.

Saeki, T. 1960. Bot. Mag., Tokyo 73 : 55-63.

Saghir, A.R., A.R. Khan and W. Worzella. 1968. *Agron. J. [illegible]* : [illegible].

Salim, M.H., G.W. Todd and A.M. Schlehuber. 1965. *Agron. J. [illegible]* : 603-607

Salter, P.J. and D.H. Drew. 1965. *Nature, Lond. 206* : 136-144

Saito, M., T. Yamamoto, K. Goto and K. Hashimoto. 1970. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 39 : 511-519.

Samitny, C. 1970. Ph.D. Thesis. Iowa State Univ.

Sampaio, I.B.M. and J. Dobereiner. 1968. Pesq. Agropec. Brasil. [illegible] : 255-2[illegible]

Sand stedt, R. 1971. *Physiol. Plant.* 24 : 408-410.

Sass, J.E. 1951. Iowa State College J. Sci. 25 : 509-512

Schalldach, I. and G. Schilling. 1966. Albrecht Thear Arch. [illegible] : [illegible].

Scrimshaw, N.S. 1966. *Proc. Natl. Acad. Sci. 56* : 352-359

Seko, H., K. Samoto and K. Suzuki. 1956. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 24 : [illegible]

Shain, Y. and A.M. mayer. 1968. *Plant Physiol. 21* : 765-776

Sharpe, P.R. and J.B. Dent. 1968. *J. Agric. Sci., Camb. 70* : 123-129.

Sharpe, R.E. and W.L. Davies. 1979. *Planta, Berl. 147* : 43-49.

Shaw, R.H. and H.C.S. Thom. 1951. *Agron. J. 43* : 541-546.

Shibles, R.M. and C.R. Weber. 1965. *Crop. Sci. 5* : 575-577

Shibles, R.M. and C.R. Weber. 1966. *Crop. Sci. 6* : 55-59.

Sibma, L. 1970. *Neth. J. Agric. Sci. 18* : 125-131.

Siemer, E.G. 1964. Ph.D. Thesis. Univ. Illonois

Simon, E.W. and R.M. Harun. 1973. *J. Exp. Bot. 23* : 1076-1085

Simpson, G.M. 1968. *Can. J. Plant Sci. 48* : 253-260.

Singh, O.S. and V.K. Sharma. 1972. Vitis. 11 : 131-134

Single, W.V. 1964. *Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb. 4* : 165-168

Sionit, N., B. Strain, H. Hellmers and P. Kramer. 1980. *Bot. Gaz. 142* : 191-196

Sironval, C. 1958. *Nature, Lond. 181* : 1272-1273

Slatyer, R.O. 1957. *Aust. J. Biol. Sci. 10* : 320-336.

Slater, J.W. 1963. Proc. 10th Easter Sch. Agric. Sci. Univ. Nottingham. [illegible]

Slatyer, R.O. 1967. *Plant Water Relationships*. Academic Press, London

Slater, J.W. 1968. *Eur. Potato J. 11* : 14-22.

Slomnicki, I. and I. Rylski. 1964. *Eur. Potato J. 7* : 184-192

Smillie, R.M. 1962. *Plant Physiol. 37* : 716-721.

Smith, D.L. and A.M. Flinn. 1967. *Planta, Berl. 74* : 72-85

Smith, E.W., R.C. Fites and G.R. Noggle. 1971. Cotton Defoliation Physiology Conference, Atlanta. pp. 47-54.

Snaith, P.J. and T.A. Mansfield. 1982. *J. Exp. Bot. 33* : 360-369.

Snow, R. 1937. *New Phytol. 36* : 283-300

Sofield, I., L.T. Evans and I.F. Wardlaw. 1974. *In* : Mechanisms of Regulation of plant Growth. Roy. Soc. Newzealand, Wellington

Soga, Y. and M. Nozaki. 1957. Proc. Crop. Sci. Soc. Japan 26 : 105-106.

Spiertz, J.H.J., B.A. ten Hag and L.J.P. Kupers. 1971. *Neth. J. Agric. Sci. 19* : 211-222.

Sprent, J.I. 1968. *Planta, Berl. 82* : 299-301.

Sprent, J.I. 1969. *Planta, Berl. 88* : 372-375.

Sprent, J.I. 1971a. *In* : Biological Nitrogen Fixation in Natural Habitats. eds. T.A. Lie and E.G. Mulder. Martinus Nijhoff. pp. 225-230

Sprent, J.I. 1971b. *New Phytol. 70* : 9-17.

Stanfield, B., D.P. Ormrod and F.H. Fletcher. 1966. *Can. J. Plant Sci. 46* : 195-203.

Stevenson, K.R. and R.H. Shaw. 1971a. *Agron. J. 63* : 17-19

Stevenson, K.R. and R.H. Shaw. 1971b. *Agron. J. 63* : 325-329

Stoy, V. 1963. *Physiol. Plant. 16* : 851-866.

Stoy, V. 1965. *Physiol. Plant. Suppl. 4* : 1-125

Streeter, J.G. 1972. *Agron. J. 64* : 315-319.

Suetsugu, I. Anaguchi, K. Saito and S. Kumano. 1962. Hokuriku Agr. Exp. Sta. Bull. 3 : 89-96.

Suge, H. and J. Hirano. 1962. Proc. Crop. Sci. Soc. Japan 31 : 129-134

Suge, H. and N. Yamada. 1965. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 33 : 330-334

Suge, H. and A. Osada. 1966. *Plant and Cell Physiol. 7* : 617-630

Sutcliffe, J. 1977. Plants and Temperature. Edward Arnold, London.

Swada, S. 1970. J. Fac. Sci. Univ. *Tokyo Sect. III Bot. 10* : 253-263

Syme, J.R. 1968. *Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb. 8* : 578-583.

Syme, J.R. 1969. *Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb. 9* : 528-531

Syme, J.R. 1970. *Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb. 10* : 350-353

Tarahashi, J., N. Murayama, M. Oshima, M. Yoshino and M. Yamagisawa. 1955. Bull. Nat. Inst. Agr. Sci. Japan Ser. B 4 : 85-122.

Takahashi, J., I. Iwata and I. Baba. 1959. Proc. Crop. Sci. Soc. Japan 28 : 22-24

Takeda, T. 1956. Proc. Crop. Sci. Soc. Japan 24 : 181-184

Takeda, T. and H. Murata. 1961. *Japan J. Bot. 17* : 403-437

Tamiya, H. 1957. Annu. Rev. *Plant Physiol. 8* : 309-334

Tanaka, A., S.A. Navasero, C.V. Garcia, F.T. Parao and E. Ramirez. 1964. IRRI Tech. Bull. 3 : 1-80.

Tanaka, A., K. Kawano and J. Yamaguchi. 1966. Int. Rice Res. Inst. Tech. Bull. 7 : 1-46.

Tanaka, A. and B.S. Vergava. 1967. IRC Newsletter Special Issue pp. 26-42

Tanaka, T., S. Matsushima, S. kajo and H. Nitta. 1969. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 38 : 287-293.

Takchevskii, I.A. and Y.S. Karpilov. 1963. *Soviet Plant Physiol. 10* : 183-184.

Tayo, T.O. and D.G. Morgan. 1975. *J. Agric. Sci. Camb. 85* : 103-110.

Teare, I.D. and C.J. Peterson. 1971. *Crop. Sci. 11* : 627-628.

Teare, I.D., A.G. Law and G.F. Simmons. 1972. *Can. J. Plant Sci. 52* : 89-94.

Temaat, A., J.B. Passioura and R. A. Olson . 1969. *Agron. J. 61*: 755-759. R. Munns 1985. Plant Physiol. 77 : 869-872.

Terman, G.L., R.E. Ramig, A.F. Dreir and R.A. Olson. 1969. Agron. J. 61 : 755-759

Thaine, R., S.L. Ovenden and J.S. Turner. 1959. *Aust. J. Biol. Sci. 12* : 349-372.

Tharp, W.H. 1960. The Cotton Plant. How It Grows. U.S.D.A. handbook No. 178.

Thomas, M.D. 1965. *In* : *Plant Physiology*. ed. F.C. Steward. Acadèmic Press. New York. pp. 9-202.

Thomas, R.O. and M.N. Christiaan sen. 1971. *Crop Sci. 11* : 454-456.

Thomas, K. and J.P. Grime. 1983. *J. Appl. Ecol. 20* : 141-156.

Throne, G.N. 1965. *Ann. Bot.* 29 : 317-329.

Thorne, G.N., M.A. Frod and D.J. Watson. 1967. *Ann. Bot. 31* : 71-101.

Thorne, G.N., M.A. Ford and D.J. Watson. 1968. *Ann. Bot. 32* : 425-446

Thornley, J.H.M. and J.D. Hesketh. 1972. *J. Appl. Ecol.* 9 : 315-317.

Torfason, W.E. and I.L. Nonnecke. 1959. *Can. J. Plant. Sci. 39* : 119-124.

Thoughton, A. 1962. Comm. Bur. Pastures and Field Crops., Hurley p. 91.

Throughton, J.H. 1969. *Aust. J. Biol Sci.* 22 : 289-302.

Trouse, A. 1970. Ann. Proc. Assoc. Southern Agric. Workers. p. 51.

Tsunoda, S. 1959. *Jap. J. Breed.* 9 : 237-244.

Tsunoda, S. 1960. *In* : Morphology and function of rice plant. ed. T. Matsuo. Nogyogijutsu-Kyokai, Tokyo, pp. 179-228.

Tsunoda, S. 1962. *Jap. J. Breed. 12* : 49-56.

Tsunoda, S. 1964. *In* : Mineral Nutrition of Rice Plants. IRRI. Johns Hopkins Press. Baltimore, Maryland.

Tsuno, Y. 1968. Proc. Symposium on comparative studies on the primary productivity of various terrestrial ecosystems. J. IBP. 1967. pp. 23-28.

Tsuno, Y. and K.Kotalado. 1970. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 39 Extra Issue 1 : 11-12.

Turner, N.C. 1979. *In* : *Stress Physiology of Crop Plants*. eds. H. Mussell and R.C. staples. Wiley, New York. pp. 343-373.

Turner, N.C. and D.P. Singh. 1984. *New Phytol. 96*: 187-195.

Turner, N.C., E.-D. Schulze and T. Gollan. 1984. *Oecologia 63* : 338-342.

Van Schaik, P.H. and A.H. Probst. 1958. *Agron. J. 50* : 192-197

Van Vliet, W.F. and H. Sparenbeg. 1970. *Potato Res. 13* : 223-227.

Van Volkenburg, E. and J.S. Boyer. 1985 *Plant Physiol. 77* : 190-194.

Varner, J.E., L.V. Balce and R.C. Huang. 1963. *Plant Physiol. 38* : 89-92.

Vernon, L.P. and S. Aronoff. 1952. *Arch. Biochem. Biophys.* 36 : 383-398.

Vernon, A.J. and J.C.S. Allison. 1963. *Nature, Lond. 200* : 814.

Viera da Silva, J. and Ch. Poisson. 1969. *Can. J. Genet. Cytol. 11* : 582-596.

Vierada Silva, J. 1972. *Physiol. Plant 25* : 213-220.

Virtanen, A.I. and A.M. Berg. 1954. *Acta. Chem. Scand. 8* : 1089-1090.

Vries, A.P. de. 1971. *Euphytica 20* : 152-170.

Wada, G. 1969. *Bull. Nat. Inst. Agric Sci. Japan Ser. A 16* : 23-107.

Waddle, B.M., C.F. Lewis and T.R. Richmond. 1961. Genetics 46 : 437-447.

Waggoner, P.E. 1969. *In* : Physiological aspects of crop yield. eds. J.D. Easton, F.A Haskins, C.Y. Sullivan and C.H.M. van Bavel ASA and CSSA. Madison

Waldron, J.C. 1966. M.Sc. Thesis. Univ. Queensland.

Waldron, J.C., K.T Glasziou and T.A. Bull. 1967. *Aust. J. Biol. Sci. 20* : 1043-1052.

Wang, T.D. and J. Wei, 1964. *Acta. Bot. Sinica 12* : 154-158.

Wankhede, N.P., I.P.S. Ahlawat and V.M. Salmi. 1970. *Indian J. Agric. Sci. 40* : 373-377.

Warldaw, I.F., D.J. Carr and M.J. Anderson. 1965 *Aust. J. Agric. Res. 16* : 895-901.

Wardlaw, I.E. 1963. *Aust. J. Biol. Sci. 20* : 25-36.

Wardlaw, I.F. 1970. *Aust. J. Biol.Sci. 23* : 765-676.

Wardlaw, I.F. 1971. *Aust. J. Biol. Sci. 24* : 1047-1058.

Wardlaw, I.E. 1974. *In* : Cereals in Australia eds. A. Lazenby and E.M. Matheson. Angus and Robertson.

Wardlaw, I.F. 1979. Proc. Agron. Soc. NZ. 9 : 39-48.

Watson, D.J. and E.C.D. Baptiste. 1938. *Ann. Bot.* 9 : 437-480.

Watson, D.J. 1947. *Ann Bot. 11* : 41-76.

Watson, D.J. 1942. *Adv. Agron. 4* : 101-145.

Watson, D.J. 1963. Proc. 10th Easter Sch. agric. Sci. Univ. Nottingham. pp. 233-247.

Watson, D.J., G.N. Thorne and S.A.W. French. 1963. *Ann. Bot. 27* : 1-22.

Watson, D.J. 1971. *In* : Potential Crop Production. eds. P.F. Wareing and J.P. Cooper. Heinemann, London. pp. 76-88.

Wattal, P.N. 1965. *Indian J. Plant Physiol. 8* : 145-159.

Weber, C.R. and B.E. Caldwell 1966. *Crop Sci. 6* : 25-27.

Weber, C.R., R.M. Shibles and D.E. Byth 1966. *Agron. J. 58* : 99-102.

Webster, R. and P.H.T. Beckett. 1972. *J. Agric. Sci. Camb. 78* : 329-358.

Weber, C.R. 1966. *Agron. J. 58* : 46-49.

Weibel, D.K. 1958. *Agron. J. 50* : 267-270.

Weiss, M.G., C.R. Weber, L.F. Williams and A.H. Probst 1955. *Agron. J. 47* : 289-297.

Welbank, P.J., S.A.W. French and K.J. Wilbs. 1966. *Ann Bot. 30* : 291-306.

Wells, B.R. and T.H. Johnston. 1970. *Agron. J.* *62* : 608-612

Wheeler, A.W. 1972. *Ann. Appl. Biol.* *72* : 327-334

Whiteman, P.C., T.A. Bull and K.T. Glasziou. 1963. *Aust. J. Biol. Sci.* *16* : 416-428

Willey, R.W. and R. Holliday. 1971a. *J. Agric. Sci. Camb.* *77* : 445-452

Willey, R.W. and R. Holliday. 1971b. *J. Agric. Sci. Camb.* *77* : 453-461

Williams, R.F. 1946. *Ann. Bot.* *10* : 41-72

Williams, R.F. 1960. *Aust. J. Biol. Sci.* *13* : 401-428

Williams, S.G. 1970. *Plant Physiol.* *45* : 374-381.

Willmer, C. 1983. *Stomata*. Longman. London.

Wolf, F.T. 1967. Z. *Pflanzenphysiol.* *57* : 128-133.

Wilson,D. and J.P. Cooper. 1969. *New Phytol.* *68* : 1115-1125

Wong, P.P. and H.J. Evans. 1971. *Plant Physiol.* *47* : 750-755

Woodbridge, C.G. 1969. *Proc. Ann. Soc. hort. Sci.* *94* : 542-544.

Woodruff, D.R. 1969. *Aust. J. Agric. Res.* *20* : 13-24

Woodworth, C.M. 1930. *J. Amer. Soc. Agron.* *22* : 37-50.

Wright, S.T.C. and R.W.P. Hiron. 1969. *Nature, Lond.* *224* : 719-720

Yabuki, K. and K. Kamotani.1971. *JIBP/PP-P*, Level III Experiments. Report 1970. pp 1-5.

Yang, S.I. and J.B. Chen. 1980. Proc. *ISSCT* *17* : 30-37

Yamada, N., Y. Murata, A. Osada and J. Iyama. 1954. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 23 : 214-222

Yamada, N., Y. Ota and K. Kushibuchi. 1957. *Proc. Crop Sci. Soc. Japan* *26* : [illegible]

Yamada, N., Y. Ota and T. Nakamura. 1961. Proc. Crop Sci. Soc. Japan 29 : 329-333

Yorke, J.S. and G.R. Sagar. 1970. *Can.* *48* : 699-704

Yoshida, S. and S.B. Ahn. 1968. *Soil Sci. Nutrition* *14* : 153-162

Yoshida, S. 1972. Annu. Rev. *Plant Physiol.* 23 : 437-464.

Yoshida, S., J.H. Cock and F.T. Parao. 1972. *In* : Rice Breeding. IRRI. Los Banos. pp 455-468.

Young, S.J. and E. De Jong. 1972. *Agron. J.* *64* : 574-578.

Zabadal, T.J. 1974. *Plant Physiol.* *53* : 125-127

Zee, S.Y. and T.P. O'Brien. 1971. *Aust. J. Biol. Sci.* 24 : 35-49.

গ্রন্থপঞ্জি

Bewley, J. D. and M. Black. 1978. *Physiology and Biochemistry of Seeds*. vol. I. Springer-Verlag.

Byrant, J. A. 1985. *Seed Physiology*. Edward Arnold.

Eastin, J. D., F. A. Haskins, C. Y. Sullivan and C. H. M. Van Bavel (eds.). 1969. *Physiological Aspects of Crop Yield*. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Madison.

Evans, L. T. (ed.) 1975. *Crop Physiology : Some Case Histories*. Cambridge University Press.

Evans, L. T. (eds.). 1963. *Environmental Control of Plant Growth*. Academic Press.

Fitter, A. H. and R. K. M. hay. 1987. *Environmental Physiology of Plants*. Academic Press.

Grace, J. 1983. *Plant Atmosphere Relationshhips*. Chapman and Hall.

Harper, F. 1983. *Principles of Arable Crop Production*. Granada.

Hunt, R. 1978. Plant Growth Analysis. Edward Arnold.

Johnson, C. B. (ed.). 1981. *Physiological Processes Limiting Plant Productivity*. Butterworth.

Jones, H. G. 1983. *Plants and Microclimate*. Cambridge University Press.

Kramer, P.J. 1969. *Plant and Soil Water Relationships*. A Modern Synthesis. McGraw Hill.

Landberg, J. J. And C. V. Cutting (eds.) 1977. *Environmental Effects on Crops Physiology*. Academic Press.

Larcher, W. 1980. *Physiological Plant Ecology*. Springer Verlag.

Levitt, J. 1972. *Responses of Plants to Environmental Stresses*. Academic Press.

Meidner, H. and T.A. Mansfield. 1968. *Physiology of Stomata*. McGraw-Hill.

Milthorpe, F.L. and J. Moorby. 1979. *An Introduction to Crop Physiology*. Cambridge University Press.

Monteith, J. L. 1973. *Principles of Environmental Physics*. Edward Arnold.

Mudd, J. B. and T. T. Kozlowski (eds.) 1975. *Responses of Plants to Air Pollution*. Academic Press.

Neiburger, M., J. D. Edinger and W. D. Bonner. 1973. *Understanding our Atmospheric Environment*. Freeman.

Oke, T. R. 1978. *Boundary Layer Climates*. Methuen.

Petterssen, S. 1969. *Introductory to Meteorologes*. McGraw-Hill.

Rending, V. V. and H.M. Taylor. 1989. *Principles of Soil-Plant Interrelationships*. McGraw-Hill.

Rose, C.W. 1966. *Agricultural Physics*. Pergamon.

Russell E.W. 1973. *Soil conditions and Plant Growth.* Longman.

Shiv Raj. A. 1978. *An Introduction of Physiology of Field Crops.* Oxford & IBH Publishing Co.

Subbiah Mudaliar, V.T. 1984. *Principles of Agronomy.* Bangalore Printing and Publishing Co. Ltd.

Wareing, P. F. and J. P. Cooper (eds.) 1971. *Potential Crop Production.* London : Heinemann Educational Books.

Williers, T. A. 1975. *Dormancy and the Survival of Plants.* Edward Arnold.

BANSDOC Library
Accession No. 17830

BANSDOC Library
Dhaka

নিশীথ কুমার পাল (১৯৫০-), পি এইচ. ডি (উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য)। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত তিনটি গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে, সুইডেন-বাংলাদেশ পরিচালিত গবেষণা প্রকল্পে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ও পরবর্তীকালে প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর হিসেবে করেন। যুক্তরাজ্যের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এগ্রিকালচার-এ একাডেমিক স্টাফ ফেলো হিসেবে কাজ করেন। ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত অর্ধ-উষ্ণ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় শস্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রের ফেলো হিসেবে ও উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক বিজ্ঞানী হিসেবে এবং যুক্তরাজ্যের পরিবেশ সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শক বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ. ডি পর্যায়ের ৭টি ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ১৮টি থিসিস প্রোগ্রামের তত্ত্বাবধান করেন। ড. পালের প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা ১৩০টি এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের উপযোগী পাঠ্য বা পাঠ্যসহায়ক গ্রন্থের সংখ্যা এই গ্রন্থের দুটি খণ্ডসহ মোট ৮টি। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় তাঁর অনেক বিজ্ঞান-বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিবাহিত জীবনে ড. পাল দুই সন্তানের জনক।

পাপু
৪